মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা ;

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা;

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-প্রচার কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

ঐ দেখ, ঐ দেখ,—উমাসুন্দরীর মরণ-চিত্র দেখ ; কি ভয়াবহ ! কি আগুণের গড় ! ঐ দেখ, আমার পিতার মূর্ত্তি—চক্ষু দিয়া বাজের আগুণ বাহির হইতেছে ! অবসর, ৮৬ পৃষ্ঠা ।

আবাহন।

(আরম্ভ)

বঙ্গদেশ মাঝে কেন মহোৎসব আজ
রমণীয় বেশে কেন শরৎসুন্দরী
হরিৎ বরণ মাঠে ধরিয়াছে সাজ;
হাসিছে মুকুল সবে মাধুরী বিস্তারি?
বাগানে শেফালি পুষ্প ফুটিয়াছে কত;
সুবর্ণ চম্পক এবে কেন প্রস্ফুটিত?
মধুগন্ধে অন্ধ হ'য়ে মধুকর যত
ছুটিছে মধুর আশে হ'য়ে আনন্দিত।
চিরসুখী রসময় অপূর্ব্ব পারুল
ফুটেছে রক্তিম জবা হিঙ্গুল বরণে।
কেন আজি আনন্দিত বাঙ্গালী সকল?
কেন আনন্দের রেখা বিষন্ন বয়ানে?
গৃহে গৃহে কতরূপ কত আয়োজন।
বঙ্গের জীবনে কেন আনন্দের স্রোত?
ভারে ভারে কতরূপ খাদ্য অগণন
সংগ্রহ করিছে কেন বঙ্গবাসি যত?
কেন পলাইছে ওই গভীর নীরদ;
বিমল গগনে বসি তারকারপতি
স্নিগ্ধকর-রশ্মি দিয়ে বিনোদে বিনোদ
কেন আনন্দিত আজি কুমুদিনী সতী?
ছিল বঙ্গ এত দিন কর্দ্দমে আবৃত;
ভাস্কর কিরণে কেন হইল অমল?
ঝাঁট দিয়া গেল কেন মৃদুল মারুত

কর্দ্দম বারিতে পূর্ণ ছিল কল্লোলিনী
কুলু কুলু ধ্বনি করি যাইত বহিয়া,
নীরব হয়েছে কেন নাহি কল-ধ্বনি
কার জন্য স্বচ্ছবারি রেখেছে সঞ্চিয়া ?
কেন আনন্দিত বল বঙ্গবাসী আ'জ,
কারে আবাহন আজি করে বিহঙ্গম,
কাহার কারণে এই মহোৎসব সা'জ
কে আসিবে বলে বল এত আয়োজন ?

(শাখা)

আসিছেন বঙ্গে আর্য্যকুলনিস্তারিণী
ছড়ায়ে সূর্য্যের রশ্মি পূরি দিঙ্মণ্ডল,
আসিছেন ভবদারা কুলকুণ্ডলিনী
বিবিধ ভূষণে তেঁই শোভে ভূমণ্ডল।

(পূর্ণকোরস)

তোল ফুল ঝুড়ি ঝুড়ি আনন্দিত হ'য়ে
স্বর্ণ চম্পক আদি মল্লিকা বকুল,
রসবতী কেয়াফুল কৃষ্ণচূড়া লয়ে,
সাজী পূর্ণ করে আজি তুল জবাফুল।
সাজাও বঙ্গেতে আজি শারদ পার্ব্বণে
চামেলি গোলাপ ল'য়ে বঙ্গের ললনা
কটিতটে বাঁধ শাটী সুদৃঢ় বাঁধনে,
সাজাও বঙ্গেরে আজি কোটা ফুলে নানা।

(আরম্ভ)

আয় মা ভবানি জগতজননী
আছি পথপানে চাহিয়া ;
তোমার কারণে হৃদয়-বাগানে
আছে আশা-ফুল ফুটিয়া।
বৎসর ধরিয়া নীরবে বসিয়া
কত দুঃখ আছি সহিয়া।

কত দুঃখ নাশ, পুরা গো মা আশ
শক্তি শূন্য বঙ্গে আসিয়া।

(শাখা)

আসিছেন মাতা জগত-জননী
শরতে পুরাতে বাসনা চয়,
মায়ের কিরিটে চপলা খেলিছে
ঝলকে ঝলকে বাহির হয়।

(পূর্ণকোরস)

আসিছেন বঙ্গমাঝে নগেন্দ্রনন্দিনী
পুরাও মনের আশা দিয়া গঙ্গাজল
অঞ্জলি পুরিয়া ফুলে ঢাক পা দুখানি
করুক মৃদঙ্গ ধ্বনি হোক্ ঘণ্টা রোল।

দ্বিজগণ মন্ত্র পড় মায়ের উদ্দেশে
জবা বিল্ব বৃষ্টি কর মাথায়ে চন্দন,
দাও অর্ঘ্যে দূর্ব্বাদল মনের উল্লাসে।
আনন্দের দিন আর হবেনা এমন।

বাজুক বাঁশরী-যন্ত্র ললিত বাদনে,
সারঙ্গে মৃদুল সুরতানপুরারব
বেহালা সুপরিপাটী সপ্ত সুরতানে
বাজাও দামামা সঙ্গে করতাল সব।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সরকার।

দুর্গোৎসব।

শারদোৎফুল্ল শেফালিকা সুগন্ধ বিস্তার করিয়াছে,—ঘন-ঘটা-মলিন আকাশ পরিচ্ছন্ন হইয়াছে,—মাঠে মাঠে কাশ কুসুম ফুটিয়াছে,—দিকে দিকে শরতের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। শরৎ আসিয়াছে,—শারদীয়া আসিতেছেন।

বঙ্গে শারদীয়োৎসব মহত্তরোৎসব। কর্ম্মশ্রান্ত দীর্ণ বাঙ্গালী এই মহোৎ-

করিতে পারে। ভক্ত, মায়ের পাদপদ্মে জবাবিল্বদল প্রদান করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করে। মায়ের মহিষমর্দ্দিনী রূপ দেখিয়া বাঙ্গালীর প্রতপ্ত প্রাণ সুশীতল হয়।

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ভাগ্য—অনেকে মায়ের এই দশভুজা মূর্ত্তি—মহিষমর্দ্দিনী মুর্ত্তি কখন হইয়াছিল, কেন হইয়াছিল, তাহা জানেন না। কি জন্য জগত-মাতা মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন,—মহিষাসুর কে, কাহার পুত্র তাহাও অনেকে অবগত নহেন। আমরা সঙ্ক্ষেপে এস্থলে সেই পৌরাণিকতত্ত্বটুকু—মহিষমর্দ্দিনী রূপের ইতিহাসটুকু—মহামায়ার মহল্লীলার কাহিনীটুকু বর্ণনা করিলাম।

দেবতা সৃষ্টির পরেই দানবের সৃষ্টি হয়। দানবের আদিপিতার নাম দনু। দনু হইতে উৎপত্তি বলিয়াই সে বংশ দানব নামে খ্যাত।

দনুর দুই পুত্র,—একের নাম রম্ভ ও অপরের নাম করম্ভ। রম্ভ ও করম্ভ উভয়েরই পুত্র না হওয়ায়, তাহারা পুত্রার্থী হইয়া উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিল। যখনকার কথা, তখন তপস্যা দ্বারা পুত্র লাভ করিতে হইত—পশুভাবে পুত্রোৎপত্তি হইত না। তখন সত্ত্বগুণে জগৎ চালিত—সাত্বিক দেবগণ তখন স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত। তমোগুণ তখনও বিকশিত হইয়া কার্য্য করে নাই।

করম্ভ জলে নিমগ্ন হইয়া সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠানে নিয়ত থাকিল,আর রম্ভ যক্ষিনীর স্থান রসাল বটবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নির আরাধনা করিতে লাগিল।

দানব তমোগুণে সৃজিত;—ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইলে সত্ত্বগুণের নাশ বা হ্রাস হইবে আশঙ্কায় সুরপতি ইন্দ্র তাহদের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন,—তিনি কুম্ভীর রূপ ধারণ করিয়া করম্ভকে নিহত করিলেন। কিন্তু রম্ভের নিকটে গমন করিবার পূর্ব্বে সে ভ্রাতৃ-নিধনবার্ত্তা জানিতে পারিল। তখন রম্ভ ক্রোধে বামকরে কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে হোম করিতে অভিলাষ করিল। পরে, দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া যেমন আপন মুণ্ড ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি অগ্নি তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"দানব, আত্মহত্যা মহাপাপ;—নিরস্ত হও। অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

রম্ভ বলিল,—"হে দেব, যদি দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন,—যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী শত্রু-বলবিনাশক আমার একটি পুত্র হয়। সেই পুত্র যেন সর্ব্বতোভাবে দেব-দানব ও মানবের অজেয়

মহাবীর্য্যবান্, কামরূপী এবং সর্ব্বজনের সম্মানিত হয়। দেবতাগণ আরাধনায় আত্মহারা—সাধকের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী। অগ্নি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলেন।

রম্ভ অভিলষিত বর লাভ করিয়া যক্ষগণে পরিবৃত শোভাময় রমনীয় স্থানে প্রস্থান করিল; এবং তথায় একটি সুদৃশ্য মত্ত মহিষীকে সন্দর্শন করিল। তাহারই গর্ভে মহিষাসুরের উৎপত্তি হয়।

কাম তখন পশু ভাবাপন্ন। তাই সে যক্ষিণীকে মহিষীপশু বলা হইয়াছে। এখন এই মহিষীকে লইয়া রম্ভের আর এক একটি মহিষের সহিত বিবাদ বাধিল,—উভয়ের মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তমোগুণে জীব পশু ভাবাপন্ন,—তাই তাহারা পশু। উভয়ের যুদ্ধে রম্ভের জীবনান্ত হইল।

রম্ভ, যক্ষদিগের পরম প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং তাহারা তাহার দেহ শুদ্ধ করিবার বাসনায় মৃতদেহ লইয়া অনলসাৎ করিল। পতি চিতায় আরোপিত হইলে মহিষীও পাবকে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিল। যক্ষেরা নিবারণ করিলেও সেই সাধ্বী প্রিয়তম পতিকে লইয়া শিখা-সমাকুল হুতাশনে প্রবিষ্ট হইল। মহিষী মৃতা হইলে তখন মহাবল মহিষাসুর মাতৃ-গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া চিতার মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইল। রম্ভের আত্মাও রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চিতাগ্নি হইতে উত্থিত হইয়াছিল,—সে সেবার রক্তবীজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

বল-দর্পিত মহিষাসুর অল্পদিনের মধ্যেই বাহুবলে ত্রিলোক বশীভূত করিল। মর্ত্ত্যধামে একছত্র রাজ্য বিস্তার করিয়া মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য জয় করিবার বাসনা করিল। এই সময়ে বীর্য্যবান্ মদোদ্ধত চিক্ষুর তাহার সেনাপতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল,—আর তাম্র বহুসংখ্যক সেনায় সমাবৃত হইয়া ধনরক্ষায় নিযুক্ত হইল। অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ, উদর্ক, বাস্কল, ত্রিনেত্র এবং কালবঙ্কক প্রভৃতি বল-দর্পিত সেনানায়ক দানবেরা তৎকালে স্বীয় স্বীয় সেনায়, সাগর-পরিবৃত সমৃদ্ধিশালী মেদিনীমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিত ছিল।

অতঃপর মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য করতলগত করিবার জন্য স্বর্গপুরে এক দূত প্রেরণ করিল এবং তাহাকে বলিয়া দিল, যদি সুরেন্দ্র আমার অধীন হইয়া কার্য্য করেন ভালই, নতুবা আমি সমরে তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বর্গ-রাজ্য গ্রহণ করিব।

বিতাড়িত করিয়া দিলেন,—তৎপরে দেবাসুরে মহাসমর উপস্থিত হইল; এবং পূর্ণ শতবৎসর এই সংগ্রাম হইয়াছিল। এই সমরে অসুরগণ জয়লাভ করিল,—দেবগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

দেবগণ দুঃখীর ন্যায় ধরাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—অসুরগণ তথাপিও সেই বিজীত দেবগণকে নির্জীত করিতে বিরত হইল না। দেবগণ অসুরগণের অত্যাচারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে বহুবর্ষ অতীত হইল,—দেবতাদিগের দুঃখ চরম সীমায় উপনীত হইল। যখন আর দুঃখ তাঁহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন তাঁহারা রজোমূর্ত্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগের দুঃখের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া শিব-সন্নিধানে গমন করিলেন।

মহাদেব সব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণু-সকাশে গমন করিলেন, এবং অসুর-বিনাশ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সমবেত দেবগণের নিকট মহিষাসুরের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন—"আমরা ব্যষ্টি শক্তিতে মদগর্ব্বিত অসুরগণের সহিত পুনঃপুনঃ সংগ্রাম করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। আবার যদি সেই ভাবেই যুদ্ধ করিতে যাই, নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হইবে। অতএব এক যুক্তি আছে,—সেই অগ্নি-বর-দৃপ্ত দানবকে রমণী ভিন্ন কেহই ধ্বংস করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা যে সে রমণীর কার্য্যও নহে। আমরা সমবেত দেবমণ্ডলী একত্রিত হইয়া ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মহাশক্তির আবির্ভাবের কামনা করি,—তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব হইবে। তিনি অসুর নাশ করিবেন।

তাহাই হইল। দেবগণের সমষ্টি শক্তি হইতে মহাশক্তির আবির্ভাব হইল। যিনি আবির্ভূ‌তা হইলেন, তিনি মহাশক্তি—জীবে জীবে, অনলে অনিলে, ফলে ফুলে সর্ব্বত্র বিরাজিতা। তিনি নিত্যা। স্বভাবতঃ নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়,—সেইরূপ সেই নির্গুণা দেবী অরূপা হইলেও দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধার্থ স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদি গুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। ব্যষ্টি শক্তি দেবতাগণের প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে সমষ্টি শক্তিতে আবির্ভূ‌তা হইয়াছিলেন।

তখন সমস্ত দেবগণের—যাঁহার যে অস্ত্র, যে অলঙ্কার, যে বল ছিল, তিনি তাহা সেই মহাদেবীকে অর্পণ করিলেন এবং মহিষাসুরের অত্যাচার নিবারণ

নমঃ শিবায়ৈঃ কল্যাণ্যৈ শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ নমো নমঃ।
ভগবত্যৈ নমো দেব্যৈ রুদ্রাণ্যৈ সততং নমঃ॥
কালরাত্র্যৈ তথাম্বায়ৈ ইন্দ্রাণ্যৈ তে নমো নমঃ।
সিদ্ধ্যৈ বুদ্ধ্যৈ তথা বৃদ্ধ্যৈ বৈষ্ণব্যৈ তে নমো নমঃ॥
পৃথিব্যাং যা স্থিতা পৃথ্ব্যা ন জ্ঞাতা পৃথিবীঞ্চ যা।
অন্তঃস্থিতা যময়তি বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্॥
মায়ায়াং যা স্থিতা জ্ঞাত্বা মায়য়া ন চ তামজাম্।
অন্তঃস্থিতা প্রেরয়তি প্রেরয়ত্রীং নমঃ শিবাম্॥
কল্যাণং কুরু ভো মাতস্ত্রাহি নঃ শত্রুতাপিতান্।
জহি পাপং হয়ারিং ত্বং তেজসা স্বেন মোহিতম্॥
খলং মায়াবিনং ঘোরং স্ত্রীবধ্যং বরদর্পিতম্।
দুঃখদং সর্ব্বদেবানাং নানারূপধরং শঠম্॥
ত্বমেকা সর্ব্বদেবানাং শরণং ভক্তবৎসলে।
পীড়িতান্ দানবেনাদ্য ত্রাহি দেবি নমোঽস্তুতে॥

অর্থ,—"তুমি শিবা ও কল্যাণী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি শান্তি ও পুষ্টি, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি দেবী ভগবতী ও রুদ্রাণী, আমরা তোমাকে সতত নমস্কার করি। তুমি কালরাত্রি, তুমি ইন্দ্রাণী, তুমি অম্বা,—তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি। তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি বৃদ্ধি, তুমি বৈষ্ণবী—তোমাকে বার বার নমস্কার করি। যিনি পৃথিবীর অন্তরে অবস্থিত করিতেছেন, তথাপি পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে পারিতেছেন না, অথচ পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি স্বীয় কার্য্য বলিয়া নিয়মিত করিতেছেন,—সেই পরদেবতা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি। যিনি মায়ার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, অথচ মায়া যাঁহাকে অবগত নহেন, কিন্তু মায়ার অন্তর্বর্ত্তিনী হইয়া যিনি সেই অজ্ঞাকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, সেই প্রেরয়িত্রী শিবাকে আমরা নমস্কার করি। মাতঃ! তুমি কল্যাণ বিধান কর,—আমরা শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছি,—অতএব আমাদিগকে

রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে ক্লেশ দিয়া থাকে। ভক্তবৎসলে! সমস্ত দেবগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয়-স্থান। দেবি! আমরা এই দানব-কর্তৃক প্রপীড়িত,—অতএব, তুমি আমাদিগকে এক্ষণে পরিত্রাণ কর,—আমরা তোমাকে নমস্কার করি।"

দেবগণ দেবীর এইরূপ স্তব করিলে, সমস্ত সুখদাত্রী মহাদেবী তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে মঙ্গলময় বাক্যে বলিলেন,—"দেবগণ! মন্দমতি মহিষকে বিমোহিত করিয়া সমরে সংহার করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও।"

অনন্তর দেবী মনে মনে ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য! দৈববল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাহা সুরসত্তমগণেরও দুরতিক্রমণীয়। কালই সুখের প্রভু এবং দুঃখের কর্ত্তা। যাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মহিষাসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ক্লেশ-সন্তাপে বিমোহিত হইলেন! দেবী এইরূপ মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই মহা ঘোর শব্দে দানবদিগের ভয় উপস্থিত হইল। সেই অদ্ভুত শব্দ শ্রবণে তখন বসুধা কম্পিত, পর্ব্বত সকল চঞ্চল, এবং বীর্য্যবান্ অক্ষোভ্য সাগরও ক্ষুভিত হইল। অধিক কি সেই শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ এবং মেরু পর্ব্বতও চালিত হইল,—তখন দানবগণ সেই মহৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল।

সে শব্দ শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বিরক্ত হইলেন, এবং শব্দের কারণ জানিতে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া গিয়া সংবাদ প্রদান করিল। এক মহামহিমাময়ী সুন্দরী রমণী আপনার সহিত যুদ্ধ বাসনা করিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত শরীরে প্রোজ্জল তেজঃ প্রভাব—আমার চক্ষুর্দ্বয় তাহাতে নিপীড়িত হওয়ায় আমি তাঁহাকে ভালরূপে দর্শন করিতেও সক্ষম হই নাই।

মহিষাসুর দূতের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। স্ত্রীলোকের হুহুঙ্কারে ত্রিলোক কম্পিত হইল—অতএব এ স্ত্রী সামান্যা নহে। বোধহয়, ইহা মায়া হইবে। যাহাহউক, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল।

মন্ত্রী দেবী-সন্নিধানে গমন করিয়া বলিল—"দেবি, তোমার অতুল রূপ,

অভিলাষী, অতএব আমার সহিত চল। তোমার রূপাদির কথা দূত-মুখে শ্রবণ করিয়া আমাদের মহারাজা তোমায় পক্ষপাতী হইয়াছেন।”

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য সহকারে দেবী বলিলেন—“তোমাদের মহারাজের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই আমি মহাকালী এখানে আগমন করিয়াছি। সে ভাবিতেছে, বিষ্ণু-আদি সমস্ত দেবগণ তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছে, অতএব সে আর কাহারি ভয় করে, বিশেষতঃ এই দেব রাজ্য—দুর্গ তোরণ বহুবিধ অস্ত্র ও অগণিত বলবান সৈন্য তাহার সহায়, আর আমি একটি মাত্র স্ত্রীলোক, তাহার কি করিতে পারিব! কিন্তু ইহা তাহার মত পশুতেই ভাবিয়া থাকে। যখন যাহার অবসান কাল উপস্থিত হয়, তখন একটি তৃণই সহস্র কুলীশের বল ধারণ করে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমি অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। হয় সে পাপাত্মা স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাতাল-তলে চলিয়া যাক্, আর না হয় আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউক।”

মন্ত্রী অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর করিল,—অবশেষে মহিষাসুরের নিকটে ফিরিয়া গিয়া সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল।

বল-দর্পিত মহিষাসুর তখন বহু সহস্র সৈন্যের সহিত বাস্কল ও দুর্মুখ নামক দুইজন বীরকে দেবী-সমরে প্রেরণ করিল। তাহারা ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে সসৈন্যে দেবী-সমরে নিহত হইল।

সৈন্যগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর তাম্র ও চিক্ষুর নামক বীর দ্বয়কে বহুসহস্র সৈন্যে পরিবৃত করিয়া চণ্ডিকার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিল। তাহারাও মহা সমরাভিনয় করিয়া অবশেষে মহানিদ্রায় অভিভূত হইল।

দেবীর হস্তে দৈত্যদ্বয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বিস্মিত হইয়া দেবীর বিনাশ বাসনায় অসিলোমা ও বিড়ালাক্ষ্য প্রভৃতি দানবগণকে সমরে প্রেরণ করিল। কিন্তু মহাকালীর কালসমরে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাহারাও সসৈন্যে নিহত হইল।

সমস্ত বীরের নিধন হইল শুনিয়া মহিষাসুর দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবী-সকাশে উপস্থিত হইল। উভয়ে অনেক কথোপকথন হইল—অবশেষে ভ্রুকুটী কুটিলাননে মহিষাসুরের-

মহিষাসুর শূলাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া চণ্ডিকাকে সবেগে আক্রমণ করিল।

তখন দেবী, সুনাভ সহস্রার চক্র করে ধারণ করিয়া মহিষাসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই চক্রাঘাতে মহিষাসুরের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং গৈরিকাদির দ্বারা অরুণবর্ণ বিশাল নির্ঝর-প্রবাহ যেমন পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তাহার কণ্ঠনাল হইতে উষ্ণ রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ দেবীর জয় ঘোষণা করিল। দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইল। দেবগণ বহুবিধ স্তব করিয়া বলিলেন,——

সুখে বাপ্যথবা দুঃখে ত্বং নঃ শরণমদ্ভুতম্।
পাহি নঃ সততং দেবি সর্ব্বৈস্তব বরায়ুধৈঃ।
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বৎপদাম্বুজরেণুতঃ॥

"দেবি সুখের সময়েই হউক, আর দুঃখের সময়েই হউক, আপনিই আমাদিগের রক্ষাকর্ত্রী;—অতএব, আপনিই উৎকৃষ্টতর অস্ত্রসমূহদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন,—আপনার চরণ-রেণু ব্যতিরেকে আমাদিগের রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।"

সাবর্ণি মন্বন্তরে সুরথ নামক ক্ষত্রিয় নৃপতি মহিষাসুরঘাতিনী মহাশক্তি দুর্গার পূজা করেন। সে বসন্তকালে,—তারপরে ত্রেতাযুগে রাবণ বধের জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গার পূজা করেন।

আমাদের ছয় মাসে দেবতাদের এক দিন, আর আমাদের ছয় মাস দেবতাদের এক রাত্রি অর্থাৎ আমাদের পূর্ণ এক বৎসর দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। আশ্বিন মাস দেবতাদিগের রাত্রির মধ্যে—কাজেই দেবী নিদ্রিতা। বিধাতার আদেশে রামচন্দ্র বোধনে দেবীকে জাগাইয়া পূজা করিয়াছিলেন,—আমরাও এখন বোধনে সুপ্তা দেবীকে জাগ্রত করিয়া পূজা করিয়া থাকি।

মানময়ী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাল ঘনীভূত।

দারোগা বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,--কনেষ্টবলদ্বয় সবলে অবিনাশ বাবুর হাতে হাত কৌড়ী লাগাইল,—তাহারই চাদর তাহার বাহুতে সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ধরিয়া রহিল,—অবিনাশ বাবু তাহাকে কাকুতি মিনতি করিলেন,—কিন্তু তাহাতে দারোগা বাবু অধিকতর উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।

এই সময় একজন বেহারা বলিয়া উঠিল—"হজুর, একখানা ছোরা।"

"বটে!"

বলিয়া দারোগা বাবু ছোরা খানি ভাল করিয়া লণ্ঠনের আলোকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপুহে—এখন কি বলিতে চাও। লাস কোথায়।"

একজন বলিল, "এই ঘরে।"

"লাস সাবধান।"

বলিয়া লণ্ঠন হস্তে দারোগা বাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন,—রক্ত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্?"

তিনি আরও একটা লণ্ঠন আনিতে বলিলেন,—তখন দুইটা লণ্ঠনের আলোকে ঘর ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন,—ঘরের এক কোণে অৰ্দ্ধ ছিন্ন রক্তাক্ত একখানা কাপড় পড়িয়াছিল,—তিনি একজন বেহারার হস্ত হইতে একখানা লাঠি লইয়া সেই কাপড় তুলিয়া ধরিলেন,—তখন তাহার পশ্চাৎ হইতে একজন কাতরে ও ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "হুজুর—হুজুর—আমার মেয়ের কাপড়।"

এই লোকটী মুসলমান,—বেশ দেখিলে ভাল গৃহস্থ বলিয়া বোধ হয়—বয়সও প্রায় ষাট বৎসর। গত রাত্রে ইহার মেয়ে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে,—মেয়ে সুন্দরী,—যুবতী—বিধবা,—বৃদ্ধ মুসলমানের স্ত্রী ছিল না,—মেয়ে তাহার বাড়ী থাকিত,—সে, মেয়েকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিত। গত

কোন সন্ধান পায় নাই। নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান না পাওয়ায়—সে থানায় সম্বাদ দিয়াছিল,—তাহাই দারোগা বাবু তদন্তে গিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহাকে সঙ্গে লইয়া থানায় ফিরিতেছিলেন,—তিনিও এই বৃদ্ধ আজগার সর্দ্দারের কন্যা মেহেরজানের কোন সন্ধান পান নাই।

"আমার মেয়ের কাপড়, শুনিয়া দারোগা বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বটে! তাহা হইলে এই বেটারই কাজ। আজ কাল ভদ্র অভদ্র চেনা দায়,—চেহারা দেখ্‌লে কে বল্‌বে বেটা এত বড় বদমাইশ। লাস খোঁজ।"

গৃহমধ্যে লাস নাই,—তবে একজন এক কোণ থেকে এক গোছা লম্বা চুল তুলিয়া ধরিল,—দারোগা বাবু ভাল করিয়া দেখিবার জন্য লণ্ঠন তুলিয়া ধরিলেন। আজগার সরদার রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমারই মেয়ের চুল,—হায়—হায়!"

তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল,—সে আর কথা কহিতে পারিল না।

গৃহ মধ্যে লাস না পাইয়া দারোগা বাবু বাহিরে আসিলেন,—বড় গম্ভীর স্বরে অবিনাশকে বলিলেন, "শালা,—লাস কোথায়?"

অবিনাশ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে একজন কনেষ্টবল বলিল, "হুজুর,—আসামীর কাপড়ে কি বাঁধা রয়েছে।"

"খোল—দেখ।"

কনেষ্টবল অবিনাশের কাপড় টানিয়া এক কোন হইতে খুলিয়া বাহির করিল, ছয় গাছা সোণার চুড়ী।

বৃদ্ধ আজগার সর্দ্দার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "হুজুর,—আমার—আমারই মেয়ের—চুড়ী।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

মানুষ সহজে এরূপ বিপদে পড়ে না। অবিনাশ এই কথায় স্তম্ভিত-প্রায় হইলেন। গৃহে স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়,—আর ঔষধ লইতে আসিয়া তাহার এই বিপদ! তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত কোনই কথা কহিতে পারিলেন না।

দারোগা বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি বাপু—এখন কি করিতে

অবিনাশ রোরুদ্যমান স্বরে বলিলেন, "মহাশয়,—আমার বাড়ী ঔষধটা দিয়া আসিতে দিন,—তাহার পর সব আপনাকে বলিতেছি।"

দারোগা বাবু আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। অবিনাশ কাতরে বলিলেন, "মহাশয়,—দোহাই আপনার———"

দারোগা বাবু রোষ-কষায়িত লোচনে বলিলেন, "চোপরাও।"

তাহার পর কনেষ্টবলদিগকে বলিলেন, "লে যাও—থানায়।" দুইজন কনেষ্টবল তাহাকে বলে টানিয়া লইয়া চলিল। অবিনাশ বল প্রকাশ বৃথা দেখিয়া বলিলেন,—"অপমান করিও না,—আমি যাইতেছি।"

দারোগা বাবু পাল্কিতে উঠিলেন, আবার বেহারাগণ হুঙ্কার করিতে করিতে ছুটিল,—কনেষ্টবলদ্বয় অবিনাশকে গরু ছাগলের ন্যায় টানিতে টানিতে ছুটিল,—অবিনাশের দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছিল,—তিনি নিজের বিপদের জন্য বিন্দুমাত্র ভাবিতেছিলেন না,—মৃতপ্রায় স্ত্রীর কথা ভাবিয়া উন্মাদ প্রায় হইয়া উঠিলেন।

থানায় আসিয়া সেই রাত্রেই দারোগা বাবু এই ব্যাপার ডায়রিতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল,—অবিনাশ সকলই বলিলেন,—কিন্তু দারোগা বাবু তাহার বিন্দু বিসর্গ বিশ্বাস করিলেন না।

বিশ্বাস না করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রথমঁ তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ হইল। যে ছোরা পাওয়া গিয়াছিল,—তাহার বাঁটে তাহারই নাম অঙ্কিত। দারোগা বাবু ইহা তাহাকে মৃদু হাস্য করিয়া দেখাইলেন,—তখন এ ছোরা যে তাঁহার নহে,—তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কলিকাতা হইতে সম্প্রতি তিনি এঁই ছোরা খানি কিনিয়া আনিয়াছিলেন,—নিজে ছোরার বাঁটে ছুরি দিয়া আপন নাম অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এ ছোরা তাঁহার ঘরে ছিল,—ইহা কিরূপে আনরপুরের মাঠের পড়ো ঘরের নিকট আসিল, তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায় হইলেন,—তাহার এ অবস্থায় যে ভাব হইল,—তাহাতে সকলেই তাহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

তাহার পর তাহার কাপড়ে মেহেরজানের চূড়ী,—ঘরে মেহেরজানের কাপড়—ঘর রক্তে রক্তময়,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে রঞ্জিত,—সেই ঘরের নিকট তিনি ধৃত হইয়াছেন! মেহেরজান নিরুদ্দেশ,—এ অবস্থায় তিনি যে খুনী

ইহার উপর আজগার সর্দ্দার বলিল, "আমি ইহাকে চিনি,—ইহাদের বাড়ী আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামে হইলেও আমার মেয়ে সময় সময় ইহাদের বাড়ী যাইত,—সে দিনও সে বলিয়াছিল যে বৈকালে সে ইহাদের বাড়ী যাইবে। ইহার স্ত্রীর সঙ্গে মেহেরজানের সৌহার্দ্য ছিল।"

সে আরও বলিল, "স্ত্রীর চিকিৎসা হইতেছে না,—আর এক টাকাও নাই,—এ কথা বলিয়া অবিনাশ টাকা ধার করিতে আমার কাছে আসিয়াছিল।"

আর অধিক প্রমাণ কি চাই! লাস জলায় অনুসন্ধান করিলে কালই মিলিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লোকের মতামত।

অবিনাশের স্ত্রী মানময়ী সমস্ত রাত্রি অজ্ঞান ছিলেন,—অবিনাশ ঔষধ আনিতে গিয়া আর ফিরিলেন না। তাহার গৃহে এক বৃদ্ধা বিধবা ও তিনি ব্যতীত আর কেহ ছিল না,—দুই বৎসর হইল,—তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়,—সেই পর্য্যন্ত অবিনাশের স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িয়াছে—তাহারা সামান্য গৃহস্থ লোক—সামান্য জমি-জায়াত কিছু ছিল—অবিনাশ তাহাই চাস্‌বাস করিয়া একরূপ কষ্টে শ্রেষ্ঠে সংসার চালাইতেন—অন্যত্র চাকরি করিতে গেলে জমি-জায়াত সব যায়, বলিয়া তিনি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্রও যাইতে পারেন নাই।

আজ প্রায় পনের দিন হইল মানময়ী ঘরে পীড়িতা,—তাহার চিকিৎসার জন্য অবিনাশ যথাসর্ব্বস্ব সমস্তই ব্যয় করিতেছিলেন। তিনি মানময়ীকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। মানময়ীর ন্যায় সুন্দরীও সে অঞ্চলে আর কেহ ছিল না। মানমময়ীর বয়স পঞ্চদশ মাত্র,—শীঘ্রই পুত্র মুখ দেখিবেন বলিয়া অবিনাশ আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, এই সময়ে স্ত্রী পীড়িতা হইলেন,—তিনি স্ত্রীর পীড়ায় উন্মাদ প্রায় হইলেন। দিন রাত্রি স্ত্রীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—তাহার পর এই বিপদ।

তিনি থানায় হাজতের মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন,—

করিয়া তিনি নিশ্চয়ই হাজত ভাঙ্গিয়া পালাইয়া স্ত্রীর নিকট ছুটিতেন। কিন্তু সে উপায় নাই! তাহার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত।

সৌভাগ্যের বিষয় সেই রাত্রে তিনি ঔষধ আনিতে প্রস্থান করিবার একটু পরেই মানময়ীর ভ্রাতা ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাহার বয়স অবিনাশ হইতে অধিক নহে,—তিনি আলিপুরে জজ আদালতে সম্প্রতি উকিল হইয়াছেন।

তিনি না আসিলে বৃদ্ধা মানময়ীকে লইয়া যে কি করিতেন,—তাহা বলা যায় না।

তাঁহারা 'এই আসিবে এই আসিবে' করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন,—সমস্ত রাত্রির মধ্যে অবিনাশ না ফেরায় তাহারা উভয়েই বিশেষ ভাবিত হইয়া উঠিলেন। ঔষধ আনিতে গিয়া লোক কোথায় নিরুদ্দেশ হইল?

বেলা হইল তবুও অবিনাশ ফিরিলেন না। তখন মানময়ীর ভ্রাতা সুরেশ বাবু তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু তাহাকে তাহার সন্ধান পাইবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। আজগার সর্দ্দার বাড়ী ফিরিয়া অবিনাশের কথা সকলকেই বলিয়াছিল,—তাহার কথা লইয়া সকলেই আলোচনা করিতেছিল,—অবিনাশকে সকলেই বড় ভাল লোক বলিয়া জানিত,—সেই জন্য তিনি মেহেরজানকে খুন করিয়াছেন—প্রথমে কেহই ইহা বিশ্বাস করিল না,—কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে,—তাহা শুনিয়া সকলেই গম্ভীর হইল,—একজন বৃদ্ধ অতি গম্ভীর ভাবে বলিল, "সুন্দর স্ত্রী বে করিলে এই রকমই হয়,—ছোঁড়া স্ত্রীর জন্যে পাগল—যা কিছু ছিল,—স্ত্রীর ব্যয়রামে খরচ করেছে—তারপর টাকা ধার করে বেড়াবার চেষ্টায় ছিল,—ওকে টাকা কে দেবে,—শেষ দেখনা স্ত্রীর জন্যেই মেহেরজানকে খুন করে তাহার গহনা নিয়েছিল!"

একজন বলিল, "মেহেরজান তার সঙ্গে আনরপুরের মাঠে গিয়েছিল কেন?"

বৃদ্ধ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "কেমন করে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল,—ওসব লোক সব পারে।"

ক্রমশঃ।

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Lives of great men all remind us we can make our lives sublime;
And, departing leave behind us footprints on the sands of time;—

Longfellow.

বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ ক্রমশঃই ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। রাজ-রোষ সেই বিভীষিকাকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। যে সময়ে আমাদের দৃঢ়চিত্ত, কর্ম্মঠ ও সৎসাহসী নেতা ও বীরের প্রয়োজন, সেই সময়েই আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এক এক করিয়া দেশের রত্ন সকল হারাইতে আরম্ভ করিয়াছি। বিগত দুই বৎসরে আমরা অনেক রত্ন হারাইয়াছি। বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক গগন হইতে আর একটি উজ্জ্বল তারা খসিয়া পড়িল। বঙ্গের সুসন্তান কৃষ্ণনগরের গৌরব রবি তারাপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৭ শে আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ১২ টার সময় পত্নী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা আনন্দমোহন ও কালীচরণের বিয়োগ-যন্ত্রনা দূর হইতে না হইতেই একি সর্ব্বনাশ! ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের প্রকৃতই দুর্দ্দিন।

বিগত ১২৫৫ সালের আষাঢ় মাসে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী চাঁদঘর গ্রামে মাতুলালয়ে স্বর্গীয় তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবগারী বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইহাঁদের আদি বাসস্থান নিজ কাটোয়া গ্রাম। ৺ গোপালচন্দ্র একরূপ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। বালক তারাপদ শৈশবেই গ্রাম্য পাঠশালে বিদ্যা-রম্ভের জন্য প্রেরিত হন; পরে তথাকার পাঠাভ্যাস সমাপ্ত হইলে পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কর্ম্মস্থল যশোহর জেলার সদরে লইয়া যান। তথায় পিতার সঙ্গে থাকিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে অতি সুখ্যাতির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। পরে কলেজে পাঠারম্ভ করার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হন এবং কিছু-কাল মধ্যে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। এই সময় তিনি মুনসফী পদ গ্রহণ

পরিত্যাগ করিয়া ওকালতি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় ইঁহার বয়স ২০ বৎসর কয়েক মাস হইয়াছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ, গিরিজা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার নলিনাক্ষ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই তারাপদের সতীর্থ ছিলেন।

স্বর্গীয় তারাপদবাবুর মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি যশোহরের হাইস্কুলের ৩য় শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন একদিন পূজার সময় তাঁহার একজন সমপাঠি একটি সাটিনের জামা গায় দিয়া আসিয়া ছিলেন, আমাদের স্বর্গীয় মহাত্মা উহা দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলেন,—বাবা এই রকম জামা আমাকে দিতে হইবে। তাঁহার পিতা হাস্য করিয়া বলিলেন, যদি তুমি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ঐরূপ সাটীনের জামা দিব। বালক তারাপদ সেই দিন হইতে সাটীনের জামা পাইবার আশায় প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং যতদিন না বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গেল, ততদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত পাঠাভ্যাস করিয়া পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বাবার নিকট আসিয়া বলিলেন বাবা আজ আমি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া প্রমোশন পাইয়াছি এবং প্রদ্যোৎকে হারাইয়া দিয়াছি (যে ছেলেটি সাটীনের জামা গায়ে দিয়া আসিয়াছিল, তাহার নাম প্রদ্যোৎ) আপনি এখন আমাকে সেইরূপ একটি সাটীনের জামা কিনিয়া দিন। বালকের পিতা পুত্রের এইরূপ পরীক্ষায় সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ বাজারে যাইয়া তাঁহাকে সুন্দর একটি সাটীনের জামা কিনিয়া দেন।

ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া প্রথমে ছোট ছোট মকর্দ্দমা করিতে আরম্ভ করেন এবং জগদীশ্বরের কৃপায় ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতে করিতে বঙ্গের একজন বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত হন। মধ্যে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে কিছু দিন ওকালতী করেন এবং হাইকোর্টের vakil হন। পরে দেশের লোকের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কৃষ্ণনগর যাইয়া ওকালতী ব্যবসা পুনরায় আরম্ভ করিতে হয়। তদবধি বাঙ্গালার এমন জেলা নাই, যেখানে তিনি মকর্দ্দমা করিতে যান নাই। কৃষ্ণনগরে থাকিয়াই মৃত্যু দিনের সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমান ভাবে কার্য্য চালাইয়াছেন। বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ জেলাতেই ফৌজদারি মোকদ্দমা চালাইবার জন্য বিশেষতঃ আসামির পক্ষ সমর্থন জন্য সাগ্রহে আহূত

মহাত্মা তারাপদ থিওজফিষ্ট ছিলেন, তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা কর্ণেল অলকটের একজন প্রিয় শিষ্য।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপ গ্রামের বিখ্যাত ৺ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা। কিছু দিন হইল জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের দৌহিত্রী শ্রীমতী ফুলহাসিনী দেবীর শুভ বিবাহ দিয়াছেন।

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতুল মাতৃভক্তি দেখিয়া অনেকেই আনন্দে অভিভূত হইতেন। ৬।৭ বৎসর হইল তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তারাপদ বাবু এতদূর মাতা ঠাকুরাণীকে ভক্তি ও ভয় করিতেন যে, তাঁহার এই প্রবীন বয়সে মাতার নিকট প্রহার পর্য্যন্তও খাইয়াছেন। মহাত্মা ধীরভাবে মাতার আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। জননীর তৃপ্তির জন্য অনেক কর্ম্মে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি দরিদ্রের মা বাপ, সাধারণের হিতসাধক, বিপদের সহায় এবং সাহস, অমায়িক ও উদার অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ছিলেন। অনেক অনাথ ও অনাথিনী তাঁহার নিকট মাসিক ও বাৎসরিক সাহায্য পাইত। যখন যে কোন লোক যে কোন ভাবে সাহায্য প্রার্থী হইত, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। লোক দেখান দান তাঁহার একেবারেই ছিলনা। কত সময় নিজের অর্থব্যয় করিয়া বিনা পয়সায় লোকের মোকদ্দমা করিয়া দিতেন, কত লোককে স্বার্থশূন্য হইয়া দুরূহ বিপদ হইতে এমন কি ফাঁসি হইতে কতবার রক্ষা করিয়াছেন এবং মহাত্মা নিজের পয়সা খরচ করিয়া ঐ সকল লোককে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তারাপদ বাবু যখন দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন আপনার সমগ্র শক্তি তাহাতে নিয়োগ করিতেন। গুরুতর শ্রমে ও পীড়ায় তাঁহার শরীর দিন দিন রুগ্ন ও ভগ্ন হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার শ্রম ও উৎসাহের বিরাম হইল না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য যে কতদূর ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা অচিরেই পাইলাম। ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও তিনি কখনও দেশের কাজ করিতে বিমুখ হন নাই। দেশের কাজ, দেশের হিত

কর্ম্ম বীরের বড়ই প্রয়োজন। আমরা পরীক্ষা ও কঠোর ভীষণ সঙ্কটের মধ্যেই এইরূপ কর্ম্মযোগীকে হারাইলাম। ইনি বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে একেবারে উদাসীন ছিলেন। কাজ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে Self-effacement অর্থাৎ আত্ম বিলোপ, তাহার অর্থ তারাপদ বাবুর জীবনে দেখিয়াছি। নিজের গৌরব অন্যকে দিয়া তিনি কাজ করিয়া যাইতেন। ইহাতেই তাঁহার শান্তি ও আরাম ছিল।

তিনি কখনও কাহার নিন্দার কথা মুখে আনিতেন না, পরনিন্দা যেখানে হইত, তিনি সেখান হইতে আপনাকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গগতা কন্যার নামে কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে সদর রাস্তার ধারে জমি ক্রয় করিয়া বহু অর্থব্যয়ে বাড়ী তৈয়ারি করিয়া "মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয়" নাম দিয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণনগরবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রগাঢ় অধ্যাবসায়ের ফলে কংগ্রেসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তারাপদ বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কৃত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসান্যাল কংগ্রেস' নামক পুস্তক পড়িলে জানা যায়। ইনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত যত্ন, চেষ্টা ও চিন্তা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই কংগ্রেসের কার্য্য করিতে যাইয়া তিনি শুধু বঙ্গবাসীর কেন ভারতবাসীর পর্য্যন্ত পরিচিত হইয়াছিলেন। যে সকল শক্তিশালী ব্যক্তি নানাস্থানে থাকিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তারাপদ বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। আজ কংগ্রেস তাহার একজন উৎসাহী কর্ম্মী ও কল্যানকামী পরামর্শদাতা হারাইলেন। কৃষ্ণনগর যাঁহাকে লইয়া বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক জগতে সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছিল, আজ সে সম্বন্ধ রজ্জু ছিন্ন হইল। কৃষ্ণনগরের এই শূন্য রাজনৈতিক সিংহাসনে আর কেহ বসিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। কংগ্রেস পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব সাজে সজ্জিত হইয়া স্বরাজ মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন, এই সময়ে শক্তিশালী, চিন্তাশীল, অকুতোভয় বীরের একান্ত প্রয়োজন। আনন্দ মোহন গিয়াছেন, কালীচরণ গিয়াছেন আবার তারাপদও গেলেন। এক পরীক্ষা—এক শোক যাইতে না যাইতেই, আবার নূতনতর পরীক্ষা ও শোক আমাদিগকে আচ্ছন্ন ও মহমান করিতেছে, ইহার ভিতরে মঙ্গলময়ের

১৮৯৬ সালে যখন কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়, তখন সেই সমিতির সফলতার জন্য তারাপদ বাবু যেরূপ কঠোর পরিশ্রম,ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার মত উদ্যোগী পুরুষ কৃষ্ণনগরে না থাকিলে, সমিতি এরূপ সফলতার সহিত কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তারাপদ বাবু যখন যে কাজে হাত দিতেন, তাহাতে মন প্রাণ সমর্পন করিতেন। লোকনিন্দা বা সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ, নানারূপ প্রতিকূলতা তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারিত না। এইরূপ একনিষ্ঠা, এইরূপ নিন্দাপ্রশংসা বিমুখ কর্ম্মীর সংখ্যা আমাদের দেশে বড়ই বিরল। বর্ত্তমান কোলাহল, পরীক্ষা ও ভীষণ মতবিরোধিতার মধ্যে এইরূপ একনিষ্ঠ ব্যক্তি বড়ই প্রয়োজন।

জাতীয় শিল্প সমিতির তিনি একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উক্ত সমিতি স্থাপনাবধি তিনি তাহার কার্য্যে আপনার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

তারাপদ বাবু কেবল যে রাজনৈতিক জটিল সমস্যার মীমাংসাতেই আপনার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এমন নহে। তিনি যে কেমন একজন দার্শনিক ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "তত্ত্ববিদ্যা" নামক পুস্তকপাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। এই পুস্তকখানি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার আইন ঘটিত পুস্তকগুলি ব্যবহারজীবী ও আইন পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের নিকট সুপরিচিত।

তিনি যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই নানা কার্য্যে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি সজ্ঞানে ধীরভাবে পত্নী, দুইটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। শান্তিদাতা পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তিতে রাখুন, এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের শোক-দগ্ধ প্রাণে সান্ত্বনা-বারি বর্ষণ করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভারত-গৌরব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কার্পাস ও বস্ত্র-শিল্পই পাশ্চাত্য জাতির সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-পণ্য। বস্ত্র-ব্যবসায়ে মাঞ্চেষ্টার ধন-কুবের। তুলার চাষে মার্কিণ রত্নগর্ভা। বণিকতাই ইয়োরোপের রাজলক্ষ্মী। যে ভারতের কঙ্কালশীর্ণ, দুর্ভিক্ষজীর্ণ ক্ষীণদেহের রস শোষণ করিয়া পাশ্চাত্য বস্ত্রব্যবসায়িগণ প্রতিবৎসর ত্রিশ কোটি মুদ্রা সুদূর সমুদ্র-পারে লইয়া যাইতেছেন, যে শিল্প-গুরু ভারত একদিন সমস্ত জগতের লজ্জা নিবারক হইয়াও আ'জ লজ্জা নিবারণের জন্য ইয়োরোপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; সেই ভারতবাসিগণ যে কতকাল হইতে কার্পাসের ব্যবহার জানিতেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বেদেও হিন্দুদের কার্পাস ব্যবহারের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ;—

মুষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ
স্তোতারং তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী।

ঋগ্বেদসংহিতা ১।১০৮।৯

অর্থাৎ মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখও আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, তন্তুবায়গণ সূত্রে ভাতের মাড় দিত বলিয়া ইন্দুর উহা খাইতে ভালবাসিত। সুতরাং ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমিত হয় যে, তৎকালে বস্ত্রবয়নের প্রণালী ও মাড় দিয়া সূত্রকে শক্ত করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নতুবা মূষিকের এত লোভ জন্মিবে কেন ?

মনুসংহিতায়ও কার্পাসের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রো স্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।"

মনু ২।৪৪।

অর্থাৎ বিপ্রদিগের উপবীতসূত্র কার্পাস দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। মনুর মতে কার্পাস-বীজ ও তুষ ইত্যাদির উপর আরোহন করিবেন। কারণ উহা পবিত্র।—

"ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষু।" মনু ৪।৭৮।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥"

মনু ৮।৩৯৭।

অর্থাৎ তন্তুবায় বস্ত্রবয়নার্থ গৃহস্থের নিকটে ১০পল সূতা লইলে মাড় দিবার জন্য গৃহস্থকে ১১পল সূত্র দিতে হইবে। অন্যথা রাজদ্বারে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

অহো! যে দেশের সমাজ ও রাজশাসন বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য অশেষবিধ যত্ন ও চেষ্টাবান্ হইতেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রাচীন সামাজিক গ্রন্থও এ বিষয়ে নীতি-প্রবর্ত্তনে উদাসীন ছিলেন না; আজি সেই দেশের শিল্প ও কার্পাসিক বস্ত্রের অবনতির জন্য রাজপক্ষ হইতে যে কুটিল অত্যাচার-মূলক নিয়ম সমূহ দিন দিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। হৃদয়ের অন্তরালে এক প্রাচীন স্মৃতি জাগরিত হয়। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "দেশের কথা" ও সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক—ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের চিন্তাশীল লেখনী প্রসূত "অবসরের" দ্বিতীয় বার্ষিক উপহার "ফুলওয়ালী" তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। সম্ভবতঃ আরবী "কতান্" হইতে ইতালীয়গণ "কতোন্" ফরাসীয়গণ কোতান (Coton) এবং ইয়োরাপীয়গণ "কটন্" (Cotton) শব্দ পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু পারসী "কুর্‌পাশ" শব্দ যে সংস্কৃত কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে কার্পাস বস্ত্রের বয়ন আরম্ভ হয়, সে শুধু কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের কথা। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বেও হিন্দুগণ কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা স্বীয় স্বীয় লজ্জা নিবারিত হইত। কিন্তু হায়! কালবশে সকলই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাই কবি গাহিয়াছেন ——

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

সুসভ্য পাশ্চাত্য জগতে ব্যোমযান বা বেলুন অন্যতম আবিষ্ক্রিয়া। অনেকে ভাবিয়া থাকেন, ভারতে কোনদিন বেলুনের ন্যায় বিমান-বিহারী-যানের ব্যবহার ছিল না। ইয়োরোপীয়গণই বেলুনের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবন-কর্ত্তা। কিন্তু পৌরাণিক রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ও ঐরূপ যানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মেঘনাদ রথারোহণ করত শূন্য পথে মেঘান্তরালে থাকিয়া

পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন বর্ণনা করিয়াছেন। পুষ্পক, বিমান-পথে চালিত হইতেছে ও রামচন্দ্র স্বীয় প্রনয়িণীর নিকটে গভীর জলধির মনোহর দৃশ্যাবলীর বর্ণনা করিতেছেন। ঐ রথ আকাশ-মার্গে ইচ্ছামুরূপ চালিত হইত। এতদ্দ্বারা অনুমতি হয় যে, প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে বেলুন জাতীয় যানের ব্যবহার ছিল। নতুবা রামায়ণকার বাল্মীকি ও রঘুবংশকার কালিদাস কখনও পাশ্চাত্য-স্বপ্নে ব্যোমযান দেখিয়া তাহার উল্লেখ করিয়া যান নাই, একথা ধ্রুব সত্য।

ধর্ম্মবিষয়েও ভারত কাহারও নিকট পরাধীন নহে। আর্য্য ধর্ম্মের ন্যায় অন্যতম প্রাচীন ধর্ম্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টধর্ম্ম জগতে কিঞ্চিদধিক একোন বিংশতি শত বর্ষ মাত্র প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু যে বেদ অপৌরষেয় নামে কথিত, তাহা যে কত পুরাতন, নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। বুদ্ধদেব যে বিমল ধর্ম্মের আলোকে অনন্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জগৎমণ্ডলে প্রেমময়-সার্ব্বভৌম-মহদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য, শত শত দাস দাসী ও সুরম্য হৈম নিকেতনকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গীয় শান্তি লাভের আশায় শ্বাপদ সঙ্কুল বনাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি সকলেই মুক্তিলাভে সমান অধিকারী। যিনি মানব-যন্ত্রণা-দর্শনে ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিবেন কিরূপে? তাঁহার হৃদয়ের অন্তরাল হইতে "অহিংসা পরমাধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বিনিঃসৃত হইল। ধর্ম্মের কলহ-ক্ষেত্রে একতার বীজ রোপিত হইল। বর্ষার দুর্দ্দমনীয় খরস্রোতকে কে বাধা দিবে? তাঁহার সে মহাবাক্য ক্রমে সুবিস্তৃত দুগ্ধ ফেনায়মান গভীর সমুদ্রের বিশাল বক্ষ অতিক্রম করিয়া, মেঘাবলী-বিঘাতিত-অভ্রভেদী-তুঙ্গশৃঙ্গ-শৈলরাজির পাষাণ-বক্ষ ভেদ করিয়া শার্দ্দূল-বিক্রমে বিশাল জগতে ছড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীময় শান্তিস্রোত প্রবাহিত হইল। মহম্মদ অসি দ্বারা ধর্ম্ম জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে অসির ঝনঝনি, কামানের গুরু গম্ভীর নাদ, নরের হৃদয়-শোণিত, প্রলোভনের ভীষণ চাটুকারিতা বা হাটে, মাটে, গোঠে রমণীর সুন্দর মুখের ছড়াছড়ি নাই। এ ধর্ম্ম পবিত্র যুক্তিপূর্ণ ও নিঃস্বার্থ।

ধর্ম্মপ্রচারে খৃষ্ট পূর্ব্ব তিন শত বর্ষে অশোক যে উদার নীতি অবলম্বন

দিগকেও লজ্জা পাইতে হয়। কিন্তু হায়! কালবশে তাহাও দৈনন্দিন ক্ষীণতা লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য ভূভাগে "ঈশা" যে প্রেমালোক বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, প্রাচ্য ভূভাগস্থ বুদ্ধ-প্রদত্ত নির্ম্মল-প্রেম-জ্যোতি বোধহয় কোন অংশে তদপেক্ষা হীন-প্রভ নহে।

কৃষি বিষয়েও প্রাচীন ভারতীয়গণ অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ডের ন্যায় কৃষিকেও তাঁহারা নিত্য কর্ম্ম রূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তখন কৃষি বিদ্যা এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে, বৈদিক আর্য্যগণ জল প্রাপ্তির আশায় বর্ষাকালীন বৃষ্টিদাতা আকাশের (ইন্দ্রের) স্তুতি পাঠ করিতেন।

"ইংদ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিংদ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীর নূষত।" (১)
গাথা দ্বারা গাথিগণ অর্কে অর্কিগণ;
বাণীতে বাণীরা করে ইন্দ্রের স্তবন। (২)

মধুসূদন সরকার কৃত বেদ সংহিতা।
ঋগ্বেদ ১।৭।১।

তখন কৃষি-শিল্প অতীব শান্তির সহিত সম্পাদিত হইত। এমন কি উভয় দল যুদ্ধে ব্যস্ত, কিন্তু তাহার নিকটেও নির্ব্বিরোধে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইত।

এইরূপ প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ছত্রে ছত্রে, প্রতি পত্রে পত্রে, ভারতের অতীত গৌরবের দৃশ্যাবলী জ্বলন্তভাষায় অঙ্কিত। জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে, প্রতি জনপদে, প্রতি নগরে, প্রতি নয়ন তৃপ্তিকর কার্য্যনিকরে ভারতের প্রাচীন গৌরব কীর্ত্তিত। যে দিকে যাও, দেখিবে প্রাচীন ভারতের প্রাচীন মহিমা উদ্ভাসিত।

যে দেশ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার এ শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়াও কি আমাদের মনে আত্ম-নির্ভরের জ্বলন্তছবি

১। ইন্দ ধাতু বর্ষণে। ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। আর্য্যেরা আকাশকে "দ্যুঃ" "বরুণ" প্রভৃতি নামে উপাসনা করিতেন। ভারতীয় আর্য্যগণই কেবল আকাশকে বৃষ্টিপ্রদ বলিয়া ইন্দ্রনামে উপাসনা করিতেন। এরূপ অনেক স্থলে ইন্দ্রকে বৃষ্টিদাতা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

২। গাথী উদ্গাতা, স্তোতা। অর্কি—অর্চ্চন হেতু মন্ত্রোপেত হোতা। অর্ক—ঋক বা

প্রতিফলিত হইবে না? ভাই ভারতবাসী! একবার অতীতের স্মৃতিটুকুকে হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া দেখ দেখি—দেখিবে, তোমরাই একদিন বড় ছিলে, আর তোমরাই এখন জগতের এক নিভৃত কোণে বসিয়া শয়ন-সুখের শান্তিময় ক্রোড়ে মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"কি ছিলে কি হলে কি হতে চলিলে।
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে॥"

কবির এই হতাশ হৃদয়ের দুটী কথা কি তোমরা একবার ভাবিয়াও দেখিবে না? হিন্দুনামের সার্থকতা কি তোমাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে না? যদি মানুষ হইয়া মানুষের ন্যায় মাতৃ-ভূমির কলঙ্ক মোচনে স্বার্থত্যাগ না করিলে, তবে ভারতের বনবিহারী শ্বাপদশ্রেণী ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য কি?

মনে রাখিও ভারত আমাদের জন্মভূমি—ভারতের জীবন আমাদের জীবন—ভারতের দেব-দেবী আমাদের আরাধ্য—ভারতের উন্নতি আমাদের উন্নতি। ভারতবাসী আমার ভাই। দরিদ্র ভারতবাসী—অজ্ঞান ভারতবাসী—আমার ভাই।

স্বার্থ, হিংসা ভুলিয়া যাও। কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে বীর-বীর্য্য ধারণ কর। ঐ দেখ, আদ্যাশক্তি আমাদের পাছে থাকিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে অভয় দিতেছেন "মা ভৈঃ।" মাতৃসেবার বিরাট আয়োজন তোমার সম্মুখভাগে সমুপস্থিত। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যাও। আপনার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্থ হও। জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতের ত্রিশ কোটি প্রাণ সমস্বরে ডাক, 'মা! মা!' পৃথিবী-ব্যাপী ধ্বনি হইবে "মা! মা!" অনন্ত আকাশ প্রতিধ্বনি গাহিবে "মা! মা!" অমনি ভারতের জল, স্থল, কানন, কুঞ্জর, গিরি-কন্দর বিকম্পিত করিয়া "মাতৃ-গাথা"—ছুটিবে মা প্রসীদ!!

শ্রীরাসবিহারী রায়।

সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে ভদ্রলোকটি বজরা হইতে তীরে নামিলেন, তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে। মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শ্বেত-শোভায় শোভিত হইয়াছে। দেহ ঈষৎন্যুব্জ ভাব ধারণ করিয়াছে,—মুখে শ্মশ্রু-গুম্ফ কিছুই নাই। মস্তকে ক্ষুদ্র একটি শিখা,—পরিধানে সুচিক্কণ ধুতি; গাত্রে এক-খানি সুমসৃণ চাদর। গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা।

অদূরে যুবকদ্বয়কে দর্শন করিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ গ্রামের নাম কি?"

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"আজ্ঞে, ইহার নাম শঙ্করপুর।"

আগন্তুক বলিলেন,—"এ গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে?"

গো। অধিক নাই,—পাঁচঘর ব্রাহ্মণ, সাতঘর কায়স্থ, আর চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর নবশাখ—ইহা লইয়াই এ গ্রামের জনসংখ্যা।

আ। এখানে ধনবান্ গৃহস্থের বাস আছে কি?

গো। আজ্ঞে না,—সকলেই প্রায় দরিদ্র; দুই এক ঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছে।

আ। এ জমিদারী কাহার?

গো। আজ্ঞে, শুনিয়াছি ইহা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

আ। আপনি কি ব্রাহ্মণ?

গো। না, আমি কায়স্থ,—আর ঐ যুবক ব্রাহ্মণ।

আ। আপনাদিগকে এত বিষণ্ন দেখিতেছি কেন? বিশেষতঃ ঐ যুবকের অবস্থা অতিশয় শোকাবহ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। উহার কি হইয়াছে?

গো। মহাশয়, সে কথা বলিতে কণ্ঠরুদ্ধ ও বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়।

আ। যদি বলিতে নিতান্ত কষ্ট হয়, বলিয়া কাজ নাই। তবে শুনিতে

গো। যখন সেকথা দেশের সকলেই শুনিয়াছে,—সকলেই জানিয়াছে, তখন আপনার নিকট বলিতেই বা দোষ কি! বিশেষতঃ আপনি বিজ্ঞ,—প্রাচীন এবং অবস্থাপন্ন।

আ। বল,—বল, তোমাদের দুঃখের কথা আমার নিকটে বল,—যদি আমার দ্বারা তাহার প্রতিকারের কোন উপায় থাকে, নিশ্চয়ই আমি সে উপায় অবলম্বন করিব।

গিরীশচন্দ্র বসিয়া ছিল, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আছে, উপায় আছে, সারা বঙ্গে আগুণ জ্বালিয়া দগ্ধ করিলে উপায় হইবে। আমার বুকভরা আগুণ আছে—লও তোমরা, এ ভীম বহ্নি লও—এ আগুণে বঙ্গ ধ্বংস হইবে, বঙ্গের নবাব ধ্বংস হইবে,—বঙ্গের কুসন্তান ধ্বংস হইবে। আর অন্য উপায় নাই"—

গিরীশচন্দ্রের চক্ষু দিয়া অনলের ঝলক বহিয়া গেল। আগন্তুক সে চক্ষু দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

গিরীশচন্দ্র সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, গোপালচন্দ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। গিরীশচন্দ্র আর কোন কথা না কহিয়া ব্যথিত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

গোপালচন্দ্র আগন্তুকের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ যুবকের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে বড় ব্যথায়—বড় অত্যাচারে উহাঁর হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে! কি হইয়াছে, তুমি তাহা আমাকে বল।"

গো। শুনুন মহাশয়,—কিন্তু বলিতে বড় কষ্ট হয়। ঐ যুবকের নাম গিরীশচন্দ্র। উনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। সংসারে উহাঁর আর কেহ নাই,—আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে। কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমির আয়ে সংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

আ। সেই জমি কয় বিঘা বুঝি জমিদারের লোকজনে খাস করিয়া লইয়াছে?

গো। আজ্ঞে, তাহা হইলে মানুষ এমন করিয়া জ্বলে না।

আ। তবে কি হইয়াছে?

গো। ঘন জঙ্গলাবৃত এই ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যস্থলে ঐ যুবক ক্ষুদ্র এক পর্ণ

স্ত্রীর নাম উমাসুন্দরী। উমাসুন্দরী, অপূর্ব্বসুন্দরী। সে কথা বাগেরহাটের গোমস্তার কাণে উঠে। ভাবি উন্নতির আশায় সেই পাপিষ্ঠ উমাসুন্দরীর রূপের কথা ফৌজদার সাহেবের নিকটে বলিয়া দেয়। ফৌজদার সাহেব উমাসুন্দরীকে কাড়িয়া লইয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে।

আগন্তুক যেন চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তারপর?"

গোপালচন্দ্র একবার সে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে মুখে যেন কেমন এক গম্ভীরতা ও চিন্তাশীলতার ভাব অঙ্কিত হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন ফৌজদার উমাসুন্দরীকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছিল, তখন কি আপনারা বাধা দেন নাই?"

গো। কি কথা বলিতেছেন? একজনের জাতি কুল মান এবং স্নেহাধার স্ত্রীকে লইয়া গেল, আর সে বাধা দিল না? প্রাণপণ করিয়া গিরীশচন্দ্র তাহাতে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু কোথায় অগণিত ফৌজ-বল-গর্ব্বিত ফৌজদার সাহেব;—আর কোথায় দীন হীন ব্রাহ্মণ। ফৌজদারের ফৌজে তাহাকে বাঁধিয়া, মারিয়া, বক্ষ-পঞ্জর বিধ্বস্ত করিয়া উমাসুন্দরীকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল।

আ। আপনারা অর্থাৎ গ্রামের লোকে ফৌজদারের কার্য্যে বাধা দেন নাই?

গো। না মহাশয়,—কেহ সাহস করে নাই। নবাবের শিকার-লব্ধ বস্তুগ্রহণে বাধা দিতে অগ্রসর হয়, এমন লোক বঙ্গভূমিতে কেহ আছে কি না জানি না।

আ। এক্ষণে কি করিতে চাহেন?

গো। আমি? আমি আর কি করিব বলুন? স্ত্রীলোকে যেমন আত্মীয়া রমণীর শোক-সময়ে তাহাকে কেবল শান্তনার প্রবোধ দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়, আমিও তেমনি আমার বন্ধুর এই বিপদ কালে শান্তনার প্রবোধ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইব।

আ। কেন অন্য উপায় কি আর নাই?

গো। আমার বোধ হয় নাই। আমার বন্ধু দীনাতিদীন,—আমি দীনাতিদীন—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—আমরা কি করিব? এই বঙ্গভূমির সম্ভ্রান্ত এবং ধনিগণও আপন আপন কন্যা-ভগিনী রক্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া-

প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যময়ী মহারাণী ভবানীও নিজ বিধবা কন্যা তারাকে নবাবের বিলাস-দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত কুটীল কৌশল উদ্ভাবনা করিয়া তবে জাতি মান বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তথাপিও অনেকের ধারণা, এখনও ভয় যায় নাই। নবাব যদি জানিতে পারেন, তারাসুন্দরী জীবিত আছেন,—নিশ্চয়ই মহারাণীকে বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে।

আ। ওকথা মিথ্যা।

গো। কি কথা মিথ্যা মহাশয় ?

আ। তারাসুন্দরীর কথা। অনেকে বলেন, উহা রচা কথা।

গো। না মহাশয়, উহা রচা কথা নহে—আসল কথা। আমি এমন লোকের মুখে ঐকথা শুনিয়াছি, যিনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তবে ঐকথা প্রচার করিয়াছেন।

আ। তিনি কি বলিয়াছেন ?

গো। যাহা সত্য ঘটনা, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। একদিন নবাব ভাগিরথী-বক্ষে নৌকারোহণ করিয়া আগমন করিতেছিলেন। বড়নগরের বাড়ীর ছাদে তখন তারাসুন্দরী ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া নবাব আত্মহারা হইলেন,—ব্রাহ্মণের বিধবা—ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী তারাকে পাইবার জন্য নবাব ব্যস্ত হইলেন। মহারাণী ভবানীকে প্রলোভন দেখাইয়া তারাকে প্রার্থনা করিলেন।

আ। তারপরে কি শুনিয়াছ ?

গো। মহারাণী অন্য উপায় না দেখিয়া, নবাবের কবল হইতে তারা-সুন্দরীকে রক্ষা করিবার জন্য এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন।

আ। সে কৌশল জাল কি ?

গো। মহারাণী মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, তারাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে এই কথা রটনা করিলেন, এবং ভাগীরথী-তটে শূন্য চিতা জ্বালিয়া দিয়া তারার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার সংবাদ প্রচার করিলেন,—তারপরে তারাকে লইয়া নাটোরের বাড়ীতে পলায়ন করিলেন।

আ। অনেকে বলে ইহা মিথ্যা কথা।

গো। যাহারা সংবাদ রাখে না, তাহারাই মিথ্যা বলিয়া জানে। যাক্, আমাদের ওসকল কথায় কাজ নাই। এক্ষণে আমরা বিদায় হই। কিন্তু

আ। আমার পরিচয়? আমার নাম দেওয়ান বিশ্বনাথ রায়।

গো। মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। হৃদয়ের আবেগে কত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি ;—দরিদ্র বলিয়া—দীনহীন বলিয়া—শোকগ্রস্থ বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

আগন্তুক সেকথার কোন উত্তর না করিয়া, যে কার্য্যে তীরে নামিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া বজরায় আরোহণ করিলেন,—বজরা মন্থর গমনে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর ত্রিশ জন ফৌজ শঙ্করপুরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোক সন্ধ্যার প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া, কোলের ছেলে বুকে লইয়া, স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীর হাত ধরিয়া জঙ্গলে মাথা গুঁজিল। কেহ কেহ গৃহকোণে লুকাইয়া থাকিল। কেহ কেহ অন্ধকারে দেহ লুক্কায়িত করিয়া ফৌজের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

ফৌজগণ গর্ব্বিত পদক্ষেপে শঙ্করপুরের বক্ষভেদ করিয়া গিরীশচন্দ্রের পর্ণকুটীর-সন্নিধানে উপস্থিত হইল,—গিরীশচন্দ্র তখন হতাশের দীর্ঘশ্বাস লইয়া উমাশূন্য গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিল,—কয়েকজন ফৌজ গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

গিরীশচন্দ্র রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি চাও? এবাড়ীর যাহা সার ছিল, সুন্দর ছিল, পুণ্য ও প্রীতি ছিল,—তাহা তোমরা লইয়া গিয়াছ,—আবার কেন?"

একজন ফৌজ অধিকতর রুক্ষস্বরে বলিল,—"শালা, বজ্জাত,—এবার তোকে লইব।"

গিরীশচন্দ্র বিকট হাস্য করিলেন। বিকটস্বরে বলিলেন,—"উমাকে নবাবের জন্য লইয়া গিয়াছিলি, এবার বুঝি বেগমের জন্য আমাকে লইতে আসিয়াছিস্?"

একজন ফৌজ তাহাকে একটা রুলের গুঁতা মারিল। কপাল কাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। গিরীশচন্দ্র বলপ্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আর একজন ফৌজ আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। দুইজনে হিড় হিড় করিয়া

প্রায় পচিশজন ফৌজ গোপালচন্দ্রের বাড়ী অভিমুখে ধাবিত হইল। গোপালচন্দ্র পূর্ব্বেই সে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এবং গ্রামে ফৌজ আসিয়াছে শুনিয়া পরিবারবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিলেন।

মুসলমানফৌজ সে বাড়ীতে গিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, গৃহজাত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া, খাট পালঙ্ক ভগ্ন করিয়া বাহির হইল, তৎপরে গৃহচালে অগ্নি প্রদান করিয়া গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেল,—তৎপূর্ব্বে পাঁচজন ফৌজ গিরীশচন্দ্রকে লইয়া ফৌজদারের কাছারিতে গমন করিয়াছিল।

ফৌজদারের অনুপস্থিতিতে সে দিবস গিরীশচন্দ্রকে কোতে পুরিয়া রাখা হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে ফৌজদার সাহেব কাছারিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার পাত্র-মিত্র সকল যথাস্থানে উপবেশন করিল। কয়েকজন ফৌজ বড় বড় সঙ্গীণ ঘাড়ে করিয়া প্রহরণায় নিযুক্ত হইল।

ফৌজদার সাহেব তখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। গতরাত্রের অধিকাংশ সময় মদিরা সেবন ও বাইজী লইয়া অতিবাহিত করিয়া ছিলেন,—এখনও তাহার ঝোঁক, এখনও তাহার রক্ত চক্ষুর স্তিমিত ভাব—এখনও তাহার জড়তা বিদ্যমান ছিল।

ফৌজদারসাহেব জাতিতে হিন্দু। কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রু গুম্ফদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত—পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ মুসলমানের ন্যায় 'ইজের-চাপকানে' দেহ আবৃত—মস্তকে একটি তাজ।

ফৌজদার সাহেব কাছারীতে আসিয়াই পার্শ্বোপবিষ্ট খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি আসিয়াছে ?"

খাজাঞ্চী বুঝিতে পারিল না, সে কে। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"ধর্ম্মাবতার, সে কে ?"

সুরা-রক্ত-আঁখি কিঞ্চিৎ টানিয়া ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"আনরপুরের সেই সয়তান। যাহাকে আনিতে ফৌজ গিয়াছিল।"

খা। আজ্ঞা হাঁ, সে আসিয়াছে।

ফৌ। কোথায় আছে ?

খা। কোতে।

ফৌ। দুই বেটাই আসিয়াছে ?

ফৌ। যার বৌউকে আনা হইয়াছিল ?

খা। আজ্ঞে হাঁ।

ফৌ। আর সেই সয়তান বেটা ?

খা। কে,—গোপাল ?

ফৌ। হাঁ।

খা। না, তাহাকে পায় নাই।

ফৌ। পায় নাই কি ? সে কি নবাবের মুল্লুক ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে ? তাহাকে চাই-ই।

খা। আদেশ হইলে আ'জ আবার ফৌজ পাঠান হইবে।

ফৌ। পাঠান হইবে কি, এখনই পাঠাও। যদি তাহাকে বাড়ীতে না পাও, তাহার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে ধৃত করিয়া আনিতে আদেশ করিবে। স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া আনিলে সে বজ্জাত আপনিই ধরা দিবে।

খা। যে আজ্ঞা, এখনই ফৌজ পাঠানর বন্দোবস্ত করা যাইতেছে।

ফৌ। আর সেই সয়তান শালাকে কোত হইতে এখানে আনাও।

খাজাঞ্চী বুঝিল, 'সয়তান শালা' অর্থে গিরীশচন্দ্র।

একজন ফৌজ দৌড়িয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ গিরীশচন্দ্রকে তথায় আনয়ন করিল।

গিরীশচন্দ্রের মুখভাব প্রদীপ্ত প্রতিহিংসার জ্বলন্ত বহ্নির উজ্জ্বল আভাময়। চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনলের ঝলক বহিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গে কালিমার ছায়া।

ফৌজদার তাহার দিকে একবার চাহিলেন। তারপর বলিলেন,—"শালা সয়তান, একি নবাবের মল্লুক নয় ?"

শালা সয়তান অর্থাৎ পত্নীহারা গিরীশচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না। কথা তাহার কাণে গিয়াছে, এখনও বোধ হইল না।

ফৌজদার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"শালা সয়তান, তোমরা ভাবিয়াছ, নবাবের রাজত্বটা কাড়িয়া লইবে! এখন ফলভোগ কর। শালারা কাহার সাক্ষাতে নবাবের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছ জান ? নবাবের চির হিতচিকির্ষু দেওয়ান বিশ্বনাথের সাক্ষাতে নবাব বাহাদুরের নিন্দা! দেওয়ান বাহাদুর নবাব-সরকারে কখন কোন চাকুরী করেন নাই—

সঙ্গে বহুল জায়গির প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাতে এই দুই শালা কত মন্দকথা বলায় তিনি ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে চালান দিতে বলিয়াছেন,— যা শালারা, এখন জেলে পচিয়া ম'রগে।"

এত শাসন-তাড়না, এত তর্জ্জন-গর্জ্জন, এত হিতকথার অবতারণা— তথাপি গিরীশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না। তখন ফৌজদার সাহেব আদেশ করিলেন,—ইহার হাতে হাতকোড়ি এবং পায়ে বেড়ী দিয়া অদ্যই মুর্শিদাবাদে রওণা করিয়া দেওয়া হউক। ইহার সঙ্গে পঁচিশ জন সশস্ত্র ফৌজ গমন করিবে।

আদেশ পালনের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রায়াগতা সন্ধ্যাসময়ে হীরাঝিলের নাচঘরে নবাব সিরাজদ্দৌলা সুমসৃণ মসলন্দের আসনে উপবেশন করিয়া ছিলেন,—চারি পার্শ্বে পারিষদগণ বসিয়া নানাবিধ বিলাস-দ্রব্যের গল্প করিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিতেছিল। গৃহ-ভিত্তি হইতে গোলাপ-গন্ধ বাহির হইয়া সান্ধ্য সমীরণের সহিত মিশিতেছিল।

নবাব কি চিন্তা করিতেছিলেন,—সহসা পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধ বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভাল, তারাসুন্দরী কি সত্য সত্যই জীবিত আছে?"

বিশ্বনাথ করযোড় করিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা, শঙ্করপুরের সেই যুবকের মুখে ঐরূপই শুনিলাম।"

ন। মহারাণী ভবানী স্ত্রীলোক হইয়া আমার সঙ্গে এত ছলনা করিল! তারার কি সুন্দর গঠন—যেন দোজোকের হুরী। একবার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি তারা জীবিত থাকে, তবে তাহাকে আনিয়া হীরাঝিলের শোভা বর্দ্ধন করিতে হইবে,—আর মহারাণী ভবানীকে এই প্রতারণার জন্য উচিত মত শিক্ষা দিতে হইবে।

পার্শ্বে রহিম খাঁ উপবিষ্ট ছিল। রহিম খাঁও একজন পার্ষদ,—নাচে গানে মদে আমোদে সব তাতেই তাহার সমান আসর। তবে সে অন্যান্য পার্ষদ-

উপরে অতি মিষ্টভাবে নবাবকে হিতোপদেশ প্রদান করিত। নবাব আমোদ করিয়া রহিমখাঁকে 'নানা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং তাহাকে লইয়া অনেক আমোদ-প্রমোদও করিতেন।

রহিম খাঁ বলিল,—"খোদাবন্দ, একটা কথা কি জানেন, পলায়িত মুর্গীকে জবাই করা ভাল নয়। ভয় খাইলে তার বুকের রক্ত জমায়ত-বস্ত হয়—মেটের স্বাদ পাওয়া যায় না।"

নবাব রহিমের কথা কাণে করিলেন কি না, বলা যায় না। তিনি বিশ্ব-নাথের প্রতি আদেশ করিলেন,—"শোন দেওয়ানজি, আ'জই তুমি নাটোরে রওনা হও। সেখানে গিয়া গোপনে এবং উপযুক্ত ভাবে তারার সন্ধান লইবে। যদি সে জীবিত থাকে, যে কোন প্রকারেই হউক, এখানে লইয়া আসা চাই। সৈন্যবল প্রয়োজন হইলেও পশ্চাৎপদ হইবে হইবে না,—সংবাদ প্রদানমাত্র সৈন্য প্রেরিত হইবে।

বৃদ্ধ বিশ্বনাথ বলিলেন,—"যে আজ্ঞা হজুর।"

রহিম খাঁ বলিল,—"দেওয়ানজি সাহেব, এ দেওয়ানিগিরিতে লাভ ও সম্মান যথেষ্ট আছে,—আর আহার-বিহারের তোফা সুবিধা আছে, তাও জানি। কিন্তু একটু ভেবে চিন্তে কাজ ক'র বাবা।"

বি। কি ভাবিতে যাইব—একি নবাবের মুল্লুক নয়? কোন্ শালা নবাব বাহাদুরের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে?

র। ঐ করেই ত দফা-রফা কর্‌তে বসেছ বাবা;—এখন ভাব্‌চো নবাবী চা'ল চালিয়ে যাচ্ছ খুব—কিন্তু হিসাব নিকেষ আছে। আরও এক কথা—এ শঙ্করপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী নয়—মহারাণী ভবানীর কন্যা!

বি। তাই কি? আমি কি কাকেও ডরিয়ে চলি? বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবের উপর কথা কয়, এমন লোক কে আছে?

র। তা নাই বটে দেওয়ানজি,—কিন্তু যমরাজের কথাওত এক একবার মনে করা উচিত।

বি। আমি ওসব কথা মনে করি না। যতদিন বাঁচি, তত দিন ত মনিবের কাজ করি,—তারপর ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

র। যমেরবাড়ীর ভাবনা ভাবার আগে, যদি নাটোর যাওয়া হয়,—তবে মহারাণী ভবানীর সিপাহীর লাঠির ভাবনাটা একটু ভাবিবেন। এ কিন্তু

দরিদ্রের জাতি কুল মান এবং স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতি আপনার ঐ নাগরা জুতার তলে দলিয়া ফেলিয়া, তাহার স্ত্রীকে কাড়িয়া আনিলেন,—আবার তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া কারাগারে পুরিয়া রাখিলেন কেন ?

বি। আমি কিছুই করি নাই,—ফৌজদারসাহেব ফৌজদ্বারা গিরীশ-চন্দ্রের স্ত্রীকে ধরিয়া আনিয়াছেন,—ফৌজদারসাহেব ফৌজদ্বারা গিরীশ-চন্দ্রকে ধরিয়া আনিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়াছেন।

র। উভয় কার্য্যই ত মহাশয়ের হুকুম অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। মহাশয়ই ত ঐ বিভাগের প্রধানতম কর্ম্মচারী—মহাশয়ই ত দেওয়ানজী।

বি। তাত বটেই—তবে কি জানেন, গিরীশ বেটার উপরে আমার ভয়ানক রাগ হইয়াছিল,—তাই তাহাকে ধরাইয়া আনিয়াছি।

র। কেন দেওয়ানজি মহাশয়,—এরাগ ওঠে কোথা থেকে ? তার স্ত্রীটিকে কাড়িয়া লইয়া আসিলেন,—সে তাহার বন্ধুর সহিত বসিয়া রোদন করিতেছিল,—আর তাহার উপরে এত রাগ হইল যে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদে পূরা হইল !

নবাব সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—"নানা, ও সব কথার আলোচনায় কাজ কি,—দেওয়ানজীর উৎসাহ ভঙ্গ করিও না।"

র। না না,—দেওয়ানজি সমান উৎসাহে কাজ করুন—তবে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম যে,মহারাণীর মেয়েকে আনাটা নিতান্ত সহজ কাজ নহে। ভাল, জাঁহাপনা,—শঙ্করপুরের সে বেগমটি কি পোষ মানিয়াছে ?

ন। কেন তুমি কি শোননি নানা,—তাহাকে জীবন্তে দেওয়ালের গায়ে পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে।

র। জাঁহাপনা,—আমি বলি কি, সব পাখীই কিছু পোষ মানে না। যে গুলা পোষ না মানে, তাহাদিগকে তাদের বাসার দিকে উড়িয়ে দিলে হয় না ? কিছুদিন পরে যে, হীরাঝিলের ইঁটে ইঁটে স্ত্রীলোকের হাড়ে ঝুলিবে।

ন। নানা,—তোমার কথা শুনিয়া কাজ করিতে গেলে পয়গম্বর সাজিতে হয়, এখন একটু মদ্য খাবে ?

র। তার জন্যেই ত এখানে এতটি লোকের সমাগম। মেহেরবানি হইলে একটু নেশা করিয়া চলিয়া যাই। আ'জ মহারাজা মোহনলাল কোথায় ? এ সময়ত তিনি কোন দিন অনুপস্থিত থাকেন না ?

র। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুরের শারীরিক অবস্থা কিরূপ?

ন। ভাল নয়। হেকিমগণ হতাশ্বাস হইয়াছেন,—বোধহয়, বাঁচিবেন না।

র। তবেইত হ'ল।

ন। কি হইল?

র। আপনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব হইলেন,—এই সমগ্র দেশ আপনার প্রজা—আপনার সন্তানের স্বরূপ হইল—ইহাদিগের মান-সম্ভ্রম, জাতি-কুল, ধন-সম্পত্তি সমস্তই আপনার হাতে—সর্ব্ব প্রকারে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।

ন। কেন, এখন কি আমি নবাব নহি?

র। হাঁ, আপনি নবাব,—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ জীবিত থাকিয়া আপনাকে গদী ছাড়িয়া দিয়াছেন,—তথাপি তিনি আপনার মুরুব্বি স্বরূপ রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবিদ্যমানে,—আপনিই সব। তখন মেয়ে মানুষ আর মদের নেশা ছাড়া চাই,—তবে আমরা যে তখন কোথায় যাব—সেই যা ভাবনা!

নবাব সেকথার কোন উত্তর করিলেন না। এই সময় একদল সুন্দরী নর্ত্তকী ও কয়েক পাত্র সিরাজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সপার্ষদ নবাব বাহাদুর তখন সিরাজী সেবন ও সুন্দরীগণের নৃত্যগীত দর্শন-শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি অনেকখানি হইল,—তখন সভাভঙ্গ করিয়া নবাব সাহেব অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। পার্ষদগণ উঠিয়া স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

অন্দরমহলের মধ্যস্থলে এক স্ফটিক-বেদিকা। স্ফটিক-বেদিকার চারি-ধারে কৃত্রিম ফোয়ারা,—ফোয়ারায় সুন্দরী পরীর পাষাণ মূর্ত্তি;—সেই মূর্ত্তির মুখ হইতে গোলাপজলের উৎস ছুটিতেছে। বেদীতলে কৃত্রিম পুষ্পবৃক্ষের সারি,—সন্ধ্যাকালে কৃত্রিম বৃক্ষ সমূহে সাদ্ধ্য ফুল্ল অকৃত্রিম পুষ্পরাশি থুপিয়া থুপিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে,—সে সকল পুষ্প হইতে সৌরভ ছুরিত হইয়া নৈশবাতাসে মিশিয়া সর্ব্বত্র সুগন্ধ বিস্তার করিতেছিল।

সেই স্ফটিক বেদিকার পার্শ্বদেশে হস্তীদন্ত বিনির্ম্মিত একখানি সুন্দর কৌচ পাতিত ছিল,—নবাব সিরাজদ্দৌলা কোন কোন সময় তথায় আসিয়া

নবাব যে নিত্যই সেখানে আসিয়া বসিতেন, তাহা নহে। যে দিন তাঁহার হৃদয়ে নির্জ্জনবাসের বাসনা জাগিত, যে সময়ে একাকী বসিয়া কোনও বিষয় চিন্তা করিবার ইচ্ছা হইত, সেই দিন—সেই সময় তিনি এই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিতেন,—বলা বাহুল্য, রাত্রিতে যখন বেগমমহলে থাকিতেন, তখনই এস্থানে বসিতেন। দিবাভাগে বসিবার এস্থান নহে।

নবাব একা,—একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। বেদীর পার্শ্বে একটি পরীবালকের হস্তে কাচাধারে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া জ্বলিয়া সর্ব্বত্র আলোকিত করিতেছিল।

নবাব তাঁহার মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর কথা, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন ও রাজ্যের কথা ভাবিতেছিলেন। মাতামহের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই,—দুই এক দিনের মধ্যেই সে প্রদীপ চিরদিনের মত নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। তখন কর্ম্মচারিগণ, জমিদারগণ, সামন্তগণ, প্রজা-গণ তাঁহার অনুগত থাকিবে কি না, তিনি মাতামহের ন্যায় অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতে পারিবেন কি না,—অন্য কোন গৃহশত্রু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে কি না,—এই সকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি নৈশ-আকাশের দিকে পতিত হইল। নবাব বাহাদুর তখনকার আকাশের অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং একদৃষ্টে আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

নবাব দেখিলেন,—আকাশ ছাইয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উদয় হইয়াছে। কিন্তু তত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জলশূন্য—যেন অন্ধকারের বিরাট জমাট। আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের কথা এই যে,—সেই ঘন কৃষ্ণ গাঢ় মেঘের মধ্য হইতে চন্দ্র তারা প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ কুল সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছিল।

নবাব বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন,—সেই কৃষ্ণ মেঘের কোলে তাঁহার মৃত পিতার মুখ ফুটিয়া উঠিল। সেই বুভুক্ষিত ব্যাঘ্র-দৃষ্টির অনল চাহনি নবাবের মুখের উপর পতিত হইল,—কৃষ্ণ মেঘ আরও কৃষ্ণতর হইয়া দাঁড়াইল। আরও উর্দ্ধে এক রমণীর দেহ দেখা গেল। আকাশে ঝড় উঠিল,—সে বাতাস মৃত্যু-গন্ধী—অনলবর্ষী।

নবাব সভয়ে দেখিলেন, সে মূর্ত্তি উমাসুন্দরীর। হীরাঝিলের দেওয়ালে

হইয়াছিল,—এখনও ঠিক সেই ভাব,—সেই ভাবে উমাসুন্দরী মেঘের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছিল, এবং নবাবের পিতৃমূর্ত্তির নয়ন হইতে অগ্নির ঝলক নামিয়া আসিয়া যেন নবাবের মস্তকে বর্ষিত হইতেছিল। নবাব শিহরিয়া উঠিলেন। জড়িত কণ্ঠের কম্পিত স্বরে ডাকিলেন,—"কে আছ?"

সৌন্দর্য্যের প্রতিমা লুৎফ উন্নেসা বেগম অদূরে ছিলেন,—ত্বরিত গমনে স্বামীর নিকটে আসিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিলেন,—"কি হইয়াছে, জাঁহাপনা?"

ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় স্বরে নবাব বলিলেন,—"ঐ দেখ, ঐ দেখ,—উমাসুন্দরীর মরণ-চিত্র দেখ;—কি ভয়াবহ! কি আগুণের গড়! ঐ দেখ, আমার পিতার মূর্ত্তি,—চক্ষু দিয়া বাজের আগুণ বাহির হইতেছে,—আমাকে পুড়াইবে, ধ্বংস করিবে!—কে আছিস্, আমায় ধর্—আমায় ধর্!"

লুৎফউন্নেসা আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, নির্ম্মল গগনে নির্ম্মলচন্দ্র বসিয়া সুশুভ্র করবর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইল,—অত্যধিক সিরাজি সেবনে এমন হইয়াছে। তখনই "বাঁদী, বাঁদী" বলিয়া চীৎকার করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আট দশজন বাঁদী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহায্যে নবাব বাহাদুরকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

সেখানে পাখার বাতাসে, গোলাপজল-সিঞ্চনে নবাব প্রকৃতিস্থ হইলেন। বাঁদীগণ চলিয়া গেল।

নবাব ও বেগম উভয়ে পালঙ্কে উপবিষ্ট। নবাব বলিলেন,—"লুৎফ উন্নেসা; আমি আকাশের গায়ে যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে আমার অশুভ বলিয়াই বুঝিতেছি; এখনও আমার প্রাণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!"

লুৎফ উন্নেসা বলিলেন,—"জাঁহাপনা, সিরাজির জন্যে এমন হয়েছে, আর কিছুই নয়।"

নবাব শুষ্কমুখে বলিলেন,—"না বেগম সাহেব, সিরাজির জন্যে ঐ অশুভ ছবি দেখা দেয় নাই,—সিরাজের ভবিষ্যতের জন্য উহার আবির্ভাব হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

আবেগ।

যাই প্রতিদিন তাহারি কাছে
বলিব বলিব আশে।
বলিতে পারি না মরম বেদনা
থাকে গো হৃদয়ে মিশে।

জাগে জাগে আজো পুরাণ স্মৃতি
জাগে সে পুরাণ গীতি।
জাগে ভালবাসা উছলিত ভাষা
যা ছিল হৃদয়ে গাঁথি।

মনে পড়ে অই সুপবিত্র খেলা
কিশোর পবিত্র সাজে।
তাই তাই তাই জল খেলা নাই
স্মরিলে হৃদয়ে বাজে।

সারাটী রজনী নীরবে বসিয়া
ভাবি গো তাঁহারি কথা।
চারুচন্দ্র এসে যায় কোথা ভেসে
কোথা সে মধুরতা।

আরত আসে না হৃদি-বৃন্দাবনে
করে না গো রাসক্রীড়া।
কদম্বের মূলে দাঁড়াইয়া কানু
ধরে না গো সপ্তস্বরা।

পরাণ আবেগ থাকে গো পরাণে
গুমরি গুমরি উঠে।
ফুলি ফুলি কাঁদি কি করিলে বিধি
কি করিল হায় শঠে!

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র নাথ।

আগমনী।

(১)

আনন্দের আবরণে শরৎ প্রকৃতি,
বরষে জোছনা-ধারা রজনীর পতি।
নীলিম গগন-পটে কভু ক্ষুদ্র মেঘ,
করে ছুটা ছুটি প্রাণে কি যেন আবেগ!
নিষ্ফল গর্জ্জন তার হতাশের শ্বাস,
চলিছে সাগর পানে তটিনী উদাস।
ফুটিছে প্রসূণ, মৃদু বহিছে পবন,
ছুটিছে প্রমত্ত অলি ভাসিছে গুঞ্জন।

(২)

আজি এ আনন্দ দিনে আয় মা কল্যাণি!
নিরানন্দ গৃহে তোর, ত্রিলোক-জননী।
কেমনে নির্ম্মম প্রাণে ভুলিয়ে সন্তানে,
রয়েছ পাষাণ সুতা; দুর্ভিক্ষ আগুণে—
হতেছে ভারত-বক্ষঃ ছার খার প্রায়,
বারেক নয়ন-কোণে হের বসুধায়।
আজি এ ভারতে তোর কেন হাহাকার,
অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ পুত্র অন্নদার।

(৩)

পুলকে পুরিত হ'ত ভারত-সন্তান,
তব আগমনে, হৃদে করি তব ধ্যান।
হইত সে নেত্রে প্রেম-অশ্রু-নিঃসরণ,
যে নেত্রে যন্ত্রণা-ধারা বহিছে এখন।
বিষাদ-কালিমা আজ বদনে বিরাজে,
আনন্দের হাসি তায় ভাসিত কি সাজে।
বিযুক্ত স্বভাব-শোভা নয়ন-রঞ্জিনী,

(৪)

নাই হেন প্রফুল্লতা সে আনন্দোচ্ছ্বাস,
নির্জ্জীব ভারতে শুধু বহে ক্ষীণ শ্বাস।
পক্ষান্তরে রাজকর-রাক্ষস ভীষণ,
শোণিত সদৃশ অর্থ করিছে শোষণ!
তারিণি! কৃপাণী তারা দানব-দলনী,
কৈ মা সে রূপে দেখা দিবে কি জননী?
যেরূপে নাশিলে চণ্ড মুণ্ড মহিষেরে,
আয় মা! দুর্ব্বল প্রাণে ডাকি গো তোমারে।

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

ভোলা।

(১)

সবে বলে ভোলা ভাল নয়।
তবে কেন ভোলানাথ সব ভুলে রয়?
স্মৃতির গোলামী করি, চির দিন দুঃখে মরি,
কুহকে পড়িয়া তার করি হায় হায়!
এ হেন স্মৃতির আর না লব আশ্রয়;—
ভোলা ভাল ব'লে ভোলা ভুলেছে নিশ্চয়।

(২)

ভুলে পড়ি সবে ভোলে ভোলারে না চায়;
মিছে আশা দিয়ে স্মৃতি সংসারে নাচায়।
ভোলার অঙ্কেতে থাকে পুণ্য-আচরণ।
স্মৃতি রাখে পাপকার্য্য করিয়া যতন।
স্মৃতি বাঁধে জীবে নিত্য নূতন নূতন।
ভুলে গেলে খুলে যায় সংসার-বন্ধন।
তবু লোকে কেন বলে ভোলা ভাল নয়।

(৩)

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু নারায়ণ,
'আত্মভোলা' ব'লে লোকে পরিচিত হন।
ভোলা ভাল ব'লে ভোলানাথের চরণ,
লভিতে হইলে আগে ভোলা প্রয়োজন।
সব ভুলে গেলে জীব শব শিব হয়।
শক্তির চরণ-কৃপা তখন লভয়।
পূর্ণানন্দময় সব ভুলে গেলে হয়।
তাই বুঝি ভোলানথ সব ভুলে রয়॥

(৪)

যে আনন্দময়ী শান্তি লাভের কারণ,
কঠোর যোগেতে মগ্ন যোগি-ঋষিগণ।
লভিতে সে শান্তিধনে ভোলাই আশ্রয়,
তাই ভোলা সব ভুলি ভোলানাথ হয়।
ভোলাগুণ জানি ভোলা মোহিত ভোলায়।
ভোলা ভাল ব'লে ভোলা ভুলেছে নিশ্চয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গান।

মরে বেঁচে বল্, আছে রে কি ফল—
ধিক্ পরাধীন জীবনে।
(আছ) আশা-যত্ন-হীন, চির উদাসীন,—
চির নিমগন শয়নে।
(ধু)—ধিক পরাধীন জীবনে!
চির-পদানত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত,
আছ বহুদিন চেতনা রহিত,—
মান-অপমান, মনুষ্যত্ব-জ্ঞান
বিলুপ্ত, দাসত্ব-গ্রহণে—

নিজ বাসে আছ চির পরবাসী—
মাসে ত্রিশ দিন কর একাদশী—
লাথির দাপটে কত প্লীহা ফাটে,
শতধারে অশ্রু নয়নে!
(ধু)—ধিক্ পরাধীন জীবনে!

গেছে সব, শুধু ছিল ধর্ম্ম, জাতি,
তা'ও আজি যায়—হায়রে দুর্গতি!
দেবতা-মন্দিরে পিশাচ বিচরে—
নিগ্রহে বিগ্রহ চরণে!
(ধু)—ধিক্ পরাধীন জীবনে!

হিন্দুর শোণিত বিন্দু পরিমাণে
বহে না শিরায়?—দেখ না নয়নে?
মা ভগিনী ধ'রে সতীধর্ম্ম হরে—
বিদরে যে মর্ম্ম রোদনে!
(ধু)—ধিক্ পরাধীন জীবনে!

কর-যোড়ে কহে অধম 'রঞ্জন'—
কি কাজে কি লাজে বহিছ জীবন?
আশু প্রতীকারে অক্ষম যদি রে—
জ্বলুক ভারত আগুণে—
(ধু)—ধিক্ পরাধীন জীবনে!

শ্রীরজনীচন্দ্র কাব্যরঞ্জন।

রামজী সেন।

রামজী সেন একজন কবি জ্যোতিষী। ইহাঁর আসল নাম রামজয় সেন বলিয়াই বোধ হয়। তবে ইনি সর্ব্বত্রই রামজী সেন বলিয়াই পরিচিত। ইহাঁর পিতার নাম, অভিরাম সেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রাণীহাটী পরগণার অধীন জামনা গ্রামে ইহাঁদের বাস। জাতি বৈদ্য। ১৭২২ শকে

খানি ভাষা গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থখানি সেন মহাশয় বহুতর জ্যোতিষ গ্রন্থ অবলম্বনে মূল শ্লোকগুলি ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়া প্রচারিত করেন। এক্ষণে আমাদের দেশে যে সমস্ত ডাক ও খনার বচন প্রচলিত আছে, তাহাতে যেমন ছন্দের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না, সেন মহাশয়ের গ্রন্থেও সেইরূপ ছন্দো বন্ধ সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে ভাষায় পদ্যানুবাদ ব্যতীত স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকও সন্নিবিষ্ট আছে। আমরা সর্ব্বকর্ম্মের যে পুঁথিখানি পাইয়াছি, তাহাতে ২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে শেষের কয়েক পৃষ্ঠা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই পাণ্ডুলিপি কোন শকে কাহা কর্ত্তৃক লিখিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। এবং প্রাপ্ত গ্রন্থ হইতে সেন মহাশয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল জানিবারও কোন উপায় নাই, তবে তিনি যে ষোড়শ শকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই।

সর্ব্বকর্ম্ম গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিহ্নলক্ষণ শ্রীমতী রাধিকা-চরণচিহ্ন লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। নিম্নে গ্রন্থারম্ভের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল;—

"নারদ বাল্মীকে কহিল নাম প্রধান।
সকল শাস্ত্রেতে আছে ইহার প্রমাণ।
রাধা-কৃষ্ণ দুর্গা-গঙ্গা-কালী-শিব-শিবে।
মরণ কালেতে মুখে এনাম কহিবে।
গণেশ সূর্য্য রাম পরাৎপর জানিল।
এই সময় নাম মুখে কলমে লিখিল।
একান্তে মাত্রা বিনে কবিতা নাহি হয়।
জীবৎ মানে জ্ঞানে আমি কহিল নিশ্চয়।
ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু সুখ নাহি চাই।
অন্তকালে কেবল শ্রীপাদ পদ্ম পাই।
এন হইতে হীন রেণু হইতে ন্যূন।
অন্তকালে যেন এই চরণে হই লীন।
পূজার সময় নানা মত হয় আশা।
রামজীর মৃত্যুকালে শ্রীগুরু ভরসা॥"

করণান্তর শিব-দুর্গাদির বন্দনা করিয়া নিজ বংশ পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে সেই প্রসঙ্গের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"বর্দ্ধমান পরগণে রাণিহাটী জামনা নিবাসী।
মম তাত রামগোপাল চরণ হৃদয় প্রকাশি।
... শশধর বংশতে শ্রীরামজী সেনগুপ্ত
লোক কৃপাবান। নত্বা বৈদ্যকুল জ্ঞাতিন
গ্রহবিপ্রাংশ্চ ব্রাহ্মণান্। পুস্তকস্য নাম
সর্ব্বকর্ম্মসু হরি মুনি চন্দ্র শাকীয়া নানা
জ্যোতিষ গ্রন্থস্ত দৃষ্টে কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে ময়া।
আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম সেনের গুণ।
রঘু মল্লিক কুলজিতে ঐশ্বর্য্য করিল বর্ণন।
সেইবংশে আমার জন্ম সকল বিদ্যাগুণহীন।
ভাষায় ভাঙ্গিল জ্যোতিষ সর্ব্বকার্য্যে যাত্রা দিন।
অন্যের কিবা কথা পিতা পুত্রেরে না শিখায়।
বিশেষ প্রয়াস পাইলে তবু সঙ্কেত নাহি কয়।
ভাষা প্রকাশ করিতে জ্যোতির্ব্বেত্তা অনুমতি নয়।
যদি এই পুস্তক দেখে অক্ষর জ্ঞান আছে যার।
সকল ক্রিয়া কর্ম্মের দিন করিবার সুসার।
এই পুস্তক দেখি যেবা মন্নাম করিবেন কি।
আব্রহ্ম কল্প পর্য্যন্ত সেই হবে মহাপাতকী।
শিব দুর্গা চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
প্রকাশি অজ্ঞান বোধ জ্যোতিষ গণন।
...... শব্দে নাহি বুঝে অজ্ঞানে।
ভাষাতে ভণয়ে বৈদ্য শ্রীরামজী সেনে॥"

আমরা আমাদের আদর্শ পুঁথিতে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। কোন কিছু সংশোধন করি নাই।

গ্রন্থে সঙ্কলন কর্ত্তা সেন মহাশয় নিজের বংশ পরিচয় দিয়া, বাসস্থানের স্থানে নির্দ্দেশ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"জামনার দক্ষিণ পার্শ্বে রামজী সেনের বাটী।"

ছিল। তাঁহার পিতা রামগোপাল সেন বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম সেন নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন।

এই অভিরাম সেনের নানা গুনের বিষয় বৈদ্যকুলজিগ্রন্থে রঘু মল্লিক মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া, সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্যোতিষী সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"অন্যের কিবা কথা পিতা পুত্রের না শিখায়।
বিশেষ প্রয়াস পাইলে তবু সঙ্কেত নাহি কয়।"

এই কথাটী যে একেবারে মিথ্যা, তাহা নহে। এইরূপ গোপনে গোপনে জ্যোতিষের অনেক বিষয়ের গণনার সঙ্কেত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সঙ্কলনকর্ত্তা সেন মহাশয় জ্যোতিষের বহুবিষয় সংগৃহীত করিয়া ভাষায় অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থে যাত্রাদি সম্বন্ধে শুভদিন ক্ষণাদি বিচার, বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার, ক্রিয়া কলাপের প্রশস্ত দিনাদি নির্ণয়, কালাশুদ্ধি প্রভৃতি বহুবিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সঙ্কলনকর্ত্তা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী শুভ দিন-ক্ষণাদি নির্ণয়ের বিশেষ উপযোগী করিয়া যে গ্রন্থখানি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থের প্রচারও বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য।

প্রদোষে।

মেঘের আড়ে ধীরে ধীরে
অস্তে যায় রবি।
সোণার কিরণ জুড়ায় নয়ন
লোহিত বরণ ছবি।
সৌরভে প্রাণ আকুল ক'রে
ফুটল বকুল ফুল,
ছুটল বায়ু গন্ধ ব'য়ে

মল্লিকা যুঁই কামিনীর
অর্দ্ধস্ফুট কলি।
সোহাগ ভরে শেফালিকা
প'ড়ছে যেন ঢলি।
আ'ধ ফুটন্ত কুসুম রাশির
ল'য়ে সৌরভ ভার ;—
মলয় পবন বিলাসীরে

সরোবরে ফুল্ল কমল
ফুটে সোহাগ ভরে
ছড়িয়ে আপন রূপের ছটা
ছিল আলো ক'রে ;—
বিরহে সে সকাতরা
রবি অস্তে যায়,
অভিমানে বিষাদিনী
ঘোম্‌টা টেনে দেয়।
রবির সনে আ'জকার মত
ফুরিয়ে গেল সুখ।
তা'ইতে যেন অভিমানে
ঢাকছে কমল-মুখ।
নীলাকাশে মনের সাধে
তারারাজির পাশে,
পতির বদন দেখ্‌বে সুখে
তাই কুমুদী হাসে।
বীচিমালা তুলে নদী
যা'চ্ছে হেলে দুলে।
রবির কিরণ ধরে বুকে
কতই খেলা খেলে।
দুটি কুলে ফুট্‌ছে কত
স্বভাব জাত ফুল।
আপন মনে যা'চ্ছে বয়ে
কুল কুল কুল কুল।
তীরে তীরে গাছ গুলি সব
দুলে মলয় বা'য়,
সোহাগ ভরে তটিনীরে
প্রাণের কথা কয়।
লোহিত বরণ রবির আগে
জ্ব'লছে নদীর বুক
রাঙ্গা মেঘের ছায়া লেগে
টুক্‌ টুক টুক্‌ টুক্‌।
বিহঙ্গকুল কলরবে
ঢা'ল্‌ছে মধুর ধারা।
শাবক পানে আস্‌ছে ছুটে
হ'য়ে পাগল পারা।

কাকেরা সব কা কা রবে
ব্যাকুল চিতে ধায়।
জগৎবাসী জীবে জানায়
রবি অস্তে যায়।
ঊর্দ্ধ মুখে হাম্বা রবে
আস্‌ছে গাভীগুলি।
সারি সারি আকাশ পানে
উড়িয়ে পায়ের ধূলি।
ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে
ঢা'কছে কানন-দেশ।
সমাগতা সন্ধ্যাসতী
ধ'রে চারু বেশ।
হীরের মত একটি তারা
ঝিকি মিকি জ্বলে।
সিঁদুর বিন্দু পরা যেন
সন্ধ্যা সতীর ভালে।
কিসের তরে প্রদোষ কালে
এ সুষমা হেরি
পুলকাশ্রু ঝরে চ'কে
বিভু-প্রেম স্মরি ?
নিশা গতে ঊষা আসে
অতি মনোহর।
সোণার বরণ তরুণ তপন
জগৎ আলোকর।
কার উদ্দেশে কার আদেশে
নিত্য আসে যায় ?
কার আদেশে সন্ধ্যা সমীর
ফুলে ফুলে ধায় ?
কার আদেশে কোকিল-গানে
মাতায় জগৎ বাসী ?
কাহার সৃজন শিশুর মুখে
মৃদু মধুর হাসি ?
যার্‌ মহিমা রবি শশী
দিক্‌ দিগন্তে ধায়,
কোটী কোটী প্রণিপাত
সেই ভবেশের পায়।

আক্ষেপ।

নিকটে থাকিতে হায় চিনি নাই তোমা,
বুঝি নাই তব শুভ্র পবিত্র মহিমা,
দেখি নাই কত তুমি প্রশান্ত সুন্দর,
তাই করিয়াছি দেব তব অনাদর।
আজি চলে গেছ তুমি দূরে, অতি দূরে,
দেবতার বাসস্থান—বৈজয়ন্ত পুরে;
আজি বুঝিয়াছি তুমি দেবতা আমার
প্রত্যক্ষ ছিলে গো এই সংসার মাঝার।
এতকাল শুধু হায় কুহকে ভ্রান্তির
রুদ্ধ হয়ে ছিল মোর উৎস ভকতির;
আজি সে কুহক দেব টুটে গেছে মোর,
তাই ডাকিতেছি তোমা প্রেমানন্দে ভোর।
এস প্রভু! ফিরে তুমি এস একবার,
অনুতাপে শুদ্ধ প্রাণ লও উপহার।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সংবাদ।

উড়িষ্যার ভীষণ জল প্লাবন হইয়া লোকের গৃহ শূন্য করিয়াছে, ধান্য ও শস্যাদি বিনষ্ট করিয়াছে। ভারত-ভাগ্যে কেবলই বিড়ম্বনা।

নদিয়া-শান্তিপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

কলিকাতায় ডফকলেজ আর জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইনিষ্টিটিউসন একত্র মিলিয়া "কলিকাতা খৃষ্টিয়ান" কলেজ নামে পরিণত হইল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহামায়া মহাশক্তির মহাপূজা সমাগনান্তে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ৺পূজান্তে আধি-ব্যাধিতে- বিজড়িত হইয়া, বড় বিপন্ন হইয়াছিলাম, তাই অবসর প্রচারে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে। এক্ষণে বিজয়ার শুভ সম্মিলনে ভগবৎসমীপে গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বন্ধু বান্ধবগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।

৺পূজায় এবার অনেক পল্লী ভ্রমণ করিয়াছি,—কিন্তু কি দেখিয়াছি? শারদীয় দিবসের সে আবিল-আলস্য মাখা ভাব নাই,—কঠোর মার্ত্তণ্ডের কঠিন করে বঙ্গদেহ প্রজ্বলিত। মাঠে মাঠে শ্যামল শস্যের মনোমুগ্ধকর সে দৃশ্য নাই,—তাহা শুকাইয়া গিয়াছে—শুষ্ক তৃণরাশিতে প্রান্তর হাহা করিতেছে। খাল-বিল পুষ্করিণী প্রভৃতি নীলজলে পূর্ণ হইয়া সে কুমুদ-কহ্লারে পরিশোভিত নাই—তাহা শুষ্ক, শীর্ণ,—সম্পূর্ণ জলাভাব। আর গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ম্যালেরিয়ার দাবদাহ। বালক বালিকা লইয়া গৃহস্থ শয্যাশায়িত—রোগের আর্ত্তনাদ, মরণের হাহাকার। মহাশক্তিই জানেন, বঙ্গে তাঁহার সংহারিণী লীলার আবির্ভাব কি না!

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এবার দুর্ভিক্ষের দারুণ বিভীষিকা। কি উপায়ে বঙ্গবাসী রক্ষা পাইবে, তজ্জন্য স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কেবল গভর্ণমেণ্টের উপরে নির্ভর করিয়া বা তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আর সময় নাই,—এখন হইতে উপায় স্থির করিতে হইবে। ফাল্গুনের পরে সারা বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে।

মহাভারতে নারীদেশের কথা আছে,—আর এই সভ্যতার দিনে নারীদেশের কথাও শোনা যাইতেছে। আমেরিকার ওহিও প্রদেশের সমস্ত কাজকর্ম্ম রমণীতেই সম্পন্ন করিয়া থাকে। সেখানে নারী বিচারক, নারী উকীল, নারী দোকানদার, নারী পুরোহিত, নারী রেল ও কল-কারখানার পরিচালক। প্রসব কার্য্যটা কি পুরুষে সম্পন্ন করে?

বৈদিক কালের দু'টা কথা।

জ্ঞান-ধর্ম্মপ্লাবিত পবিত্র বেদগাথা-মুখরিত পুণ্যভূমি-আর্য্যাবর্ত্তের নানা রত্নবিশোভিত কীর্ত্তিকিরীটের উজ্জ্বলতম রত্ন চতুর্ব্বেদ। প্রণবভাষিত প্রাচীন ভারতের পূতচেতা ঋষিগণ গগনে পবনে বেদগাথা শুনিয়া পরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই বেদগাথা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদি-ভিত্তি। বেদমন্ত্র শুধু হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার প্রস্রবণ নহে। ইহাতে তাহার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সকলই প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং সকল বিষয়েই বেদের শিক্ষা চিরদিন সমভাবে পবিত্র ও সুমহান্।

এমন কি প্রাচ্যবিদ্ পাশ্চাত্য মনীষিগণও বলিয়া থাকেন, বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ জগতে বর্ত্তমান নাই। প্রাচীন আর্য্যসমাজের রীতিনীতি বেদ মধ্যে যেরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, সেরূপ চিত্র অপর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিকই আত্মার অবিনশ্বরতা, ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন, সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণের আধার দেবতাগণের প্রার্থনা এবং অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ দস্যুদিগের সহিত আর্য্যদিগের যুদ্ধের কাহিনী ব্যতীত চারিবেদে যে সকল সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, তাহা বড়ই সুন্দর। সে সকল সামাজিক রীতির কথা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সাধারণ ইতিহাসে বৈদিক সময়ের যে দুই একটী চিত্র অঙ্কিত হয় নাই, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব।

অক্ষক্রীড়া।

বৈদিক কালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন, তাহা অল্প লোকেই বিদিত আছে। পুণ্যশ্লোক নলরাজা যে অক্ষক্রীড়া করিয়া রাজ্য ধন পরিজন সকলই হারাইয়াছিলেন, আপন রাজশ্রী ভ্রষ্ট হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, যে অক্ষক্রীড়ার জন্য জনার্দ্দনানুগৃহীত পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের নিকট লাঞ্ছিত অবমানিত হইয়াছিলেন, যে দ্যূতক্রীড়া অদ্যাবধি অসংখ্য হিন্দুকে কমলাকৃপাবঞ্চিত করিয়া দেয়, প্রমাণ পাওয়া যায়, বৈদিক আমলেও সেই অক্ষক্রীড়া দোষ পরিদৃষ্ট হইত। অথর্ব্ববেদে রমণীবিলাস, ক্রোধ, সুরাপান এবং অক্ষক্রীড়া একত্র বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে

"যখন অক্ষস্থলে পাশক আবর্ত্তিত হইতে থাকে, তখন আমার হৃদয়ে অসীম আনন্দ উপলব্ধি হয়। ইহা মজুবাত পর্ব্বতোদ্ভব সোমলতা সদৃশ প্রীতিপ্রদ। শ্বশ্রূদ্বেষান্বিতা, বনিতা যখন স্নেহবিহীনা হয়, সে সময়ে অক্ষ ব্যতীত অপর কেহই আনন্দ প্রদান করে না। অক্ষক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি সুখভোগ করে। ক্রীড়াপরায়ণ ব্যক্তি অক্ষকে অমৃতময় বোধ করে।" *

কিন্তু পরক্ষণেই অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নিজ কর্ম্মফলে কষ্ট ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ করিল। তখন বিলাপ-গীতিতে সে আপনার হৃদয়ের যন্ত্রণার পরিচয় দিতে লাগিল।

"অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির বনিতাকে অপরে গ্রহণ করে, সর্ব্বস্বাপহারী বিরক্তিপ্রদ অক্ষ-ক্রীড়াকারীকে একবার কথঞ্চিৎ ধন অর্পণ করে। 'কখনও ক্রীড়া করিও না, কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন কর, তোমার যে ধন আছে, তাহাই প্রচুর বোধ করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।' সবিতা বলিতেছেন—কিতব! ঐ তোমার গাভীকুল, ঐ তোমার বনিতা।"

ঋগ্বেদ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। সুতরাং যখন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অক্ষক্রীড়া আর্য্য-সভ্যতার প্রথম প্রভাতাবধিই প্রচলিত বিধি বলিয়া মনে হয়।

রমণী-প্রণয়।

ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়-কবিতা-বাহুল্যের কথা বলিয়া থাকেন। প্রভাত-সমীর-সদৃশ চঞ্চল স্ফটিক-পাত্র সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর ললনা-স্নেহ লইয়া অমর আর্য্য কবিকুল সুদৃশ্য বৃক্ষসমন্বিত মধুর কুসুমপরিশোভিত ভারতের লতাকুঞ্জগুলি মুখরিত করিয়াছেন। হিন্দুহৃদয়ের এই বৃত্তিরও প্রস্রবণ বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ললনা-স্নেহ আকর্ষণ করিবার মন্ত্র ঔষধাদিরও অথর্ব্ববেদে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্লুমফিল্ড সাহেব (Bloomfield) সাহেব তাঁহার অথর্ব্ব বেদের ইংরাজী অনুবাদে এইরূপ অনেকগুলি আকর্ষণীয় কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটি ওষধিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"যথায় সর্ব প্রকার জাতি দেখিতে

* মৃচ্ছটিক নাটকে সংবাহক দ্যূতস্থান হইতে পলাইয়া বলিয়াছিল---রাজহীন নৃপতির পক্ষে ঘ্রাঘামার-শব্দ যেমন চিত্তাকর্ষক, মুদ্রাহীন ব্যক্তির পক্ষে পাশার শব্দও ঠিক সেইরূপ। ....কোকিলের গীতের মত অক্ষের শব্দ প্রকৃতই মনোমুগ্ধকর।

৺হরিকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনূদিত।

পাওয়া যায় সেই সিন্ধুতীর হইতে তুমি আনীত হইয়াছ। ঈর্ষার তুমি প্রত্যক্ষ ঔষধ। দাবানলে যেরূপ সর্ব্বদিক্ প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ বহ্নি তাহারও হৃদয়ে প্রজ্বলিত রহিয়াছে। বারি যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত করে, তুমি তেমনি তাহার হৃদয়ের প্রতিহিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপিত কর।"

গ্রিফিথ্ (Grifith) সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত নবপরিণীত বর ও বধূর প্রণয়বন্ধনের মন্ত্র বড়ই সরস, কবিতাময়ী, বড়ই সুন্দর।

"মধুময় আমাদের আঁখির দর্শন, আমাদের সৌরভময় মুখ স্নিগ্ধ ও মসৃণ। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করিতেছে——তোমার হৃদয়ে আমার স্থান দান কর।"

কুমারীর স্নেহাকর্ষণ করিবার উপায় অপর মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

"আমার রসনাগ্রে মধু রহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় তাহার আদিস্থল। তুমি আমার রসনায় পরাজিত হও। তুমি আমার শুধু আমারই। আমার আগমন মধুময় এবং মধুময় আমার প্রস্থান। আমার কণ্ঠস্বর এবং বচন মধুর। তোমার দৃষ্টি মধুময় হইলে প্রীত হইব।—তোমার ঘৃণাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য তোমার চৌদিকে ইক্ষুর কুঞ্জ রোপিত করিয়াছি। হে প্রিয়তমে! তাহা হইলেই তুমি আমায় ভাল বাসিবে, চিরদিন আমার নিকটে থাকিবে।"

হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ সুপবিত্র বেদে যখন এইরূপ প্রণয় সঙ্গীত শুনিতে পাই, তখন পুণ্যক্ষেত্র ভারতের কুঞ্জে কুঞ্জে চিরদিনই প্রণয়-সঙ্গীত পরিশ্রুত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

আর্য্যসভ্যতার প্রথম ঊষালোকেই হিন্দুজাতি প্রেমের মহত্ব কীর্ত্তন করিতেন, রমণীর সাররত্ন সতীত্বের পবিত্রতা শিক্ষা দিতেন, স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষেধ করিতেন।

শবসমাধি।

আধুনিক মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই শবসমাধি হইয়া থাকে। হিন্দুগণ মৃত্যুর পর জড় দেহ দাহন করিয়া থাকেন। কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র হইতে ইউরোপীয় মনীষিগণ অনুমান করিয়া থাকেন, বৈদিক সময়ে শব-দাহন ও শব-সমাধি উভয় বিধিতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইত। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে শবদেহ শকটে তুলিয়া সমাধি

তদনুরূপ একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। * শবকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়ে বলীবর্দ্দযোজিত শকটে লইয়া যাওয়া হইত। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"তোমার জীবন বহনজন্য শকটে এই বলীবর্দ্দ যোজিত হইল। ইহা তোমাকে পুণ্যাত্মাদিগের আবাসস্থল যমপুরীতে লইয়া যাইবে।—"

ঋগ্বেদে বিশদভাবে সমাধিক্রিয়ার রীতি বর্ণিত হইয়াছে। ধরিত্রীগর্ভ-নিহিত শবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে——

"তুমি এক্ষণে দেখিতেও পাইতেছ না, শুনিতেও পাইতেছ না, তোমাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি—এখন তুমি বহুদূরে যাত্রা কর। তুমি আমাদিগের যোদ্ধাগণকে বা সন্ততিগণকে বিপন্ন করিও না। যাহারা এখন এস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা মৃতের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহারা সকলে শতবর্ষ জীবিত থাকুক। মৃত ও জীবিতের মধ্যে আমরা শিলাখণ্ড স্থাপিত করিয়াছি। এই প্রস্তরের দ্বারা মরণ দূরে থাকুক। যে সকল স্ত্রীলোক এখনও বৈধব্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাঁহাদের মহানুভব স্বামী বর্ত্তমান, প্রথমে তাঁহারা রত্নালঙ্কৃত হইয়া অশ্রুসম্বরণানন্তর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।—তাহার পর মৃতব্যক্তির বনিতা উত্থান করুন। তাঁহাকেও জীবলোকে যাইতে দাও।—তোমার স্বামীর জীবন গিয়াছে। তোমার হস্ত ধরিয়া যে তোমাকে (সংসারের পথে) লইয়া যাইবে, এক্ষণে তুমি তাহার বিধবা। হে জীবনহীন জন, মাতা বসুমতীর গর্ভে প্রবেশ কর। বিস্তৃত বসুধা কুমারী সদৃশ কোমল, তাঁহারই ক্রোড়ে পাপ হইতে মুক্ত থাক। মাতা যেমন শান্ত-ভাবে তাঁহার শিশু সন্তানকে বেষ্টিত করেন, পৃথিবী তেমনি তোমার চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ হউক। পিতৃগণ তোমার বিশ্রাম স্থানটি নিরাপদে রক্ষিত করুন। যম যিনি প্রথম মৃত্যুর দুয়ারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি তোমার জন্য একটি নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করুন।"

এই শ্লোকে যেমন শব-সমাধির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য অনেক শ্লোকে আবার তেমনি শব-দাহনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বলেন—অতি পুরাকালে শব-সমাধি বিধি প্রচলিত ছিল। তাহার পর ক্রমে স্বাস্থ্যাদি নানা কারণ জন্য হিন্দুগণ শব-দাহন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

---

* শব্দরত্নাবলিতে শব অর্থে "ক্ষিতিবর্দ্ধক" লিখিত হইয়াছে। লেঃ

এইরূপ অনেক প্রকার রীতিনীতি বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক সময়ে দৃষ্ট হইত এবং তাহার ছায়া অদ্যাবধি হিন্দুর দৈনিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।
এম-এ, বি-এল, এম-আর-এ-এস।

স্বপ্নসুন্দরী।

সুপ্তি মরু মাঝে একি মায়া-মরীচিকা
আঁধার রহস্যে একি স্বর্গ-দীপশিখা ?
যত ভূত ভবিষ্যৎ মানসের ছায়া
সহসা দেয় কি দেখা ধরি দিব্য কায়া !
ব্যবধান অন্তরাল হরি' কি কুহকে
দূরত্বের কাছে আনে আঁখির পলকে !
স্বর্গ মর্ত্ত্য হয়ে যায় পলে একাকার,
নিমিষে শুকায়ে যায় বিচ্ছেদ-পাথার।
কে তুমি ছলনাময়ী, আত্মসহচরী
নিদ্রার সমুদ্রে তুলি চেতনালহরী
ভাসায়ে দিয়েছ তব মায়ার তরণী ?
সে মোহে আকাশ স্তব্ধ বিস্মিতা ধরণী !
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু—অপূর্ব্ব মিলন
সজীব রাখিছে নিত্য দুর্ব্বহ জীবন !

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, এম-এ, বার-য়্যাট-ল।

নির্ব্বাণ।

এত শিশুমুখ, এত স্নেহের বচন,
নিরুদ্ধ হৃদয়দ্বার করে না মোচন।
সেথায় পশে না আর কোন হাসি গান,
কোন আলো কোন ছায়া—সকলি নির্ব্বাণ।

উপেক্ষিতা শকুন্তলা। *

গাঢ়তর স্বর্ণবর্ণে তখনও অমরার তরুশীর্ষ রঞ্জিত ছিল। সন্ধ্যাসতীর ধূসর অঞ্চলে তখনও ত্রিদিব প্রকৃতির ম্লান হাসি সম্পূর্ণ আবরিত হয় নাই। মন্দার-কুসুম-সৌরভবাহী মৃদু মলয় সাহচর্য্যে লতাবিতানের দ্বারে দ্বারে সুষমাভাণ্ডার উন্মুক্ত। কলনাদিনী সুরমন্দাকিনীর উদ্দাম তরঙ্গনিচয়,—তটে ক্রীড়াশীলা দেববালাগণের চরণাঙ্কিত অলক্তকরাগ চুম্বনে রত। তীরে বৃক্ষশাখায় নিস্তব্ধ কুলায়ে ক্রৌঞ্চবধূ আহারান্বেষণে বহির্গত প্রিয়জনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুখরিত ত্রিদিবকানন তখন স্তব্ধ সন্ধ্যায় রবির ক্ষীণালোকে মূর্চ্ছিত ও নীরব।

দূরে নির্জ্জন পারিজাতকুঞ্জে শ্যামদূর্ব্বাসনে অর্দ্ধশায়িতা শকুন্তলার নয়ন-বল্লরী নিমীলিত ছিল। সুকুমার করপুটে কপোল বিন্যস্ত। অযত্নরক্ষিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম ভূমি স্পর্শ করিতেছিল। মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় ম্লান—অলকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র ললাটে দুই চারি বিন্দু শ্রমজলে গাঢ়চিন্তার ভাব প্রকটিত ছিল। ত্রিদিব প্রকৃতির সেই বিরাট—সন্ধ্যাশোভা, তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সে মধুর আলাপন মন্দার পুষ্পের সে অতুল সৌরভ, এবং মলয় মারুতের শীতল প্রবাহ তাহার দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ও স্পর্শন পথে অনুভূত হইতেছিল না। শকুন্তলা আজ ভাবে বিভোরা, বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা।

সুদূর মর্ত্ত্যে নির্জ্জন তপোভবনে সেদিনও শকুন্তলা এই ভাবেই বিভোরা ছিল। পুষ্পগন্ধময়ী পূত আশ্রম প্রকৃতি তাহার এই আলেখ্যই নিরীক্ষণ করিয়াছিল। সেদিনও কোপনস্বভাব বিমুখ অতিথি দুর্ব্বাসার শাপবাণী তাহার শ্রবণে পশে নাই। মেঘমন্দ্র স্বরে উচ্চারিত—

> বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
> তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
> স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
> কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥——

তাহারই সর্ব্বনাশকারী এই অভিসম্পাতবাণী সমগ্র কানন প্রতিধ্বনিত করিয়াও শকুন্তলার কর্ণকুহর আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই! কিন্তু এতদুভয় আলেখ্য চিত্রের ভাব বর্ণ ও প্রাণগত পার্থক্য কত! সে দিন যে

সুচারু বদনকমল বালারুণ-রক্তিমরাগে ক্ষণে ক্ষণে ক্রীড়ারঞ্জিত হইতেছিল, আজ তাহা প্রশান্ত—ঔদাস্যব্যঞ্জক। প্রিয়সম্মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা সেদিন তাহার বদনে নয়নে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা নাই। আশা ও কামনার সে চঞ্চল প্রবাহ মন্দীভূত হইয়াছে। সে চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন ভাবময়ী শকুন্তলা আপনার হৃদয়াসীন প্রিয়দেবের সন্নিকটে আপনাকে লইয়া উপনীতা হইতেছিলেন। কল্পনা দেবী তাঁহাকে প্রিয়জনসম্মিলন-সুখে বিভোরা করিতেছিল, দুষ্মন্তের সুমধুর প্রণয়সম্ভাষণে, শকুন্তলাহৃদয়ে সুখের প্লাবন বহিয়া যাইতেছিল, তাঁহার আদরে ভামিনী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন।

শকুন্তলা ভাবিতেছিলেন, সে দিন লতামণ্ডপে মৃণালবলয় সন্ধিস্থানচ্যুত হইয়া পড়িলে আর্য্যপুত্র কত যত্নে নানা ছলে বিলম্ব করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, সে মদিরাময় স্পর্শানুভূতি আমার প্রত্যেক ধমনীতে কি আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিল। হায় বিধাতঃ! কতদিনে অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হইবেন—কতদিনে প্রাণেশ্বরসান্নিধ্যসুখভাগিনী হইয়া এ নিদারুণ বিরহযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব! কখন মনোরথে প্রাণেশের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া অভিমানের সুরে বলিতেছিল—"ছি আর্য্যপুত্র! তুমি বড় নিষ্ঠুর, আশ্রিতাকে এত কথা বলিয়া, এত ভাল বাসিয়া এতদিন কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলে?" আবার পরক্ষণে আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন "যদি আর্য্য-পুত্র তাহাকে ভুলিয়া যান তবে তাহার কি দশা হইবে?" তখন কাতরা রমণী বারংবার দুষ্মন্তপ্রদত্ত প্রণয়নিদর্শনী অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, আর একাগ্র মনে বিশ্বনিয়ন্তার চরণে প্রার্থনা করিতেছিলেন, "দয়াময়! যে রত্ন দিয়াছ, তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না, প্রভো! যদি কৃপা করিয়া অভাগিনীর অদৃষ্টে এত সুখ লিখিয়াছিলে তবে বর দাও প্রভো! যেন আজীবন উপভোগ করিতে সমর্থ হই! দেখিও পিতঃ! এ সুখের উৎস রুদ্ধ হইলে শকুন্তলা প্রাণে বাঁচিবে না।" কখন সভয়ে চিন্তিত হইতেছিলেন, আমি আজীবন আশ্রমে প্রতিপালিত। রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিব, কি করিলে তাঁহারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তাহা ত জানি না! আবার মনকে প্রবোধ দিতেছিলেন,

বাসেন। অমনি পুলকে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল। আশায় নিরাশায়, আনন্দে উদ্বেগে কামনাময়ী শকুন্তলার হৃদয় তখন ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত হইতেছিল।

কিন্তু আজ সে ঘাত-প্রতিঘাত শান্ত হইয়াছে! আশা-নিরাশার সে তুমুল সংগ্রাম থামিয়া গিয়াছে। হর্ষ-বিষাদের সে চঞ্চল লীলা শকুন্তলার প্রশান্ত বদনে নয়নে আর প্রতিভাত হইতেছিল না। সেই পরিবর্ত্তনময় আলেখ্য আজ স্থির ধীর। আর আপনার চিন্তা তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল না। আপনাকে লইয়া আর তিনি সসঙ্কোচে প্রিয়দেবের সন্নিকটে উপনীতা হইতেছিলেন না। আজ তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলিয়াছিলেন। আশা, সাধ, কামনার স্থান তাঁহার হৃদয়ে আদৌ নাই। তজ্জনিত উদ্বেগ, ভয় সঙ্কোচের চিহ্ন এ মধুর আলেখ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে না।

এখন শকুন্তলার সর্ব্বস্ব ব্যাপিয়া প্রিয়দেবের আসন পড়িয়াছে। সারাবিশ্ব অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার রমণীয় মূরতি প্রকটিত হইয়াছে। নয়নে অপর কিছু দেখিবার নাই, শ্রবণে আর কিছু শুনিবার নাই, মানসে আর কিছু ভাবিবার নাই! তাঁহার এ প্রণয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়াছে! শকুন্তলার প্রেমযজ্ঞে আজ পূর্ণাহুতি হইয়াছে, তিনি সকলই বলি দিয়া অবিরাম বিভুচরণে দুষ্মন্তের মঙ্গল প্রার্থনায় বিভোরা—আত্মজ্ঞান বিরহিতা!

শকুন্তলা ভাবিতেছিলেন "এই ত অমরা দেখিলাম, অমরার সকল দেবতা দেখিলাম, কিন্তু তোমার তুলনা কোথায় প্রভো! সে সৌম্য সদাপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল, সে সমবেদনাপূর্ণ মধুর দৃষ্টি আর কোথাও ত নাই। সে মহান্ হৃদয়ের কণামাত্রও ত কাহাতেও পরিলক্ষিত হয় না! হে সৃষ্টির আদর্শ পুরুষ! হে স্বামিন্! তোমার গুণগানে অমরাবতী পূর্ণ, তোমার ন্যায়পরতা, ধর্ম্মপ্রাণতা দেবতারও শিক্ষণীয়। কোন ঘোর দুষ্কৃতির ফলে অভাগিনী তোমার চরণে আশ্রয় পাইয়াও তোমাতে বঞ্চিতা হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মের অবতার, তুমি নিষ্ঠুর হইতে পার না। আমার পাপের ফল আমায় ত ভোগ করিতেই হইবে, তুমি কি করিবে দয়াময়! চরণের রেণুকণা আমি, আমার অনন্তকোটী প্রণাম গ্রহণ কর স্বামিন্!"

শ্রীমতী রাণী দেবী।

মানময়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রমেশ বাবুর চেষ্টা।

বলা বাহুল্য এই সকল কথা শুনিয়া রমেশবাবুর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! ভগিনী মৃত্যুশয্যায়—ভগ্নীপতি খুনের দায়ে ধৃত,—গৃহে এক পয়সাও নাই,—তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন,—তাঁহার অবস্থাও খুব সচ্ছল নহে! তিনি বাড়ী ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত প্রায় বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন,—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে পিসি আসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বৌমার আজ জ্বর ছেড়েছে?"

রমেশবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি—কি বলিলেন?"

বৃদ্ধা আবার বলিলেন, "আমার বোধ হ'ল যেন বৌমার আর জ্বর নেই।"

এই পনের ষোল দিন মানময়ীর জ্বর একবারও ছাড়ে নাই,—তাহার উপর বিকার হইয়াছিল। রমেশবাবু সত্বর উঠিয়া বলিলেন, "চলুন—দেখি।"

তিনি দেখিলেন যথার্থ ই মানময়ীর জ্বর ছাড়িয়াছে,—ঘরে কুইনাইন ছিল, তখন কুইনাইনের বড়ী করিয়া তিনি তাহাকে খাওয়াইলেন,—পরে প্রতি-ঘণ্টায় তাহাকে কুইনাইন দিলেন। সে দিন আর মানময়ীর জ্বর আসিল না।

সে ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিতেছিল,—সে কাহাকে খুঁজিতেছে,—রমেশবাবু তাহা বুঝিলেন,—তাঁহার হৃদয় যেন কে ভাঙ্গিয়া দিল,—তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি পিসিকে তাহার নিকট রাখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

পরদিনও কাটিল,—মানময়ীর জ্বর হইল না। রমেশবাবু সঙ্গে যে দুই চারি টাকা আনিয়াছিলেন,—তাহা হইতেই ভগিনীর পথ্যের আয়োজন করিলেন,—কিন্তু মানময়ী স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত অধীরা হইয়া উঠিল, রমেশবাবু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনিও নিতান্ত অধীর হইলেন।

বৃদ্ধা পিসিও অবিনাশের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এ সময়ে মানময়ীকে তাহার কথা বলিলে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া তিনি পিসিকে তাঁহার কোন কথা মানময়ীকে এখন বলিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন, "ভাল ডাক্তার আনিতে অবিনাশ কলিকাতায় গিয়াছে,—দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিবে।"

কিন্তু কথা গোপন থাকে না। অবিনাশের কথা চারিদিকে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছিল,—এক দিন এক স্ত্রীলোক আসিয়া বৃদ্ধা পিসিকে সকল কথাই বলিল, তখন পিসি উঠানে পড়িয়া উচ্চৈস্বরে কাতরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ভগিনীর নিকট রমেশবাবু বসিয়াছিলেন,—বৃদ্ধার ক্রন্দন শুনিয়া তাঁহার হৃদয় হৃদয়ের ভিতর বসিয়া গেল, তিনি বুঝিলেন যে, আর গোপন রাখা চলিবে না,—হয়তো অবিনাশের কথা শুনিয়া মানময়ীর সহসা মৃত্যু হইবে,—তাহার শরীরে কিছু নাই।

মানময়ী বৃদ্ধার ক্রন্দন শুনিয়া বলিল, "দাদা,—আমায় একটু উঠাইয়া বসাইয়া দাও,—আমি জানি পিসিমা কাঁদিতেছেন কেন?—আমার মন বলিতেছে,—তাঁহার কি হইয়াছে,—না হ'লে তিনি কখনই আমায় ফেলে থাকিতেন না,—দাদা তাঁহার কি হইয়াছে আমায় বল। না বলিলে আমি পাগল হইয়া যাইব।"

রমেশবাবু নিরুপায়! তাঁহার কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিল,—চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

মানময়ী ধীরে ধীরে বলিল, "দাদা লুকাইও না,—আমি কি বিধবা হইয়াছি?—তাহা হইলে আমার হাতে লোহা কেন—সীঁতায় সিন্দুর কেন?"

নবম পরিচ্ছেদ।

আদর্শ-স্ত্রী।

এই বলিয়া মানময়ী হাতের লোহা খুলিতে উদ্যত হইল,—"কি কর,—কি কর," বলিয়া রমেশবাবু তাহার হাত ধরিলেন।

মানময়ী বলিল, "তবে তাঁহার কি হইয়াছে,—পিসিমা কাঁদিতেছেন

রমেশবাবু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, না—না,—আমি বলিতেছি—অবিনাশ ভাল আছে,—তবে—তবে—"

"তবে কি ?"

"তবে—"

"দাদা—আমায় সব বল,—তাঁহার কি হইয়াছে,—আমি তোমায় বলিতেছি, আমি না জানিতে পারিলে পাগল হইব।"

"অবিনাশ একটু বিপদে পড়েছে ?" "তুমি একটু ভাল হও—"

"তিনি বিপদে—আর আমি ভাল হব,—আমার আবার ভাল মন্দ কি,—শীঘ্র বল তাঁহার কি বিপদ হয়েছে—আমাকে কি পাগল করিতে চাও ?"

অগত্যা বাধ্য হইয়া রমেশবাবু অবিনাশের বিপদের সকল কথাই বলিলেন। নীরবে অবিচলিত ভাবে মানময়ী সকল কথা শুনিল—তৎপরে পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় একদৃষ্টে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

রমেশবাবু বলিলেন, "তাহাকে যে মিছামিছি ধরিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অবিনাশ গহনার জন্য একজনকে খুন করিবে,—এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। সে শীঘ্রই খালাস হইয়া বাড়ী আসিবে।"

মানময়ী চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিলে, দাদা ?"

"অবিনাশকে মিছামিছি ধরেছে,—সে শীঘ্রই খালাস হ'য়ে বাড়ী আসিবে।

"তা আমি জানি,—এই জন্যই আমার শীঘ্র শীঘ্র আরাম হওয়া দরকার,—আমি এ রকম প'ড়ে থাকিলে,—কে তাহার খালাসের চেষ্টা করিবে,—আমি জানি দাদা,—তুমি তাঁকে বিপদে রেখে নিশ্চিন্ত থাকিবে না।"

"নিশ্চয়ই নয়,—আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তাকে খালাস করিব।"

"আমাদের এক পয়সাও নাই—জমি জমাত বেচিতে হয়,—দাদা বেচে ফেল।"

"তুমি অধীর হইও না,—আমি তাহাকে শীঘ্রই খালাস করিব।"

"আমি অধীর হই নাই,—আমি অধীর হইলে তাঁহার জন্য করিবে কে ? আমি কালই ভাল হয়ে উঠ্‌বো—দাদা—"

"কি বল—"

"তিনি এখন কোথায় আছেন,—তাঁকে তারা কোথায় রেখেছে ?"

তিনি জেলে আছেন,—তবে সেখানে কি একবার আমি গিয়ে দেখা করিতে পারি না?—তুমি উকিল তুমি এসব জান।"

"হাঁ,—দেখা করিতে পারিবে না কেন? হুকুম লইলে দেখা হইতে পারে।"

"তবে আজই আমায় একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাও।"

"তুমি একটু ভাল হও,—"

"আমি খুব ভাল হয়েছি।"

"অধীর হইও না।"

"আমি কি অধীর হয়েছি,—না,আমি অধীর হই নি,—আমায় নিয়ে চল।"

"আমি আগে তার সঙ্গে দেখা করে আসি,—তারপর তোমায় নিয়ে যাব।"

"আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না কেন?"

"না—ব্যস্ত হইও না,—তা হ'লে তার ক্ষতি হবে।"

"তাঁর ক্ষতি হবে—তবে আমি যাব না—তুমি এখনই যাও—।"

"পিসিকে ঠাণ্ডা ক'রে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে এখনই যাব,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিব।"

"যাও—আমার কাছে কারও থাকিবার প্রয়োজন নাই,—দাদা, আমি ভাল হয়েছি।"

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

জেলে।

অতি কষ্টে চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া রমেশ বাবু বাহিরে আসিলেন। তিনি একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া বারাসত রওনা হইলেন,—অবিনাশ বারাসতের জেলে ছিলেন।

জেলে কয়েদীর সহিত দেখা করা সহজ কাজ নহে। যাহা হউক অনেক লাঞ্ছনার পর তিনি অনুমতি পাইলেন।

অবিনাশ জেলে উন্মত্ত প্রায় ছিলেন,—এই কয় দিনে তাঁহার চেহারার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। রমেশকে দেখিয়া তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী—"

তাহার অবস্থা দেখিয়া রমেশ বাবুর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তিনি

"জ্বর নাই ?"

"না—এখন যাহাতে তুমি খালাস হও,—সে সেই জন্য ব্যস্ত হইয়াছে।"

"ইহারা আমাকে মিছামিছি ধরিয়াছে,—আমি মেহেরজানের খুনের বিষয় কিছুই জানি না।"

"যথার্থ কি সে খুন হইয়াছে।"

"তাহাও কিছু জানি না।"

"সব আমায় বল দেখি।"

অবিনাশ সমস্ত আদ্যোপান্ত তাহাকে বলিলেন,—শুনিয়া রমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন শত্রু আছে বলিতে পার ?"

এ প্রশ্নে অবিনাশ বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "শত্রু ?—শত্রু—কই—আমার কোন শত্রু নাই।"

"নিশ্চয়ই আছে—তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে আমার বোধ হইতেছে,—কেহ ষড়যন্ত্র করিয়া তোমায় এ বিপদে ফেলিয়াছে—এখন জিজ্ঞাস্য সে কে ?"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হয়তো একজন ইহা করিতে পারে!"

রমেশবাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কে সে ?"

অবিনাশ কোন উত্তর দিলেন না,—রমেশ বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে ?"

এবার অবিনাশ দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "ভাই,—আমাকে যদি ফাঁসি যাইতেও হয়,—তাহা হইলেও আমি সে কথা প্রকাশ করিতে পারিব না।"

রমেশ বাবু এই কথায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ?"

অবিনাশ নীরব।—রমেশ বাবু অনেক জেদাজিদি পীড়াপীড়ি করিলেন,—কিন্তু অবিনাশ কিছুতেই সেকথা প্রকাশ করিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া জেল হইতে বাহির হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

পত্র।

তিনি গাড়ীতে উঠিতেছিলেন,—এই সময়ে কোচমান তাঁহার হাতে এক পত্র দিল,—তিনি এখানে পত্র পাইয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ পত্র দিল ?"

"একজন স্ত্রীলোক দিয়া গেল,—বলিল আসিলে দিতে।"

"কে সে—কোথায় গেল ?"

"কে সে—তাহা জানি না—এই দিকে গিয়াছে।"

রমেশ বাবু পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র এই :—

"ভাল চাও তো ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া—যাহা দুই পয়সা উপার্জ্জনের জন্য করিতেছ,—তাহাই কর। এ সকল ব্যাপারে অনর্থক হাত দিলে,—তোমার দশাও অবিনাশ শালার মত হইবে—সাবধান—সাবধান।"

তবে শত্রু আছে।—তিনি যাহা ভাবিতেছিলেন,—তাহা মিথ্যা নহে,—অথচ অবিনাশ এ সমূহ বিপদে পড়িয়াও তাহার নাম করিতেছে না,—নিশ্চয়ই ইহার ভিতর গুরুতর রহস্য আছে,—এ রহস্য কি ?

রমেশ বাবু মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "কোন্ দিকে সেই স্ত্রীলোক গিয়াছে,—আয় দেখি-দেখি।"

তাঁহারা উভয়ে চারিদিকে অনেকক্ষণ সেই স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিলেন,—কিন্তু কোথায়ও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না,—তখন অগত্যা রমেশবাবু ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি অনেক চিন্তা করিলেন। যাহারা এইরূপ ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করিয়া অবিনাশকে ফাঁসিকাষ্ঠে পাঠাইতেছে,—স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে তাহারা সহজ লোক নহে। শত্রুকে নষ্ট করিবার জন্য হয় তো তাহারা একজনকে খুন পর্য্যন্ত করিয়াছে,—তাহার পর সেই খুনের দায়ে তাহাকে ফাঁসি পাঠাইতেছে ? কি ভয়ানক! সংসারে এমন নর-রাক্ষসও আছে ?

অবিনাশ অতি ভালমানুষ লোক,—গ্রামের সকলেই তাহাকে ভালবাসে,—সুতরাং তাহার এমন শত্রু কে হইল,—কেন হইল—আর যদি হইয়াও থাকে,—তবে অবিনাশ তাহার নাম করিতেছে না কেন ?

এই শত্রুর কথা,—এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ না হইলে,—তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে,—তাহাতে তাহার রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই।

কি বিপদেই পড়িলাম! ইহাকে রক্ষা করিবার উপায় কি ?

সে তো কিছুতেই কোন কথা বলিল না। মানময়ী হয়তো এ কথা জানিতে

দেখি। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে অবিনাশকে রক্ষা করিবার পায় নাই।

তাহার পর এই পত্র! আমাকে শাসাইয়াছে? তাহারা আমায় চেনে না। আমি ভয় পাইবার লোক নহি।

রমেশবাবু এই সকল ভাবিতে ভাবিতে অবিনাশের বাড়ী ফিরিলেন। মানময়ী উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আসিবামাত্র ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, দাদা,—আমি এখানে আর এক মিনিটও থাকিব না,—আমায় এখনই সঙ্গে ক'রে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও।"

মানময়ীর ব্যাকুলতা ও ব্যগ্রতা এবং তাহার এই কথা শুনিয়া রমেশবাবু বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ কেন?"

পান্থ-পাদপ।

হে বিশাল লক্ষবাহু বিটপী মহান্
হে প্রাচীন মৃত্যুঞ্জয়, কত যুগ ধরি
একাকী দাঁড়ায়ে আছ নীরব প্রহরী
হেরিতেছ জগতের পতন-উত্থান!
কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা সহিয়াছ তুমি
হে সহিষ্ণু মহাশাখি! পাতি স্নিগ্ধ ছায়া
নিষ্ঠুর পথিক দলে বিশ্রামের ভূমি
করিয়াছ দান। তারা ভুলি স্নেহ মায়া
অতিথিবৎসল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া
মিটায়েছে রক্ততৃষা, কুঠারের ঘাতে
কেটেছে তোমার শাখা, লয়েছে লুটিয়া
তোমার সোনার ফল। কি অভিসম্পাতে
শুষ্কপর্ণ-সমাচ্ছন্ন ওগো অনাহারি
তোমার মলিন ছবি আজিকে নেহারি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

স্বদেশী প্রেম
ও
কবিবর হেমচন্দ্র।

প্রথম প্রস্তাব।

জানিনা কোন্ শুভঙ্করী মহাশক্তির অলক্ষ্য প্রভাবে বাঙ্গালার হৃদয়ে হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের পুণ্যধারা প্রবাহিত হইয়াছে। আজ সমগ্র বঙ্গ স্বদেশ-প্রেমে প্রমত্ত। বক্তার বক্তৃতায় স্বদেশ-প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কবির বীণায় স্বদেশ-প্রেমের ঝঙ্কার উঠিতেছে, লেখকের রচনায় স্বদেশপ্রীতি ক্রীড়া করিতেছে, বালক-কণ্ঠে স্বদেশভক্তি—বিঘোষিত হইতেছে, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা, মহাজন বণিক্ ব্যবসায়ী, কৃষক শ্রমজীবী সকলের হৃদয়েই অল্পাধিক ভাবে স্বদেশ-প্রেমের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। বঙ্গের প্রথম স্বদেশ-প্রেমিক কবির প্রতি শ্রদ্ধার উপহার দিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। সে স্বদেশ-প্রেমিক কবি এখন অমর ধামে, কিন্তু এ মর ভবনেও তিনি অমর নাম রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমর বীণার ঝঙ্কৃতি শতসহস্র প্রাণে স্বদেশ-প্রেমের প্রসুপ্ত ভাবকে জাগরিত করিয়াছে, আজ কবির প্রাণের কথা, মর্ম্মগাথা গৃহে গৃহে উদ্গীত হইতেছে। সে বীণা কখনও বা দীপকের উন্মাদন ভাবে, কখনও বা হাম্বীরের গম্ভীর আরাবে, কখনও বা বেহাগের উদাস স্বরে, কখনও সিন্ধুর সোহাগ ভরে, কখনও বা বসন্ত-বাহারের প্রমোদ-সুখে তালে তালে কত তরঙ্গ তুলিয়াছে। যাঁহার প্রাণের মধুর ভাব বহন করিয়া বীণায় এইরূপ মধুর ধ্বনি উঠিয়াছে, তিনি হেমচন্দ্র——বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাগুণে—কবি-কীর্ত্তিমঞ্চের অনেক উচ্চ স্থানে আসন পাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা বিবিধ ভাবে এবং বিবিধ বর্ণে বঙ্গ ভাষাকে অনুপ্রাণিত এবং অনুরঞ্জিত করিয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখপ্রসারিণী ছিল। প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়ে যে শক্তির শিখা জ্বালিয়া দিয়াছিল, পাশ্চাত্য কবিগণের প্রতিভা-রেখা তাহার সমুজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তিনি যখন স্বদেশ-প্রেমিকতার উন্মাদিনী মদিরায় প্রাণ মাতাইয়াছেন, তখন কবি স্কট, বা কাউপারের প্রগাঢ় স্বদেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাস, তাঁহার ভাষায় যেন ক্রীড়া করিয়াছে—তিনি যখন অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া অমর বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন, তখন মহাকবি বায়রণ স্মরণ-পথে আসিয়া

পড়েন—তিনি যখন মাতার অধঃপতনের বিষদগাথা গাহিয়া প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন মনে হয় যেন কবি ক্যাম্বলের প্রতিভা বঙ্গভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।—তিনি যখন প্রেম-গীতিকায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় তন্ত্রে আঘাত করিয়াছেন, তখন মহাকবি শেলীর প্রেমের তরঙ্গ যেন বঙ্গভাষায় তরঙ্গায়িত হইয়াছে—তিনি যখন পরিহাস বা বিদ্রূপের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তখন যেন পোপ, বা ড্রাইডেনের শক্তি তাঁহার লেখনী-মুখে প্রকাশিত হইয়াছে—আবার তিনি যখন সুরাসুরের ভীষণ সংঘর্ষণ বর্ণনায় স্বৈর-বিহারিণী কল্পনার উপাসনা করিয়াছেন, তখন মহাকবি মিল্টন-পূজিতা কল্পনা যেন তাঁহার প্রতি বর-প্রদা হইয়াছে, বলিয়া মনে হয়। হেমীকল্পনা কখনও বা স্বাধীনতার প্রাণদেবতার ন্যায় উদ্দীপনাময়ী বীণার নিক্কণে নির্জ্জীব জড়ে প্রাণ-শক্তি নিষিক্ত করে,—কখনও বা বিনষ্টশ্রী মলিনমূর্ত্তি রাজলক্ষ্মীর ন্যায় বিগত গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া বিষাদের দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়কে বিহ্বল করে—কখনও বা সুরসিকা প্রেমিকার ন্যায় কলকণ্ঠে সরস প্রেমগানের সুধাধারা ঢালিয়া দেয়, অথবা বিরহ-বিচ্ছেদ-নৈরাশ্যের উদাস গানে হৃদয়কে বিবশ করে—কখনও বা মৃদুহাসিনী প্রমদার ন্যায় বিলোল কটাক্ষের সহিত পরিহাস-রসিকতার মধুর সংলাপে মনকে আনন্দিত করে—কখনও বা প্রখরা প্রগল্‌ভা ভামিনীর ন্যায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপোক্তির তীব্রবাণে পরিহাসপাত্রকে বিদ্ধ করে,—আবার কখনও বা কলাবতী সুরবালার ন্যায় সুনিপুণ তুলিকায় অমরার অতুল দৃশ্য ভূতলবাসীর নয়নগোচর করে। আমরা হেমচন্দ্রের বিবিধমুখী-প্রতিভার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব না—কেবল তাঁহার স্বদেশ-প্রেম-বিহ্বল প্রাণের আবেগ তাঁহার ভাষায় কিরূপ ফুটিয়াছে,তাহাই দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

স্বদেশ-প্রেমিকতাই হেমচন্দ্রের সমুচ্চভাব। স্বদেশের বিগত গৌরবে গর্ব্বিত—স্বদেশের বর্ত্তমান অধঃপতনে মর্ম্মাহত—স্বদেশের গৌরব-গানে সতত উন্মুক্ত প্রাণ কবিগণের মধ্যে হেমচন্দ্রই প্রথম। কবিবর মধুসূদনের "রেখো মা দাসেরে মনে" কবিতাটী স্বদেশ-প্রেমের সুধারসে অভিষিক্ত বটে কিন্তু তাহা হইলেও স্বদেশ-প্রীতি তাঁহার কবিতার অঙ্গীভূত স্থায়ী ভাব নহে। ইহা বঙ্গভূমির প্রতি প্রবাসীর সদ্যো বিচ্ছেদসমুদ্ভূত ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম তাঁহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব,—অনেক কবিতাতেই তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে স্বদেশের কথা উঠিয়াছে, সেইখানেই তাঁহার স্বদেশ-প্রেম-প্রভা তরল শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে—

তরঙ্গ-প্রহত পদ্মের মৃণাল তাঁহার প্রাণে ভারতের অবস্থা জাগাইয়া তুলিয়াছে—যুবরাজের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া তিনি ভারতের অতীত গৌরব ভাবিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। কবিবর হেমচন্দ্রই নিদ্রিত জাতীয় শক্তির নিদ্রাভঙ্গের প্রথম প্রভাত-বৈতালিক। ভারতীয় শক্তি পরিশ্রান্ত রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় সুষুপ্তিঘোরে অভিভূত, জড়, অসাড়, নিস্পন্দ। একদিন শৌর্য্য-বীর্য্যের বিদ্যুৎ-জিহ্বা ভারত হইতে ছুটিয়াছিল, একদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিস্পন্দোজ্জ্বল প্রভা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়াছিল। একদিন কঠোর কর্ম্ম-জীবনের অক্লান্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ভারতীয় শক্তি সাধনার উচ্চগ্রামে অধিরোহণ করিয়াছিল; একদিন শূর বীর সাধু সুধী মনীষি মহর্ষিগণ সমসেবিতা ভারত-মাতা সন্তান-সৌভাগ্যে একান্ত ভাগ্যবতী ছিলেন; একদিন ভারতকবি মাতৃভূমির মহৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়াছেন—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি,
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে,
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥"

সেই ভারত-ভূমি—আজ এই; সেই উগ্রসাধনাসম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ সুসন্তানগণের বংশধরগণ এই ঘৃণিত, অধঃপতিত, নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, অধম, অক্ষম বর্ত্তমান ভারতসন্তান! কবিবর হেমচন্দ্র ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সহিত ঘোরতমসাচ্ছন্ন বর্ত্তমানের কথা ভাবিয়া দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় এবং ঘৃণায় ম্রিয়মাণ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় শত অগ্নিময় ভাবের বিলোড়নে আগ্নেয়গিরির ন্যায় সততই অভ্যন্তরে আন্দোলিত হইত। ভারত সম্বন্ধীয় কথার প্রতিপ্রশ্বাসে তাহার প্রচণ্ড উত্তাপ নিঃসৃত হইত। ভারত সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কবিতা তাঁহার আগ্নেয়গিরিসন্নিভ হৃদয়ের অগ্ন্যুৎপাত—তাহার প্রতিছত্রে অগ্নিময় দ্রবনিঃস্রব তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে। যদি উচ্ছ্বসিত ভাবের আবেগ ভাষা ধারণ করিতে পারে, এরূপ সম্ভব হয় তাহা হইলে হেমচন্দ্রের ভাষা তাহার আবেগপূর্ণ স্বদেশ-প্রেমকে ধারণ করিয়াছে। সে ভাষা মৃতদেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ন্যায়, ক্ষণেকের তরেও নির্জ্জীব জড় প্রাণকে উত্তেজিত করিয়া রাখে। তাঁহার ভাষায় নৈরাশ্যের ঘোর ঘনঘটার মধ্যেও উদ্দীপনার বিদ্যুৎপ্রভা স্ফুরিত—বিলাপ পরিতাপের মধ্যেও আশা ও উৎসাহের বাক্য গ্রথিত। তাঁহার অশ্রুজলের মধ্যেও তরঙ্গবহ্নি লুক্কায়িত। ভারতের পূর্ব্ব গৌরবে তাঁহার হৃদয় গর্ব্বোৎফুল্ল,

ভারতের পূর্ব্বকর্ম্মশক্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় পুনরভ্যুদয়ের আশায় মুগ্ধ—তিনি স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া জগতে পুনর্ব্বার সম্মান-পদবীতে আরোহণ করিতে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন—তিনি পূর্ব্ব কর্ম্মশীলতার আদর্শ দেখাইয়া বর্ত্তমান নিষ্কর্ম্মভাব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপর জাতি কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা দেখাইয়া তিনি নিদ্রিত ভারতকে জাগরিত করিবার জন্য বীণার ঝঙ্কারে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতেছেন,—"আর ঘুমায়োনা, দেখ চক্ষুমেলি—অথবা—

"সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"—

কখনও আবার ভারতসন্তানগণের ঘোর নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া প্রাণের গভীর আক্ষেপে তীব্রভাষায় ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন—

"কারে উচ্চে ডাকিতেছি আমি
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি—
আর কি ভারত সজীব আছে?

আবার কখনও বা স্বর্গমর্ত্ত্য আলোড়ন করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য ভারত-সন্তানকে অটল সঙ্কল্প, অভগ্ন উদ্যম, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচলিত অধ্যবসায় শিক্ষা দিয়াছেন। যে সাধনায় জগতে জাতীয় মহিমাধ্বজা উত্থিত হইবে, কবিবরের ভাষায় সে সাধনার বীজমন্ত্র এইরূপ—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাবজ্র বহ্নিশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

কেবল "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এইরবে" কবিতাটী পড়িলেই হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম-প্রমত্ত হৃদয়ের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র কবিতায় স্বদেশ-প্রীতির মূল প্রস্রবণ হইতে কত ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা ছুটিয়াছে—গর্ব্ব, মান, অভিমান, আশা, উৎসাহ, দুঃখ, ক্ষোভ, ঘৃণা প্রভৃতি কত ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত এই ক্ষুদ্র কবিতায় নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই, যেহেতু ইহার প্রত্যেক ভাব পাঠকের হৃদয়ে সেই ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া থাকে—পাঠক আপন হৃদয়-তন্ত্রী হইতে হৈমী-বীণার প্রতিঝঙ্কার শুনিতে পাইবেন—হৈমী-শিঙ্গার গম্ভীর আহ্বান-বাণী পাঠক-হৃদয়ে প্রতিধ্বনি না তুলিয়া নীরব হয় না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

নিও তুলে।

এ' বিশ্বের চারিধার
অন্ধকারে পড়িয়াছে ঢাকা ;
গেছে মুছে বৈচিত্র্যের
রূপরাশি সম্মোহন আঁকা !
সমীর প্রবাহ মান,
তরুরাজি কম্পমান,
সকলি আঁধার মাঝে
আছে ডুবি আগেকার মত ;—
কেবল আলোক রশ্মি
সবে গেছে অতি বিস্ফুরিত !

২

সীমাহীন দিক্ গুলি
অন্ধকারে গিয়াছে মিলা'য়ে ;
পক্ষপুট বিস্তারিয়া
পাখী কবে গিয়াছে ডাকিয়ে !
মৃদুল মধুর তান
শূন্যতার পূর্ণ প্রাণ
যেন আছে করি ভাণ
তমো মাঝে অতি অনাদৃত
প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে
ছুটাছুটি করে অবিরত !
নিষ্ক্রিয় হইয়া গেছে
আলোকের তীব্র প্রখরতা
রন্ধ্রহীন অন্ধকারে
ঢাকিয়াছে দিয়ে কঠোরতা
আমি যে আপনা হারা
রয়েছি আঁধারে ঘেরা
কাহার করুণা খুঁজি'
বাড়াইয়া রহিয়াছি হাত ।—
তুমি ত জগৎময়
স্নেহের আধার দীননাথ !

অনন্ত দীনতা লয়ে
আঁধারে ছুটেছি তব-পাশ ;
আমার নাহিক ভয়
দাও তুমি যদি ক্ষীণ-আশ।

যবে এ' কোমল প্রাণ
নিয়ে গ্লানি অপমান
অশ্রুময় আঁখিপ্রান্তে
আসিবে গলিয়া প্রেমময়,
কমল কোরক করে
মুছাইয়া দিও বিশ্বময়।

নৈরাশ্য ব্যস্ততা যবে
ব্যাকুল করিবে প্রাণখানি
দিও নাথ বরষিয়া
শান্তির আশীষ স্নেহবাণী ;

হৃদয়ের প্রতিদ্বার
দিবনা খুলিয়া আর
আপনারে দিয়ে তোমা
ঘুমাইয়া রহিব আড়ালে ;
চা'বনা জগৎ পানে ;
খুলি দ্বার, নিও ডেকে কালে !

জীবনের যবে বর্ষা
আঁধারিবে হৃদয়-গগন,
জ্বালি' দুঃখ বিদ্যুল্লতা
ভীষণতা বাড়া'বে যখন,
নিরাশ গম্ভীর ধ্বনি
আঘাতিয়া হৃদিখানি
সকরুণ আঁখি হ'তে
বহাইবে যবে অশ্রুজল
ওগো নাথ! সে সময়
নিও তুলে কোলে সুকোমল!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

জয় পরাজয়।

পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। সামান্য অঙ্কুরোদ্গম হইতে সুবিশাল গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু ও সমস্ত কার্য্যই বিবিধ নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত পরিরক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু জয় পরাজয়ের নিয়ম কি?

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—বাল্যকাল হইতে এ কথা শুনিয়া আসিতেছি। পরন্তু কার্য্যকালে সংসার ক্ষেত্রে তাহা দেখিতে পাই কৈ? বরং দেখিতে পাই—যাহা উদার, যাহা পবিত্র ও যাহা সৎ তাহারই প্রায়শঃ পরাজয় হয়; আর যাহা অনুদার, অপবিত্র ও অসৎ তাহারই জয়লাভ ঘটিয়া থাকে। মদ্য-পানাসক্ত বারবনিতানুরক্ত বাবু অপেক্ষা প্রাতঃস্নায়ী নিরামিষাশী পুরোহিত ঠাকুর নিশ্চয়ই ধার্ম্মিক। কিন্তু সংসারে জয়ী কে? বাবুর করুণা-কটাক্ষ লাভের জন্য পুরোহিত ঠাকুরকে সতত লালায়িত দেখিতে পাই। সুতরাং ধর্ম্মের জয় হয় কৈ? বরং "যতো ধর্ম্মস্ততোঽজয়ঃ"—যেখানে অধর্ম্ম সেখানেই জয় হইয়া থাকে!

প্রকৃতই কি তাই? কখনই না। ধর্ম্ম কখনই পরাজিত হন না; হইতে পারেন না। সকল দেশের সমস্ত পুরাণ ইতিহাস আলোচনা কর—সর্ব্বত্রই ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিতে পাইবে। অধর্ম্ম অধর্ম্মের কাছে জয় লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু ধর্ম্মের নিকট চিরকালই বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়াছে। যাহা যে নিয়মে আবহমান কাল হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে তাহার ব্যত্যয় হইবে কেন? অনাদিকালপ্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের কে বাধা জন্মাইতে পারে? হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "ধর্ম্ম" পদের মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, জয়-পরাজয়তত্ত্ব তাঁহার নিকট সুপরিব্যক্ত। ধর্ম্মের সঙ্গে জয়ের এমনই সম্বন্ধ যে, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয় হইবে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু́ণাস্তৈ,-র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ, শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ)

হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত জ্ঞানরত্ন-ভাণ্ডার। এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্যরসময় ইতিহাস আর কোনও জাতির আছে কি? ইদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকৃতমতি

কতিপয় পণ্ডিতমানী অপণ্ডিত ব্যক্তিই হিন্দুশাস্ত্রকে 'কৃষকদের গান' 'কুরুচিপূর্ণ' 'অসার' বোধে উপেক্ষা করেন ;—শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতেই পারেন না ; সুতরাং তাহাতে বিজ্ঞানের গন্ধ পাইবেন কিরূপে ? মদ্য মাংস খাইলে বুদ্ধি স্থূল হয়, এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নিত্য মদ্য-মাংসাহারী পাশ্চাত্য গুরুদিগের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া তদুপদেশে হবিষ্যাহার ও অন্যান্য সদাচার করিতে করিতে যেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক (থিওসফি) দল এতত্ব বুঝিল, অমনি "আমিষাহার পরিত্যাজ্য" "সকলে হবিষ্য আহার কর" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ইচ্ছা—পৃথিবী হইতে আমিষ আহারটা একেবারে উঠাইয়া দিবে।

"বহুস্পৃশাপি স্থূলেন স্থীয়তে বহিরশ্মবৎ।"—স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি বহু পরিশ্রমে বহুশাস্ত্র আয়ত্ত করিলেও উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যেমন সূচী অল্প স্থান স্পর্শ করে, কিন্তু অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, আর একখানি প্রস্তর অনেক স্থান স্পর্শ করিতে পারে কিন্তু বাহিরেই থাকে, ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। মাংসের দোষ-গুণ উহারা সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই, তাই "মাংস মনুষ্যের অখাদ্য" বলিয়া নির্দেশ করে। নচেৎ মাংস সকল মনুষ্যেরই অখাদ্য নহে। কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, যাক্ ও কথা।

চৈতন্যরূপী পরম পুরুষ পরমেশ্বরই প্রকৃতির সাহায্যে এই জগদাকার ধারণ করিয়াছেন। সেই প্রকৃতি—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়ী। এই গুণত্রয়ের বিভিন্ন প্রকার সংযোগে বিভিন্নাকারে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি আকার ধারণ করিয়াছেন। সত্ত্বগুণে বিষ্ণু পুষ্টি করেন, রজোগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, তমোগুণে শিব সংহার করেন।—সত্ত্বগুণে স্থিতি আনন্দ, রজোগুণে ক্রিয়া—দুঃখ, তমোগুণে সংহার—অভাব—জড়তা। সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয় সর্ব্বভূতেই সর্ব্বদা ন্যূনাধিক ভাবে বর্ত্তমান থাকে। যখন যাহার দেহে যে গুণের বৃদ্ধি হয় তখন তদনুরূপ কার্য্যও ঘটিয়া থাকে। কোন এক গুণ প্রবল হইলে অপর দুই গুণকে সে আক্রমণ করিয়া দুর্ব্বল করে,— স্বয়ং প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষামব্যক্তিং প্রকৃতিং বিদুঃ॥" (গরুড় পুরাণ)

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় যখন সমান ভাবে থাকে অর্থাৎ কোন গুণই অপর গুণদ্বয়কে অভিভব করিয়া স্বয়ং প্রবল হইতে না পারে, তখন কোন গুণেরই সবিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। গুণগণের সেই অপ্রকট অবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। জীব যে যে গুণের যে পরিমাণ ভাগ লইয়া দেহ ধারণ করে, সেই সেই গুণ যতক্ষণ সেই সেই পরিমাণেই থাকে ততক্ষণই প্রাণিগণ প্রকৃতিস্থ বা সুস্থ বলিয়া অভিহিত হয়। যখন গুণত্রয় সেই স্বাভাবিক ভাব অতিক্রম করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা বিকৃতি ও তদ্ভাবাপন্ন প্রাণীদিগকে বিকারগ্রস্ত বলা যায়। স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণাধিক ভারতবাসী বিদেশী তমো-গুণাধিক কুশিক্ষার ফলে অধুনা ঘোর বিকারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং যাহা হিতকর তাহাকেই ক্ষতিকর ও যাহা সৎ তাহাকেই অসৎ বলিয়া মনে করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

গুণত্রয়ের যথাযথ বিচার করিলেই জয়-পরাজয়তত্ত্ব স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু গুণত্রয়ের যথাযথ বিচার করিয়া সম্যক্ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সকল সময়ে সকলেই যে সক্ষম হইতে পারেন তাহা নহে, দেশ কাল পাত্র ভেদে উহার ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। মাদৃশ অল্পজ্ঞ মানবের সে তত্ত্ব যথাযথ প্রকট করা পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ বাতুলতা মাত্র। তথাপি সংক্ষেপে দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ব্যবসায়ই করিতেছি, কিন্তু কূটমতি ম্লেচ্ছনৃপতি-প্রবর্ত্তিত কুশিক্ষা ও কদাচারে আংশিক আক্রান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া চিত্ত রজস্তমোগুণে আক্রান্ত; সুতরাং পাঁচ জনের কাছে প্রশংসা পাইবার আশা-টুকু ছাড়িতে পারিতেছি না। পাঠকবর্গ এ চাপল্য মার্জ্জনা করিবেন।

সত্ত্বগুণ লঘু সূক্ষ্ম, তমোগুণ গুরু স্থূল, আর রজোগুণ মধ্যম অর্থাৎ অল্প গুরুতা বিশিষ্ট। সূক্ষ্মের নিকট স্থূল পরাজিত হয়: তাই তামসিক ব্যক্তি রাজসিক ও সাত্ত্বিক উভয়ের নিকট এবং রাজস ব্যক্তি সাত্ত্বিকের নিকট নিয়ত পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তামসিক বৃক্ষ তদপেক্ষা রাজসিক কীট-পতঙ্গের খাদ্য। রাজসিক হস্তী তদপেক্ষা সাত্ত্বিক মনুষ্যের আজ্ঞাধীন। সুবিশাল বটবৃক্ষের সহিত কি সামান্য কীট-পতঙ্গের তুলনা হয়? কিন্তু বটবৃক্ষের ফল আহরণ করে কে? হস্তীর বলের সহিত মনুষ্যের বলের তুলনা হয় না, তথাপি কিন্তু হস্তী মনুষ্যের বশীভূত। কোথায় এই দেববাঞ্ছিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আর কোথায় সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপ! তথাপি ভারতবর্ষ

আজি ইংলণ্ডের পদানত কেন? ইহার কারণ কি? কারণ এই—ভারতবর্ষ আজি তামসিক আর ইংলণ্ড রাজসিক। তামসিক রাজসিকের নিকট চিরকালই পরাজিত হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ সত্ত্বগুণপ্রধান ছিল, সে কালে এই ভারতবাসীরাই সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল; কালপ্রভাবে ভারতের এই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আবার যখন ভারত তমোভাব পরিহারপূর্ব্বক ইংলণ্ডাদি দেশ অপেক্ষা সত্ত্বগুণবহুল হইবে তখন আবার ঐ সকল দেশ এই অধঃপতিত ভারতবাসীর পদানত হইবে, সন্দেহ নাই। "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা—চক্রনেমিক্রমেণ।" এ নীতির অন্যথা হয় না; সেই সুদিনের মনঃপ্রাণোন্মাদিনী প্রভাতী বাজিয়া উঠিয়াছে—নিদ্রিত ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে উদ্বুদ্ধ হইতেছে—ঐ শুন,—"বন্দে মাতরম্।" *

শ্রীকৃষ্ণদাস শাস্ত্রী।

প্রেম।

'প্রেম' শব্দটী অতি মধুর; এমন মধুর শব্দ এমন মধুর সামগ্রী বুঝি সংসারে আর নাই বালক যুবা বৃদ্ধ যে-ই হউন, প্রেমের মধুর ভাবে, প্রেমের মদিরাময় আবেশে, প্রেমের মোহিনী মন্ত্রে সকলেই মুগ্ধ। প্রেমের অন্ধ কুহকে সকলেই আত্মহারা। এই প্রেম, সাহিত্য দর্শন বা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রতীত হয় না, ইহা স্বভাবতঃ, মাতৃবক্ষে ক্ষীর সঞ্চারের ন্যায়, প্রত্যেক জীবের অন্তরে পূর্ণভাবে উদয় হইয়া থাকে।

প্রেমময় ঈশ্বরের অনন্ত অসীম জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সকল বস্তুতেই তাঁহার প্রেমের ছবি দেদীপ্যমান। ঐ যে বালার্ক-সিন্দুর-বিন্দু ললাটে পরিয়া প্রেমময়ী ঊষা ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন, উনি প্রেমের ছবি। ঊষার প্রেমে জগৎ নবজীবন লাভ করিয়া হাস্য করিতেছে ঊষার প্রেম-অনুরাগে বিহগেরা মধুর কূজন করিতেছে, ঊষার শুভ্র আলোকচ্ছটায় দশদিশি উদ্ভাসিত। ঊষার মধুর স্পর্শে কুসুম বালাগণ বিকশিত। ঊষার আগমনে কমলিনীনাথ বিরহক্লিষ্টা কমলিনীর প্রফুল্ল-বদনখানি অনুরাগে চুম্বন করিয়া প্রফুল্ল করিতেছেন। তাই বলি ঊষা প্রেমময়ী, কেবলঊষাগমে প্রণয়িযুগল

---

* গুণত্রয়তত্ত্ব বারান্তরে বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

বিরহবেদনা হৃদয়ে লইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করে ও রজনীর অপেক্ষায় ক্ষুণ্ণ মনে সময় কাটায়। কিন্তু, বিরহের পর মিলন সুখকর বলিয়াই, উষা প্রেমিক যুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। উষার আগমনে বৃক্ষশাখাগুলিও শিশিররূপ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। তাই বলি, এজগতে প্রেমবন্ধনে সকলেই আবদ্ধ। এ পার্থিব সংসার প্রেমের বলেই চালিত; মানব হৃদয়কে ভগবান্ যদি এত প্রেমময় না করিতেন, তাহা হইলে জগতে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা হইত। প্রেমের জয় সর্ব্বত্রই। প্রেম জড়ে চেতনে অপ্রতিহত ভাবে নিত্য জাগ্রত। যে দিকে চাও সেই দিকেই সংসারে প্রেমের অব্যর্থ অমোঘ আকর্ষণ-শক্তি দেখিবে; বিশাল ব্যোম রাজ্যে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল এই অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরদিনই আপন আপন কেন্দ্র পথে ঘূর্ণিত হইতেছে। ওই যে অত্যুচ্চ গিরিরাজ ক্ষুদ্রকায় তটিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তটিনী সুন্দরী সমীরণভরে নাচিয়া, নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া, সাগরের দিকেই ধাববান হইতেছে, দিবাকর উদয় হইয়া ধরার সহিত বদ্ধালিঙ্গন হইয়া উদয় হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত গমন করিতেছে, প্রেমের আকর্ষণশক্তিই তাহার মূল। ওই যে ক্ষুদ্র কোমলকায়া ব্রততী উহাও প্রেমাবেগে সহকারকে বেষ্টন করিয়া আছে। সুনীল আকাশে সুধাকর, প্রেমামৃত বর্ষণ করিয়া, কুমুদিনীর ম্লান মুখখানি প্রফুল্লিত করিতেছেন; আবার প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া প্রকৃতি সুন্দরী জগতকে অভিনব বেশে সাজাইতেছেন। তবে প্রেম স্থানভেদে অধিকারী ভেদে, পাত্রাপাত্র ভেদে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে। কোথাও প্রেম প্রীতিরূপে, কোথাও প্রেম ভক্তিরূপে, কোথাও স্নেহরূপে কোথাও বা বাৎসল্যরূপে, কোথাও প্রেমপূর্ণ রূপে আবির্ভাব হয়।

একবার বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-উন্মত্ততা দেখুন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, সর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সর্ব্বভূতের আধার হইয়াও নরদেহ ধারণ করিয়া প্রকৃতিরূপা প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমে এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে তাঁহার মধুর মুরলী দিবানিশি "রাধা" নামেই সাধা ছিল। রাধানাথ রাধা-প্রেম-মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া জগৎকে প্রেম শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী শ্রীমতীর প্রেমে তন্ময় হইয়াই "দেহি পদ-পল্লবমুদারং" বলিয়াছিলেন। রাধা-প্রেমে তাঁহার কহ্লার-বিনিন্দ নয়নে জলধারা বিগলিত হইত। রাধা-প্রেমে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করিত, যমুনা উজান বহিত, বৃন্দাবনের তরুলতাও

দোলায়মান হইত। ভ্রমর-ভ্রমরী গুঞ্জন করিত, রাধা-প্রেমে কুঞ্জের শারিশুকও "জয়রাধে" বলিয়া গান গাহিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের জন্যই নন্দের বাধা মস্তকে বহন করিয়াছিলেন এবং রাধা-প্রেমে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন—

"রাই তুমি যে আমার গতি
তোমার লাগিয়া প্রেমতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।"

আবার, যশোদা মাতার বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বন্ধনহীন কর্ম্মহীন ভগবান্ তাঁহার নিকট বন্ধন দশাও ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রেম অপার্থিব, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অমূল্য। এ প্রেমে ভোগতৃষ্ণা ছিলনা, আসঙ্গলিপ্সাও ছিলনা, কামগন্ধও ছিলনা, তাই এই প্রেমের মোহিনী-মন্ত্রে গোপিকারা প্রেম-রজ্জুতে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিল, তাই কৃষ্ণ-প্রেম-পিপাসিতা গোপিনীগন তাঁহার মুরলীর মধুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া গৃহকার্য্য বিস্মৃত হইত। লজ্জা সরম কুল মান ভয় ত্যাগ করিয়া পতি-পুত্র-আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করিয়া যমুনাতটে কদম্বতলে ও বিজন বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহার মধুর অধরের মুরলী-ধ্বনিতে মুগ্ধা কৃষ্ণ-প্রেমপিপাসিতা হইয়া শ্রীমতী গুরুগঞ্জনা লজ্জা ভয় কুল মান ত্যাগ করিয়া কুঞ্জকাননে মিলিতা হইতেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর প্রেমগানে জগৎ বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইত। প্রেমময়ের আহ্বানে গোপিকাগণ আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদের শরীর অবসন্ন হইত, চেতনা বিলুপ্ত হইত, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত। কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী ব্রজগোপিকাগণ, শ্রীমতীর সহ, জগৎপতির অনঙ্গবর্দ্ধন প্রেম-সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিত। এই প্রেমচিত্র কবি অতুল তূলিকায় কি মধুর ভাবেই পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গ-বর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥"

আহা এমন মধুর প্রেমের কি তুলনা আছে! বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীতে যে

সকল ললিতপদবিন্যাস আছে, তাহা পাঠ করিলে নয়নে আপনিই অশ্রুধারা পড়িতে থাকে। মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের কোটী-চন্দ্র-বিনিন্দিত বদনের অনুপম সৌন্দর্য্য যে একবার দর্শন করিত, সে তম্মুহূর্ত্তেই বিহ্বল হইত, তাহার চক্ষু আর ফিরিত না। তাঁহার মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন, বালক বৃদ্ধ যুবা যে শ্রবণ করিত সে-ই তৎক্ষণাৎ হরি-প্রেমে মত্ত হইয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইত। আবার, প্রভু পাপী তাপী দেখিলেই আগে গিয়া সপ্রেম আলিঙ্গন করিতেন। জগাই মাধাইয়ের নিকট মা'র খাইয়াও বলিয়াছিলেন "মেরেছ কলসী-কানা, তা বলে কি প্রেম দিবনা?" শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-সংকীর্ত্তনে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানব নিশ্চল হইত। আহা সে উচ্চ প্রেমের কি মধুরতাই ছিল! গৌর-প্রেমের তুলনাই নাই। আবার প্রেমময় খ্রীষ্ট যখন জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও ভগবৎপ্রেমে আত্ম ভুলিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়া জগতের হিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দৈত্যকুল-চূড়ামণি ভক্ত প্রহ্লাদ হরি-প্রেমে হলাহল পানেও কাতর বা ভীত হয়েন নাই। প্রেমের বলেই প্রহ্লাদ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত্র ধ্রুব, শৈশবেই ভগবৎপ্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তপশ্চরণার্থ বনগমন করিয়াছিলেন ও অসীম প্রেম ভক্তিতে ভগবৎ চরণ লাভ করিয়াছিলেন— এই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মগ্ন হইয়াই নারদ শুক সনকাদি দেবর্ষিগণ অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবার রাজপুত্র শাক্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ বিষয়-বাসনা ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া, পরমরূপবতী গুণবতী পতিপ্রাণা ভার্য্যা গোপাকে ত্যাগ করিয়া, নবপ্রসূত কুমারকে ত্যাগ করিয়া, পিতা মাতার স্নেহ ত্যাগ করিয়া, এই জরামৃত্যুব্যাধি নিষ্পীড়িত সংসারের অসারতা দেখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য নরনারীকে মুক্তি-পথের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রেম-মন্ত্রে অনেকে দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বাণ-পদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শাক্য দেবের সার্ব্বজনীন প্রেমে জগৎ উন্মত্ত হইয়াছিল। এদিকে শুভক্ষণে, শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হরি-প্রেমে জগত মাতাইয়াছিলেন। তিনি হরি-প্রেমে মত্ত হইয়া হরিধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের ভুবন-মোহন রূপমাধুরী ও তাঁহার শ্রীমুখের মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন যে শুনিত সে আর প্রকৃতিস্থ থাকিতনা।

শ্রীচৈতন্যদেব জগতের প্রেম-শিক্ষা-দাতা, তিনি সন্তানবৎসলা শচীমাতাকে

ত্যাগ করিয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িণী বিষ্ণু-প্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া হরিপ্রেমে আত্মহারা হইয়া, বিহ্বল হইয়া, একমাত্র কৌপীনধারণপূর্ব্বক জগতের জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার জন্যই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জগতে এই প্রেমই সংসারবন্ধনের মূলী-ভূত কারণ; প্রেমের বলেই মানব বলীয়ান্। তাই, মানব সমাজে, সংসার বন্ধনের মূল প্রেমের জন্যই, স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে বিবাহবন্ধনে যে পবিত্র বিমল দাম্পত্যপ্রেমের সৃষ্টি হয়, সে প্রেম অতুলনীয়। দাম্পত্যপ্রেমের ন্যায় এমন স্বর্গীয় ভাব, এমন নির্ম্মলতা ও এমন পবিত্রতা আর কিছুতেই নাই। সংসারে পতি-পত্নীর একাত্মতা অতি সুখের, তাই দাম্পত্য-প্রেম, সংসারে স্বর্গ। এমন হৃদয়-স্নিগ্ধকর, প্রাণোন্মাদকর, অন্তস্তলস্পর্শী সুখকর দাম্পত্য-প্রেম ছাড়া জগতে এমন কি আছে যাহাতে আমিত্ব লোপ হইয়া যায়। নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেমে জীবকে যখন আত্মহারা করে, তখন আমিই তুমি তুমিই আমি, তুমিই শরীরের অর্দ্ধাংশ;তোমার অভাবে আমার অভাব,তুমিই দেহ আমি ছায়া, তুমিই আত্মা আমি প্রাণ, তুমিই কার্য্য আমি কারণ, এই ভাব হইয়া পড়ে। এইরূপ তদীয়তা মদীয়তাই দাম্পত্য-প্রেমের চরমোৎকর্ষ। তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার প্রেমেই আমার স্বর্গ তোমার আহারেই আমার পরিতৃপ্তি, তোমার মোহিনী রূপেই আমার নয়ন মুগ্ধ, তোমার মধুর স্বরেই কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, তোমার বীণবিনিন্দিত মধুর সম্ভাষণ আমার শ্রবণে পীযূষধারা মনে হয়। তোমার কোমল কটাক্ষে হৃদয়ের অন্তস্তল বিদ্ধ হয়, তোমার হাস্যে জ্যোৎস্না ফুটে; কণ্ঠে পিককাকলী শ্রুত হয়, তোমার প্রত্যেক পদ-বিন্যাসে আমার হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে। এইরূপ স্বার্থশূন্য প্রেমই বিশুদ্ধ, ইহাতে ভোগাসক্তির লেশ মাত্র থাকে না—ইহাই নির্ম্মল—নির্ব্বিশেষ প্রেম। এই প্রেমেই মত্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মৃতশব আলিঙ্গন, রজ্জু-জ্ঞানে বিষধর সর্প আশ্রয় করত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। প্রেমে তন্ময় হইলে, মানবের রূপ বিচার থাকে না, সম্বন্ধ বিচার থাকে না, আত্মপর ভেদ থাকে না, কুলমান থাকে না, জাতি বিচারও থাকে না। ইহাই ঐকান্তিক প্রেম। এই প্রেমই ভগবৎপ্রেম নামে অভিহিত।

শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসী।

হিন্দু-বিধবা।

(১)

এত সাধ এত আশা
হৃদয়ের সুপ্ত ভাষা
একটী তরঙ্গ হায়
সব গেল ডুবে—
কামনার বিসর্জ্জন
ভেঙ্গে গেল প্রাণ মন
নিরাশা হৃদয়ে ধরি
রহিলে এ ভবে ॥

(২)

বজ্র সম অকস্মাৎ
লাগিল প্রচণ্ড ঘাত
সহিলে নীরবে বাঁধি
পাষাণেতে মন—
স্বেচ্ছায় ফেলিলে দূরে
চাহিলে না আর ফিরে
কতই সাধের তব
অঙ্গ-আভরণ ॥

(৩)

বিসর্জ্জিয়া আশা যত
গড়িলে আপন মত
কোমল হৃদয় তব
করিয়া পাষাণ—
প্রস্ফুটিত হৃদি কুঞ্জে
কত ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে
ফুটিত—'শুকাল এবে
হইল শ্মশান ॥

(৪)

ঈশ্বর চরণে মন
করিলে গো সমর্পণ
সংসার ভুলিলে এবে
ভুলিলে সবায়—
কে তোমা আনিয়া দিল
পেলে কোথা এত বল
এ দৃঢ় সংযম দেবী
শিখিলে কোথায় ॥

(৫)

বিলাস আমোদ ভরা
চঞ্চল চাহনি পোরা
হাসি ভরা সে আনন
লুকাল কোথায়—
মূর্ত্তিমান্ স্থির ধীর
এবে শান্ত সুগভীর
একটী তরঙ্গে সব
ডুবে গেল হায় ॥

(৬)

জীবনের পর পারে
আছে স্থান তব তরে
মিলন-কানন এক
পূর্ণ শোভাময়—
বিচ্ছেদ-বেদনা ব্যথা
নাহি যায় কভু সেথা
তোমার ব্রতের ফল
ফলিবে সেথায় ॥

(৭)

হইবে মিলন পুনঃ
পাইবে হৃদয় ধন
অনন্ত প্রেমের বাঁধে
বাঁধি দুই জনে—

রহিবে গো চিরদিন
বিচ্ছেদ বেদনা হীন
স্বর্গীয় সুষমা ফুটি
উঠিবে পরাণে॥

শ্রীবামনদাস বসু।

একলব্যের প্রতি।

একলব্য!

নিষাদ তনয় তুমি! হায় বহু আশে
শস্ত্রবিদ্যা লভিবারে, দ্রোণাচার্য্য পাশে
গিয়াছিলে; ভেবেছিলে শিষ্য হবে তা'র!
গুরুপদে মাগি' লবে ধনুর্ব্বিদ্যা সার!
গর্ব্বিত সে দ্রোণাচার্য্য! অন্যায় বিচারে,
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিল তোমারে
ব্যাধের তনয় জানি,' শুনি নীচ জাতি!
দেখিলনা—বুঝিলনা তব জ্ঞান-ভাতি!
আসিলে ফিরিয়া হায় অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
স্থাপিলে দ্রোণের মূর্ত্তি গভীর কাননে।
দারুময় গুরুপদে শিষ্যত্ব গ্রহণ
করিলে; লভিলে বিদ্যা হ'য়ে একমন।
আচার্য্য আদেশে শেষে অঙ্গুষ্ঠ ছেদনে
দিলে গো দক্ষিণা; কীর্ত্তি রটিলে ভুবনে!

শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

প্রতিবাদ।

বিগত ২৯ এ কার্ত্তিকের "মিহির ও সুধাকর" সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে অবসরে প্রকাশিত মল্লিখিত "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" নামক ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের একটি প্রতিবাদ প্রকাশ হইয়াছে। মিহির ও সুধাকর মুসলমান-পত্রিকা; – ঐ প্রতিবাদ-প্রবন্ধের লেখকও একজন সদ্বিদ্বান্ মুসলমান। তিনি আশঙ্কা করিয়াছেন, অবসরে প্রকাশিত উপন্যাসে নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বিকৃত হইয়াছে ও হইবে; যাহা ইতিহাসে নাই, তাহাই লিখিত হইয়াছে ও হইবে। এখনও আমার লিখিত উপন্যাসের অতি সামান্য মাত্র প্রকাশ হইয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সমালোচনা বা প্রতিবাদ সম্ভবে না; তথাপি মুসলমান বন্ধুর প্রীত্যর্থে এস্থলে সেই প্রতিবাদের একটা উত্তর দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি। মিহির ও সুধাকরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; কেন না, তাহা না পড়িলে, অবসরের পাঠকগণ বুঝিবেন কি প্রকারে?

মিহির ও সুধাকরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই,—"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য একজন বিখ্যাত দার্শনিক ঔপন্যাসিক এবং আজকালকার দিনে একজন প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক বলিয়া আদৃত। তিনি প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালী নভেলপাঠকের নিকট পরিচিত, কারণ, তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অনেকগুলি নূতন ধরণের উপন্যাস সাহিত্য-বাজারে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বের গবেষণাপূর্ণ অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি "অবসর" মাসিক পত্রিকার একজন প্রধান লেখক। যদিও অনেক গুলিন উপন্যাস তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তবুও কি ভাবিয়া এত দিন তিনি মুসলমান চরিত্রকে ততদূর অধঃপাতে দেন নাই। বাস্তবিক তজ্জন্য তাঁহার উপর এতদিন একটু ভক্তিও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি একজন জ্ঞানী হইয়াও (৪র্থ ভাগ, ভাদ্রের) "অবসরে" সিরাজদ্দৌলার যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সে ভক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একজন ঐতিহাসিক উপন্যাসলেখক হইয়াও সিরাজ-চরিত্রকে কলুষিত করিতে কেন চেষ্টিত হইতেছেন, তাহার কারণ বুঝা যায় না। যে সিরাজ-চরিত্রকে উজ্জ্বল প্রতিপন্ন করিবার জন্য

হিন্দুগণ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, বুঝি না কি ভাবিয়া সুরেনবাবুর মত একজন ধীমান্ তাঁহার জীবন-উদ্যানকে কণ্টকিত করিবার জন্য এই নূতন উপন্যাসখানির রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে সিরাজদ্দৌলার স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতিবৎসলতা অভিনয়-মঞ্চে অভিনীত করিয়া দেশময় এক নবজীবনের সৃষ্টি করিয়াছে, জানি না কেন তাঁহার শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত জীবনে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

অক্ষয়বাবুর উন্নত মস্তিষ্কপ্রসূত সিরাজদ্দৌলা নামক পুস্তক খানিকে সুরেন বাবু কি কল্পনা বলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চান? হঠাৎ সুরেন বাবুর এ খেয়াল কোথা হইতে আসিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সিরাজ-দ্দৌলা সম্বন্ধে তাঁহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস কেন যে এখনও অপনোদিত হয় নাই, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। ইহা কি বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের গুণ না কি? স্বদেশী আন্দোলনে মিলনপ্রয়াসী হিন্দুগণ কি বলিতে চান? যাঁহারা মিলন-প্রার্থী, তাঁহাদের কি উচিত নয় যে, এই অযথা কুৎসার প্রতিবাদ করেন? হিন্দুর ফেনচাটা "সোলতান" কেন যে চুঁ চাঁ করিতেছেন না, বুঝি না। তিনিও কি এখন সুরেন বাবুর তানে তান ধরিতে চান? এবং তথা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাবকে অত্যাচারী, কামুক, লম্পট, পরস্ত্রীহারী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে চান? "সোলতান" যে একটা গলা-চুলকান আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার কি এখন এদিকে দৃষ্টি পড়ে না? না, তিনি এসব বিষয়ে আন্দোলন করিতে ভয় পান?—কি জানি পাছে তাঁহার আদরের ভাই (হিন্দু) রাগ করিয়া বসেন? আমরা "সোলতান" সম্পাদককে একজন পাশকরা মৌলবী বলিয়া জানি। তিনি অনেক সময়ে ইতিহাস আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে সুরেন বাবুর এই কল্পিত উপন্যাস যাহাতে অঙ্কুরেই উৎপাটিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন একান্ত আবশ্যক এবং এ বিষয়ে কিছু কাগজ-কলম খরচ করিয়া আন্দোলন করা উচিত। তাঁহার (৪র্থ ভাগ ভাদ্রের) "অবসর" খানি পড়া নিতান্ত উচিত। এবং প্রতিবাদ ক্ষেত্রে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান আবশ্যক।—"সিরাজী" নিজকে একজন ইতিহাসজ্ঞ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন; তাঁহার কি উচিত নয় যে, "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন? "সিরাজী" এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ না করিলে আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ হিন্দু বলিতে বাধ্য হইব।

"সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" লেখক যে তূলিতে অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছেন, তাহাতে যে তাহার স্থানবিশেষের প্রতিবাদ করা আবশ্যক, তাহা নহে; বর্ত্তমান সংখ্যায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার আগাগোড়াই * *। লেখক ছত্রে ছত্রে গতায়ু নবাবকে অন্যায় আক্রমণ করিয়া তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছেন। অঙ্কুরেই যাহার এতটা বাড়াবাড়ি, শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত হইলে যে কি হইবে, তাহা "তিনিই" জানেন। সিরাজচরিত্রে আবার বদ্ধমূল ঘৃণা আসিয়া পড়িবে। তখন চুনো পুঁটি পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কলেপনে চেষ্টিত হইয়া পড়িবে। তাই অনুরোধ, প্রবীণ সুধাকর-সম্পাদক অঙ্কুর উদ্যত না হইতেই যাহাতে উৎপাটিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। আর যে বিষয় লইয়া লেখক মস্তিষ্ক ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু নিহিত আছে, তাহাও জানিতে চাই।"

ইহাই সুধাকরে প্রকাশিত প্রবন্ধ। ইহার একটা উত্তর লিখিয়াও সুধাকর সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে অবসরের পাঠকগণের ও সাধারণের অবগতির জন্য এসম্বন্ধে এস্থলেও কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম।

মাননীয় লেখকবন্ধুর প্রথম ও প্রধান অভিযোগ—সিরাজদ্দৌলার জীবন-উদ্যানকে কণ্টকিত করিবার জন্য আমি এ উপন্যাস খানির রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ অভিযোগ ভুল,—সিরাজচরিত্র যে দোষে দূষিত, যে পাপে তাপিত, আমি তাহাই অঙ্কিত করিয়াছি। সিরাজের ইন্দ্রিয়-দোষ,—সিরাজের বিলাস-বাসনা—সিরাজের পান ও সঙ্গদোষ—সিরাজের কুলস্ত্রী-অপহরণ মহাপাতক সর্ব্ববাদিসম্মত ও ঐতিহাসিক সত্য। ইহা আমি নূতন করিয়া বলিতেছি না, বা ইহা আমার রচা কথা নহে। লেখকবন্ধু ঐতিহাসিক পণ্ডিত অক্ষয়বাবুর "সিরাজদ্দৌলা" নামধেয় গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—সুরেন বাবু কি কল্পনাবলে ঐ গ্রন্থোক্ত সত্য, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চান? কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বন্ধু যদি আগে সে গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিয়া একথা লিখিতেন, বাধিত হইতাম। আমি দেখাইব যে, অক্ষয়বাবু মীরজাফর খাঁ প্রভৃতির স্কন্ধে অধিকাংশ কলঙ্কভার অর্পণ করিয়া সিরাজকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এদোষ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অক্ষয়বাবুর "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"ইংরাজদিগের ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। বাঙ্গালীর নিকট সিরাজদ্দৌলা কেবল

ইন্দ্রিয়পরায়ণ অর্থপিপাসু উশৃঙ্খল যুবক বলিয়াই পরিচিত;—এই পরিচয় কিয়দংশে অতিরঞ্জিত হইলেও, একেবারে মিথ্যা নহে।”

ঐ গ্রন্থের ৬৯ পৃঃ—“মোহনলাল একজন সামান্য অবস্থার লোক। নবাব-সরকারে তাঁহার কোনই পদগৌরব ছিল না। সিরাজদ্দৌলা যখন যৌবনোন্মাদে মত্ত, সেই সময়ে যে সকল লোক দলে দলে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিলেন, মোহনলাল তাঁহাদিগেরই একজন। মোহনলালের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভগিনী ছিলেন। রূপে তিনি বঙ্গসুন্দরীদিগের মধ্যে সমধিক রূপবতী বলিয়া পরিচিত। যৌবনোদ্গমে সেই অতুল রূপরাশি ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই রূপসী ক্ষীণাঙ্গীদিগের মধ্যেও ক্ষীণাঙ্গী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহাঁর দেহভার ৩২ সেরের অধিক ছিল না,—এই অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা সিরাজদ্দৌলার নিকট অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। তখন সেই রূপরাশি সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরে আসিয়া উপনীত হইল।”

ঐ ৭১ পৃঃ—“মোহনলালের ন্যায় আরও কত লোকে এইরূপে সিরাজদ্দৌলার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তবে রাজ্যপরিদর্শন উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নানাস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং ফৌজদারগণ যে তাঁহার মনস্তুষ্টি ও শুভদৃষ্টি লাভের প্রত্যাশায় গায়ে পড়িয়া অনেক সুন্দরী ললনার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন,—তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ছলে, বলে, কৌশলে এবং অর্থবিনিময়ে অনেক কুলকামিনী সিরাজের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন;—”

ঐ ২০ পৃঃ—“মাতামহ স্বাধীনতা দিয়াছেন, স্বহস্তে প্রমোদশালা গড়িয়া তুলিয়াছেন, প্রয়োজনানুরূপ বৃত্তিনির্দ্দেশ করিয়া ভোগবিলাসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং দৌহিত্রের বিলাস-স্রোত প্রবলবেগেই ছুটিয়া চলিল! হায় সিরাজদ্দৌলা! এই বিলাস-স্রোতেই যে সময়ে ধন, মান, জীবন এবং সিংহাসন পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইবে, তাহা জানিলে তোমার জীবন বুঝি হীরাঝিলের বর্ত্তমান ইতিহাসকে এত বিষাদপূর্ণ করিতে পারিত না।”

এই বিষাদকাহিনীই “সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন” উপন্যাসে প্রকটিত হইবে। তাই, সে বিলাস-স্রোতের বেগ ভাদ্রমাসের অবসরে—প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। আগুন কিসে জ্বলিল, সেকথা না বলিয়া সাজানো বাগান

পুড়িয়া গিয়াছে বলিলে, কাহার মনস্তুপ্তি হইতে পারে? কিন্তু সে বিলাস-স্রোত অন্য কিছু হইতে পারে, এ তর্কও উঠিতে পারে না। লেখকবন্ধুর প্রামাণিক অক্ষয়বাবুর গ্রন্থে—ঐ প্রবন্ধেই সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঐ ২৩ পৃঃ—"সিরাজের বুদ্ধিকৌশলের সঙ্গে অর্থবল মিলিত হইয়া নিত্য নূতন উৎসবের সৃষ্টি করিতে লাগিল। সে উৎসবে নৃত্যগীত, সুরা এবং সুরাসহচরীদিগের প্রাধান্য বাড়িতে লাগিল। অবশেষে গৃহস্থের সুন্দরী ললনা-অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়াও সিরাজের অনুচরদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি ধাবিত হইল! অর্থ-বলে, ছলকৌশলে, প্রলোভনে অনেক গৃহস্থকন্যার সর্ব্বস্বধন লুণ্ঠিত হইতে লাগিল! বাঙ্গালী যাহার জন্য সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠে, সে এই মহাপাপ;—এই মহাপাপের কথা দিন দিনই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল।"

অক্ষয়বাবু একথা আরও স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।—"রাণী ভবানী বিধবা হিন্দু রমণী,—গঙ্গাবাস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী বড়নগরের রাজ বাটীতে অবস্থান করিতেন। * * * তারা নাম্নী তাঁহার এক বিধবা কন্যাও তাঁহার সহিত বড়নগরের রাজবাটীতে থাকিয়া গঙ্গাবাস করিতেন। তারা বালবিধবা। অপরূপ রূপলাবণ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া সর্ব্বজন প্রশংসিতা। তিনি মাতার সাধুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া বাঙ্গালীর নিকট শুক্লাম্বরধারিণী ব্রহ্মচারিণী বলিয়া পূজনীয়া হইয়াছিলেন। বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যায় এই অনুপম রূপরাশি মলিন না হইয়া আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার নিকট তারার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। একদিন প্রাসাদশিখরে পাদচারণ করিতে করিতে আজানুলম্বিত কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া রাজকুমারী তারা স্বচ্ছন্দভাবে বায়ুসেবন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ক্রোড়বাহিনী ভাগীরথী জলে সিরাজদ্দৌলার বিলাসতরণী মন্থর-গতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কুক্ষণে সেই অতুলনীয় রূপের ফলিত জ্যোতি চকিতের ন্যায় সিরাজের পাপ-চক্ষে পতিত হইল! সিরাজ নবীন যুবক, চিত্ত দুর্দ্দমনীয় বেগে নিয়ত অসংযত, পারিষদবর্গের অপরাজিত উত্তেজনায় সর্ব্বদা মদদর্পিত, সুতরাং সিরাজ সেই রূপরাশি হস্তগত করিবার জন্য উন্মত্ত হৃদয়ে উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। * * * অবশেষে বিচক্ষণ পরামর্শদাতৃগণ একদিন মহাসমারোহে গঙ্গাতীরে এক

চিতাকুণ্ড প্রজ্বলিত করিলেন. ধূমপুঞ্জে ভাগীরথীতীর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রাষ্ট হইল যে, রাজকুমারী তারা সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন! ইহাতে তারাঠাকুরাণীর ধর্ম্মরক্ষা হইল বটে, কিন্তু সিরাজের পাপ-লিপ্সা ভষ্ম হইল কি না, কে বলিতে পারে? প্রকৃত ঘটনা কতদিন গোপনে থাকিবে? সিরাজদ্দৌলা যখন শুনিলেন যে, তারাঠাকুরাণী এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তখন সে রাজরোষ কে নিবারণ করিবে? সুতরাং সময় থাকিতে জমিদারদল গোপনে গোপনে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনের চিন্তা করিতে লাগিলেন।"—ঐ ৮১ পৃঃ।

লেখকবাবুর লিখিত পুস্তকে সিরাজদ্দৌলার চরিত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে. তাহার কিছু কিছু এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। এখনও কি বলিতে চান,—সিরাজদ্দৌলার শুভ্রজ্যোৎস্নাস্নাত জীবনে আমি কলঙ্ক-কালিমা লেপনের প্রয়াস পাইয়াছি! সিরাজদ্দৌলার চরিত্র শুভ্রজ্যোৎস্নাস্নাত ছিল না,—শুভ্র-জ্যোৎস্নাস্নাত চরিত্র মহাত্মা আলিবর্দ্দীর নিকটে লালিত পালিত হইয়াও সিরাজ পবিত্র জীবন লাভ করিতে পারেন নাই। অনেকগুলি হিন্দু-মুসলমান কুসঙ্গী তাঁহাকে পাপ-বিলাস-স্রোতে টানিয়া আনিয়া ধ্বংসের কোলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। যদি এই মহাপাতকে তাঁহার জীবন কলঙ্কিত না হইত, তিনি অত অল্প দিনে রাজ্য হারাইতেন না,—দেশও মুষ্টিমেয় ইংরেজসৈন্যের চরণতলে চিরবিক্রীত হইত না?

লেখকবন্ধু যে ইতিহাস খুলিবেন, সিরাজচরিত্রে এ মহাপাতকের জ্বলন্ত কাহিনী অধ্যয়ন করিবেন। Travel's of a Hindu. Halwell's India Tracts তারিখ—ই—মনসুরি প্রভৃতি বহু ইতিহাস গ্রন্থেই সিরাজচরিত্রের ইন্দ্রিয়দোষ পূর্ণমাত্রায় লিখিত হইয়াছে। অর্ম্মিসাহেবের গ্রন্থেও এ সকল কথা আছে। বিচার ও তর্ক স্থলে ঐ সকল ঐতিহাসিকগণকে ভ্রান্ত বলিলেও মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনকে ভ্রান্ত বলিবার উপায় নাই; কারণ তিনি সিরাজের সমসাময়িক এবং সদা সন্নিকটবর্ত্তী। তিনি তাঁহার মুতাক্ষরীণ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, মুসলমান লেখকবন্ধুর তাহা পড়িবার সুবিধা আছে। মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদ (Mutagh Trans vol 1.) সাধারণে পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাসে" মুতাক্ষরীণের এক স্থলের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"মহাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁর

শ্রীবৃদ্ধির দশায় তাঁর পরিবারবর্গ যেরূপ লাম্পট্য ও অনাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ভদ্র ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহাদের ঐ সমস্ত দুষ্কৃতি তাঁহার অকলঙ্ক কুলে চিরদিনের মত কালিমালেপন করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কন্যারা ও প্রিয়তম সিরাজদ্দৌলা যেরূপ ঘৃণার্হ দুষ্টাচার করিতেন, তাহা যে কোন লোকের পক্ষেই নিতান্ত অযশস্কর। তাঁহাদের মত উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরত কথাই নাই। তাঁহাদের আদরের গোপাল সিরাজদ্দৌলা নগরের রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া এরূপ ঘৃণিত ও অকথ্য আচরণ করিতেন যে, লোকে দেখিলে অবাক্ হইত। তাঁহার সহচর নবাব-পরিবারের একদল দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত সর্ব্বদাই তিনি জঘন্য ব্যবহারে কালক্ষেপ করিতেন। পদ-মর্য্যাদা, বয়স, বা স্ত্রীপুরুষ, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বিবিধ বিপদের মধ্যে কষ্ট করিয়া যে রাজপদ সম্মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এই কুকীর্ত্তিই তাহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিল। ক্রমাগত উপেক্ষিত হওয়ায়, এই অনাচারস্রোত বর্দ্ধিত হইয়া সেই অভ্রান্ত সর্ব্বদ্রষ্টার আক্রোশ আকর্ষণ করিল। নবাব দেখিয়াও না দেখায়, এই অনাচার সিরাজের চরিত্রে স্বাভাবিক হইয়া উঠিল,—উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া সিরাজ ক্রমশ-ই অত্যাচার-অনাচারের পথে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাতে তাঁহার আর কিছুমাত্র অনুশোচনা রহিল না। তাঁহার এই অসঙ্গত কামনাশক্তির নিকট ইচ্ছামত স্ত্রীপুরুষের বলিদান চলিতে লাগিল;—যৌবন-সুলভ-চাপল্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহার উপর অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আরব্ধ হইল। কুক্রিয়া-সক্ত মনের মত সহচরে বেষ্টিত হইয়া, সিরাজ যে সকল পাপাচার করিতেন, আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট ক্ষমা পাইবার ভরসায়, বা বয়স ও মনের স্বাভাবিক দোষে, সে সমস্ত যেন তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ ব্যবহারের মত দাঁড়াইয়া গেল। প্রকৃতই দেখা যাইত, সিরাজ কোন সময়ে অভ্যস্ত অনাচার করিবার অবসর না পাইলে, ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণমনে থাকিতেন। এই ব্যবহার ক্রমে তাঁহার স্বভাবের সহিত এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া গেল যে, এজন্য অনুতাপের লেশমাত্র হইত না,—কার্য্যের পরে সে কথা স্মরণই হইত না। পাপ-পুণ্যের ভেদজ্ঞান রহিত হওয়ায়, তিনি নিকট কুটুম্বও মানিতেন না। যেখানে যাইতেন, ব্যভিচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন। আত্মহারা লোকের মত সম্মানীও উচ্চবংশীয় লোকের ভবনেও সেই কুক্রিয়ার পণ্যশালা প্রস্তুত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অত্যল্পকালমধ্যেই সিরাজ লোকচক্ষে 'ফেরোয়ার' ন্যায় ঘৃণিত হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িলে লোক 'হরি রক্ষা কর।' বলিয়া উঠিত।"—বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৭৮ পৃঃ। মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদের ৬৪৪—৪৫ পৃঃ (Mutagh Trans vol I P. 644—45)

"রিয়াজ্-উস্সালাতীন্" নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসোক্তি লইয়া কালীপ্রসন্নবাবু "বাঙ্গলার ইতিহাসের" ২০২ পৃষ্ঠায় অনেক কথা লিখিয়াছেন,—তন্মধ্যে ইহাও লিখিত হইয়াছে—"দরবারের সদস্য ও সেনাপতিগণ সিরাজ-দ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে, লাম্পট্যজনিত অত্যাচার-অনাচারে, পরুষবাক্য ও হৃদয়ের কাঠিন্যে পূর্ব্বাবধিই অসন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে এই দুই জন নূতন ব্যক্তির অধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের পরিসীমা রহিল না। বিশেষতঃ মোহনলালের সগর্ব্ব ব্যবহার তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল;—তজ্জন্য প্রধান প্রধান নাগরিক ও সামন্তগণ এই অপদার্থ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন।"

এখন আমার কৈফিয়ৎ এই যে,—আমি সিরাজদ্দৌলার সেই মহাপাতকের কথা প্রচার করণোদ্দেশে এই উপন্যাসখানির রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই;—যেরূপে আলিবর্দ্দী খাঁর পুণ্যপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসন সিরাজের পাপ-বহ্নিতে বিদগ্ধ হইয়াছিল, যে কারণে প্রজার নিশ্বাস-বহ্নি দাউ দাউ শব্দে সে অক্ষয়—সে দৃঢ়—সে স্বদেশবৎসল—সে স্বর্গীয় করুণাময় রাজপ্রতাপ দগ্ধ করিয়াছিল, যে কারণে যে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি শক্তিশালী ব্যক্তিগণ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, যে রূপে ও যে কারণে স্বদেশের রাজশ্রী বিনারক্তপাতে ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল, যে কারণে মোহনলাল শেষপর্য্যন্ত মুসলমান নবাবের পক্ষ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—তাহা-রই পরিস্ফুট চিত্র দেখানই আমার উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের কোন পার্থক্য নাই। যে পাপের কথা অবসরে আলোচিত হইয়াছে, সিরাজের যদি সে পাপ না থাকিত,—তাহা হইলে মোহনলাল প্রভৃতি নগণ্যেরা প্রভূত শক্তিশালী এবং গণ্যমান্য মীরজাফর খাঁ প্রভৃতির উপরে আধিপত্য ও দুর্ব্ব্যবহার করিত না; তাহা হইলে, মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ অপমানের কশাঘাতে ব্যথিত ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্বদেশের পায়ে অধীনতার লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া দিতেন না; তাহা হইলে বিনাবাক্যব্যয়ে দেশের লোক ইংরেজচরণে শরণ লইত না।

সুধাকরের লেখক বন্ধুর দ্বিতীয় অভিযোগ,—ভাদ্র মাসের অবসরে লিখিত

"সিরাজদ্দৌলার স্বপ্নে"র আগাগোড়া প্রতিবাদ হওয়া উচিত, এবং তজ্জন্য মাননীয় শ্রদ্ধেয় মৌলভি সোলতান-সম্পাদককে অনেক ভৎর্সনাও করিয়াছেন, এবং স্বদেশ-সেবক হিন্দু-মুসলমান মিলনপ্রয়াসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—ইহার প্রতিবাদ না করিলে হিন্দু-মুসলমানে মিলন নিতান্ত অসম্ভব হইবে! কিন্তু কেন হইবে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, বোধ হয়, নিষ্কলঙ্ক গতায়ু মুসলমান নবাবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন জন্য মুসলমানগণ ব্যথিত হইয়া হিন্দুর উপরে রাগ করিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য! কিন্তু বাস্তবিক নবাব সিরাজদ্দৌলা নিষ্কলঙ্ক ছিলেন না। তাহা অক্ষয় বাবুর প্রমাণ্য গ্রন্থ এবং বহু ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি,—প্রয়োজন হইলে আরও দেখাইতে পারিব। আমি বুঝি, যাহা পাপ, তাহা হিন্দু-মুসলমান সকলের পক্ষেই পাপ! ব্যক্তিগত সে পাপে সমগ্র জাতি বা সমগ্র সমাজ দায়ী নহে,—বরং পাপীর পাপ-চিত্র দেখিয়া,—পুণ্যবানের পুণ্য আলোক দেখিয়া সমাজ সাবধান হইতে পারেন। বিশেষতঃ রাজনৈতিক জগতের হিতার্থে রাজাদিগের চরিত্র যথাযথ আলোচিত হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। নবাব সিরাজদ্দৌলার যে সকল গুণ বা পুণ্যানুষ্ঠান ছিল, তাহাও ইহাতে বাদ পড়িবে না। রঙ্গমঞ্চে সিরাজচরিত্র স্বদেশবৎসলতা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণের আকর বলিয়া অভিনীত হইতেছে। তা' হউক, কিন্তু তাদৃশ সদ্‌গুণের পরিচয় তাঁহার পূর্ব্বজীবনে কোথাও মিলে নাই। পরে মাতামহের উপদেশে যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, তখন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে মহাপাতক করিয়াছি, জীবন দিয়াই বুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। স্বপ্নের স্মৃতির মত সে সকল কথা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল,—তাই রাজত্বের কয়েক মাস তিনি চারিদিকে অবিশ্বাসের করাল ছায়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি মোহনলাল প্রভৃতির সঙ্গ ছাড়িয়া যদি পুরাতন অমাত্যগণের অনুগত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ভাগ্য-চক্র অন্য দিকে ঘুরিতে পারিত। তবে যে অবশেষে মীরজাফরের পদে মস্তকমণি অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার দুর্ব্বলহৃদয়েরই পরিচয়। যাহা হউক, সিরাজচরিত্র দোষে গুণে বিজড়িত—ইহাতে দোষগুণের কথাই উল্লেখ হইবে। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, যাহা ইতিহাস তাহা ঢাকা দিয়া কেবল গুণ বা দোষের কথা উল্লেখ করা পাপের কার্য্য সন্দেহ নাই। অধিকন্তু ঐ উপন্যাসে দেখাইব, কোন্ মহাপাতকের অনল-দহনে সিরাজ-রাজত্ব ধ্বংস হইয়াছে; কেন শক্তিশালী হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া

সিরাজের অধঃপতন কামনা করিয়াছেন; কেন হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে, এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কেন মোহনলাল সিরাজের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা কোন্ ভুলে আপন সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছিলেন,—তারপরে শত চেষ্টাতেও সে ভুল সংশোধন করিতে পারেন নাই। বুঝি শেষ জীবনে দেবতা হইয়াও প্রথম জীবনের দানবীয় পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। আশা করি, লেখক বন্ধু উপন্যাসখানির শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অভিমতি প্রকাশ করিবেন, এবং তাঁহাকে বলাই বাহুল্য সাহিত্যিক নিয়মও তাহাই।

বন্ধুর তৃতীয় অভিযোগ—"যে বিষয় লইয়া "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" লিখিত হইতেছে, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু নিহিত আছে।" এ স্থলে আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতে চাহি যে, যে বিষয় লইয়া "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" লিখিত হইতেছে, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, ঐ উপন্যাসে এখনও তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। আমার উদ্দেশ্য, আমি ঐ উপন্যাসে দেখাইব—রাজার উপরে রাজা আছেন, নবাবের উপরে নবাব আছেন, বাদসাহের উপরে বাদসাহ আছেন,—যিনি আছেন, তিনি শ্রীশ্রীভগবান্। জীব কাঁদিলে তিনি বিচার করেন। রাজশক্তি পুণ্যশক্তি—পাপশক্তি নহে, পাপ আসিলে রাজ্য যায়। আলিবর্দ্দী খাঁর পুণ্যরাজ্য, সিরাজের পাপে বিধ্বংস হইয়াছিল.—হায়, কে জানিত হিন্দু-মুসলমান প্রজার ক্রন্দনে মুর্শিদাবাদের মহাশক্তি বণিক্ ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন! তবে যদি উপন্যাস-বর্ণিত উমাসুন্দরীর অপহরণের কথা লইয়া কথা তুলিয়া থাকেন,—তাহার উত্তরে এ কথা বলিলে কি দোষ হইবে জানি না যে,—বন্ধুর প্রামাণিক অক্ষয় বাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থ বর্ণিত—"রাজ্যপরিদর্শন উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নানাস্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং ফৌজদারগণ তাঁহার মনস্তুষ্টি ও শুভদৃষ্টি লাভের প্রত্যাশায় গায়ে পড়িয়া অনেক সুন্দরী ললনার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন,"—সেই সুন্দরী ললনার একটি উমাসুন্দরী না হইতে পারিবে কেন? "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" উপন্যাস; ইতিহাস নহে। উপন্যাস ও ইতিহাসে প্রভেদ এই যে, ইতিহাস বলিয়া দেয়, অমুক লোক অমুক পুণ্যকার্য্য বা পাপ কার্য্য করিত,—আর উপন্যাস ইতিহাস-কথিত সেই কার্য্য লইয়া চরিত্রসৃষ্টি করে। ইতিহাসে যাহা সূক্ষ্ম ছিল, উপন্যাসে তাহা স্থূল হয়।—সেই সৃষ্টি-চরিত্র, সেই ঐতিহাসিক সত্য, স্ফুটতররূপে মানবসমাজে দেখাইয়া দেয়।

ইতিহাস যাহা অনির্দ্দিষ্ট সংক্ষেপভাবে বলিয়া দেয়, উপন্যাস তাহা নির্দ্দিষ্ট চরিত্র লইয়া বিস্তারিত রূপে দেখাইয়া দেয়। ইতিহাস পাঠে যে ফল, ইহা পাঠে তাহা হইতে ফল উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কেন না, ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিষয় উপন্যাস দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা পায়, সুতরাং তাহা সহজে গিয়া পাঠকের মানসিক বৃত্তির উপরে ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত করে। ইহাতেই উপন্যাসের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়।

অতএব লেখকবন্ধু "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" অঙ্কুরেই যে বিনাশের কামনা করিয়াছেন, তাহা করিবার কোন কারণ নাই। কারণ থাকিলে, আমি নিজেই তাহা বন্ধ করিয়া দিতাম। সেজন্য বিশেষ কোন প্রতিবাদের প্রয়োজন হইত না। শঙ্করপুরের ব্রাহ্মণ-পত্নী হরণের প্রবাদ-গাথা এখনও দেবগ্রামের দিকে শুনিতে পাওয়া যায়;—এখনও দুই একজন প্রাচীন "চাষালোকে" সে গাথা বলিতে পারে। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও সত্য বজায় রাখিয়া উপন্যাসে এরূপ চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারা যায়। তাহা জ্ঞানী ও সাহিত্যবন্ধুকে বলাই বাহুল্য।

আরও একটি কথা বলিব। সে কথাটা এই যে, সাহিত্যের হিসাবে উপন্যাসও কাব্য। কাব্যে অলঙ্কার সৃষ্টি, ভাবের সৃষ্টি, মানসিক কল্পনার সৃষ্টি—এ সকলে লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু তাই বলিয়া রামকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ একটি প্রণয়-গাথা গাহিয়া কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদন করিলেন বলিয়া, কাব্য মধ্যে একটি প্রণয়-গাথা রাখিয়া দেওয়া যায় না। রামকে বনে পাঠাইয়া দশরথ শোক করিয়াছিলেন, এবং সেই শোকে তাঁহার জীবন বিনষ্ট হইয়াছিল,—ইতিহাস এই কথা বলিয়া দিলে, লেখক সেই স্থলে একটি শোকগাথা রচনা করিয়া দিতে পারেন, অথবা তাঁহার আত্ম-কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা বা অনুতাপময় গাথার সৃষ্টি করিতে পারেন। সে স্বাধীনতা আছে বলিয়াই, এবং তাহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র ভাল ফুটে বলিয়াই লেখকগণ তাহা করিয়া থাকেন,—এ উপন্যাসে আমাকেও তাহা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে সিরাজ বা কাহারও চরিত্র কলুষিত বা ভিন্নাকার ধারণ করিবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও জ্বরাসুর।

হিন্দু শাস্ত্র-ভাণ্ডার বিজ্ঞানেতিহাসময়। বৈজ্ঞানিক ইহার বর্ণে বর্ণে নব নব বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রকটিত দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন; ঐতিহাসিক ইহাতে ভূত ভাবিষ্য বর্ত্তমান কালত্রয়ের ঘটনাবলির অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শনে আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকেন; আর যিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তিনি এই অপূর্ব্ব শাস্ত্রভাণ্ডার দর্শনে কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গই নির্ণয় করিবেন।

জগতে যুগে যুগে অবতার রূপে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়া সংসারভার লাঘব করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিত সবিশেষ বর্ণিত আছে। তাহারই একটী উপন্যাসের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। হরিবংশ গ্রন্থে বিষ্ণু পর্ব্বে ১৮০ ও ১৮১ অধ্যায়ে "বিষ্ণু জ্বর-যুদ্ধ" ও "জ্বর-পরাক্রম" বর্ণিত আছে। এই উপাখ্যানের ভিতরে অপূর্ব্ব কবিত্বের কমনীয় আবরণে অতি গুরুতর একটি বৈজ্ঞানিক সত্য কেমন সুন্দর রূপে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বাণ রাজা আপন কন্যা উষার জন্য অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উদ্ধার সাধনার্থ বহু সৈন্যসহ বাণ রাজার রাজধানী শোণিত পুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। হলায়ুধও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বাণরাজের রাজধানী সমীপে আগমন করিলেই কালান্তক যমের ন্যায় ভীষণমূর্ত্তি জ্বর, কৃষ্ণ-সেনাগণের ধ্বংসের জন্য তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইল। সর্ব্ব প্রথমে বলরাম আক্রান্ত হইলেন। প্রবল জ্বরের প্রকোপে তাঁহাকে "ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইল," তাঁহার "গাত্রের লোম সকল কণ্টকিত হইয়া উঠিল," "নেত্রদ্বয় আকুঞ্চিত ও বারংবার ঘুরিতে লাগিল।" দাম্ভিক ও নির্ভীক বলরাম আপনার এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একান্ত ত্রাসান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই ভীষণ ব্যাধি উপশমের জন্য আপনার নিকট ডাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শুশ্রূষায় তিনি ক্রমে নিরাময় হইলেন। কিন্তু ভ্রাতাকে শুশ্রূষা করিতে যাইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দেহেও জ্বর সংক্রামিত হইল। প্রধান সেনানায়কও যখন এই ভীষণ জ্বরের হস্তে রক্ষা পাইলেন না, তখন সামান্য সৈন্যগণের কিরূপ দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আসামের গৌহাটী ও তন্নিকটস্থ স্থানই প্রাক্‌জ্যোতিষপুর বাণ রাজার দেশ বলিয়া স্থির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্বরের যেরূপ লক্ষণ উক্ত অধ্যায়-দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে তদ্দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পারা যায়। উক্ত জ্বরলক্ষণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই আসাম প্রদেশ স্বনামপ্রসিদ্ধ কালাজ্বর নামক ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও পূর্ণাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাণদেশীয় অতি ভয়ঙ্কর শৈব জ্বরের (আসামের কালাজ্বরের) হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। মায়াবী অসুর তাঁহার শরীরে গোপনে প্রবেশ করিল। তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে তাঁহার বার বার পদস্খলন, কখন জৃম্ভাবিকাশ, কখন দীর্ঘ শ্বাসপতন, কখন রোমোদ্গম, কখন বা নিদ্রাগম হইতে লাগিল।" তিনি এইরূপ উৎপীড়িত হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্যের ও আলোচনার বিষয়। তিনি বুঝিলেন যে, এই বিষম জ্বর হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভের কোন সহজ উপায় নাই। তখন তিনি একরূপ নিরুপায় হইয়াই শৈবজ্বরের বিনাশ সাধনের জন্য আপনার শরীরে দ্বিতীয় জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। *

শ্রীকৃষ্ণের আপনার সৃষ্ট জ্বর অনায়াসে শৈব-জ্বর অর্থাৎ বাণদেশীয় জ্বরকে তাঁহার শরীর হইতে বিতাড়িত করিল। এদিকে সহসা আকাশ হইতে দৈববাণী হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ ঐ পলায়মান শৈব-জ্বরকে সমূলে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়াও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। "এই জ্বরকে বিনাশ না করিয়া তোমার রক্ষা করাই কর্ত্তব্য" এই অশরীর-বাণীর অনুরোধে তাহাকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার সময় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, "যদি তুমি আমার প্রিয় হইবার বাসনা রাখ তবে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ চতুষ্পদ পশুগণ মধ্যে, দ্বিতীয় ভাগ স্থাবর মধ্যে ও অপর অংশ (৩য় অংশে) মাত্র মনুষ্যগণ মধ্যে বিচরণ কর। তন্মধ্যে তোমার তৃতীয় ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষী মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রহিল। অপরাংশ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক নামে বিচরণ করিবে" ইত্যাদি।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধের ৬৩ অধ্যায়ে বৈষ্ণব জ্বর ও শৈব-জ্বরের ভীষণ যুদ্ধ অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যদি ঐরূপ আকাশবাণী না হইত ও যদি শ্রীকৃষ্ণ জগতের রোগ ও শোকে ব্যথিত হইয়া ঐ আকাশবাণী উপেক্ষা করিতেন, তবে আজ হয়ত জগতের কেহ আর জ্বর রোগে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিত না; জ্বর-জ্বালা চির দিনের জন্য সংসার হইতে অপসৃত হইত। কিন্তু মানুষ আপনার কর্ম্ম-ফলের জন্য অখণ্ডনীয় ভাগ্যের অধীন। তিনি পূর্ণাবতার হইয়াও মানব-ভাগ্যের বিপর্য্যয় করিতে পারিলেন না। তাই আঁজিও আমরা আপনাদের কর্ম্মফলে বাধ্য হইয়াই জ্বর-জ্বালা ভোগ করিয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছি।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কবি এই উপাখ্যান দ্বারা অতি সুন্দর রূপে আপনার ভূয়োদর্শন ও বিষয়াভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, জগতের মঙ্গলের জন্যই জ্বরাসুরকে সমূলে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে তাহার নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করাই প্রয়োজনীয়। এই জ্বর-পরাক্রম নামক অদ্ভুত উপাখ্যান হইতে ইহাই বুঝিলাম যে, জ্বরের ঔষধ জ্বর। অর্থাৎ যাহাতে জ্বর স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাই জ্বর-উপশমের একমাত্র নিদান। এই মহামূল্য তত্ত্বটি হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক মহাত্মা হানিমানের আবিষ্কার বলিয়া যাঁহারা পাশ্চাত্য-জগতের উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন, আজ তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুন, হানিমানের আবির্ভাবের বহুশতাব্দি পূর্ব্বে এই ভারতে ভারতবাসী তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে যদি কেহ ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তবে অবশ্যই আমি তাহা দিতে পারিব না। * তবে এই মাত্র বলিতে পারি এই দেশে বৈদিক কাল হইতেই হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মূল "সম সমের প্রশমন" তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হিন্দু-শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিবেন। ঐ মূল তত্ত্বটি জ্বর রোগে কিরূপে প্রযোজ্য হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব-জ্বর ও শৈব-জ্বরের যুদ্ধে কবি-জনোচিত ভাবে হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই উভয় গ্রন্থের ঐ বর্ণিত বিষয়, মহাত্মা হানিমানের জন্মের বহু পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

---

* হরিবংশ ও শ্রীমদ্ ভাগবতের উল্লিখিত এই বিষয়টিকে যদি কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তিনি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ঔপন্যাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব" গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার ভ্রম ঘুচিতে পারে।

এইরূপ অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের ঋষিপ্রণীত প্রাচীন গল্প ও উপন্যাসের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে। শব্দ ও কবিত্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া কোটী-কোহিনুর অপেক্ষা মূল্যবান্ ও অত্যুজ্জ্বল নানাবিধ রত্ন-রাশি উদ্ধার করা যদিও সহজসাধ্য নহে, তবু চেষ্টা করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার তড়িতালোকে এখন আমরা নানাকারণে অনেক পাশ্চাত্য বিষয়ের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ও বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার মানসে কখন বা ভীষণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার স্তূপ, কখন বা অতল সমুদ্রের গভীরতম তল-প্রদেশের কর্দ্দম রাশি, কখন বা গগনস্পর্শী চিরতুহিনমণ্ডিত পর্ব্বতশিখরস্থ অন্ধকারাবৃত গুহা সকল, কখন বা কঠিন মৃত্তিকার স্তরসমূহ বিদীর্ণ করিয়া তাহার অভ্যন্তর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। নানা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য কোবিদগণও পৃথিবীর ভিন্নভিন্নদেশীয় মানবগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে অনেক আলোক প্রাপ্ত হইতেছেন এবং স্বীয় গভীর গবেষণার বলে আদিম মানব জাতির অনেক অলিখিত অদ্ভুত ঐতি-হাসিক তত্ত্বের প্রচার করিয়া সভ্য জগৎকে প্রতিনিয়ত স্তম্ভিত করিতেছেন। আমরা কি তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদের শাস্ত্রসমুদ্রের গর্ভস্থ রত্নরাশি উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের ক্ষুদ্র সময়, অর্থ ও চিন্তা ব্যয় করিতে পারি না? আমরা যদি এইক্ষণ আমাদের পৈত্রিক ভগ্ন ইষ্টকালয়ের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশির অভ্যন্তরস্থিত বহুমূল্য তৈজস-পত্রাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে যত্ন ও চেষ্টা না করি, তবে এই জাতীয় কার্য্যে আর কে হস্তক্ষেপ করিবে? কোন বিদেশী অবশ্যই আমাদিগকে এ বিষয়ে নিষ্কাম ভাবে সাহায্য করিবে না। বঙ্গবাসী প্রমুখ বঙ্গীয় সম্পদকগণের যত্নে এখন প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ সকলের নির্ভুল ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহজলভ্য হইয়াছে। ভরসা করি, বঙ্গের অনেক স্বদেশভক্ত স্বজাতিপ্রেমিক কৃতী সন্তান অন্ততঃ এই রত্নোদ্ধার-বাসনাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে আগ্রহান্বিত হইবেন।

শ্রীকুমুদকান্ত বসু।
মুনসেফ, সিলেট।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মন্দার—গীতি কাব্য, শ্রীমতী পুষ্পময়ী দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা। অবসরের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর নিকট ২২নং ছুতার পাড়া লেন, চাঁপাতলা এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

মহিলা কবির কাব্য উপহার পাইয়া সাদরে ও সযত্নে পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কবির এই প্রথম উদ্যম, এই প্রথম উদ্যমেই কবি—যেরূপ কৃতকার্য্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আজ কালিকার অনেক পুরুষ কবি পারেন না। ইহাতে এমন কতকগুলি সুন্দর ভাবময়ী কবিতা আছে, যাহা সুকবির যোগ্য। ইহার স্থানে স্থানে এমন কতকগুলি সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কবির কল্পনা চিত্তহারিণী, রচনাও আনন্দদায়িনী। কাব্যখানি ভাব-সম্পদে শব্দ-সম্পদে মহিমান্বিত। এমন স্নেহ-করুণা-মায়া-বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব অথচ সুন্দর সংমিশ্রণ কোথাও দেখি নাই। দেবতারা দেবী পুষ্পময়ীর অমৃতময়ী লেখনীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করুন। প্রার্থনা করি, কবির প্রতিভা দিন দিন সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া সাহিত্য-সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হউক।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে দু একটি সামান্য ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইল; ইহা কবির কি মুদ্রাকরের, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এত গুণরাশির মধ্যে এ সামান্য ভ্রম-প্রমাদ অবশ্য ঢাকা পড়িয়া যায়। তা বলিয়া সামান্য ভ্রম প্রমাদও উপেক্ষার বস্তু নহে। আশা করি, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ভ্রম-প্রমাদ পরিশূন্য ও সুমার্জ্জিত অবস্থায় দেখিব। মুদ্রাঙ্কণ বাঁধন অতি সুন্দর ও পরিপাটি।

মাসিক সংবাদ।

কংগ্রেস। এবার নাগপুরে কংগ্রেস বসিবার কথা ছিল, তাহা হইল না। বাগ্‌যুদ্ধে গরমদলের পরাজয় হইয়াছে; নরমদলের মতানুসারে শ্রীযুক্ত রাস-বিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুদূর 'সুরাট' প্রদেশেই কংগ্রেস বসিবে স্থির হইয়াছে।

মুক্তি। ভারত-জননীর সুসন্তান মহামতি শ্রীযুক্ত লাজপত রায় ও শ্রীযুক্ত অজিতসিং—ইঁহারা দুইজনে বিনা বিচারে ইংরেজরাজ কর্ত্তৃক মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন।
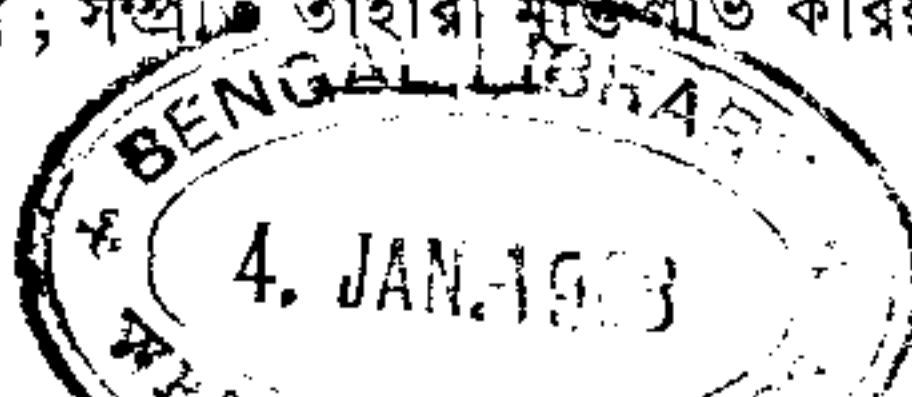
বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভারতের ভাগ্যবিধাতা ষ্টেট সেক্রেটারি জন্ মরলি বাহাদুর বলিয়াছেন,—পরীক্ষা স্বরূপ ভারতের কয়েকটা বাছা বাছা জেলায় শাসনাধিকার ও বিচারাধিকারের পার্থক্য বিধান করা হইবে। বিচার ও শাসন অধিকার এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকায় প্রজাবর্গ প্রায়শঃ সুবিচারে বঞ্চিত হয়। ভারতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ফলে, এখন যেমন ম্যাজিষ্ট্রেরেরা নিজেই আসামী পাকড়াইয়া নিজেই বিচার করিয়া জেলে পাঠান,—কোন কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেরেরা অতঃপর আর তাহা পারিবেন না। ইহার জন্য ভারতবাসী বহু কাল ধরিয়া কাঁদাকাটি করিতেছে; এখন তাহার ফুল দেখা গিয়াছে, কিরূপ ফল হইবে কেমন করিয়া বলিব? আশার কথা বটে। তবে ভারতের ভাগ্য কিরূপ কে জানে?—সমুদ্র মথনে লভে হরি লক্ষ্মীহর বিষ। ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে ন বিদ্যা ন চ পৌরুষ।

জাতীয়তা রক্ষা করা সকল দেশের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সিংহল দ্বীপের ওলন্দাজেরাও এই জাতীয়তা রক্ষায় সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। সম্প্রতি সিংহল দ্বীপে ইহাদের এক সমিতি বসিয়াছে। উদ্দেশ্য প্রধানতঃ এই কয়টী,—(১) ওলন্দাজ যুবকগণ যাহাতে পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলে তাহার চেষ্টা। (২) ওলন্দাজ যুবকগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকারেই স্বাবলম্বন করিতে শিখে তাহার চেষ্টা। (৩) ওলন্দাজদিগের পরস্পর যাহাতে সহানুভূতি সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা। (৪) ওলন্দাজ সাহিত্যের যাহাতে সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়,—যাহাতে ওলন্দাজদিগের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের বহুলরূপে পঠন পাঠন হয় তাহার চেষ্টা, করা। কেবল সভায় বা কথায় নহে, উহারা কাজেও করিতেছে। ইহাই ত জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টরী পরীক্ষা পাশ করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। সমাজ-সংস্কার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তান্তে তাঁহাকে সমাজে পুনঃগ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মোগল সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে কামান ব্যবহার করেন এবং তাহার পূর্ব্বে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ভারতে কেহ কখনও করে নাই। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বালকবৃন্দকে একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য তারিখ বলিয়া ১৫২৬ সালটি স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়। (১) প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতনিচয় কিন্তু বলিয়া থাকেন, উক্ত সময়ের বহু পূর্ব্বেই ভারতে বারুদের সাহায্যে সমর-কালে নরহত্যা করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল। Sir Henry Elliot তাঁহার বহুমূল্য ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে গবেষণাদ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, অতি পুরাকালেই ভারতের আর্য্যগণ বারুদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং মহাভারত রামায়ণ বর্ণিত সময়ে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল পরিমাণে ব্যবহার ছিল। অবশ্য প্রাচীন হিন্দুজাতি এই লোকক্ষয়কারী পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে জানিত একথা সত্য হইলে যে, তাহাদের গরিমা অধিক হইবে তাহা নহে, তবে ঐতিহাসিক সত্য সাধারণকে বিদিত করিবার জন্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

১৪৯৮ খৃঃঅব্দে পর্ত্তুগীজগণ আসিবার পূর্ব্বে ভারতে বন্দুকের সাধারণ ব্যবহার ছিল, তাহা কারিয়া ইজুসার লেখনী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। (২)

তৎকালীন পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারীদিগের সাক্ষ্য দ্বারাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাফি (Maffie) বলেন, ভারতবাসীরা পর্ত্তুগীজদিগের অপেক্ষা বন্দুক ব্যবহারে সুদক্ষ। গুজরাটের রাজা এবং চিতোর আক্রমণের সময় বদর কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইঁহারা তাহার উল্লেখ করেন। ইহা ব্যতীত অনেক মহম্মদীয় ইতিহাসলেখক তুফং তোপ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কানিংহাম সাহেবের মতে সম্রাট্ সিকন্দর কর্ত্তৃক কাশ্মীরের মন্দির সকলের ধ্বংস কার্য্য বারুদ সাহায্যে হইয়াছিল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ।

---

(১) বাবর বলেন, বাঙ্গালীরা ভাল গোলন্দাজ ছিল এবং তাহারা ঐবিদ্যা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে মহম্মদীয় বীরদিগের অভিযানের মধ্যে মাহামুদের যুদ্ধযাত্রাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার সহিত মুধ্ পর্ব্বতের জাত রাজপুতদিগের নৌযুদ্ধ কালে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সুতরাং Sir Henry Elliot প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্দিগের সিদ্ধান্ত—মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া অবধিই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বাবধিই যে এদেশে বারুদ প্রস্তুতও ব্যবহৃত হইত তাহার ও প্রমাণ তাঁহারা সংগ্রহ করিতে বিমুখ হন নাই। আমরা অতি সংক্ষেপে সে সকল যুক্তির উল্লেখ করিব।

বারুদের ইতিহাস বর্ণনা কালে Major Wardell লিখিয়াছেন (৩) হালহেড্ (Halhed) অনুবাদিত হিন্দুদিগের আইন পুস্তকে (৪) বারুদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন উল্লেখ পাওয়া যায়। তথায় নিম্নলিখিত নিষেধ বাক্য দৃষ্ট হয়—"শাসনকর্ত্তা (Magistrate) প্রতারণাময় যন্ত্রের সাহায্যে বিষাক্ত শস্ত্র লইয়া কিম্বা কামান, বন্দুক বা অন্য কোনও প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবে না।" হালহেড সাহেব ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন,—"চীনদেশে এবং হিন্দুস্থানে বহু পূর্ব্ব হইতেই বারুদের ব্যবহার বিদিত ছিল।" ইংরাজী কথা "Fire arms" সংস্কৃত শব্দ "অগ্নি অস্ত্রে"র ঠিক অনুবাদ। বাণের মুখে অগ্নি সংযোগ করিয়া বংশনির্ম্মিত ক্ষেপণী হইতে তাহা আর্য্যেরা শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিত; ইহা তাহাদের একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র। তাহার পর তিনি হিন্দুপুরাণবর্ণিত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত "শতাগ্নি" নামক অস্ত্রের গুণ বিবৃত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পুরাকালে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল।

বাস্তবিক হালহেড্ সাহেবের উপরোক্ত অনুবাদ হইতেই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। Elphinstone তাঁহার ভারতের ইতিহাসের পূর্ব্বাধ্যায়ে মনুর অনুবাদের একস্থলে "অগ্নিবাণের" ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। (৫)

এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহকল্পে পাশ্চাত্য পণ্ডিতনিচয় দেখিলেন, তাঁহাদের

(৩) Encyclopaedia Britanica.

(৪) মনু প্রভৃতির অনুবাদক Halhed সাহেব Code of Gentoo law নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৫) Menu, Elphinstone vol I, p 3 দ্রষ্টব্য।

ধারণার প্রধান সাক্ষ্য পাওয়া যায় গ্রীকদিগের লেখনী হইতে। Sir Henry Maine বলেন, পুরাতন জাতীয় জীবনের বর্ণনা পাইতে গেলে আমাদের তিন প্রকার সাক্ষ্যের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমতঃ সেই জাতি অপেক্ষা কম সভ্য সমসাময়িক জাতি কর্তৃক সেই জাতির বর্ণনা; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের স্বজাতিবর্ণিত ইতিহাস এবং তৃতীয়তঃ প্রাচীন ব্যবহারবিধি। (৬) প্রাচীন ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রমাণেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীক বীর আলেক্জাণ্ডারের সহিত যে সকল গ্রীক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতে এ বিষয়ে বহুল পরিমাণে জ্ঞান পাওয়া যায়। থেমিসটিয়স্ (Themistius) বলেন, ব্রাহ্মণগণ (৭) দূর হইতে বিদ্যুৎ ও বজ্রের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন! অবশ্য বিদ্যুৎ ও বজ্র আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ ও আলোকমালা সে বিষয় নিঃসন্দেহ! সম্রাট আলেক্জাণ্ডার কর্তৃক অরিষ্টলকে লিখিত কল্পিত লিপি মধ্যে, উষ্ণ ভারতভূমিতে যে সকল ভয়ঙ্কর প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি তাঁহার সৈন্যদিগের উপর বর্ষিত হইয়াছিল,তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়টি মহাকবি দান্তে (Dante) তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রভাবে সুন্দর কবিতায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

টিসিয়স্ (Ctesias) ইলিয়ন (Aelian) ফাইলস্ট্রেটস্ (Philastrates), প্রভৃতি গ্রীকগণ এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন। এ অস্ত্র বারুদের সাহায্যে ব্যবহৃত হইত না এবং Wilson প্রভৃতির মতে কুম্ভীরের তৈল হইতে কোনও রাসায়নিক সংযোগের দ্বারা উপরোক্ত লেখকগণবর্ণিত অগ্নির উৎপত্তি হইত। টিসিয়স্ বলেন, সিন্ধুতীরে এক প্রকার তৈল নির্ম্মিত হয়। ইহা মৃৎপাত্র মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠময় প্রাচীরাদির উপর নিক্ষেপ করিলে এক প্রকার ভীষণ অনলের সৃষ্টি হয়। ভারতবাসীরা কেবল রাজাজ্ঞায় রাজার জন্যই প্রস্তুত করে। ইলিয়ন বলেন, এই তৈল-পূরিত অস্ত্রের এরূপ ক্ষমতা যে, ইহা পশুপক্ষী মানব প্রভৃতি সকলই ধ্বংস করিতে পারে। ভারতবর্ষের নরপতিবৃন্দ ইহা দ্বারা নগর জয় করেন।

গ্রীক লেখকত্রয় বর্ণিত পদার্থ যাহাই হউক, তাহাদিগের বর্ণনায় অত্যুক্তির মাত্রা অত্যধিক হইলেও তাহারা যে কোনও প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া বিস্মিত

(৬) Ancient law ch v, p, 120.

(৭) বিদেশীয়েরা সমগ্র হিন্দুজাতিকেই সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

হইয়াছিল, হিন্দুদিগের সমরকুশলতায় তাহাদের নিজ দেশে অজ্ঞাতশক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা ব্যতীত অতি প্রাচীন পারস্য ও আরব্য গ্রন্থবর্ণিত এতদ্‌বিষয়ক বর্ণনার সহিত গ্রীকবর্ণনার সামঞ্জস্য দেখিয়া Elliot প্রভৃতি তাঁহাদের ধারণা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফাইলস্ট্রেটস্ (Philastrates) বলেন, সিকন্দর যদ্যপি হাইফাসিস (Hyphasis) উত্তীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে কোনও মতে এই সকল মনীষিগণের প্রাচীরবেষ্টিত বাসস্থান জয় করিতে পারিতেন না। কোনও শত্রু আসিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহারা ঝড় এবং বজ্রের দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করে, বোধ হয় যেন আকাশ হইতেই ঝড় ও বজ্র প্রেরিত হইয়াছে।

রাইজাতুস্‌সফা (Rauzatu-s-Safa) নামক গ্রন্থের মতে সিকন্দরের সহিত পুরুরাজের যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য লেখকগণও সিকন্দরের নামের সহিত অনেক বহ্নিময় অস্ত্রের গল্পের সহিত সংযোগ করে।

মাতোয়াম্‌লিন্ (Ma-Twam-Lin) (৮) নামক চৈনিক গ্রন্থে ভারতের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় "কাষ্ঠবৃষ" ও "ঘূর্ণায়মান ঘোটক" ভারতবাসীরা সমর কালে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ঘূর্ণায়মান ঘোটকের কথা গ্রীক ও আরব্য লেখকগণও উল্লেখ করিয়াছেন। মজ্‌মলুৎতারিখি (Majmalu-T-Twarikhi) নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা হাল্‌কা একটী মৃতহস্তী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সৈন্যসমূহের পশ্চাতে রাখিতে পরামর্শ দিয়া এবং যখন কাশ্মীর রাজসেনা নিকটবর্ত্তী হইল। তখন সেই হস্তী বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার শরীরাভ্যন্তর হইতে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সেই সৈন্যের এক অংশ ধ্বংস করিয়া দিল। (৯) ফরদুসী (Firdusi) সিকন্দরের যুদ্ধ বর্ণনা কল্লেও এইরূপ একটি লৌহ অশ্বের বিদীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুতরাং এই সকল বিদেশীয়বর্ণনা হইতে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের ধারণা—প্রাচীন হিন্দুগণ ইচ্ছানুরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে জানিত। এ বিষয়ে

(৮) Translated in Asiatic Society's journal (1836) vol XX.

(৯) উপরোক্ত গ্রন্থখানি ১১২৬ খৃঃ অব্দে আরব্য ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল এবং তাহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে উহা একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আরব্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ব্যবহার, বিবিধ প্রমাণের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এ বিষয়ে জাতীয় ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির প্রমাণ সকলের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ রামায়ণ। কোন কোন পণ্ডিত পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন, মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, কারণ মহাভারত বর্ণিত অনেক রীতি সুসভ্য সমাজে দূষণীয়। এক স্ত্রীর পঞ্চ স্বামী প্রভৃতি কাহিনী বর্ব্বর সমাজেরই পরিচায়ক। এক্ষণে কিন্তু উভয় গ্রন্থের ভাষা, আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রভৃতি বিচার করিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহাভারত রামায়ণাপেক্ষা আধুনিক।

এই রামায়ণেই কেরী মার্শমেন সাহেব বহ্নিময় অস্ত্রের উল্লেখ পাইয়াছেন। বিশ্বামিত্র মুনি শ্রীরামচন্দ্রের উপর প্রীত হইয়া রাক্ষস-নিধনকল্পে অশেষ প্রকার বাণ উপহার দিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে একটী আগ্নেয় অপরটী শিখর। উপরোক্ত অস্ত্রদ্বয়ের বর্ণনা হইতে উক্ত পণ্ডিতদ্বয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন রামায়ণের সময়াবধিই ভারতবর্ষে বারুদের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। (১০)

মহাভারতেও এ বিষয়ে অশেষ প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়। একস্থলে বর্ণিত আছে—"বজ্র সদৃশ শব্দকারী একটি উড্ডীয়মান গোলক।" এই বর্ণনাটি লইয়া প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহা বাদানুবাদ হইয়াছিল। Bopp বলেন, ইহা উল্কার বর্ণনা। অপর পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা কামানের প্রমাণ। মহাভারতের মতে ভরদ্বাজ মুনি অগ্নিতনয় অগ্নিবেশকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং অগ্নিবেশ তাহা ভরদ্বাজতনয় দ্রোণকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই অংশের টীকায় Wilson সাহেব বলেন—"আধুনিক সময়ে এবং বহু প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ হিন্দুগণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিত।"

হরিবংশে একস্থলে আছে ঃ—"সগর রাজা ভার্গবের নিকট হইতে অগ্নি অস্ত্র পাইয়া তালজঙ্ঘ ও হৈহয়দিগকে নিধন করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।

---

(১০) Sir Henry Elliot কিন্তু এ প্রমাণের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন না। তিনি বলেন, ঐ প্রসঙ্গে একটী "বায়ব" বানের উল্লেখ আছে। বায়ব অস্ত্র এতাবৎকাল কেহ আবিষ্কার করে নাই, সুতরাং সমস্ত বর্ণনাটীই কবিকল্পনা-প্রসূত।

অপর একস্থলে আছে ঃ—"মহাভুজ ঔর্ব্ব তাঁহার কুমারকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইহার তেজ অমরবৃন্দও সহ্য করিতে পারিতেন না।"

তাহার পর শ্রীভাগবত বর্ণিত ব্রহ্মাস্ত্রের বর্ণনা [পাঠ করিয়া অনেকেই ধারণা করেন, ব্রহ্মাস্ত্র আধুনিক বন্দুকের মত কোনও অস্ত্র। সূত কহিলেন—"অরিনিসূদন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া হস্ত প্রক্ষালনানন্তর তাঁহার শত্রুর বিপক্ষে আপনার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। পরস্পর বিরোধী দুইটী অনলোদ্গারক অস্ত্রে স্বর্গমর্ত্ত্য আলোক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রখর সূর্য্যকরসদৃশ প্রতীয়মান হইয়াছিল।" অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে সংহার করিবার মানসেও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাস্ত্রের উপর টীকায় রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "Encyclopaedia Bengaleasis" নামক গ্রন্থে বলেন,—ইহা সম্ভবতঃ এক প্রকার বন্দুক। ভাগবতের ছায়া অবলম্বনে লিখিত হিন্দী প্রেমসাগর পুস্তকে "লাগে তোপক ছোড়নে" প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

পুরাণ প্রভৃতি বর্ণিত অস্ত্রের উল্লেখ হইতেও আগ্নেয়াস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। শকুন্তলায় সমুদ্রাভ্যন্তরীণ ঔর্ব্ব নামক এক প্রকার অগ্নির কথা বর্ণিত আছে।

অশেষ প্রকার প্রমাণাদির বিচার করিয়া Sir Henry Eliot সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীন অবস্থায় কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহৃত হইত। বারুদের প্রধান উপাদান যবক্ষার ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং হিন্দুদিগের দ্বারা এ দ্রব্য যুদ্ধকালে ব্যবহারের কোনওরূপ অন্তরায় দৃষ্ট হয় না।

আমরাও বলি, যখন হিন্দুগণ সকল বিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিলনে, তখন বারুদ আবিষ্কার তাহাদের পক্ষে কিছু আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় না। ক্রমে হিন্দুসমাজে কারুণিকতার বৃদ্ধির সহিত এবং সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ঐ সকল বর্ব্বর নরহত্যার উপায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। এম-এ, বি-এল, এম-আর এ-এস।

আর গাহিব না।

আর গাহিব না আর গাহিব না
বিষাদের গীতি নিতি নিতি আর
যাক্ যাক্ যাক্ ভেঙ্গে চুরে যাক্
কল্পনা, সাধের বীণাটী আমার।
উঠিছে ভারতে জেগে অবিরত
সহস্র কণ্ঠেতে সহস্র তান
তার মাঝে কেবা শুনিবারে চায়
ভালবেসে—ভাঙা বীণার তান।
অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকা
একটী ক্ষুদ্র তারকা তথায়
নিষ্প্রভ নির্জ্জীব পড়ে এক কোণে
কেই বা তাহার পানেতে চায়।
যে কাননে ফোটে অমৃত পূরিত
মন্দার কুসুম তথা কি আর
সৌরভ বিহীন অপরাজিতায়
আছে কি আদর আছে কি তার।
বিশাল জগতে কত লক্ষ প্রাণী
কে করে তত্ত্ব কে কোথা রয়
তা' হ'তে এক ক্ষুদ্র প্রাণী গেলে
জগতের তাতে কি ক্ষতি হয়।
তবে কেন আর এ বিষাদ গীতি
গাহি নিতি খুলি হৃদয়-দ্বার।
যাক্ যাক্ যাক্ ভেঙে চুরে যাক্
কল্পনা,সাধের বীণাটী আমার!

শ্রীপুষ্পময়ী দেবী।
"মন্দার"-রচয়িত্রী।

দায়িত্ব-বোধ।

(প্রীতি-সমিতিতে পঠিত।)

"Tell me not in mournful nnmbers
Life is but an empty dream,"——

"বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন !"—

কবি ভাষার এই যে দুইটী ছত্র, ইহার মূল্য হয় না। জীবন যে কেবল অলীক কল্পনাময় স্বপ্নের সমষ্টি নহে, জীবনে মানুষের যে একটা উচ্চ উদ্দেশ্য আছে, স্বপ্নের কুহক ছাড়া আরও যে একটা মহৎ সার পদার্থ ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে, ইহা ভাবিবার বিষয়। যেদিন সেই অনন্ত অপরিজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়া এই প্রত্যক্ষীভূত ধরিত্রীবক্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, সেই দিন হইতে জীবন-নাট্যক্ষেত্রে এক মহাঅঙ্কের অভিনয় হইবার আয়োজন হইল। জীবনধারণ এক মহান্ ব্রত, সেই ব্রত উদ্‌যাপনেই এই মহাভিনয়ের যবনিকা পতন।

জীবনের এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে—কর্ম্মভূমির কর্ম্মোদ্ধারে যে মহতীশক্তি আমাদিগকে ভ্রান্তপথ হইতে অপসৃত করিয়া সত্যপথে পরিচালিত করে,উদ্ভ্রান্ত উদাসীন মনকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পুনঃপুনঃ উৎসাহিত করে,—সেই মহাশক্তিই মানবজীবনের দায়িত্ব-জ্ঞান। এই দায়িত্ব-জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়াই কবি তন্ময় ভাবে কহিয়াছিলেন,—"এ জীবন নিশার স্বপন" নহে, এ জীবনের কাজ অনেক, এ জীবন কর্ত্তব্যময়—এ জীবন দায়িত্বপূর্ণ।

নৈরাশ্যের প্রবল তাড়নায়, দুঃখ-ক্লেশের বিকট ভ্রূভঙ্গিতে যখনই আমরা জগতের কর্ত্তব্য-পথে চলিতে ভীত ও শক্তিহীন হই, তখনই এক স্বর্গীয় অব্যক্ত শক্তি আমাদের জড় হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। শিরায় শিরায় তখন আশা ও উৎসাহের বৈদ্যুতিক স্রোত ছুটিতে থাকে। নৈরাশ্যের অন্ধকারময় ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইবার জন্য তখন হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারা দেখা দেয়। বিপজ্জালপূর্ণ সংসার পথে চলিতে তখন আর ভয় কি?—তখন প্রাণে যে মহাবলরূপী দায়িত্ব-জ্ঞান, মাথার উপর ধ্রুবতারারূপী দায়িত্ব-বোধ!

বাস্তবিক, যখন আমরা ভাবি, আমাদের জীবন দায়িত্বপূর্ণ, তখন আর আমরা আলস্যের অধীন হইয়া থাকিতে পারি না! অজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ এই হৃদয় যখনই জানিতে পারে, জগতে তাহার দায়িত্ব অনেক,

দায়িত্বই তাহার প্রাণ, সে দায়িত্বময়,—তখনই তাহা অজ্ঞতার ক্ষুদ্রগণ্ডি বিধ্বস্ত করিয়া কর্ম্মজগতে প্রসারিত হইয়া পড়ে। এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাদের হৃদয়কে দৈববাণীর মত বলিয়া দেয়—"আর ঘুমাইও না, উঠ, তোমার সম্মুখে অনন্ত কাজ।"

আদ্যন্তহীন আবহমান কালের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনকাল যেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল, জনক জননীর জন্য, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, বন্ধুবান্ধবের জন্য, দীন দুঃখীর জন্য, সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থের জন্য, তেমনই আমাদের ভাবিবার সময় আসিল। সর্ব্বদা সকল প্রকার দায়িত্বের মধ্য দিয়া আমরা চলিতে বাধ্য হইলাম। কারণ দায়িত্ব-জ্ঞান ভিন্ন দ্বিতীয় এমন কোন শক্তিই নাই, যাহা আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে, যাহার সাহায্যে আমাদের জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে। দায়িত্বজ্ঞান শূন্য মানবের জীবন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় উৎপাদিকাশক্তি শূন্য। তাহার জীবনধারণ আর বলীবর্দ্দের শর্করা ভারবহনতুল্য কথা।

দায়িত্বজ্ঞান এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান এক কথা। ঋণ করিলে তাহা যেমন অবশ্য শোধ্য, জীবনে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কর্ম্মের দায় হইতে মুক্ত হওয়াও তেমনি অবশ্য বিধেয়। ঋণ পরিশোধ না করিলে উত্তমর্ণ যেমন ধর্ম্মাধিকরণে আমাদের নামে অভিযোগ করিবে, তেমনই জীবনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যসমষ্টি সেই উত্তমর্ণের মত অভিযোগ লইয়া একদিন আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।

দায়িত্বজ্ঞান-রশ্মিতে যাহার হৃদয় উদ্ভাসিত, তিনি কোন প্রকার অসৎ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ভীত নহেন; কোন প্রকার সৎকার্য্যের জন্য জীবন দানেও কাতর নহেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, এই কার্য্য পালনেই তাঁহার দায়িত্ব-মুক্তি।

মানব জীবনে দায়িত্ব বড় বেশী। অনেক সময় মনে হয়, দায়িত্ব-ভার-বহুল-প্রপীড়িত হইয়া আমরা হতাশ হইয়া থাকি, জীবনে আর কোন কার্য্যই করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। আমরা দায়িত্ব-জ্ঞানে অজ্ঞ বলিয়াই এ প্রকার অদ্ভুত ধারণা করিয়া থাকি; কারণ, আমাদের জীবনের দায়িত্ব অধিক হইলেও উহা এমন সুকৌশলে সংন্যস্ত যে কখনই আমাদিগের যুগপৎ তাবৎ দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবার প্রয়োজন হয়

না। একের পর আর, এইরূপ ক্রমপর্য্যায়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়, আমরাও তাহাই করিয়া দায়িত্বমুক্ত হইতে পারি।

শৈশব হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মানবের দায়িত্ব-জ্ঞান-লিপ্স চরিত্রোপার্জ্জন। যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থার মধ্য যুগ পর্য্যন্ত দায়িত্ব—সংসার-ধর্ম্মতোৎপরো, বার্দ্ধক্যে সংসারে নির্লিপ্তাবস্থায়, সেই শৈশব হইতে ক্রম-পুষ্ট ধর্ম্মবুদ্ধিসম্ভূত ভগবানের চিন্তাই পরম দায়িত্ব।

শাস্ত্রে পিতৃঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণ এই ত্রিবিধ ঋণের (দায়িত্বের) উল্লেখ আছে ; এবং সেই ত্রিবিধ দায়িত্বের মধ্যেই জগতের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন, উন্নতি, পরিপুষ্টি এবং সমৃদ্ধির সংজ্ঞা নিহিত।

সুতরাং দায়িত্ব লইয়াই আমার জন্ম, দায়িত্বই আমার জীবনে দৃঢ় জড়ীভূত ; চিরজীবন এই দায়িত্বের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া আমাকে ব্রতোদ্‌যাপনের পথ পরিষ্কার করিতে হইবে ;—উহাই "জীবন-সংগ্রাম" এবং এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিলেই মানবজীবনের সকল দায়িত্বের পরিসমাপ্তি।

উপরিউক্ত ত্রিবিধ দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় আমাদিগকে অবিরত নির্ম্মলচিত্তে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আমি যে আমার জীবনের দায়িত্ব বুঝিতে শিখিয়াছি, আমি যে আমার কার্য্য নিজে দেখিয়া লইতে পারিব, দায়িত্ব জ্ঞান যে আমার হইয়াছে,—নিঃসঙ্কোচে স্বার্থত্যাগ যখন আমরা করিতে পারিব, তখন আমরা তাহা বুঝিতে এবং বিশ্বাস করিতে পারিব, নচেৎ নহে। দায়িত্বই আমার জীবনের ব্রত ; যেদিন স্বার্থ-সম্পর্ক-রহিত বিমল দায়িত্ববুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে, সেই দিন এই ব্রতোদ্‌যাপনের পরিণতি হইবে।

নিতান্ত শৈশবে তুমি অজ্ঞান। দায়িত্ববুদ্ধি তখন তোমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় নাই। পঞ্চম বর্ষ কাল পর্য্যন্ত এই জন্য মানবজীবন শাস্ত্রানুসারে পাপপুণ্যে নির্লিপ্ত। কৈশোরে দায়িত্ব-জ্ঞানের অঙ্কুর উপ্ত হইল। বিদ্যাশিক্ষা, হিতাহিত-জ্ঞান উপার্জ্জন ও চরিত্রের বিশুদ্ধিরক্ষারূপ দায়িত্বের সহিত প্রথম জীবনের সংবর্ধণ আরম্ভ হইল। যথারীতি বিদ্যোপার্জ্জন, চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির সম্বিকাশসাধন, সম এবং বিশিষ্টের (গুরুজনের) সহিত যথোপযুক্ত সসম্ভ্রম ব্যবহার ইত্যাদি জীবনের এই যুগের কর্ম্ম। জীবনের এই যুগ 'স্বর্ণযুগ' এবং এই যুগে 'আত্মঋণ' পরিশোধ করিতে হয়। সাম্য, সরলতা, প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, এবং সার্ব্বজনীন একত্ব ভাব লইয়া এযুগের দায়িত্বময় জীবনাতিপাত। সংসারের বিশুদ্ধ চিন্তায় মস্তিষ্কালোড়নের ভয় নাই, শুদ্ধ আত্মশুদ্ধি রক্ষা করিতে

পারিলেই জীবনের এ যুগের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু এইখান হইতেই জীবনের মহান্ দায়িত্বের সূত্রপাত হইল।

যৌবনের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। ইহাই জীবনের মধ্যযুগ; এই যুগে আমাদিগকে প্রভূত প্রকার ঋণে আবদ্ধ, লিপ্ত এবং মুক্ত হইতে হইবে। এই সময় হৃদ্‌বৃত্তিগুলির যুগপৎ বিকাশে মানুষের মন অপূর্ব্ব উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়। কুরঙ্গশ্রেষ্ঠ যেমন স্বনাভিস্থ কস্তুরীগন্ধে আপনিই মুগ্ধ, এই যুগে মানবও তেমনি আপন বল, বুদ্ধি, গৌরবে আপনি মুগ্ধ।

জীবনের এই মহাদায়িত্বময় যুগে কত কত জীবনের সহিত আমাদের মৈত্রী ও সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবে। তখন দায়িত্বের সেই ভীষণ স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেলে চলিবে না, তাহা হইলে দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা কঠিন। জীবনের এই যুগ বড় দায়িত্বময়।

এই ঝঞ্ঝামুখে জীবনতরী যদি ঠিক থাকে, তবেই জীবন শান্তিময়। ইহার পর এক নূতন দেশে গিয়া আমাদের জীবনতরী লাগিবে;—ইহাই যৌবনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রৌঢ়াবস্থার প্রারম্ভ। এখানে জীবনতরী শান্ত, স্থির। এইখানে পিতৃঋণ পরিশোধ করিও, ঋষিঋণ, দেবঋণের মুক্তির চেষ্টাও ভুলিও না; তারপর জীবনস্রোত ক্রমশঃ কত কত দেশ, কত কত সৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশ-চুম্বিত অনন্ত জলধিরূপ অনন্তত্বে মিশিয়া যাইবে,—তখনই জীবনের পরামুক্তি।

* * * * * *

যে বিষম দায়িত্বের কথা আমরা বলিয়া আসিলাম, তাহা আত্মজীবন লইয়া; ইহাপেক্ষা আর এক উচ্চতর অঙ্গের দায়িত্ব মানব-জীবনের আছে, তাহা পরের জীবন লইয়া।—প্রজার জন্য রাজার সে দায়িত্ব, দরিদ্রের জন্য ধনীর সে দায়িত্ব, দুর্ব্বলের জন্য বলবানের সে দায়িত্ব, তাহা এই শ্রেণীর। সুতরাং **স্বার্থত্যাগ** এবং **পরপোকার** দায়িত্বমুক্তির দুইটী বিভিন্ন উপাদান এবং **ন্যায়পতার** উপর ইহাদের ভিত্তি সংস্থাপিত।

এই স্থানে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিও। দায়িত্বমুক্তির নিমিত্ত, এই উচ্চতর ব্রতোদ্‌যাপনের জন্য ভগবান দায়ীর হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব শক্তিই না নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন? কেহ ন্যায় বলে বলী, কেহ ধনবলে বলী, কেহ চরিত্রবলে, আর কেহ বা বাহুবলে বলী।

যে দেশের রাজা প্রজাসম্বন্ধীয় দায়িত্বজ্ঞানে জ্ঞানী, কেবল তিনিই রাজ্য

শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া 'রামরাজা' আখ্যায় অভিহিত এবং পূজ্য হইতে পারেন। যে ভূম্যধিকারীর দায়িত্বজ্ঞান আছে, কেবল তিনিই বিষম উপাধি-লোভ সম্বরণ করিয়া, লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নীরবে, বিনাড়ম্বরে লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িতের অন্নসংস্থান করিতে পারেন। অসীমদৈহিকবলে বলীয়ান যে ব্যক্তির আপন বলের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞান আছে, কেবল তিনিই বল-গর্ব্বে গর্ব্বিত না হইয়া সহস্র বাধাবিঘ্ন প্রত্যাখ্যান করিয়া, দুর্ব্বলকে পীড়িত হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার সহায় হইতে পারেন। এবং কেবল সেই ব্যক্তি—যাঁহার হৃদয়ে দায়িত্ব-জ্ঞান প্রোজ্জ্বলরূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—কেবল সেই মহাপুরুষই সর্ব্ববিধ বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়া নির্ভীক অটল চিত্তে সৎকার্য্যের জন্য জগতের সম্মুহ শঙ্কটের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন।

পুরুষসিংহ জেম্‌স এব্রাম গারফিল্ড, যেদিন দাসত্ব প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ লেখক ৺দীনবন্ধু মিত্র যে দিন নীলদর্পনরূপ উজ্জ্বল মুকুরে দুর্দ্দান্ত নীলকরের পৈশাচিক মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিয়াছিলেন; আর সেদিন—ধর্ম্মাধিকরণের পবিত্র দায়িত্বজ্ঞানে জ্ঞানী পেনেল ও কটন যে ন্যায়ের স্তম্ভ বঙ্গে ও আসামে প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, সেই দিন, সেই সময়ে জগৎ বুঝিতে পারিয়াছে—দায়িত্ব-জ্ঞানের মূল্য কি, দায়িত্ব-জ্ঞান ন্যায়ের ভিত্তির সহিত কত ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ! দুর্ব্বলের জন্য, নির্দোষের জন্য ন্যায়রাজ্যের ঐরূপ মহৎ বিধান চিরকালই মানবজীবনের দায়িত্বের অন্তর্ভূত।

ব্যক্তিগত বিচার ছাড়িয়া দিলে ইংরাজরাজ্য ন্যায়ের রাজ্য; এমন অটুট শান্তির একাধিপত্য সমগ্র ভারতে পূর্ব্বে ছিল না। সম্রাট আমাদিগকে যে ন্যায় বিতরণ করেন, তাহার মূলে সেই একমাত্র প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি রাজার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব-জ্ঞানে ইংরাজ জ্ঞানী; এই দায়িত্বের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দায় মুক্তির প্রতীকার করেন বলিয়াই ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ রাজা। আর যে রাজ্যের রাজা প্রজার প্রতি দায়িত্ব ভুলিয়া স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতায় 'খামখেয়ালে' দিন কাটাইয়া দেন, সে সম্রাটের রাজ্যে অরাজকতা অনিবার্য্য। রুষের উশৃঙ্খল-রাজনীতি ইহার উদাহরণ। *

'দায়িত্ববোধ' এই শক্তিটাই আমাদিগকে প্রাণীকরণ করে। আমাদের জীবনের উন্নতি, অবনতি, দৈন্য, সমৃদ্ধি, জড়তা এবং চৈতন্য এ সকলেরই মূলে একমাত্র দায়িত্বজ্ঞান বর্ত্তমান। বিশাল-জগৎসংসার চলিতেছে এই দায়িত্বের

* বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য নয়।

উপর নির্ভর করিয়া। দা—য়ি—ত্ব এই তিনটী অক্ষরের ভিতরে আমাদের মুক্তির সমস্ত আয়োজন নিহিত; এককথায় এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাদের মুক্তির সোপান।

উপসংহারে বলি, জীবনের উদ্দেশ্য যে শুধু কর্ম্ম করা তাহা নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে সেই অনন্তের দিকে অগ্রসর হওয়াই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল যেমন জয়লাভের জন্য কেবল অনবরত সম্মুখেই অগ্রসর হয়, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না,—আমরাও অমূল্য মানবজীবনের দায়িত্ব-সংগ্রামে জয়লাভের নিমিত্ত সংসারের কঠোর পথে—ধৈর্য্য সহকারে কেবল অগ্রসর হইব, পশ্চাৎপদ হইব না। হৃদয়ের বৃত্তি সমূহকে এক কেন্দ্রীভূত ও দৃঢ় কর; তাহারা যেন জীবন-সংগ্রামে,—

May———

"Fill up the gapes in our files
Strengthen the wavering line,"—

তারপর আবার কি? জীবনের কঠোর দায়িত্বযুদ্ধে জয়ী হইয়া—

We shall———

"Continue our march
On, to the bound of the waste
On, to the city of God."

দায়িত্ব মুক্তির ইহা অপেক্ষা ঋজু ও চরম পথ আর নাই।

একদিন এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের এই দায়িত্বময় জীবনকে তাহার সমস্ত কার্য্যের "নিকাশ" দিতে হইবে। এমন একদিন আসিবে, যেদিন;—"God shall bring every work into judgement with every secret thing, whether it be good or whether it be evil."—সেইদিন যদি প্রমাণ করিতে পারি, আমরা জীবনকালে আমাদের দায়িত্বের বিষয় একবারও ভাবিয়াছি,—দায়িত্বজ্ঞান একদিনের তরেও আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকে, তবেই মঙ্গল; নতুবা সে 'নিকাশে' ঠেকিলে আবার সেই অনন্ত দায়িত্ব লইয়া আমাদিগকে এখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সেই দ্বিগুণ দায়িত্ব লইয়া কত কোটী জীবন এমনি যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? তাই ভাবিতেছিলাম, জীবন যে মহান্ দায়িত্ব পূর্ণ সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা ভাল,—যেমনটী আসিয়াছিলাম, আবার তেমনটী ফিরিয়া যাইব, এ বড় গৌরবের কথা নহে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

মানময়ী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যের উপর রহস্য।

মানময়ী কি বলিতে যাইতেছিল,—সহসা সে কথা কষ্টে অবরোধ করিয়া বলিল, "পরে বলিব—দাদা—এখনই আমায় নিয়ে চল,—আমি এক মিনিটও থাকিব না।"

"এত ব্যস্ত হইতেছ কেন,—একটু ভাল হও।"

"না—না—না—এখানে থাকিলে আমি বাঁচিব না—এখনই নিয়ে চল।"

"কি হইয়াছে,—নিশ্চয়ই কিছু হইয়াছে—না হইলে তুমি আগেতো যাই-বার কথা কিছুই বল নাই। কি হইয়াছে,—আমায় বল।"

"দাদা—এখনই আমায় এখান থেকে নিয়ে চল—পরে সব বলিব।"

রমেশ বাবু দেখিলেন, ভগিনী এখন তাহাকে কিছুই বলিবে না,—তাহার বলিবার ক্ষমতাও নাই,—সে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার শরী-রের যে অবস্থা তাহাতে তাহাকে এ সময়ে বিরক্ত করিলে তাহার আবার পীড়া হইতে পারে—এই জন্য তিনি বলিলেন, "আচ্ছা,—তাহাই হইবে—আমি তোমায় লইয়া যাইবার জন্য এখনই বন্দোবস্ত করিতেছি।"

তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন,—পশ্চাৎ হইতে মানময়ী ডাকিল, "দাদা!"

রমেশ বাবু ফিরিলেন, মানময়ী বলিল, "তাঁর বিচার বারাসতে হইবে না আলিপুরে হইবে?"

"খুনি মকদ্দমা—আলিপুরে জজের কাছে হইবে?"

"তাহা হইলে আমি এখান থেকে গেলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না,—তোমার বাসা তো আলিপুরের কাছে?"

"হাঁ—কোন ক্ষতি হবে না। যাহা করিবার আমাদের সেই খানেই করিতে হইবে।"

"তবে এখনই চল,—আমি সব গুছাই।"

রমেশ বাবু আবার বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন,—আবার মানময়ী তাঁহাকে ডাকিল—তিনি ফিরিলে সে বলিল, "তিনি কি বলিলেন, সব আমায় বল।"

অবিনাশ যে, তাহার শত্রুর কথা কিছুতেই বলিতে স্বীকার করে নাই,—এ কথা ভগিনীকে বলা উচিত কিনা—রমেশ বাবু সে কথা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভাবিলেন, এই সুবিধা। মানময়ীকে এ কথা বলিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই তাহাকে সকল কথা বলিবে।

তিনি অবিনাশ যাহা যাহা বলিয়াছিল, সমস্তই বলিলেন—তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবিনাশ বলিতেছে না কেন,—বলিতে পার ?"

মানময়ী সহসা নিতান্ত অন্যমনস্কা হইয়াছিল। ভ্রাতার প্রশ্নে চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল,—তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা,—কি বলিলে ?"

রমেশ বাবু বলিলেন, "আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, অবিনাশের কোন শত্রু এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। সে কে অবিনাশ তাহা জানে—অথচ কিছুতেই বলিতেছে না। এ কথা প্রকাশ না হইলে অবিনাশ আরও বিপদে পড়িবে। তুমি যদি কিছু জান তো—আমায় সব বল।"

মানময়ী কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু সে তাহা বলিল না,—নীরবে রহিল। রমেশ বাবু আবার বলিলেন, "যদি জান তো বল,—না হইলে অবিনাশকে রক্ষা করা কঠিন হইবে।"

মানময়ী তবুও নীরব। রমেশ বাবু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি দেখিতেছি ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে—তুমিও সব জান—বলিতেছ না।"

"দাদা—দাদা—"

মানময়ী কাঁদিয়া উঠিল,—শয্যায় মুখ লুকাইল। এ অবস্থায় তাহাকে বিরক্ত করা উচিত নহে ভাবিয়া রমেশ বাবু বাহিরে আসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়।

রহস্যের উপর রহস্য—এ রহস্য কি ? অনেক ভাবিয়াও রমেশ বাবু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তবে এইটুকু বুঝিলেন যে, তাহার অনুপস্থিতিতে এমন কিছু ঘটিয়াছে যে, তাহাতে মানময়ী আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে চাহিতেছে না। সে কি !

তিনি পিসিমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু বৃদ্ধা তাহার কোনই সদুত্তর দিতে পারিলেন না। রমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বারাসতে গেলে কেউ এখানে এসেছিল?"

"না—কই—কে আসিবে।"

"ভাল ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি।"

"কই—কেউ না,—কেবল গোপলার মা এসেছিল,—সে প্রায় আসে,—সে বৌমাকে বড় ভালবাসে।"

"গোপলার মা কে?"

"ও পাড়ার থাকে?"

"সেকি মানময়ীকে কিছু বলিয়াছে?"

"কি আর বলিবে—সে এসে বৌমার গায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। অনেকক্ষণ থেকে চলে যায়?"

"আপনি কি তখন মানময়ীর কাছে ছিলেন।"

"না—কেমন ক'রে থাকিব। ঘরের কাজ কর্ম্ম আছে,—সে এসে বাছার কাছে বসিলে আমি ঘরকন্নার কাজ করিতে যাই।"

রমেশ বাবু বুঝিলেন এই গোপলার মাই,—নিশ্চয় মানময়ীকে এমন কিছু বলিয়া গিয়াছে যাহাতে সে তিলার্দ্ধ এখানে আর থাকিতে চাহিতেছে না। সে কি বলিয়াছে, রমেশ বাবু তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

তিনি সেই দিনই কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আবার মানময়ীর নিকট আসিলেন,—দেখিলেন, সে অন্যমনে এক দৃষ্টে জানালার দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

রমেশ বাবু ডাকিলেন, "মানময়ী!" সে চমকিত ও ভীত ভাবে তাঁহার দিকে ফিরিল,—ব্যগ্রভাবে বলিল, "দাদা,—যাবার সব ঠিক করেছ?"

"হাঁ—সব ঠিক করিয়াছি।"

"রাত্রে নয়,—এখনই চল।"

"হাঁ—খাওয়া দাওয়া ক'রে যাব।"

"যেন আমরা যাইতেছি,—এ কথা কেহ যেন জানিতে না পারে।"

"মানময়ী,—তুমি কেন এ সকল বলিতেছ,—তুমি কি মনে কর কেহ আমাদের যাওয়া বন্ধ করিতেপারে?"

"না—না—তা—তা—নয়—"

"তুমি আমার নিকট গোপন করিতেছ—সব আমায় খুলিয়া বল,—না হইলে আমি অবিনাশকে রক্ষা করিতে পারিব না!"

"দাদা—দাদা—তুমি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিও না,—আমি কিছু বলিতে পারিব না—তিনি সবই বলিবেন,—এখন আমায় শীঘ্র এখান থেকে লইয়া যাও,—আমি আর এখানে বাঁচিব না।

রমেশ বাবু নিরুপায়,—তিনি বিস্মিতের উপর বিস্মিত হইতেছিলেন,—এ কি গূঢ় রহস্যজাল তিনি জড়িত হইয়া পড়িলেন!

যাহাই হউক,—এখানে মানময়ী থাকিলে তাহার বিপদের যে সম্ভাবনা আছে,—তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন,—তাই প্রথমে তাহাকে তাঁহার ভবানী-পুরের বাসায় অনতিবিলম্বে লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন,—তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করা যাইবে।

এই সকল ভাবিয়া তিনি প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যের অনুসন্ধান।

রমেশ বাবুর এই গোপলারমার সহিত দেখা করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল,—কিন্তু এখন তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভাবিলেন, মানময়ীকে বাসায় রাখিয়া তিনি এখানে ফিরিয়া আসিয়া এই রহস্যের অনুসন্ধান করিবেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রেল হয় নাই,—সুতরাং আনরপুর হইতে হয় গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে কলিকাতায় আসিতে হইত। রমেশ বাবু অনেক কষ্টে একখানি ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করিলেন। পিসিমার বিশ্বাস ছিল, কলিকাতায় গেলে জাত ধর্ম্ম থাকে না,—তাই তিনি কিছুতেই কলিকাতায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না,—এমন কি মানময়ীর জন্যও নহে।

সজল নয়নে মানময়ী স্নেহময়ী পিসিমার চরণধূলি লইয়া বিদায় হইল,—বলিল, "পিসিমা,—তিনি খালাস হইলে একসঙ্গে আসিব,—তোমার কোন ভয়

মানময়ীর গুপ্ত সঞ্চিত যাহা ছিল, তাহা হইতে দশটি টাকা পসিমাকে দিয়া সে বলিল, "আবার শীঘ্রই দাদার কাছ থেকে কিছু নিয়ে তোমায় পাঠাইব।"

পথে বিপদের আশঙ্কা আছে,—রমেশ বাবুর মনে ইহা আপনা আপনিই হইয়াছিল,—কেন হইয়াছিল, তাহা তিনি জানেন না,—এই বিপদ যে কি তাহাও তিনি জানিতেন না,—অথচ স্বতই তাহার মনে হইতেছিল যেন কি বিপদ ঘটিবে। এই জন্য তিনি একটু সাবধান ও প্রস্তুত হইয়া যাওয়া বিবেচনা করিলেন।

কানাই বলিয়া অবিনাশের এক বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল,—তিনি পিসিমাকে এক দিনের জন্য একলা রাখিয়াও কানাইকে সঙ্গে লওয়া স্থির করিলেন। পিসিমাকে এ কথা বলায় তিনি বলিলেন, "আমার আবার ভয়টা কি? কানাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও—কাল আবার পাঠিয়ে দিও।"

কানাই কিছু জানিলেও জানিতে পারে, এই ভাবিয়া রমেশ বাবু তাহাকে এক পাশে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কানাই, তুমি অবিনাশের কাছে অনেক দিন আছ,—তাহার কোন শত্রু আছে বলিতে পার?"

কানাই রমেশ বাবুর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল,—তৎপরে বলিল, "বাবু—শত্রুর অভাব কি? সকলেরই শত্রু আছে?"

"অবিনাশের কোন শত্রু আছে।"

কানাইও কি বলিতে যাইতেছিল,—থমকাইয়া থামিল,—তৎপরে বলিল, "আমরা গরিব লোক,—আমরা এসব কি জানি।"

রমেশ বাবু বুঝিলেন কানাইও তাঁহাকে কথা গোপন করিল,—এমন কি গূঢ় রহস্যে অবিনাশ জড়িত যে, কেহই তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছে না?

রমেশ বাবু কৌতূহলে নিতান্ত অধীর হইলেন,—কিন্তু উপায় নাই,—ভাবিলেন, মানময়ীকে বাড়ী পৌছিয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিয়া এ রহস্য ভেদ করিবেন। এ রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে অবিনাশকে রক্ষা করা কোন মতে সম্ভব হইবে না।

কানাই—গোয়ালা,—তাহার শরীরে অসীম বল ছিল। রমেশ বাবু তাহার চিরসঙ্গি বৃহৎ লগুড় তাহাকে সঙ্গে লইতে বলিলেন, নিজেও এক বৃহৎ বংশ-যষ্টি সঙ্গে লইলেন। আহারাদির পরই তাঁহারা রওনা হইলেন।

রাজপুতানার স্মৃতি।

(১)

পাষাণ হৃদয়ে বাঁধিয়া আজিকে
দেখিছে হিন্দুকবি,
রাজপুতহীন রাজপুতনায়
বিষাদ-পাণ্ডু-ছবি।
প্রতি ধূলিকণা সিক্ত যাহার
বীরের শোণিত পাতে,
জগৎ-পূর্ণ বীরেন্দ্র শত
মিশিয়া রয়েছে যাতে ;
সেই বীরভূমি সেই সে চিতোর
নেহারি কাঁদিছে কবি,
চিরদিন তরে ডুবেছে যে তার
মুক্ত স্বাধীন রবি !

(২)

জাগে অসংখ্য শৈল শিখর
জাগে ভীম "আরাবলি"
ফেলেছিল যারা যবন সৈন্যে
পাষাণ চরণে দলি ;———
অশ্বের খুরে অগ্নি ছুটায়ে
হেথা রাজপুত সবে
অরাতি বাহিনী চূর্ণ করিয়া
দুর্জ্জয় হ'ত ভবে।
ওই যে আঁধার গিরি কন্দর
ওই যে রয়েছে কাছে
মোগল-অস্থি এখনো তাহার
চরণে ছড়ানো আছে!

(৩)

ওই যে শোভিছে চিত্রের মত
সে' উদয় সরোবর,
তেমনি মধুর ছায়া-মায়াময়
তেমনি ত মনোহর।
ওই সে "লাইন" গিরি সঙ্কট
চাহিলে নিম্ন পানে,
মোগল সেনার আর্ত্ত নিনাদ
এখনো পশিবে কাণে।
উন্নত ফণা আরঙ্গজেব
হইয়া গর্ব্ব-হত,
করেছিল হেথা রাণার চরণে
আপনার শির নত।

(৪)

যা ছিল সকলি রয়েছে তেমনি
ওরে রাজপুত ভাই!
কেবল তোদের ও দেহের মাঝে,
সে পরাণ আর নাই!
ওই ত রয়েছে সে "কমলমির"
সে "পেশোলা" সরোবর,
চাহিলে সে পাণে দৃঢ় বাহু তোর
হয় নাকি দৃঢ়তর!
বারেক কি আজ বহেনা তুফান
তোদের অলস প্রাণে
রে মূঢ় যখন ফিরাস নয়ন
"হলদিঘাটা"র পানে?

(৫)

ভু'লে কি গেছিরে বীর "জয়মল"
"পুত্তে"র জয়গাথা

ভু'লে কি গেলিরে "পান্না" বীরের
বিপুল স্বার্থত্যাগ!
ভু'লে কি গেলিরে সে ধন-কুবের
"ভামসা"র অনুরাগ।
ভুল্‌লে কি গিয়েছিস্ সে বিরাট বীর
পূর্ব্ব পুরুষগণে,
সর্ষপ তরু রোপিল কি বিধি
শাল বৃক্ষের মূলে?

(৬)

এই মহাভূমি এই বীরপ্রসূ
এই চিতোরের লাগি,
প্রতাপ সিংহ কেঁদে ফিরেছিল
হইয়া সর্ব্বত্যাগী।
বীরের চিতায় জেগেছিল বীর
সতীর চিতায় সতী!
যবন সৈন্য শত লুণ্ঠনে
করিতে পারেনি ক্ষতি।
এ পাহাড় চেয়ে শত গুণ দৃঢ়
অভেদ্য বীর হিয়া,
চিতোরে আবরি রাখিয়াছিল যে
ভীম আবরণ দিয়া।

(৭)

চাহিস্ যখন ওরে রাজপুত!
শৈল প্রাচীর পানে,
শত অস্ত্রের ঘন ঝঞ্ঝনা
পশে নাকি তোর কাণে?
বর্ষার ঘোর জলদ মন্দ্রে
বিজলি ঝলস হেরি,
কেঁদে কি উঠেনা তোর ও হৃদয়
গত গৌরব স্মরি?

খর চামুণ্ডা "ভুখি হুই" রবে
মুক্ত কৃপাণ হাতে
হৃদয়-শ্মশানে ভ্রমে নাকি তোর
শুদ্ধ আঁধার রা'তে !

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, এম্-এ, বার-য়্যাট-ল।

প্রার্থনা।

১

কোথা তুমি সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা
কোথা তুমি বিঘ্ন বিনাশন !
জানি না তো কত দূর, তোমার বৈকণ্ঠপুর
জানিনা কেমনে তোমা
করি আবাহন।

২

জানি আমি অক্ষম দুর্ব্বল
জানি তুমি জগত জননী
যাহা সাধ, যাহা আশা, যাহা মরমের ভাষা
আমরা কেমনে কব'
জানিছ আপনি।

৩

যদিও মা, পরাণের কথা
ভাল ক'রে শিখিনি বলিতে
শিশু যদি অব্রুবাণ, তবুতো মায়ের প্রাণ
সবি যে বোঝেন মাতা
দেখিলে কাঁদিতে।

৪

আজি বর দেহ মা বরদে !
দূর হোক সকল নীচতা,
হিংসা দ্বেষ দলাদলি, শতদূরে যাক্ চলি,
উছলি উঠুক বুকে
তোমারি মমতা।

৫

প্রাণে দেহ পবিত্র বাসনা
দেহে দেহ অমর শকতি,
করিতে তোমার কাজ, ত্যজি যেন ভয় লাজ
হৃদয় ভরিয়া দেহ
স্বাত্বিকী ভকতি।

৬

তুমি দে'ছ মানব-জনম
আমি যেন করি না বিফল,
যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, যাহাকিছু তব কর্ম্ম,
তাহাই করিতে দিও
মিনতি কেবল।

শ্রীমানকুমারী দাসী।
"বীরকুমার বধ"-রচয়িত্রী।

আহ্বান।

নিরাশা-সমুদ্র-কূলে কে তুমি ললনে,
মধুর বীণার তানে করিছ আহ্বান?
জাননা কি, আমি পান্থ নিরাশা-কাননে,
হারায়েছি লক্ষ্য, হেরি দিবা অবসান!
সায়াহ্নের রক্তমেঘ, সরক্ত তরঙ্গ,
প্রফুল্ল তটিনীবক্ষে নাচিয়া নাচিয়া
সভয় কম্পিত যেন করিয়াছে অঙ্গ,
ভবিষ্য জীবন-নদী দেছে উদ্বেলিয়া!
তবু হায়! বাঞ্ছিত হে! আহ্বান তোমার,
জাগায়ে তুলেছে কত কত নব আশা;
ফুটিয়া উঠিছে কত স্বপ্ন অমরার,—
অতীতের সেই স্মৃতি,—প্রীতি, ভালবাসা!
মরনের কূলে দেবি! এসেছি এবার,
ডাকিওনা—ফিরা'ওনা—মিনতি আমার!

রমণী।

মিলি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাহার বয়স চত্বারিংশৎ বর্ষ মাত্র, কিন্তু দেখিতে বোধ হয় সে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা। তাহার বিবর্ণ রক্তশূন্য ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতেছে; তাহার জ্যোতিঃহীন, কোটরগত চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত-নিমীলিত হইতেছে। অসহ্য রোগযাতনায় ব্যাকুল হইয়া রমণী পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে।

তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী লিলি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে ক্রন্দন করিতেছিল। তাঁহার রক্তবর্ণ নয়নযুগল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

মিলির জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার অধিক আর বিলম্ব নাই। পুরোহিত এখনি আসিবেন। জীবনে সে যাহা কিছু অসৎকার্য্য, পাপাচরণ করিয়াছে, মরিবার পূর্ব্বে পুরোহিতের নিকট সে তাহা ব্যক্ত করিবে। পুরোহিত তাহাকে,পাপমুক্ত করিবেন। কন্‌ফেসন (Confessioan)না করিলে, আত্মার সদ্গতি হয় না—পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ না লইলে আত্মা স্বর্গে স্থান পায় না।

কক্ষের চারিপার্শ্বে যেন মৃত্যুর ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোথায় সাড় নাই শব্দ নাই, গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। কক্ষের এক পার্শ্বে ঔষধের শিশিগুলি পড়িয়া আছে, চেয়ারগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে। সকলেই ত্রস্তে সঙ্কুচিত-চিত্তে, নিঃশব্দে, নীরবে, যমরাজের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

দুই ভগিনীর পূর্ব্ব কাহিনী বড়ই হৃদয়বিদারক, মর্ম্মস্পর্শী। বসন্তের প্রথম প্রভাতে সহসা একদিন কোকিলের কুহুতানে যেমন জগৎ মুখরিত হইয়া উঠে, বনভূমে কুসুমরাশি ফুটিতে থাকে, যৌবনের প্রথম প্রভাতে তেমনি লিলির অন্তরে প্রেম-ফুল বিকসিত হইয়াছিল, প্রণয়ের মধুর-গুঞ্জনে তাহার হৃদয় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রণয়ী-প্রণয়িনী স্বপ্নসুখে সময় অতিবাহিত করিতেছিল। বিবাহের সমুদায় আয়োজন হইয়াছিল; তিন দিন পরেই দুইটী হৃদয় বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইবে। এমন সময়ে সহসা—একি? বসন্তের নির্ম্মল আকাশে সহসা বজ্রাঘাত কেন? সুখের প্রথম প্রভাতে সহসা অন্ধকার কেন? নিষ্ঠুর অদৃষ্টের একি তীব্র উপহাস!

---

* নব প্রকাশিত মাসিক হার্ভার্ড রিভিউ হইতে অনুদিত।

বিবাহের তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সহসা লিলির প্রণয়ী হেনরী ধরাতল ত্যাগ করিল।

যুবতীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, হতাশা তাহার ভগ্ন হৃদয় অধিকার করিল।

যুবতী প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর বিবাহ করিবে না। বিধবার কৃষ্ণ পরিচ্ছদে সে তাহার অনুপমেয় সৌন্দর্য্যরাশি আবৃত করিল।

একদিন তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী, পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা মিলি, দিদির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "দিদি, তুমি বে' করবে না? চিরকাল একলা থাকবে। আমিও কখন বে' করব না। তোমাকে ছেড়ে আমি কখনও যাব না।"

বালিকার এই অসীম স্নেহ দর্শনে লিলির হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, কিন্তু বালিকা যে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে, একথা সহসা তাহার বিশ্বাস হইল না।

কিন্তু বালিকা মিথ্যাবাদিনী নহে—সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল। পিতা মাতার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ব্যাকুল মিনতি তুচ্ছ করিয়া, সে অবিবাহিত রহিল। কত সুন্দর রূপবান যুবক ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কত বীরশ্রেষ্ঠ বলশালী পুরুষ ভগ্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু মিলির প্রতিজ্ঞা টলিল না, সে বিবাহ করিল না।

সেই দিন হইতেই তাহারা কখনও পৃথক্ হয় নাই। তাহারা একত্রে ভোজন করিত, একত্রে ভ্রমণ করিত, একত্রে শয়ন করিত। তাহারা যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটিয়াছিল।

কিন্তু লিলি অপেক্ষা মিলিকে সমধিক বিষণ্ণ বোধ হইত। লিলি এত যত্ন করিত, এত চেষ্টা করিত—কিছুতেই সহোদরার সেই বিষাদসিক্ত, সুন্দর মুখখানি আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিত না। অন্তরের কি এক অসহ্য বেদনা, কি এক তীব্র জ্বালা তাহার জীবনের সুখ শান্তি হরণ করিয়াছিল, তাহার শরীর মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল যৌবনের প্রান্ত সীমা অতিক্রম না করিতে করিতেই তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চুলগুলি সাদা হইয়া গেল, চর্ম্ম লোল হইয়া আসিতে লাগিল, শরীর ক্ষীণ ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। লিলি বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও তাহাকে দেখিলে মিলির কনিষ্ঠা বলিয়া বোধ হইত।

আজ লিলির জীবনলীলা সাঙ্গপ্রায়। কা'ল রাত্রি হইতেই তাহার

বাক্য স্ফুরণ হইতেছে না। আজ প্রাতে সে দিদিকে ক্ষীণ জড়িত ভাষায় বলিল, "দিদি আরত আমার সময় নাই। পুরোহিতকে ডাকিয়া পাঠাও।"

লিলি ব্যথিত চিত্তে, ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছিল। তাহার জীবনে স্নেহের, ভালবাসার যাহা কিছু সামগ্রী ছিল, কৃতান্ত তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। আজ নিষ্ঠুর কৃতান্ত তাহার একমাত্র স্নেহের ধন, অঞ্চলের নিধি, জীবনের সহচরী মিলিকে হরণ করিতে আসিয়াছে। বিবশা, জ্ঞানহারা হইয়া সে রোদন করিতেছে।

অদূরে পদশব্দ শ্রুত হইল—ধর্ম্মযাজক কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মযাজককে দেখিয়া মিলি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল। ধর্ম্মযাজক উচ্চাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ধীর স্বরে বলিলেন, "বৎসে! ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিবেন। সময় উপস্থিত, তুমি নির্ভয়ে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।"

মিলির সমুদায় দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পিত কলেবরে সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "দিদি, উঠে বস—শুন।"

লিলি অতি কষ্টে অশ্রু-স্রোত সংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল। মিলি ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া, বলিতে লাগিল—"দিদি, ভাই—ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর।"

লিলি বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "মিলি, বোন্—তোমাকে আমি ক্ষমা করিব? কিসের জন্য? জীবনে তুমিত কখন আমার প্রতি অন্যায়াচরণ কর নাই। তুমি আমার জন্য আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন করিয়াছ, আমার জন্য তুমি চিরকাল কষ্ট সহ্য করিয়াছ। তুমি দেবী……।"

লিলিকে বাধা দিয়া মিলি বলিয়া উঠিল, "দিদি, চুপ কর ভাই। আমাকে বলিতে দাও। আমারত আর বেশী সময় নাই।……ওঃ, কি ভয়ানক,…… আজ আমি সব বলিব। শুন……হেন্‌রী, হেন্‌রীকে তোমার মনে আছে!…"

লিলি শিহরিয়া উঠিল; মিলি বলিতে লাগিল, "হেন্‌রী প্রথম যে দিন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল—তোমার মনে পড়ে, আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। আহা! হেন্‌রীর কি সুন্দর সুঠাম আকৃতি, কি বিশাল আয়ত চক্ষু, হেন্‌রীকে দেখিয়া আমি একেবারে বিমুগ্ধ হইলাম।

"আমার বয়স তখন ১৫ বৎসর ছিল—না? তোমরা সকলে আমাকে

বালিকা মনে করিতে—কিন্তু যুবতীর গাঢ় অনুভব শক্তি আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

"আমি দিবারাত্র হেন্‌রীকে ভাবিতাম; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, হেন্‌রী আমার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া বেড়াইত! তাহার অপরূপ রূপ আমার সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

"হেনরী প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিত, আমি একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। আমি মনে মনে আমার জীবন, যৌবন, মন, প্রাণ, সমুদায়ই তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলাম।

"সহসা একদিন শুনিলাম যে, তোমার সহিত হেন্‌রীর বিবাহের স্থির হইয়াছে। আমার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। দিদি আমার, উঃ সে জ্বালা—বড় জ্বালা।

"আমি তিন দিন অনিদ্রায় কাটাইলাম—যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কত কাঁদিলাম। কোন মতে মন সান্ত্বনা মানিল না। হিংসাবিষে আমার শরীর জর্জ্জরিত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, না, সে হবে না। লিলি হেন্‌রীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে বিবাহ করিব।'

'কিন্তু বুঝিলাম, হেন্‌রী আমার নহে—তাহার হৃদয় তোমার নিকট বিক্রীত।'

"এক দিন সন্ধ্যা বেলা তোমরা বেড়াইতে গিয়াছিলে—মনে পড়ে? সে দিন শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। বহিঃপ্রকৃতি জ্যোৎস্নালোক হাসিতেছিল। আমি প্রকোষ্ঠে পদচারণ করিতেছিলাম। দেখিলাম অদূরে তোমরা বেড়াইতেছ। আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

"দেখিলাম, হেন্‌রী তোমাকে তাহার সেই বিশাল বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইয়া তোমার মুখচুম্বন করিল। আমার চক্ষু নিমীলিত হইল, যন্ত্রণায় আমার হৃদয় পুড়িতে লাগিল। দুঃখে ক্রোধে আমি উন্মত্ত হইলাম।

"প্রতিশোধের জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। হেন্‌রী যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া তোমাকে বিবাহ করিবে, সে চিন্তা আমার অসহ্য হইল। হেন্‌রীকে এত দিন আমি হৃদয়-দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতাম,—হেন্‌রীর মূর্ত্তি হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইল, শূন্য হৃদয় ক্রোধ অধিকার করিল।

"তুমি হেন্‌রীর জন্য কেক্ রন্ধন করিতে—মনে আছে? আমি লুকাইয়া একদিন কেকের সঙ্গে বিষ মাখাইয়াছিলাম

"আমাদের মালীর নিকট অনেক রকম বিষ থাকিত, সেত তুমি জান। সেদিন হেন্‌রী তিনখানা কেক্ খাইয়াছিল। আমি একখানা কেক্ খাইয়াছিলাম। অবশিষ্ট কেক্‌গুলি আমি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তিন দিন পরে হাঁস গুলি মারা গেল—মনে আছে ত?

"দিদি আমায় কিছু বলিওনা, ভাই। শুন। হেন্‌রীর জীবনের অবসান হইল। আমি চিররুগ্ন হইয়া রহিলাম। "কিন্তু ভাই, তখনও যন্ত্রণার শেষ হয় নাই। সেই দিন হইতে আমার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল।

"সহসা যেন আমার চেতনা হইল। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি আমার পাপের গুরুত্ব অনুভব করিলাম।

"উঃ—আমার জীবনে কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি। সেই দিন হইতে পলে পলে আমার অন্তর পুড়িতেছিল, প্রতিমুহূর্ত্তে আমার হৃৎপিণ্ড দগ্ধ হইতেছে।

"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম 'দিদিকে একদিন বলিব—মৃত্যুকালে দিদিকে সব কথা বলিয়া যাইব।

"দিদি আমার,—সময় উপস্থিত, উঃ— যাই যে।

"প্রাতে, সায়াহ্নে, দ্বিপ্রহরে, সময়ে, অসময়ে, আমি ভাবিতাম, দিদিকে একদিন বলিব।

"দিদি, আজ মরিতে ভয় হইতেছে। ভাবনা হইতেছে, মরিবার পর যদি হেন্‌রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়—উঃ।

"দিদি, কি করি ভাই? তোমার পূর্ব্বে আমি হেন্‌রীর সহিত কি প্রকারে সাক্ষাৎ করিব?

"কিন্তু আমার ত আর দেরী নাই। বিধাতা আরত আমাকে এখানে রাখিবেন না।

"দিদি, স্নেহের বোন্, আমকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা করিলেও আমি অনেকটা সুস্থির হ'তে পারি।"

দিদির নিকট কোন উত্তর না পাইয়া, মিলি একবার চিৎকার করিয়া উঠিল, "পুরুত ঠাকুর, দিদি কি ক্ষমা করিবেন না? দিদি ক্ষমা না করিলেত আমি মরিতে পারিব না। উঃ—মিলি শ্রান্ত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার নিশ্বাস দ্রুত প্রবাহিত হইতেছিল।

লিলি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ হয় তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। বাহুতে মুখ লুকাইয়া রমণী একাগ্রচিত্তে

অতীতের কথা চিন্তা করিতেছিল। হায়! হেন্‌রী জীবিত থাকিলে, কি সুখেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইত! তাহার প্রণয়-দেবতার মনোহর কান্তি তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, হেন্‌রীর জীবন্ত ছবি লিলি মনশ্চক্ষে দেখিল। হায়! সেই চুম্বন, সেই সান্ধ্য ভ্রমণ এখনও তাহার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু জীবনের সুখপ্রভাত উদিত হইতে না হইতেই ঝটিতি ঘন অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া ফেলিল, সুখ-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইল।

সহসা ধর্ম্মযাজক গুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ম্যাডাম্ লিলি, তোমার ভগিনী মৃত্যুশয্যায় শায়িত।"

চমকিত হইয়া লিলি মুখ তুলিল, কম্পিত ওষ্ঠে সহোদরাকে চুম্বন করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "বোন্ আমার—তোমাকে আমি ক্ষমা করিতেছি, অন্তরের সহিত ক্ষমা করিতেছি।"

শ্রীমতী রাণী দেবী।

কর্ম্ম।

কর্ম্মহীনতায় নাহি সুখ-সুধা-কণা,
বিপুল-বিরতি-বুকে অনন্ত যাতনা!
অবশাঙ্গ জড়সম বসি থাকি স্থির—
কি সুখলহর গণি' কাল-পয়োধির?
কর্ম্ম হৃদয়ের বর্ম্ম—নর্ম্ম সহচর—
সেই জানে কোন্ খানে আনন্দ-নির্ঝর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী; বি, এ।

স্থায়ীত্ব।

যুবতীর বুকে রূপ—লাবণ্য—যৌবন—
থাকে কতক্ষণ?
প্রভাতে-উন্মুখ তার,
মধ্যাহ্নে-বিকাশ,
সন্ধ্যায় মরণ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা; বি, এ।

স্বদেশ-প্রেম

ও

কবিবর হেমচন্দ্র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য খণ্ড কবিতা পাঠ করিলেও—তাঁহার হৃদয়ের প্রধান ভাব, ভারত-প্রেম কত অনুসঙ্গী ভাবের সহিত উদ্বোধিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কোথাও হর্ষ, কোথাও বিষাদ, কোথায় উৎসাহ, কোথাও আশঙ্কা, কোথাও আশা, কোথাও নৈরাশ্য, কত প্রকার ভাবের সূত্রবৎ সুন্দর সমাবেশ সুদক্ষ সূক্ষ্ম বয়ণে এক একটী কবিতা গ্রথিত। কবি কখনো বা ভারতের পুণ্যকর্ম্মা নরনারীগণের নাম স্মরণ করিয়া জাতীয় গৌরবে উন্নত হইয়া গাহিতেছেন ;—

যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন
গাহিল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্য
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে।
তাদেরি রুধিরে জনম এদের
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনি নাচায়
সেই পূর্ব্ব গানে কভু গর্ব্বে চায়
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।

কখন বা কল্পনার হাত ধরিয়া গৌরবময় অতীতের চিত্র-পটখানি খুলিয়া দেখিলেন, ভারতমাতা জগত-গুরু রূপে সম্পূজিতা—ভারতের আলোকে জগৎ আলোকিত।—

ভারত-কিরণে জগতে কিরণ
ভারত-জীবনে জগত-জীবন
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন
আছিল যখন ষড়-দরশন—

ভারতের বেদ, ভারতের কথা
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে
ফিণিক্, সিরীর, য়ুনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।

তখন স্বদেশসেবক, স্বদেশভক্ত, বীর্য্যবান্, সন্তানগণ জননী ভারত-ভূমির সেবা করিত——তখন উত্তুঙ্গমহিম-মহোজ্জ্বল কিরীট-কুণ্ডলে ভারত ভূষিত ছিল——অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রবল প্রতাপে ভারতের নিকট সকলেই নতশির থাকিত——তখন ভারতমাতা জগন্মাতা ছিলেন। কবি প্রাণ-স্পর্শিনী ভাষায় বলিতেছেন!

ছিল যবে পরা কিরীট-কুণ্ডল
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল—সদৃশ শিখায়
জগতে আছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশী
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া
ছিলাম তখন জগত-মাতা!

আবার পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতির পার্শ্বে বর্ত্তমান অধঃপতনের বিষাদ-মলিন চিত্রখানি সমুদিত হইয়া, তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে; তিনি গম্ভীর আক্ষেপে পূর্ব্বগৌরবের পরিচায়ক সকল চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত করিয়া, স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশন হইতে নিবৃত্তি লাভের আশায় ভারতমাতার মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—

হে বিপুল সিন্ধু! করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায়?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল জলে?

কখনও বা ভীষণ বিষাদে—অরুন্তুদ খেদে কবি ভারতের মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়েছিলি
হেন অলঙ্কার? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হ'তনা তায়।
তা'হলে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়!

কবি বায়রন্ ইটালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন!—

Italia! Oh Italia! thou who hast
The fatal gift of beauty, which become
A funeral dower of present woes and past.

কবিবর হেমচন্দ্রও বলিতেছেন, ভারতের সৌভাগ্য, ভারতের সৌন্দর্য্য, ভারতের ঐশ্বর্য্যই ভারতের পক্ষে কাল হইয়াছিল। এই সকলের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই প্রলুব্ধ, প্রবলপরাক্রান্ত পর-জাতি ভারতে উৎপতিত হইয়াছে—ভারতবাসীকে পদদলিত করিয়াছে। যাহা হউক, ভারতে যখন যুবরাজের প্রথম শুভ-পদার্পণ হয়, কবি হেমচন্দ্র মনের আবেগে যুবরাজের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অতীত গৌরব-গাথা শুনাইয়া ভারতবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ে যত ভাবের উদয় হয়—মাতৃভক্ত কবির হৃদয়েও সেই সকল ভাবেরই উদয় হইয়াছে। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থলে ভারত-মাতাকে কিরূপ ভাবে দেখিবার অভিলাষ হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত কয়টি ছত্রেই প্রকাশ পাইবে।

ছিল সাধ বড় মনে, ভারতও এদেরই সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া
আবার উজ্জ্বল হবে, নব প্রজ্জ্বলিত ভাবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।
জন্মিবে পুরুষগণ, বীর যোদ্ধা অগণন
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া॥

কিন্তু সে আশার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে, সে সাধের কাল্পনিক-চিত্র

মানস পটে প্রকটিত হইতে না হইতে—হায়! সত্য—নিষ্ঠুর, নিদারুণ সত্য—কোথা হইতে বিষাদের কালিমা,—নৈরাশ্যের ঘনঘটা আসিয়া অর্দ্ধোদিত অস্ফুট সাধের ছবিখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল! কবি বিষাদে ও নৈরাশ্যে গাহিলেন;—

সে আশা হইল দূর, নীরব ভারত পুর
একজনো কাঁদেনা রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া!
এ ক্ষিতিমণ্ডল মাঝ আর্য্য কিরে নাহি আজ
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া?
সে সাধ ঘুচেছে হায়, আর মা জননী আর
লয়ে তোর মৃত্তিকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

প্রেমিক, ভক্ত সন্তানের অশ্রুজলে দেশের মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হয়—কবি ভারতের পূর্ব্বকথা ভাবিয়া কাঁদিয়াছেন এবং কাঁদিবার সঙ্গী পান নাই বলিয়া বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় তাঁহার অশ্রুধারা নিষ্ফল হয় নাই। আজ যে মাতৃ-পূজা-মহাযজ্ঞের আহ্বান-মন্ত্রে বঙ্গবাসী ধৃতব্রত, কবিবর হেমচন্দ্রই সেই অনুষ্ঠানমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। কবির মত, জননীর মৃত্তিকা লইয়া—মনের সাধ মিটাইয়া, কাঁদিতে কয়জন আছেন জানিনা; তবে এরূপ ভক্তের মহাপ্রাণ যে বহু প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবির প্রাণের এই মর্ম্মকথা কবির হৃদয়ের এই মর্ম্মব্যথা—বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী কি কোন কালে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না?

নৈরাশ্যের উপর নৈরাশ্য—নৈরাশ্যের গাঢ় ঘোর কৃষ্ণমেঘজাল—অসীম অনন্ত অনির্দ্দিষ্ট সান্দ্রতমঃপুঞ্জ—ভারতের এই নিদারুণ অধঃপতন যেন অনিবার্য্য বিধিলিপি—কঠিন অখণ্ডনীয় নিয়তি;—তথাপি প্রেমিক কবি—মাতৃভক্ত কবি—আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—তবুও আশার ক্ষীণ আলোক যেন তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে—নিয়তির কঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। তিনি তাই গাহিলেন।—

না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশায়েছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার
ভারত কিরণময় হইবে কি আর?

যত্ন আশা পরিশ্রমে, খণ্ডিয়া নিয়তি ক্রমে
উঠিয়া প্রবল হ'তে পারিবে কি আর
ওই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?

আহা মরি! কি সুন্দর স্বদেশ-প্রেম—কি প্রীতি—কি ভক্তি—কি বিহ্বলতা—কি আত্মবিস্মৃতি—কি আবেগ—কি উদ্বেগ—কি ব্যাকুলতা—কি অধীরতা—কি অশ্রুবিসর্জ্জন !

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেরূপ জীবন-সঙ্গিনী সহচরীর ন্যায় প্রকৃতিকে ভালবাসিতেন—নিভৃতে প্রকৃতির সহিত হাসিতেন—খেলিতেন—কাঁদিতেন—ভাবিতেন—এবং প্রকৃতিতেই তন্ময় হইতেন ; কবি হেমচন্দ্রও সেইরূপ জননী-ভাবে ভারত-ভূমিকে ভালবাসিয়াছিলেন—সেই মহৈশ্বর্য্যশালিনী মহামহিমান্বিতা মাতার পুত্র ভাবিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন—দশাবিপর্য্যয়ে মাতার বর্ত্তমান দুর্গতি ও নিগ্রহ দেখিয়া নীরবে অশ্রুমার্জ্জন করিতেন—কখনও বা পুনরভ্যুদয়ের আশায়, কুহকময় কল্পনার আবেশে কত সুখময় স্বপ্ন দেখিতেন ! তাঁহার প্রেমে যেন প্রত্যক্ষ পারম্পরার্থিক সম্বন্ধ ছিল—ভারত তাঁহার যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতা মাতা—তিনি যেন তাঁহারই ক্রোড়ে, তাঁহারই যত্নে—তাঁহারই স্নেহে, তাঁহারই স্তনে, পালিত লালিত বর্দ্ধিত। কবিবর হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেম বিশাল, গম্ভীর—অতলস্পর্শী,—অসীম, অনন্ত ; তাহা কখনও স্থির শান্ত, কখনও বা মৃদু মন্দ সমীরণে আন্দোলিত, কখনও বা বাত্যাবিক্ষোভিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

প্রাচীন সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ।

প্রথম বর্ষের "অবসরে" আমরা "কয়েকটি প্রাচীন হেঁয়ালী" প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আরও বহুল হেঁয়ালী, ছড়া ও প্রাচীন গীত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত এই সকল আপাততুচ্ছ ক্ষুদ্র পদার্থগুলির প্রকাশ দ্বারা নানা উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। সেকালের লৌকিক জীবনের একটা অস্পষ্ট ছায়া উক্তরূপ পদার্থরাজিতে যেন সংমিশ্রিত দেখায়। এরূপ হেঁয়ালী প্রভৃতির প্রচলন সকল দেশেই ছিল ও আছে। বাঙ্গালীরা একসময়ে এরূপ জিনিসের খুব পক্ষপাতী ছিল, হেঁয়ালী প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহা জাতিবিশেষের আদরের সামগ্রী,

তাহা তাহার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, একথা কিরূপে বলা যায়? বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এসকল বিষয়ের সমাবেশ নিতান্ত আবশ্যক। সেই অধ্যায় সঙ্কলনের সাহায্যকল্পে আমরা এযাবৎ নানাবিধ প্রাচীন ছড়া প্রভৃতির সংগ্রহ করিতেছি। "অবসরের" পাঠকবর্গকে অদ্য আরও কয়েকটি হেঁয়ালী ও গীত উপহার প্রদত্ত হইল।

এই প্রবন্ধে ৭টি হেঁয়ালী ২টি প্রাচীন গীত ও একটি দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ছড়া প্রকাশিত হইল।

হেঁয়ালীগুলির মধ্যে একটির রচয়িতা আলি মোহাম্মদ ও আর একটীর রচয়িতা শ্রীচাঁদ দাস বলিয়া লিখিত আছে। ভণিতাশূন্য অপর গুলির মধ্যে অর্থাৎ ১ম হেঁয়ালিটি সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওলের রচিত। উহা তাঁহার কৃত বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যেও দেখা যায়। আলি মোহাম্মদ ও শ্রীচাঁদ দাসের কোন পরিচয় জানা যায় নাই।

গীত দুইটির মধ্যে একটির ভণিতা নাই এবং অপরটি মাধব নামক কবির রচনা। মাধব নামের কবি বাঙ্গলা প্রাচীন সাহিত্যে অনেক। ইনি কোন্ মাধব, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই।

দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ছড়াটি কাহার রচনা, জানি না। উহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, উহা আরও দীর্ঘায়ত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদধিক আর আমাদের হস্তগত হয় নাই।

সবগুলিই আমরা অবিকল প্রকাশ করিতে যত্ন পাইয়াছি। প্রাচীনসাহিত্যে পাঠাশুদ্ধি অতি সাধারণ ভ্রম। এই সব হেঁয়ালী প্রভৃতির পাঠও যে সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ ও প্রমাদরহিত, তাহা বলা যায় না। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ হেঁয়ালী গুলির পাঠ ও অর্থ বিনির্ণয় করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব। নিম্নে আমরা হেঁয়ালী ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা,—

(১)

সারঙ্গ অরির হিত, তাহার বন্ধুর মিত,
তার সুত প্রচণ্ড প্রতাপ।
তাহান * তনয়া-পতি, মুনির সন্ততি অতি,
তান * রিপু মোরে দিল শাপ॥

* তান—তাহান—তাঁর; তাঁহার।

সখি হে, মোর বাক্য কর অবধান।
ভুবন দ্বিগুণ করি, তাহাতে তপন পূরি,
তার আধা * করিমু যে পান॥

(২)

অলি-বাহন-বাহন হাম্ ভরি চলিএ।
শশি-বাহন-বাহন সহ মুখে ঠেলিএ॥
পবন-সুতের সুত পড়ি গেল ভগ্না।
যদুকুলনন্দন কাঁধে লগ্না॥

(৩)

চক্ষু বদন আছে নাহি তার অন্ত।
সকল শরীর আছে নাহি তার দন্ত॥
পূর্ব্বে মনুষ্যে খাইত অখনে না খাএ।
কহে কবি মাধবে শুনহ সভাএ॥
বুঝ বুঝ পণ্ডিত ভাই ছিঅলি † অনুছিরি (?)।
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষ অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥

(৪)

দিবসেকে বৃদ্ধ যুবা হএ একবার।
মনুষ্যে ভক্ষণ করে চর্ম্ম নাহি তার॥
সেই তান জননীর আদ্য নাম রতি।
ত্রিপুরারি নাম ধরে তান নিজ পতি॥
কহে আলি মোহাম্মদে ছিঅলি অনুসন্ধি।
মূর্খে বুঝিব কিবা পণ্ডিত হএ বন্দী॥

(৫)

দ্বিতীয় দীঘল ‡ রজ্জু ধরে বেদবাণী।
উদর অধর তার ভিন্ন নাহি জানি॥
কর পদ নাহি তার মুণ্ড বিবর্জ্জিত।
মাংস নাহি রুধির নাহি জীবন বঞ্চিত॥
পুনি পুনি পিএ বারি উদিত সঘন।
শ্রীচান্দ দাসে কহে শুন বুধগণ॥

---

* আধা—অর্দ্ধেক। † ছিঅলি—কি হিঅলী—হেঁয়ালী? ‡ দীঘল, দীর্ঘ।

(৬)

দেখিতে সুরঙ্গ পক্ষী মনে লাগে শঠ।
মহাদেব নহে তার শিরে ধরে জট॥
বীর হনুমান্ নহে দুই পাএ * জুঝে।
রাবণের অরি নহে পণ্ডিতে ভাল বুঝে॥

(৭)

ধেনুর পতির প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু,
তাহার পতির নিজ সুতে।
তাহার যে বাণে মোর তনু হৈল জর জর,
হায় নারী সহিমু কেমতে॥
যখনে শুনিলাম বিরাট-তনয়া আমি দিতে
না পারিলাম ;
পবন সুতের সুত গলাএ বান্ধিআ।
শ্যামতনু-সুতে মাতা প্রবেশিমু গিআ॥

(৮)

আর কবে দিন দিবে তারা!
দিন গেল আমি পাইনা সারা॥
দেহ হইল পাপের ভরা।
কত দিনে দিন যাবে—
দিন যাবে তব পদ ভাবে?
সে পদ অভাবে প্রায় দিন গেল,
সে দিন আর না হইল ;
দিনে দিনে কুদিন হইল আমার।
আর কিবা সাধে এসুখ সম্পদে
এঘোর বিপদে আইলুম্।
দিনে দিনে যত বিপদে ঠেকে
মিছামায়ায় বন্দী হইলুম্॥
আপনে কত লাঞ্ছনা জননীরে দিলাম
কত যন্ত্রণা,

* পাএ—পায়ে ; পাঁয়ে।

গর্ভ-নিস্তার তাড়না।

থাকি কি কুশল জননীর কি ফল
ধরে মায়ার ফল রসাতল ভরা।
(অ মন!) কত দিনে প্রাণ যাবে, ভব হবে অন্ধকার!
কোথায় যাবে মাতা পিতা ভ্রাতা
ধন জন বন্ধু পরিবার॥
তারা হৈয়ে উদাসী, কর্‌বে শ্মশানবাসী
বেঁধে দিবে ভিক্ষার ঝুলি!
কত লইয়ে আম কাষ্ঠ সাজাইয়ে শয্যাকাষ্ঠ
তাতে নিয়ে দিবে তুলি॥
(অ মন!) প্রবল [illegible]নল জ্বেলে দিবে
মিছা মায়া দেহ কর্‌বে ভস্মরাশি।
তারা নি[illegible]য় আসিবে চলে
অ[illegible]গ কর্‌বে কত কান্নাকাটি।
দ্বারে দিবে ছাই
মইলে জ্ঞান শক্র ঘাঁটী—॥
বলয় মাধবে, কেহর কেহ নহে ভবে,
উচিত দিন থাকিতে তারার সারা।
আর কবে দিন দিবে তারা!

(৯)

গুরু বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।
মুই যার সঙ্গে পার হই যাব, চিন্‌লিনা মন তারে॥
পার কর মোরে মাঝি ভাই,
সঙ্গে আমার পয়সা নাই,
সঙ্গে নাই গো কড়ি, মন বেপারি চেয়ে রইলাম তোরে।
রাত্রি হৈল ভোর, আমার পন্থ বহুদূর
সঙ্গের সঙ্গী নহে গো কেহ যাইব কেমনে॥

(১০)

গুহ্য নামে মহা লিঙ্গ নামে মূলাধার।
পীত বর্ণ চতুর্দ্দল মুর্ত্তির আকার॥

হৃদের উপরে পদ্ম রক্তবর্ণ হএ।
তাহার উপরে পদ্ম বিষ্ণুর আলয়॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সারঙ্গ ধরে হাতে।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে মুকুট শোভে মাথে॥
তার পরে মহাদেব দিব্যকলেবর।
পঞ্চ বক্তু তিন আঁখি জটাজূট-ধর॥
শূন্যের উপরে শূন্য ব্রহ্মাণ্ড যে তথা।
ভাবিলে পরম তত্ব মনে পাইবা দেখা॥
হস্তী না আইসে যায় সূচের অগ্রেতে নাহি বেধ।
এই গুরু সংক্ষেপে চিনিলাম প্রত্যেক॥

শ্রীআবদুল করিম ~ শ্রীআজিজর রহমান।

আলীপুর।

বীরভূম, মহা প্রতাপশালী, স্বাধীন, মহারাজ বীরসিংহের নামানুসারে স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মহাবীর ভীম কর্তৃকই ইহার নাম বীরভূম হইয়াছে। মহাত্মা হান্টার সাহেবের লিখিত বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, ভীর নামক অসভ্য জাতীর বাস বলিয়া উহা বীরভূম নামে অভিহিত হইয়াছে। উহার উত্তরে মুঙ্গের এবং রাজমহল, দক্ষিণে বর্দ্ধমান এবং পাচিত * পূর্ব্বে রাজসাহী এবং পশ্চিমে মুঙ্গের ও পাচিত। এই স্বাধীন রাজ্য মধ্যে আক খোক্‌রা নামক গ্রামে বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বিনাশ করত তদীয় সহোদরী হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

মহাবীর বীরসিংহ, প্রথম হিন্দুরাজা। ফতেসিংহ ও চৈতন সিংহ, তাঁহার সহোদর। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বীরভূম, বীরসিংহ স্বীয় ভ্রাতা ফতে সিংহকে প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যে মুর্শীদাবাদও বীরভূমের অন্তর্গত। মহারাজ বীরসিংহ আসাদুল্লা খাঁ কর্তৃক বিনাশিত হম। আসাদুল্লা তৎসঙ্গে বিনাশিত হম।

---

* পাচিত—অধুনা ইহার নাম বাঁকুড়া।

বীরভূমের অধিপতিগণ।

(১) জোনদ খাঁ। (২) বাহাদুর খাঁ। (রণমস্ত খাঁ)। (৩) খোজা-কমল খাঁ। (৪) আসাদুল্লা খাঁ। (৫) সৈয়দ জমা খাঁ। (৬) আজমত জমা খাঁ। (৭) আহম্মদ জমা খাঁ। (৮) মহম্মদ আলি খাঁ। (৯) আশদ্ জমা খাঁ। (১০) বাহাদুর জমা খাঁ। (১১) মহম্মদ জমা খাঁ। (১২) দোয়ার জমা খাঁ। (১৩) জহর জমা খাঁ।

মহাবীর আলিনখি খাঁ এই বংশসম্ভূত। তিনি স্বীয় পিতার সহিত বিবাদ করিয়া, রাজ্য গ্রহণ না করিয়া, মুর্শীদাবাদের অধীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রধান সেনাপতি বলিয়া বিদিত হইলেন। নবাবের আদেশক্রমে ইংরাজগণকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন; তাঁহারা নির্ম্মল বায়ুর অভাবে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইহাই অন্ধকূপ হত্যা।

আলিনখি ইংরাজাধিকৃত রাজ্য গ্রহণ করত উক্ত রাজ্য "আলিপুর" নামে অভিহিত করিলেন। এখনও আলিপুরে, আলিনখির নাম লুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে এই স্থানে ছোট লাটের বাসভবন।—

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন।*

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবাব বলিলেন,—"বেগম সাহেব, বাঁদীকে সিরাজি আনিতে বল।"

লুৎফ-উন্নেসা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"আ'জ সিরাজি পান আর না করিলে ভাল হয়। সিরাজির জন্যেই মাথা খারাপ হইয়াছে।"

---

* গত ২য় সংখ্যা অবসরের "সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন" নামক প্রবন্ধের অনেকস্থলে মুদ্রাকর-প্রমাদ ঘটিয়া গিয়াছে। হাতের লেখা পড়িতে না পারায় এমন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ৭৯ পৃঃ ২৪ ছত্রে "শঙ্কর পুর" স্থলে "আনর পুর" হইয়াছে, এবং ৮৫ পৃঃ ২৫ ছত্রে "হুসেন কুলী"র মুখ ফুটিয়া উঠিল র স্থলে "পিতার মুখ" হইয়াছে। এক স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, অন্যান্য স্থানেও তাহাই হইয়াছে, অতএব নবাবের মৃত পিতার মুখ নহে, মৃ° হুসেন কুলির মুখ হইবে। ভুলটা অতি মারাত্মক, কিন্তু উপায় নাই, অনুগ্রহ করিয়া পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

"না না,—আমি সিরাজি অধিক খাই নাই। তুমি শীঘ্র ডাক।"

নবাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ স্বরে এই কথা বলিলেন। লুৎফ-উন্নেসা সে কথার আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। সিরাজদ্দৌলার কথায় প্রতিবাদ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। তখন বেগমসাহেব একজন বাঁদীকে ডাকিয়া সিরাজি আনিতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র তাহা প্রতি-পালিত হইল,—বাঁদী হৈমপাত্রে করিয়া উৎকৃষ্ট সুরা আনিয়া উপস্থাপিত করিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা তাহার অনেকখানি পান করিয়া, লুৎফ-উন্নেসাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"বেগমসাহেব, একটা গান গাও।"

গৃহদেওয়াল বিলম্বিত বীণাটি টানিয়া লইয়া, লুৎফ-উন্নেসা তাহার সুর বাঁধিলেন,—তারপরে আপন বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ তাহার সহিত সংমিলিত করিয়া গান গাহিলেন। নবাব নিস্তব্ধ হইয়া সে গান শুনিলেন।

অনেকক্ষণ ধরিয়া লুৎফ-উন্নেসা তাঁহার মধুর কণ্ঠে মধুর গীত গান করি-লেন। সিরাজি সেবন-ক্লান্ত নবাব সে গান শুনিতে শুনিতে পালঙ্কের উপরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। লুৎফ-উন্নেসা যখন জানিতে পারিলেন, নবাব নিদ্রিত হইয়াছেন,—তখন গান বন্ধ করত কর-ধৃত বীণাটি যথাস্থানে সংস্থা-পিত করিয়া নবাবের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং পুষ্প ব্যজনীর দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

লুৎফ-উন্নেসা দেখিতে লাগিলেন,—নবাবের নিদ্রা, সুখ-নিদ্রায় পরিণত হয় নাই। তিনি নিদ্রার ঘোরে যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে হস্তপদ সঞ্চালনও করিতেছিলেন,—ক্রমে তাঁহার অধরোষ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া উঠিল—কপোলদেশে বিন্দু বিন্দু স্বেদনীর দেখা দিল। লুৎফ-উন্নেসা বুঝিতে পারিলেন—নবাব স্বপ্নে বড় যন্ত্রণা পাইতেছেন। একবার তাঁহার মনে হইল, নবাবকে ডাকিয়া জাগাইয়া দেই—আবার ভাবিলেন, নবাব জাগিয়া যদি রাগ করেন—সে রাগের ঔষধ নাই! নবাব সিরাজদ্দৌলার ক্রোধে কাহারও অব্যাহতি নাই। লুৎফ উন্নেসা ডাকিতে সাহস করিলেন না। ব্যগ্র-বিচঞ্চল ভাবে নবাবের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।—সেইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপরে সহসা নবাব উঠিয়া বসিলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া আপন অবস্থা ও জাগরণ অবস্থা স্মরণ করিয়া লইলেন; তারপরে

অতি উদাস নয়নে লুৎফ-উন্নেসা বেগমের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—"লুৎফ-উন্নেসা !"

লুৎফ-উন্নেসা আরও কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিলেন,—"কেন জাঁহাপনা,—বাঁদীত চরণ প্রান্তেই উপস্থিত।"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নবাব বলিলেন,—"আমি বড় খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছি,—এখনও আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতেছে।"

লু। হাঁ্যা প্রিয়তম, তুমি যে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

ন। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? কি প্রকারে বুঝিতে পারিলে লুৎফ-উন্নেসা?

লু। তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে আমি বসিয়া বাতাস করিতেছিলাম। নিদ্রাকালে তোমার মুখে কষ্টের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল—তাই দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম, তুমি কোন দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছ। আমি জাগাইতাম,—কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

ন। ডাক নাই ভাল করিয়াছ,—ডাকিলে হয়ত আমার অদৃষ্টের সবটুকু দেখিতে পাইতাম না।

লু। তুমি কি স্বপ্ন বিশ্বাস কর? স্বপ্ন কিন্তু অমূলক চিন্তা মাত্র।

ন। অনেকে ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু তাহাদের কথাও অমূলক মাত্র। তবে স্বপ্ন যদি অমূলক চিন্তা মাত্র তবে যে বিষয় কখনও আমি চিন্তা করি নাই—কখনও কল্পনাতেও মনে আনিনাই, সে সব বিষয় আমার দৃষ্ট হইল কি প্রকারে?

লু। ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি, গাড়ীর চাকা ঘুরাইয়া দিলে, তাহার যেমন একটা বেগ হয়, তেমনি কোন এক বিষয় চিন্তা করিলে, চিন্তারও একটা বেগ জন্মে;—নিদ্রাকালে সেই বেগ অদম্য হইয়া নানাবিধ বিষয় মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া দেয়,—তাহাই স্বপ্ন। তাই জাগ্রত অবস্থায় যাহা ভাবা যায় নাই, তাহাও মনে উপস্থিত হয়।

ন। লুৎফ-উন্নেসা, তুমি জান না, স্বপ্ন অনেক সময় কোরাণের বাক্যের ন্যায় সত্য হয়। যাই হোক্, আমি আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়াছি। স্বপ্ন—কি ভীষণ স্বপ্নই দেখিয়াছি, লুৎফ-উন্নেসা!

লু। কি স্বপ্ন দেখিয়াছ, প্রিয়তম, আমি শুনিতে পাই না কি?

ন। শুনিবে? কিন্তু শুনিয়া দুঃখ পাইবে—আতঙ্কিত হইবে। আমি তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না।

লু। স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র,—পূর্ব্ব হইতেই মাথাটা কিছু গরম হইয়াছিল, তাহারই ফলে ঐরূপ ছাই ভস্ম স্বপ্ন দেখিয়াছ। চিন্তার কিছু মাত্র কারণ নাই। আর সকল কারণের কারণ, করুণাময় খোদাতালা। তাঁহাকে ডাক,—সকল চিন্তা, সকল আপদ দূর হইবে।

ন। খোদাতালা আমায় রক্ষা করুন। লুৎফ-উন্নেসা,—স্বপ্নে যে এমন বিভীষিকা—এমন ঘটনা-পরম্পরা—এমন সত্যের ছায়া-চিত্র অঙ্কিত হয়, ইহা আমি জানিতাম না। আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শোন। না বলিলে, মনের ব্যাকুলতা বিদূরিত হইতেছে না।

লু। প্রিয়তম, স্বপ্নে কি দেখিয়াছ বল। শুনিবার জন্য আমারও প্রাণ বড় আকুল হইয়াছে।

ন। সে স্বপ্ন নয় প্রিয়তমে। আমার বোধহয়, তাহা খোদাতালার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ। আমি জাগ্রত অবস্থায় আকাশের গায়ে যে ভীষণ ছবি—যে ভীষণ ভাব দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা তুমি জান—তখনই তাহা তোমাকে বলিয়াছিলাম। তারপরে যেমন আমার ঘুম আসিল, আর অমনি দেখিলাম—যেন নানা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে;—আকাশ হইতে দেবদূতেরা নামিয়া আসিয়া পারিজাত-গন্ধামোদিত রথে করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেল। আমি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবেশন করিলাম। সে সিংহাসনে শত শত বৃশ্চিক—তাহারা আমাকে কামড়াইয়া জ্বালাতন করিল,—তাহাদের বিষদংশনে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। সিংহাসন হইতে ঝাঁপ দিয়া নামিতে গেলাম—শত শত নিশ্বাস-বহ্নি একত্র জমাট পাকাইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া—নগর পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই জমাট নিশ্বাসের প্রবল আগুন। সে আগুনে আমাকে অধিকদূর যাইতে দিল না—নাগপাশের মত আমাকে বাঁধিয়া ফিরাইয়া আনিল। আমার বুক হইতে রক্তবন্যা উঠিয়া সিংহাসন বিধৌত করিল,—তারপর দেখিলাম—আমাদের সাধের সাজানো নগরের রূপান্তর হইয়াছে। এক ছিল, আর হইয়াছে। দেখিলাম,—কবিকুঞ্জে সরস্বতীর স্বপ্তস্বরা বাজিতেছে,—দূরে অভ্রভেদী মান-মন্দিরে বসিয়া কাহারা গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ওজন করিতে ব্যস্ত,—বৃহৎ অর্ণবপোত, অমূল্য

বাণিজ্য ও অদ্ভুত ভৌগলিক বিবরণ লইয়া আসিয়া বন্দরে বন্দরে নঙ্গর বদ্ধ; উন্নত জ্ঞানে, স্পর্দ্ধিত বীর্য্যে, উদার নীতিতে, অক্ষুণ্ণ সমৃদ্ধে—অবাধ কোষ দণ্ডজ প্রভাবে আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে!—দলে দলে মন্ত্রীবর্গ, দুর্গস্থিত সৈন্য, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিৎ, নাবিক, বণিক, ভৌগলিক, ধর্ম্মাধিকরণ,—নগর যুড়িয়া, দেশ যুড়িয়া বসিয়াছে। চারিদিকে বিজয় দুন্দুভি বাজিতেছে। যে দুই খানি ভীষণ ছবি আকাশপটে দেখিয়াছিলাম,—তাহারা এবং তাহাদের মত আরও কতকগুলি একত্র হইয়া—তাহাদের দীর্ঘ তপ্তশ্বাসের বহ্নিতে আমার সমস্ত দেহটাকে গলাইয়া একটা তাল পাকাইয়া লইল। আমি একটি গোলকের ন্যায় হইয়া গেলাম—আমাকে গড়াইতে গড়াইতে লইয়া গিয়া এক ভীষণ অন্ধকূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ দিয়া প্রবল ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

লু। জাঁহাপনা, তুমি খোদাতালার নাম কর। ও সকল কিছুই নহে। মনের চঞ্চলতা জনিত অমূলক চিন্তা মাত্র। নূতন বেগমের মৃত্যুতে বোধ হয়, তোমার প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাই এ স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। একটা কথা বলিব?

ন। কোন কথাই আমার ভাল লাগিতেছে না,—কি বলিবে বল?

লু। আমি বলি, আর ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

ন। কোন্‌ সকল কার্য্যের?

লু। মদ্যপান ও পরস্ত্রী হরণ।

সিরাজ সেকথার কোন উত্তর করিলেন না। তিনি বিষন্ন মুখে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময় বর্ষা ও তরবারিধারিণী তাতার দেশীয় এক রমণী আসিয়া গৃহের বাহির হইতে সেলাম জানাইল।

তাতার, জর্জ্জিয়া ও হাবসী দেশের রমণীগণকে সিরাজদ্দৌলা হিরাঝিলের পুরী রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বর্ষা ও তরবারি লইয়া অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিত।

তখনও রাত্রি অধিক হয় নাই। তখনও নবাব বাড়ীর ঘড়িতে দ্বিপ্রহর বাজে নাই। তখনও নবাব বাড়ীর নরনারী সকলে নিদ্রিত হয় নাই।

সিরাজদ্দৌলা লুৎফ-উন্নেসার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাহিরে কে?

লুৎফ-উন্নেসা একজন বাঁদীর নাম করিয়া ডাকিলেন। ডাকিবা মাত্র সে আসিল। যে আসিল, তাহার নাম জেরিনা। জেরিনা যুবতী ;—সে লুৎফ-উন্নেসার অত্যন্ত প্রিয় সহচরী। লুৎফ-উন্নেসার কক্ষের পার্শ্বের কক্ষে তাহার বাসকক্ষ। লুৎফ-উন্নেসা বলিলেন,—"বাহির হইয়া দেখ, কে আসিয়াছে ?"

জেরিনা বাহিরে গেল, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"একজন রক্ষকী, নবাব আলবর্দ্দী খাঁ বাহাদুর আমাদের নবাব বাহাদুরকে এখনই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন,—তাঁহার অবস্থা ভাল নয়। একজন বাঁদী সেখান হইতে আসিয়াছে।"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—"তাহাকে এখানে ডাকিয়া দিতে বল্।"

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। বাঁদী আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা, বৃদ্ধ নবাব বাহাদুরের আজ্ঞা, আপনি এখনই তাঁহার সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করেন।"

সিরাজ লুৎফ-উন্নেসার মুখের দিকে চাহিলেন। লুৎফ-উন্নেসা বলিলেন,—"তুমি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ। পীরের পদস্পর্শে সমস্ত দুশ্চিন্তা অপনোদিত হইবে।"

নবাব গাত্রোত্থান করিলেন। তারপরে বহির্ব্বাটীতে গমন পূর্ব্বক অনেকগুলি লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া সিরাজদ্দৌলা পুণ্যাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁর প্রাসাদে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবাব ভবনের সুন্দর ও সুরম্য এক কক্ষমধ্যে একখানি বহুমূল্য পালঙ্কে সুমসৃণ ও সুকোমল শয্যার উপরে হিন্দু-মুসলমানের আদর্শ পুণ্যাত্মা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ শায়িত। গৃহমধ্যে স্ফটিকাধারে অনেকগুলি বাতি জ্বলিতেছিল। সুগন্ধে গৃহখানি ভরপুর ছিল। নবাবপত্নী, পালঙ্ক-পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর সেবা করিতেছিলেন,—তিন চারিজন বাঁদী দূরে দূরে আজ্ঞা পালনার্থ অপেক্ষা করিতেছিল। সিরাজদ্দৌলা একাকী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ত্বরিত গতিতে মাতামহের শয্যায় মাতামহীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। তৎপরে মাতামহকে ডাকিতে যাইতেছিলেন,—বেগমসাহেব হাত নাড়িয়া ডাকিতে নিষেধ করিলেন, এবং অতিশয় মৃদু স্বরে বলিলেন,—"একটু ঘুম আসিয়াছে, ডাকিও না।"

সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলেন। গৃহমধ্যে উজ্জ্বল আলোকগুলি নিঃশব্দে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছিল। বাহিরে আকাশে অষ্টমীর চাঁদ উঠিতেছিল,—বিধবার হাসির মত ক্ষীণ জ্যোৎস্না, প্রাসাদের ছাদের উপর পড়িয়া, যেন কোন সুখের বাসরের অতীত স্মৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিতেছিল। আকাশে বাতাস নিস্তব্ধ,—অসংখ্য তারকা অবাক্ হইয়া পৃথিবীর মুখপানে চাহিয়া ছিল।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর উদরী রোগ—নিদ্রা প্রায় ছিলনা, অতি শীঘ্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই পার্শ্বে প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজকে দেখিতে পাইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—"আসিয়াছ?"

সিরাজ সে ক্ষীণ স্বরে ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি ডাকিয়াছেন, বলিয়া আসিয়াছি।"

আ। বোধহয়, তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে?

সি। আপনার জন্যে আমি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছি যে, শয়ন করিলেও ভাল নিদ্রা হয় না। আপনার অসুখ বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে, সে জন্য আমার মনে বিন্দু মাত্রও শান্তি নাই।

আ। তা' আমি বুঝিতে পারিতেছি,—আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি আমার রোগ-শয্যায়—আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বসিয়া থাক। কিন্তু কি করিব, সিরাজ! সকলই খোদাতালার ইচ্ছা। বাঁচা-মরা মানুষের ইচ্ছার মধ্যে নহে।

সি। আপনি ঔষধ সেবন বন্ধ করিলেন কেন?

আ। আর ঔষধ খাইয়া কি করিব? ঔষধ অনেক খাইয়াছি,—বৃদ্ধ বয়সের উদরী রোগ,—কখনও কাহারও সারে না। তথাপি দেশীয় এবং বিদেশীয় অনেক চিকিৎসকের অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াছি,—রোগের উপশম কিছুতেই হইল না। তখন আর কেন? এখন খোদাতালার নামই একমাত্র মহৌষধি।

সি। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া আমি পাগলের মত হই,—আমার প্রাণ বড় উতলা হয়।

আ। না না,—উতলা হইবে কেন? যাহাতে মানুষের হাত নাই,—যাহা ঘটিবেই, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতে নাই। তুমি কি ঘুমাইতেছিলে?

সি। না, আমি জাগিয়াই ছিলাম।

আ। এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ কেন? অসুখ হইবে যে। তোমার মাথায় অতি গুরুভার অর্পিত হইল,—বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তৃত জনপদ তোমার ভুজ-রক্ষিত হইল,—যাহাতে স্বাস্থ্য ও মন ভাল থাকে,—সর্ব্বদা সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সিরাজদ্দৌলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সে ভার যেন আমার পক্ষে শুভদায়ক হইবে না।"

আলিবর্দ্দী খাঁ উপাধানের উপর মস্তক একটু সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"কেন? ওকথা কেন সিরাজ?

সি। আপনি রোগ-ক্লিষ্ট,—হয়ত আমার সে কথা শুনিলে, আরও ক্লান্ত হইবেন?

আ। যতক্ষণ জীবিত আছি—ততক্ষণ তোমার শুভাশুভ চিন্তা করিতে আমি প্রস্তুত। কি হইয়াছে, বল? কেহ কি তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছ?

সি। না, খোদাবন্দ, সেরূপ কেহ করে নাই।

আ। তবে?

সি। একটু আগে, আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম—নিদ্রিতাবস্থায় এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্ন কি সত্য হয়?

আ। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা—তার জন্যে কোন ভয় নাই। কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?

সি। আরও আছে।

আ। কি আছে?

সি। আমি শুইবার আগে হিরাঝিলের কৃত্রিম পাহাড়-পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম—হঠাৎ দেখিলাম, আকাশের গায়ে হোসেন কুলী খাঁর মূর্ত্তি—সে যেন আগুনের গড় হইয়া, আমার উপর বিকট দৃষ্টিতে চাহিতেছে—সে দৃশ্য অতি ভীষণ!

আ। তুমি সুরাপান করিয়াছিলে কি?

সিরাজদ্দৌলা নিরবে রহিলেন।

আ। স্বপ্নে কি দেখিয়াছ?

সিরাজদ্দৌলা স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমুদায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া বলিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরবে নিস্তব্ধে কি চিন্তা করিলেন। তারপরে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"শোন সিরাজ, আমার অন্তিম উপদেশগুলি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আজীবনকাল পর্য্যন্ত আমার এই সকল উপদেশ স্মরণ রাখিও।"

সিরাজদ্দৌলা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর পদপ্রান্তে সরিয়া গেলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ বলিলেন,—

"তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা অমূলক চিন্তা হইলেও ঐ চিন্তার স্রোতে একটা সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে। তুমি স্বপ্নে যে দৃশ্য দেখিয়াছ,—সে ইংরেজ জাতির চিত্র। ইংরেজ জাতিই বিদ্যা ধন জ্ঞান ও মানে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিতেছে। অতএব তোমাকে এখন হইতে সাবধান হইতে হইবে।"

সিরাজদ্দৌলা সরল বালকের ন্যায় মাতামহের মুখের দিকে উদাস চাহনিতে চাহিয়া রহিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ বলিলেন,—

"আমার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া আসিয়াছে,—আর দিন নাই। কত দিন তোমাকে কত উপদেশ দিয়াছি। আ'জ তোমাকে আবার উপদেশ দিতেছি,—সাবধান হইও। যদি জীবন ও পুণ্য, রাজ্য ও কীর্ত্তি রক্ষা করিতে বাঞ্ছা কর,—তবে আমার উপদেশগুলি প্রতিপালন করিও।"

সিরাজ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আজ্ঞা করুন।"

আ। তুমি আমার পাদস্পর্শ করিয়া বল, আর কখনও মদ খাইবে না। মদে মানুষকে পশু করে। মানুষের সদ্বৃত্তি সমুদয়কে অসদ্বৃত্তিতে পরিণত করে। স্বাস্থ্য ও মনের বিনাশ সাধন করে,—তাই সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই মদ্য পান দূষনীয়। তুমি মুসলমান—মুসলমানের মদ্য স্পর্শ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। বিশেষতঃ তুমি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার ভাগ্য-বিধাতা হইলে—সহস্র সহস্র নরনারীর সুখ-শান্তির ভার খোদাতালা তোমার উপরে অর্পণ করিতেছেন,—তুমি যদি মদ্যপানে চিত্তকে কলুষিত করিবে, তবে খোদাতালা তোমার উপরে নিশ্চয়ই অভিশম্পাত করিবেন। প্রতিজ্ঞা কর—সিরাজ, আমার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনও মদ্যপান করিবে না।"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—"আর কখনও মদ্যপান করিব না।"

আলিবর্দ্দী খাঁ বলিলেন,—"আর এক কথা। খোদাতালা তাঁহার নিজ শুভ ইচ্ছাদ্বারা কোটী কোটী লোকের সুখ, শান্তি ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য এক ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা প্রদান করেন। খোদাতালার সেই শুভ ইচ্ছাশক্তির বলেই একজন কোটি কোটি লোকের উপরে প্রাধান্য করিতে সক্ষম হয়। সেই শুভ ইচ্ছাশক্তির জন্যই কোটি কোটি লোক এক ব্যক্তিকে সম্মান ও ভক্তি

করিয়া থাকে। নতুবা এক ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে কোটি কোটি লোক তাহার মুখাপেক্ষী ও পদানত থাকে? কিন্তু সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা খোদাতালার সেই শুভ ইচ্ছাশক্তি রক্ষার চেষ্টা করিবে। যে তাহা না করে, তাহার কাজেই সে শক্তি থাকে না। তাহার রাজ্য ও রাজশক্তি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে যে জাতির ইতিহাসই খুলিবে, আমার একথার সত্যতা উপলব্ধি করিবে। অতএব খোদাতালার শুভ ইচ্ছাশক্তি যাহাতে তোমার পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকে, তাহার জন্য সতত চেষ্টা ও প্রার্থনা করিবে।"

সি। কিপ্রকার চেষ্টায় সে শুভ ইচ্ছাশক্তি রক্ষা করিতে পারা যায়?

আ। আগে বুঝিয়া লও, সে শুভ ইচ্ছা কি! এই পৃথিবীতে যত কিছু পদার্থ দেখিতে পাও, সে সমস্তই খোদাতালার। খোদাতালা এ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন,—এসকল লইয়া তিনি লীলা করিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থা এই জগতে পুণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক,—জীব জীবের জন্য রক্তশূন্য আত্মবলি প্রদান করুক। জীব জীবকে ভাই বলিয়া ডাকিতে শিখুক,—সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান হউক। কতকগুলি মেষকে চরাইতে যেমন একজন মেষ-পালকের প্রয়োজন, কতকগুলি বালককে শিক্ষা দিতে যেমন একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, এক সংসারের লোককে সৎপথে রাখিতে যেমন একজন কর্ত্তার প্রয়োজন,—তদ্রূপ কতকগুলি লোকের সুখশান্তি ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য একজন রাজার প্রয়োজন। খোদাতালার ইচ্ছা, সর্ব্বত্র শান্তি ও সুখ বিরাজ করুক,—সেই ইচ্ছা পালকের যে শক্তি, সেই শক্তি রাজায় অর্পিত হয়। রাজা যদি সেই শক্তির অপব্যভহার না করেন, তাহা হইলে তিনি নিরাপদ,—নতুবা নিশ্চয়ই তাঁহার শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি দিয়াছিলেন, তিনিই হরণ করিয়া লন। তুমি যদি ভাব, একটি দীনের বুকে বাঁশ দিয়া ডলিলে, সে আমার মত, বিশাল শক্তিমান্ মানবের কি করিতে পারিবে? এমন ভাবিও না,—বিনা কারণে যদি জীব তোমার দ্বারা কষ্ট পায়, তবে তাহার একটি ক্ষীণ শ্বাসও তোমার শক্তি ক্ষয় করিতে সমর্থ হইবে। শক্তি তোমারও নয়, তাহারও নয়। যিনি দিয়াছিলেন,—তিনিই কাড়িয়া লইবেন। ভারতে দিল্লীর বাদশাহের শক্তির কথা শুনিয়াছ ত,—কিন্তু মানবের প্রতি অত্যাচার করিয়া—দীনের নিশ্বাস কুড়াইয়া, তাহা ক্ষয় হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া সেই অতুল শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গেল, কেহ বুঝিতে পারিল কি? পাত্রস্থ কর্পূর যেমন উপিয়া যায়, তেমনই উপিয়া গেল। এমনই যায়। যিনি দেন, তিনিই কাড়িয়া

জন। তুমি তোমার কার্য্য সাধনের জন্য কর্ম্মচারী রাখিয়া যদি তাহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইল না বুঝিতে পার, তবে কি তাহাকে পরিবর্ত্তন কর না? খোদাতালা মনুষ্যসমাজকে শান্তিতে রাখিবার জন্যই রাজারূপ এক দাসকে রাখিয়া দেন,—সে যদি তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তবে তাহাকে রাখিবেন কেন?—সিরাজ, আমার কথা বুঝিয়াছ কি?

সিরাজদ্দৌলা ছল ছল নেত্রে বলিলেন,—"হাঁ, বুঝিয়াছি।"

আ। ঐ কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। প্রজা বড়ই হউক, আর ছোটই হউক, সন্তানের মত দেখিবে। নিজে যাহাতে সন্তুষ্ট হও—তাহাদিগকেও সেইরূপে সন্তুষ্ট রাখিবে। তুমি তাহাদিগের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে বাসনা কর, তাহাদিগকেও সেইরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিবে।

সিরাজদ্দৌলা নীরব হইয়া বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে মাতামহের রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ পুনরায় বলিলেন,—"শোন সিরাজ, তুমি এখন বালক নহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত সমস্তই বুঝিতে পার। আমি বহুদিন ধরিয়া বঙ্গরাজ্য শাসন ও পালন করিয়াছি,—এই দীর্ঘকাল কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিয়া যাই। রাজা, প্রজার মা-বাপ। মাতৃ-স্নেহ, মাতার পালয়িত্রী শক্তি এবং পিতৃ-স্নেহ ও পিতার শাসনশক্তি উভয়ই রাজাতে থাকা চাই। তরবারিবলে রাজ্যশাসন হয় না,—লৌহ-হস্তে প্রজার নিকট হইতে শান্তি আদায় করা যায় না। দেশ বা জনপদ রাজার নহে, প্রজার। প্রজা লইয়াই রাজত্বের মূলভিত্তি—রাজা তাহাদের মধ্যে সুখ ও শান্তি আনয়নের কর্ম্মচারী মাত্র। প্রজা জ্ঞানবান্ ও ধার্ম্মিক হইলে রাজার আবশ্যক হয় না। কালে যখন তাহা হইবে, তখন প্রজাতন্ত্রের রাজ্যই হইবে। সেকথা যাক্,—প্রজা দরিদ্র, প্রজা হীনবল—তা বলিয়া উপেক্ষনীয় নহে। ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস—আগ্নেয়গিরি উৎপাদনে সক্ষম, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও। তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ,—আমারও বিশ্বাস তাই,—ইংরেজগণকেই তোমার শত্রু বলিয়া মনে করি।"

সিরাজ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি তাহাদের সম্বন্ধে কি করিব?"

আ। কি করিবে, তাহাও স্থির করিয়াছি। আমি কত নিশি জাগিয়া তোমার কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছি। হোসেন কুলীর বিদ্যা ও প্রতিভা উভয়ই ছিল,—সে জীবিত থাকিলে, তোমার রাজ্য নিরাপদ হইত না।

সি। সে কি করিত?

আ। কুলী খাঁ শওকতজঙ্গকে ভালবাসিত—শওকতজঙ্গের প্রতি তাহার আন্তরিক টান ছিল। হোসেনকুলী যদি এখন জীবিত থাকিত, তোমার সিংহাসন লাভ সহজ হইত না। কিন্তু এখন প্রবল শত্রু ইংরেজ। আমি জানি, তুমিও ইংরেজচরিত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহাদিগকে নজরে নজরে রাখিবে, তাহাদিগকে শাসনে রাখিবে—আর পারত একেবারে নির্ম্মূল করিও। তাহাদিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দিও না, সৈন্য সংগ্রহ করিতেও দিও না। তাহাদিগকে যদি শক্তি-সঞ্চয় করিতে অবসর দাও—এদেশ তোমার থাকিবে না।"

সিরাজদ্দৌলার মুখে তড়িত্তেজ বহিয়া গেল। উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"জাঁহাপনা, আমি তাহা জানি। আজ আপনার উপদেশে আমি আরও বুঝিয়া লইলাম।"

আলিবর্দ্দী খাঁ বেগমসাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। বেগমসাহেব স্বামীর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতেছেন?"

আ। আমার কোরাণ?

বে। ঐ পবিত্র বাক্সের মধ্যে আছে।

আ। বাহির কর।

বেগমসাহেবা উঠিয়া গিয়া কোরাণখানি বাহির করিয়া আনিলেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সেখানি গ্রহণ করিয়া, ডাকিলেন,—"সিরাজ!"

সিরাজদ্দৌলা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"জাঁহাপনা?"

আ। কোরাণ গ্রহণ কর।

সিরাজদ্দৌলা কোরাণ গ্রহণ করিলেন।

আ। তুমি কি তোমাকে মুসলমান বলিয়া জান?

সি। আজ্ঞা হাঁ, আমি আমাকে মুসলমান বলিয়া জানি।

আ। কি হাতে করিয়াছ, জান?

সি। জানি, কোরাণ!

আ। কোরাণ হাতে করিয়া শপথ কর,—আর কখনও মদ খাইবে না।"

সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন দৃঢ়তার জ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিল। তিনি

গর্ব্বিত স্বরে, দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"কোরাণ হাতে করিয়া, আপনার নিকট শপথ করিলাম, জীবনে আর কখনও মদ্য স্পর্শ করিব না।"

আলিবর্দ্দী খাঁর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিল। স্নেহাধার সিরাজের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে জীবনযাপন করিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। কিন্তু কাহার জন্য এত যুদ্ধ করিলাম, কাহার জন্য যুদ্ধশিবিরে কত নিশি জাগরণে কাটাইলাম, কাহার জন্যই বা কৌশল-নীতিতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিলাম? তোমার জন্যই ত এত করিয়াছি। আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, তোমার রাজ্য নিরাপদ করিয়া যাইতাম,—কিন্তু তাহা হইল না। তোমার কার্য্য তোমাকে একাকীই সম্পন্ন করিতে হইবে। সাবধান, সিরাজ; পাপ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথে বিচরণ করিও,—দরিদ্র বলিয়া—প্রজা বলিয়া—বিজিত বলিয়া—নিঃসম্বল বলিয়া মানুষকে উপেক্ষা করিও না। ইংরেজের শক্তি হ্রাস করিতে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইও।"

সিরাজদ্দৌলা গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"আপনার আদেশ প্রতিপালনে প্রাণপণ যত্ন করিব।"

আ। যাও, এখন শয়ন কর গে। রাত্রি অনেক হইয়াছে,—কি জানি এই কথাগুলি বলিবার জন্য মনে কেমন একটা উদ্বেগ হইয়াছিল, তাই এই গভীর রাত্রে তোমাকে ডাকাইয়াছিলাম।"

সিরাজদ্দৌলা আরও কিয়ৎক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া তৎপরে হীরাঝিলের প্রাসাদে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন হীরাঝিলের সদর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে একটা বড় গোলযোগ হইতেছিল।

কারারক্ষীর দুই জন দূত আসিয়া জানাইয়া ছিল, কারাগৃহ ভঙ্গ করিয়া কয়েদীর দল বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—আমরা ফৌজদার সাহেবকে একথা জানানায় তিনি কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই,—সুতরাং কয়েদিগণ নিরাপদে প্রস্থান করিয়াছে। সে কথা লইয়া হীরাঝিলের অনেক কর্ম্মচারীরই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া ছিল। তাঁহারা উঠিয়া, একত্র জমাট পাকাইয়া তৎকার্য্যের বিবিধ প্রকার সমালোচনা ও জল্পনা কল্পনা করিতেছিলেন। কেহ বলিতেছিলেন,—

ইহার মধ্যে বিদ্রোহীর হাত আছে, সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছিলেন,—ফৌজদার সাহেবও সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, নতুবা তিনি ফৌজ লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিলেন না কেন? কেহ বলিলেন, মীর জাফর খাঁ অবশ্যই এ সকল ষড়যন্ত্রের কথা অবগত আছেন, নতুবা সহসা এমন কার্য্য সংঘটন হইতে পারে না। আর একজন বলিলেন—যতই কেন হউক না, নবাব বাহাদুর জানিতে পারিলেই সকলকে ধৃত করাইয়া আনিয়া শূলে চড়াইয়া দিবেন। নবাব বাহাদুর অর্থে—নবাব সিরাজদ্দৌলা, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তখন রোগ-শয্যায় শায়িত—তাঁহার পুণ্য জীবনপ্রদীপ তখন নির্ব্বাণোন্মুখ। সিরাজদ্দৌলাই তখন রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতেন।

নবাব বাহাদুরও ঠিক সেই সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিল—"বিদ্রোহ—সম্পূর্ণ বিদ্রোহ উপস্থিত। জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদিগণ পলায়ন করিয়াছে। যথাসময়ে সংবাদ পাইয়াও ফৌজদার সাহেব ফৌজ লইয়া বাহির হয়েন নাই। কাজেই পলায়িত কয়েদিগণও ধৃত হয় নাই। তাহারা স্বচ্ছন্দে—নিরাপদে অভিলষিত স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

নব দীক্ষিত মানব-আত্মায় দীক্ষাগুরুর আত্মিক পুণ্যশক্তি সঞ্চারিত হইলে, শিষ্য হৃদয় এক অপূর্ব্ব কম্পনে কম্পিত হইতে থাকে,—পুণ্যাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁর পুণ্যশক্তি সঞ্চরণে সিরাজদ্দৌলার হৃদয়ও এই সময় প্রবলরূপে কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার কাম-কলুষিত হৃদয় তখন পুণ্যের প্রভাবে দোলায়মান হইতেছিল। পুণ্যশক্তির প্রভাবে পাপশক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। মানব-হৃদয়ে যখন পুণ্যশক্তির সঞ্চার হয়, তখন পাপ-শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসে,—সময়ে আবার পাপাত্মার শক্তি প্রেরণায় যদি পাপশক্তির উদ্বোধ না হয়, তবে পাপশক্তি একেবারে মরিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা লালসা-বাসনার জগতে—কাম-কামনার মানবসমাজে সর্ব্বত্র ঘটিয়া উঠে না বলিয়াই যত গোলযোগ! তাই যোগী যোগ ভ্রষ্ট হয়, পুণ্যাত্মা পুণ্যপথে বঞ্চিত হয়।

সিরাজদ্দৌলার হস্তে পবিত্র কোরাণ প্রদান করিয়া, পুণ্যাত্মা আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজের হৃদয়ে যে পুণ্যশক্তি সঞ্চরণ করিয়া দিয়াছেন, তখনও তাঁহার হৃদয়ে তাহার প্রবল কম্পন হইতেছিল। তিনি উদাসীনের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্দিগণ এখন কোথায়?"

কারারক্ষীর একজন দূত বলিল,—"খোদাবন্দ; গোলাম তাহা অবগত

নহে। তাহারা উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সহরের সদর পথ বহিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

ন। ফৌজদার সাহেবর নিকট সংবাদ দিতে কে গিয়াছিল ?

কা। যে গিয়াছিল, তাহার নাম জানি না। তবে সাত আটজনকে কারাধ্যক্ষ তখনই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহা তুমি নিজে শুনিয়াছিলে কি ?

কা। আজ্ঞা না। তবে কারাধ্যক্ষ আমাদিগকে এখানে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিলেন, বলিও—ফৌজদার সাহেব সংবাদ পাইয়াও আসেন নাই।

ন। কত জন বন্দী পলায়ন করিয়াছে ?

কা। কাণাখোঁড়া এবং রোগশয্যাশায়ী কয়েদী ভিন্ন আর সমস্তই পলায়ন করিয়াছে। আন্দাজ হাজার কয়েদী হইতে পারে।

ন। কি প্রকারে তাহারা কারাদ্বার মুক্ত পাইল ?

কা। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের পরে সমস্ত কয়েদীর মিলিত চীৎকার বাহির হইতে শোনা যাইতে লাগিল।

ন। তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

কা। আমি আহার করিতেছিলাম। ঐরূপ ঘন ঘন চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া তাড়াতাড়ি আহার সমাপ্ত করিয়া, কারণ জানিবার জন্য কারাধ্যক্ষের নিকটে গমন করিলাম। তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম,—তিনি বলিলেন, বোধহয় কি কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কা'ল সকালে কিছু কিছু বেত লাগাইয়া দিলেই ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে। কিন্তু চীৎকারের তখনও বিরাম হইল না,—বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তখন আমরা ঐ চীৎকার থামান কর্ত্তব্য বলিয়া, কুড়ি পঁচিশ জনে একত্র হইয়া, খাস কয়েদখানার দরোজা খুলিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম। আমাদের সকলের হাতেই অস্ত্র ও বেত ছিব। কিন্তু সেই দরোজা খুলিবামাত্রই বাঁধ ভাঙ্গা জল-স্রোতের ন্যায় কয়েদিগণ বাহির হইয়া পড়িল,—আমরা কোন ক্রমেই সে বেগ সহ্য করিতে পারিলাম না,—সরিয়া পড়িলাম। আমাদের দুইজন সঙ্গী গুরুতর রূপে আহত ও একজন নিহত হইয়াছে। আমিও সামান্য রকম আঘাত পাইয়াছিলাম।

ন। কারাগারেওত প্রায় দুই শত সৈন্য থাকে। তাহারা কি কয়েদিগণের প্রতিরোধ করিল না ?

কা। হুজুর,—সে সময়কার কয়েদীদিগের বল-দর্পিত অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বোধ হইতেছিল, যেন সেই সহস্র কয়েদীর দেহ বিভিন্ন হইলেও শক্তি এক। যেন তাহারা এক প্রাণে; এক মনে, এক উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল। বৃষ্টির জল বিন্দু সকল এক হইয়া মাঠ ভাসাইয়া চলিয়া যাইবার সময় যেমন তৃণ রাশি তাহাদের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের বেগের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যায়,—সমবেত কয়েদিগণের সমবেত শক্তিতে আমাদের সৈন্যগণও তেমনি ভাসিয়া গিয়াছিল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"কয়েদিগণ কেন এরূপ করিল, তাহার কোন কারণ তোমরা জানিতে পারিয়াছ কি?"

কা। আজ্ঞা না, সবিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। তবে কয়েদিগণ চলিয়া গেলে, আমিও কারাধ্যক্ষ খাস কয়েদ-ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম,—সেই শূন্য বিস্তৃত গৃহে তখন কয়েকজন অন্ধ, খঞ্জ ও পীড়িত কয়েদী মাত্র ছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

আ'জ তিন চারিদিন ধরিয়া একজন অল্প বয়স্ক কয়েদী, অন্যান্য কয়েদিগণকে লইয়া নানারূপে পরামর্শ করিত। সে কি কি বলিত, সব জানি না,—তবে এই কথা অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি যে, "নবাবী-কারাগার হইতে জীবনে বাহির হওয়া যাইবে না। আজীবন কাল এখানে পচিতে হইবে—তারপর না খাইয়া মরিয়া যাইতে হইবে। তার চেয়ে বাহির হইবার চেষ্টা করিলে হয় না? কেহ কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিত,—বলিত, বাহির হইতে গিয়া ধরা পড়িলে, মৃত্যু নিশ্চয়। তখনই সেই যুবক কয়েদী উত্তরে বলিত—আর কারাগারে থাকিলেই বুঝি বাঁচিতে পারা যাইবে? আজীবন আবদ্ধ থাকিয়া—আজীবন ধীরে ধীরে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে এক দিনে একবারে মরাই কি ভাল নয়? আর যদি বাহিরে যাইতে পার—স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিব।" তাহার কথা অতিশয় উত্তেজনায় পূর্ণ। তাহার কথায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া এইরূপ করিয়াছে।

ন। বাস্তবিক কারাবাস ভয়ঙ্কর কথা! কারা সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

কা। এখন গোলামের প্রতি কি হুকুম হয়?

ন। তুমি কারাগৃহে ফিরিয়া যাও।

সিরাজদ্দৌলার একজন উচ্চ কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"এই কার্য্যে বাহিরের লোকের যোগ আছে বলিয়া বিবেচনা হয়।"

সিরাজদ্দৌলা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"কাহার যোগ আছে বলিয়া বিবেচনা কর?"

ক। প্রথমতঃ ফৌজদার সাহেবের। নতুবা তিনি ফৌজ লইয়া কেন তাহাদিগকে ধরিতে গেলেন না?

ন। আর কাহার?

ক। বোধহয়, আর একজন বড় লোকের।

ন। তাঁহার নাম কি?

ক। গোলামের অনুমান—মীরজাফর খাঁ।

নবাব সে কথা শুনিয়া একটু চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন—"বৃথা গণ্ডগোল তুলিয়া কাজ নাই। যাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, আর তাহাদিগকে অধীনতার পাশে বাঁধিয়া প্রয়োজন নাই।

কর্ম্মচারীটি চমকিয়া উঠিলেন। ইহা কি নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা! বিনা কারণে বা সামান্য কারণে যিনি আগুন জ্বালিয়া তুলেন,—যিনি মানুষের প্রাণের স্বাধীনতা বা সুখ-শান্তি বুঝিতে পারেন না,—আ'জ এই গুরুতর ব্যাপারে তিনি এত নিশ্চল কেন? কোন্ গুণে—কি কারণে বৈশাখী প্রখর রবিকর মুহূর্ত্তে শারদীয় শশধরের অমল স্নিগ্ধ কৌমুদীতে পরিণত হইল!

কর্ম্মচারী সেইকথা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া গেলেন। নবাব তৎপূর্ব্বেই অন্দর মহলে গমন করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই নিরব নিশিথে যে প্রকারে ও যে কারণে কয়েদিগণ জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল, এবং জেল হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা যাহা যাহা করিয়াছিল,—এস্থলে তাহার একটু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

এখনকার দিনের ইংরেজের জেলের তুলনায় যাঁহারা সেকালের মুসলমান-আমলের জেলের কল্পনা মনে করেন, তাঁহারা অভ্রান্ত নহেন। তখনকার জেল, বায়ুর গতি বিহীন অন্ধকারময় গৃহ—ময়দান। কয়েদীদিগের দ্বারা

বিশেষ কোন কার্য্য করান হইত বলিয়া শোনা যায় না,—যেমন কার্য্য করান হইত না, তেমনি আহারও বড় একটা দেওয়া হইত না। যাহা দেওয়া হইত, তাহা মানবের অখাদ্য—ধান্য চাউলে মিশ্রিত অন্ন, তাহাও অপ্রচুর। তখনকার জেলের কয়েদী না খাইয়া মরিয়া যাইত। কোন কয়েদীর কয়েদের নির্ণীত সময় ছিল না। কেহ কেহ কয়েদে আজীবনকাল থাকিয়াই মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িত, কেহ কেহ কদাচিৎ নবাব বা কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিত। তবে আহার ও বস-বাসের সুখহেতু কয়েদিগণ অচিরেই মৃত্যু পথের পথিক হইয়া কারা যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্তি লাভ করিত। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে, তখন কথায় কথায় এখনকার মত মানুষকে জেলে যাইতে হইত না। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের জেলে সহস্রাধিক কয়েদীর অধিক সে দিন ছিল না।

গিরীশচন্দ্রকে ধৃত করিয়া আনিয়া জেলখানায় পুরিয়া রাখা হইয়াছিল। গোপালচন্দ্র বাহিরে ছিল, কিন্তু তাহাকেও ধৃত করিবার আদেশ হইয়াছিল। সুচতুর গোপালচন্দ্র সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, পরিবারবর্গকে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গোপনে রাখিয়া আসিয়া নিজে ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছিল। দেশ তখন সিরাজদ্দৌলার নামে শিহরিয়া উঠিয়াছিল,—মুর্শিদাবাদে মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি দুর্বিনীত সিরাজের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ রোগ-শয্যায় শায়িত—সিরাজদ্দৌলা মদ আর মেয়েমানুষ লইয়া ব্যস্ত—রাজকার্য্য উচ্ছৃঙ্খলতার আগুনে বিদগ্ধ হইতেছিল। অপর দিকে ঘেসেটি বেগম রক্ত নাগিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধফণা তুলিয়া সিংহাসনের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন,—সিরাজ নবাব হইবেন কি না, তখনও স্থির হয় নাই। রাজকার্য্য যথেচ্ছাচারের পথে চলিতেছিল—রাজকর্ম্মচারিগণ যথেচ্ছাচারিতার পথে চলিতেছিলেন।

গোপালচন্দ্র ছদ্মবেশে মুর্শিদাবাদে আগমন করিলেন। ছদ্মবেশে ঘেসেটি বেগমের অমাত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বন্ধু গিরীশচন্দ্রের উদ্ধারার্থ তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন,—তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। ফৌজদারসাহেব ঘেসেটি বেগমের অর্থ খাইয়া উদর পূর্ণ করিতেছিলেন,—তিনি সত্বরেই বশীভূত হইলেন, এবং প্রয়োজনকালে সৈন্য সাহায্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

গোপালচন্দ্র বান্ধবের উদ্ধারার্থ অকূলে ঝাঁপ দিলেন। তিনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করপুরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে পাইয়া বিশ্বজয়ী

ধীরের ন্যায় স্থানীয় ফৌজদারের ফৌজ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং অচিরে বন্দীরূপে তিনি মুর্শিদাবাদের জেলখানায় প্রেরিত হইলেন। তাঁহার অপরাধ কি, কেহ তাহার বিচার করিল না—কেহ তাঁহাকে একটি মুখের কথাও শুধাইল না। বিনা কথায় তিনি কয়েদে বন্দী হইলেন।

গোপালচন্দ্রে গিরীশচন্দ্রে সাক্ষাৎ হইল। গিরীশচন্দ্র দাবদগ্ধ তরুর ন্যায় শুকাইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া গোপাচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপরে বলিলেন,—"আমি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া, বন্দী হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

গিরীশচন্দ্র ক্ষীন কণ্ঠে বলিলেন,—"ভাই, ভাল কর নাই। আমার জন্যে কেন তোমার সুখের তরু স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়াছ? আমি উদ্ধার হইয়া কি করিব? আমার কি আছে,—আমি কাহাকে লইয়া সুখী হইব?"

গো। তুমি জীবনে যত সুখী,—পৃথিবীর অধীশ্বরও বুঝি তোমার মত অত সুখী নহেন। তুমি সতীর স্বামী। একটি সতীর হৃদয়ভরা অপূর্ব্ব প্রেমে তুমি অভিরঞ্জিত। অন্যের প্রণয়িনীতে সন্দেহ থাকিতে পারে—অন্যের প্রেমে অবিশ্বাস থাকিতে পারে,—কিন্তু তোমার তাহা নাই। মরণ-পরীক্ষায় স্থির হইয়া গিয়াছে, তোমার উমা, তোমাগত প্রাণ। সে তোমারই প্রেম বুকে করিয়া কঠোর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। তুমি সতীর স্বামী—তুমি যদি সুখী না হইবে, তবে কে সুখী গিরীশচন্দ্র?

গিরীশচন্দ্রের শুষ্ক নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। তাহা হইতে অগ্নিকণা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। গিরীশচন্দ্র বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"গোপাল, গোপাল,—সে নাই। সে চলিয়া গিয়াছে। ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—গোপাল, আমি কি কারাগারে মরিতে পারিব না? এ যন্ত্রণা—সে যন্ত্রণার কাছে তুচ্ছ যন্ত্রণা! সে যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া মরিয়াছে,—আর আমি মুক্ত—শীতল বাতাসে সুখে বিচরণ করিতে বাহির হইব? আর কেন ভাই? আমার জন্য কেন তুমি এ ভীষণ আগুনে পুড়িতে আসিয়াছ?"

গো। আসিয়াছি কেন শুনিবে? তোমার কি মনে নাই,—তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তোমার বুকের আগুনে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা পুড়াইবে--বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাবকে পুড়াইবে। তাহা ভুলিয়া গেলে কেন ভাই? মরিলে তাহা কে করিবে? সতীর পুণ্যাত্মা স্বর্গ হইতে তোমার কার্য্য দর্শন করিতেছেন।

উন্মাদ-স্বরে গিরীশচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ঠিক

বলিয়াছ, আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি আমার বুকের আগুন দিয়া দেশ জ্বলাইয়া আসি। তারপরে এখানে আসিয়া মরিব!"

গোপালচন্দ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"স্থির হও ভাই, স্থির হও। তোমার সতী-স্ত্রী স্বর্গে গিয়াছেন,—শত উন্মাদ-ক্রন্দনেও তাঁহাকে পাইবে না। আমাদের কর্ত্তব্য আছে—সাবধানে সে কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। কিন্তু প্রলাপ-চীৎকারে কার্য্য বিনষ্ট হইবে, অতএব আমি যাহা বলিব—ধীর ও স্থিরভাবে তাহা করিও।"

গিরীশচন্দ্র স্থির নয়নে গোপালচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার কার্য্যে যদি আমার উমার প্রীতি সম্পাদন হয়,—তবে আমি তাহাই করিব। সে কাজ কি গোপালচন্দ্র?"

গো। মানুষ মরিলে তাহার সমাপ্তি হয় না, একথা তুমি বোধ হয় মান্ত কর?

গি। হাঁ, তাহা করি বৈ কি!

গো। সাপে যেমন খোলস পরিত্যাগ করে, মানুষ তেমনি পার্থিব দেহ ত্যাগ করে। খোলস ত্যাগ করিলেও যেমন সাপের মনোবৃত্তি আদির পরিবর্ত্তন ঘটে না, মানুষেরও তেমনি দেহ পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর কর্ম্মজনিত মনোবৃত্তির ধ্বংস হয় না। তোমার স্ত্রী বিদেহী আত্মায় তোমার প্রতি কার্য্য লক্ষ্য করিতেছেন,—তুমি তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যে তাহাকে কষ্ট দিয়াছে—যে তাহার জীবন ধ্বংস করিয়াছে, তুমি তাহাকে জ্বালাইতে চেষ্টা কর।

গি। ভাল কথা গোপাল, আমি তাহাই করিব। এখন কি করিতে হইবে, তাহাই বল?

গো। আমরা এই কারাগার হইতে বাহির হইব—ইহাই আমাদিগের প্রথম কাজ।

গি। কি প্রকারে সে কাজ সম্পন্ন হইবে? ভীষণ লৌহদ্বার কারাগার রক্ষা করিতেছে।

গো। দরোজা লৌহের, আর মানুষ কি মাখমের? এত বন্দী রহিয়াছি, চেষ্টা করিলে অবশ্যই লৌহদ্বার ভগ্ন করা যাইবে। না ভাঙ্গিতে পারিলে, আরও উপায় আছে।

গি। সে উপায় কি?

গো। আগে সমস্ত কয়েদীকে তাহাদের অবস্থা ও বাহির হইবার উপায় বুঝাইয়া দেওয়া যাউক। তারপরে আমরা সকলে চীৎকার করিলে, কারাধ্যক্ষ দরোজা খুলিয়া আমাদিগকে দেখিতে আসিবে, তখন আমরা একযোগে তাহাদিগকে দলিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িব।

গি। বাহির হইতে সৈন্য আসিয়া যদি আমাদিগকে আক্রমণ করে ?

গো। তা' করিবে না। ফৌজদার সাহেবকে হাত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই বন্দী হইয়া কারাগারে আসিয়াছি।

গি। গোপাল, তুমিই যথার্থ কর্ম্মবীর—যদি বাহির হইতে পারি, উমার প্রীতির জন্য যাহা বলিবে, তাহাই করিব। ভাই, উমার সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই লোপ হইয়া গিয়াছে।

গোপালচন্দ্র সেই দিবস হইতে কয়েদীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—"জেলে পড়িয়া পচিয়া মরার চেয়ে আত্মশক্তি পরীক্ষা করিয়া মরা ভাল"—ক্রমে তাহার বহুল জ্বলন্ত উদাহরণ ও উত্তেজনা পূর্ণ বাক্যে সমস্ত কয়েদী উত্তেজিত হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তারপরে যাহা ঘটিয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে তাহার বর্ণনা করিয়াছি।

গোপালচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র নির্ব্বিঘ্নে কয়েদিগণকে সঙ্গে করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে বাহির হইয়া পর দিবস মধ্য রাত্রে ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গল প্রায় কুড়িক্রোশ দূরে হইবে। এই জঙ্গল বহুদূর বিস্তৃত ছিল,—এবং বিবিধ বণ্য বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই স্থানেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুর্শিদাবাদে প্রেরিত খাজনার বহু অর্থ দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়,—এই স্থানেই পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের বিখ্যাত দস্যু "বদ্দিনাথ বিশ্বনাথের" সর্ব্বপ্রধান আড্ডারূপে পরিণত হয়।

ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে উপনীত হইতেই রাত্রি শেষ হইয়া গেল,—পূর্ব্ব-দিগ্‌ভাগে লোহিত রঙ্গ বিকীর্ণ করিয়া অরুণদেব সমুদিত হইলেন।

বন্দিগণ শুষ্ক কাষ্ঠ ও শুষ্কপত্র সংগ্রহ ও স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিল। কতক লোক বা সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবেষ্টন করিয়া বসিল,—কতক লোক বা এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে

ক্রমে অরুণ-রথে সূর্য্যদেব উদিত লইলেন,—বনভূমি সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইয়া পড়িল।

গোপালচন্দ্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শোন ভ্রাতৃগণ, এখন আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত;—কিন্তু স্বাধীন নহি। নবাব সিরাজদ্দৌলা হয়ত আমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য এতক্ষণ ফৌজআদি প্রেরণ করিয়াছেন,—হইতে পারে, সে সকল ফৌজ আমাদিগের অনুসন্ধানে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে। আমরা যদি আপন আপন বাড়ী যাই, আমাদিগকে পুনরায় ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে।"

অধিকাংশ লোকেই বলিল,—আপনার কথাতেই আমরা জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপে চলিতে এবং যাহা করিতে আদেশ করিবেন, তাহাই করিব।"

গোপালচন্দ্র উদ্দীপনা স্বরে বলিলেন,—"আমি যাহা বলিব, তাহা আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি হিতকর বলিয়াই বিবেচনা করি। জেলে পড়িয়া পচিয়া মরিতাম,—মাতৃ-ভূমির স্বাধীনক্রোড়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাইলাম। এখন আমাদিগের কার্য্য—অত্যাচারের যন্ত্রণা আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছি। যাহাতে দেশে অত্যাচার না হয়, অত্যাচারিদের বক্ষোবেদনা যাহাতে বিদূরিত করিতে পারি, আমরা তাহা করিব। তদর্থে আমরা সকলে নিষ্কামভাবে কার্য্য করিব। আমাদের লক্ষ্য ভগবান্। কার্য্য মাতৃ-সেবা।"

অধিকাংশ লোকেই সমস্বরে বলিল,—"সে কার্য্য আমাদিগকে কে শিখাইবে।"

গোপালচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"ভগবান্ই তাহার শিক্ষা গুরু।"

সকলে সমস্বরে বলিল,—"আমরা তাহাই করিব।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"নব সাধনার নূতন প্রভাতে আমরা নব-জীবন লাভ করিলাম। এস সবে একবার প্রাণ ভরিয়া নবালোকারুণিত কার্য্যশক্তি প্রেরক গোপীজনবল্লভ ভগবান্কে ডাকি। এস সকলে তাঁহাকে প্রণাম করি।

যিনি সকল কর্ম্মের ফলপ্রদাতা—
যিনি কর্ম্মফলের বিনাশ-বিধাতা—
যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর্ত্তা
যিনি সর্ব্ব জীবের হৃদয়াধিষ্ঠাতা

তিনি আমাদের কার্য্যের সহায় হউন। আ'জ হইতে আমরা তাঁহার নামে অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচারীতের রক্ষা কার্য্যে দীক্ষিত হইলাম। সকলে বল—

"জয় জগদীশ হরে."

ব্রাহ্মণীতলার গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া সহস্র কণ্ঠের সমবেত স্বর উঠিল,———

"জয় জগদীশ হরে!"

সে স্বরে প্রতিধ্বনি জাগিল। কাননের পশু পক্ষী জাগিল। আর জাগিল—সহস্র মানবের হৃদয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মল বসন্তের আকাশে ইতস্ততঃ যে সকল খণ্ড বিখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহারা একত্রে যোট পাকাইয়া বসিল,—কৌমুদীরঞ্জিত চন্দ্র অস্তগত হইলেন। বঙ্গের রাজনৈতিকি গগন হইতে নির্ম্মল জ্যোৎস্না-পূর্ণ পূর্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অস্তমিত হইলেন। তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় রাজনৈতিক গগনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলা একত্রে যোট পাকাইয়া বসিতে লাগিল।

সিরাজদ্দৌলা মাতামহের শীতল স্নেহ-বন্ধনের মধ্যে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। মাতামহের আদর্শ জীবন লাভ করিতে যদিও তিনি সক্ষম হয়েন নাই, তথাপি তিনি মাতামহের অভাবে জগত সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন! কয়েকদিন শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান দিলেন। তারপরে ক্রমে ক্রমে শোকভার অপনোদিত হইতে লাগিল। জগতের সমস্ত কার্য্যই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। কোলের ধন হারাইয়া যে জননীকে আজি হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে দেখিতেছ, কয়েক দিন পরে তাঁহাকেই আবার হয়ত হাসির লহরে ভাসিতে দেখিবে।

ক্রমে ক্রমে সিরাজদ্দৌলা রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে আমোদ-আহ্লাদে যোগদান করিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্যরক্ষার সবিশেষ বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পরে হীরাঝিলের প্রমোদশালায় নৃত্যোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। সুবিস্তৃত গৃহ—গৃহতল মর্ম্মর প্রস্তর-শোভিত। তদুপরি সতরঞ্চ—সতরঞ্চের উপরে মখমলের বিছানা। সমস্ত গৃহে অসংখ্য আলোকমালা জ্বলিতেছিল,—গোলাপ-আতরের গন্ধে সমস্ত গৃহ সৌরভিত। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত অপ্সরা-নিন্দিত রূপসী নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতে পুরুষ-পতঙ্গের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। নবাব সিরাজদ্দৌলার বান্ধবগণ মাত্র সে গৃহে প্রবেশের অধিকারী—মাত্র তাঁহারাই দর্শকের আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই—দগ্ধ-গৃহ-গাভীর ন্যায় তাঁহাদের চিত্ত ছটফট করিতেছিল। নাচিয়া গাহিয়া রূপের বিলাস-বিভঙ্গী করিয়া নর্ত্তকী সুন্দরীগণ কিছুতেই তাঁহাদের মন বাঁধিতে পারিতেছিল না। সুরাসহচরী বেশ্যাসুন্দরী আসিয়াছে—কিন্তু সুরা কৈ? ধান্যের জন্যই পললের আদর,—যদি ধান্য নাই, তবে পলল কেন?

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পরে আজি এই প্রথম বৈঠক। পূর্ব্বে নৃত্যগীত আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎকৃষ্ট সুরা আসিয়া সকলের হৃদয়রঞ্জন করিত, আজি এখনো আসেনা কেন? চাতক আর কতক্ষণ মেঘের পানে চাহিয়া থাকিবে? কৈ নবাব সিরাজদ্দৌলাই বা কোথায়? দেখিতে দেখিতে রাত্রিও প্রায় প্রহরতীত হইয়া গেল। সুরাপান অভাবে নর্ত্তকীগণও অবসাদ গ্রস্ত হইয়া উঠিল।

একটি গীত পরিসমাপ্তি করিয়া, তাহারা চক্ষু টানিয়া হাব-ভাবে দর্শকগণের মস্তকচ্ছেদের আয়োজন করিয়া বলিল,—"যদি অনুমতি হয়, আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া লই। গলা ধরিয়া আসিতেছে।"

দানেশ খাঁ বলিলেন,—"ব'স বাবা, কাট খোলায় আর ভাল লাগে না।"

রামকান্ত বলিলেন—"ঠিক ব'লেছ বাবা, একটু লাল চোখ না হ'লে কি ওসব লাল মুখ ভাল লাগে?"

ঠিক এই সময়ে সেই গৃহে নবাব সিরাজদ্দৌলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবোদিত সূর্য্যদর্শনে যেমন শীতার্ত্তের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, সিরাজের আগমনে তেমনি তদীয় বান্ধবগণের মনে আশার সঞ্চার হইল। কেন না, আর সুরাহীন প্রাণে বিরহ-দাবানল-দহন সহ্য করিতে হইবে না।

নবাবের আগমন মাত্রে সকলেই উঠিয়া দাড়াইলেন, এবং প্রফুল্ল মুখে যথাবিধি ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। নবাবও হাসিমুখে আসন পরিগ্রহ

করিলেন। এবং হাসিমুখে সকলকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং বিবিধ বাক্যালাপে নবাবের মনস্তুষ্টির প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কেবল নর্ত্তকী চতুষ্টয় দণ্ডায়মান থাকিল,—তাহাদের পৃষ্ঠলম্বিত ভুজঙ্গিনী তুল্য বেণী হইতে সুরভিগন্ধস্ফুরিত হইয়া সমস্ত গৃহ মুখরিত করিতে লাগিল।

নবাব বলিলেন,—"তোমরা একটা গান গাও। গান বাঙ্গলাই গাও।"

বাদকেরা নিমেষে বাদিত্রে সুর মিলাইল। গায়িকারা নিমেষে বাজনার সুরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গান আরম্ভ করিল। তাহারা গাহিল ঃ—

ভালবাসা মিছেকথা শুধু আঁখিজল।
নিষ্ফল রোদন আর জীবন নিষ্ফল।
হৃদয় সর্ব্বস্ব ল'য়ে সে চরণে ঢেলে দিয়ে
যেচে লওয়া হয় শুধু প্রতপ্ত অনল।

পরাণে পরাণ দিয়ে অনিমিষে রব চেয়ে
মিছে আশা—ভেঙ্গে দিয়ে করে চূরমার্;
নিমিষে ভুলিয়া যায়, নিমিষেতে পর হয়,
নিমিষে বলিয়া দেয় ভ্রান্তি আপনার।

বিরক্তি ঘৃণার হাসি উপেক্ষার বিষরাশি
ঢেলে দেয় হৃদি-ত্বকে তুষের অনল,
আজীবন সে অনল জীবন-সম্বল।

নর্ত্তকী সুন্দরীগণ নাচিয়া হাসিয়া হাবে ভাবে আসর জমাইয়া সে গান গাহিল। অনেকক্ষণ পরে গীত সমাপ্ত হইল। নবাব বাহাদুর তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন,—তাহারা চলিয়া গেল। নবাব-পার্ষদগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। এ কি হইল,—আকাশ ভরা মেঘের উদয়, কিন্তু বর্ষণ হইল না কেন? নবজলধর রূপে নবাবসাহেবের আগমন হইল, কিন্তু সুরারূপ বৃষ্টির অভাব হইল কেন? পিপাসাকুল চাতকের দল যে তৃষ্ণায় মারা পড়ে!

রহিম খাঁ তাঁহার মাথার জরির তাজ একটু নাড়িয়া চাড়িয়া, নবাব সিরাজদ্দৌলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"খোদাবন্দ, এতটি এয়ার যে, প্রাণে মারা যায়!"

সিরাজদ্দৌলা হাসিয়া বলিলেন,—"কেন নানা, ব্যারাম কি?"

র। ব্যারাম প্রবল তৃষ্ণা।

সি। কিসের; রূপের, না রসের?

র। রূপ, রাজভোগ্য,—এয়ারগণের প্রসাদী রসে অধিকার আছে।

সি। নানা,—আমিত জীবনে আর মদ্যপান করিব না। আমার স্বর্গীয় নানা আমার হাতে পবিত্র কোরাণ দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। আমি মুসলমানের অস্পৃশ্য ও অপেয় মদ আর স্পর্শ করিব না,—পান করিব না।

র। নিশ্চয় সত্য?

সি। হাঁ, নানা; নিশ্চয় সত্য।

একজন পরিষদ পার্শ্ব হইতে অতি মৃদুস্বরে বলিল—"তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, আর দেখিতে আসিবেন না।"

সিরাজদ্দৌলা সহাস্য আস্যে বলিলেন,—"প্রতিজ্ঞা তিনি করেন নাই, আমি করিয়াছি। তিনি মরিয়াছেন, আমি মরি নাই।"

পরিষদ রামকান্ত বলিলেন,—"ত্রিরাত্রি দিব্যি পালন করিলেই সব কেটে যায়। আপনার দিব্যি প্রায় পনর রাত্রি উৎরে গিয়েছে।"

রহিম খাঁ কৌতূহল নয়নে স্থির দৃষ্টিতে সিরাজদ্দৌলার বদন পানে চাহিয়া রহিলেন।

সিরাজদ্দৌলা দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—"শোন ভাই সকল, যাহা করিতে নাই, এত দিন তাহাই করিয়া আসিয়াছি। মাতামহ—আমার উপাস্য ও আদর্শ-দেবতা মাতামহ, মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া আমারই হিতার্থে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, জীবনে তাহা ভুলিব না। মদ ছাড়িয়াছি, জীবনে আর তাহা স্পর্শ করিব না। আমার হৃদয়ের অনুরোধ, আমার বন্ধুগণও কেহ মদ স্পর্শ করিবেন না।"

রহিম খাঁ নতজানু হইয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"জাঁহাপনা, কোরাণের বাক্য হইতে আপনার এই আদর্শ চরিত্র আমাদিগকে সৎপথে লইতে সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। রাজা—মানুষের আদর্শ—রাজা মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহায়। আমরা—অন্ততঃ আমি, আজি হইতে মদ্য পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু একটি কথা।"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে নবাব সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—"কি কথা নান-সাহেব?"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে রহিম খাঁ বলিলেন,—"কথাটা কি জানেন জাঁহাপনা, মদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে মানুষটা ত্যাগ করিলে হয় না?"

নবাব সিরাজদ্দৌলা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"কেন, আমাকে কি খোজা হইতে বল?"

র। না না, জাঁহাপনা, তা' কেন? তবে কি জানেন—পানি সর্ব্বত্রই গলা ঠাণ্ডা করে,—তবে পঙ্কিল না হয়, এইটাই দেখিয়া লইতে হয়। খালে বিলে ডোবায় ঝাঁপাইয়া বেড়ানটাত ভাল নয়। অধিকন্তু, নানান্ যায়গার পানি খাইলে ঠাণ্ডা লাগারও সম্ভাবনা। আপন অধিকৃত পুকুর খুব পরিষ্কার রাখিয়া তার পানি খাওয়াই ভাল।

সি। তুমি কি তাই বল?

র। জাঁহাপনা, আমি তাই বলি। আপনার স্বর্গীয় মাতামহ একটি বেগমে চিরদিন সুতৃপ্ত ছিলেন। আপনার মহলপূরা বেগম—আর বাহিরের ধূলা জড় করিবেন না। ইহাতে প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা নিস্তব্ধ ভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া সমবেত সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। সকলেরই ভয় হইল, রহিম খাঁর কি দুর্দ্দশা ঘটে! উদ্ধত সিরাজদ্দৌলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিতে পারিত না—ইহাতে অনেকেই অবমানিত ও দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা রহিম খাঁকে কোন প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। অধিকন্তু সহাস্য মুখে বলিলেন—"নানা, তাহাই হইবে। যাহাতে প্রজার প্রাণে কষ্ট হয়, আমি এমন কাজ আর করিব না।"

রহিম খাঁর নয়নকোণে জল আসিল। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"খোদা-তালা, বঙ্গ-সিংহাসন নিরাপদ করুন। আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুতে তাঁহার পবিত্র আত্মা, নবাব সিরাজদ্দৌলাতে আবিষ্ট হউক।"

সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—"নানা, আমি সর্ব্ব প্রকারেই নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর চরিত্রের অনুকরণ করিতে যত্নবান্ হইব। কিন্তু তাঁহাতে আমাতে আস্মান্ জমিন্ ফারাক,—খোদাতালা আমার হৃদয়ে বল প্রদান করুন।"

সে দিনকার আসর এইরূপেই ভঙ্গ হইয়াছিল। ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শ্মশান।

(১)

শরীর হইতে যবে,
আত্মা অন্তর্হিত হ'বে,
অচল হইবে জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ;
ভৌতিক শরীর হ'তে,
নিজ নিজ অংশ ল'তে,
পঞ্চভূত অগ্রসর হইবে যখন।
মৃতদেহ বলি' হায়!
কেহ না স্পর্শিবে তা'য়,
অপবিত্র বলি' সবে করিবে বর্জ্জন ;
সে দিন কে ভালবেসে,
বুকে তুলে ল'বে এসে ?
এই সেই করুণার পূত প্রস্রবণ
শ্মশান,—পবিত্র ভূমি পুণ্য নিকেতন !

(২)

সংসার সংগ্রাম শেষে,
জীর্ণ দেহে, ছিন্ন বেশে,
ছাড়িয়া আত্মীয় বন্ধু, সংসার-বন্ধন ;
ছাড়ি' ধন-জন-গর্ব্ব,
ছাড়িয়া বিষয় সর্ব্ব,
ছাড়ি' নর-জনমের শত প্রলোভন ;
কালের আহ্বান বাণী,
শুনে স্তব্ধ হ'বে প্রাণী,
যে দিন,—উঠিবে গৃহে আকুল ক্রন্দন ;
সে দিন কে ভাল বেসে,
বুকে তুলে ল'বে এসে ?
এই সেই করুণার পূত প্রস্রবণ
শ্মশান,—পবিত্র ভূমি পুণ্য নিকেতন !

(৩)

সুখী, দুঃখী হেথা সবে,
শেষেতে মিলিত হ'বে,
আত্মপর ভেদ ভুলি'—শক্রতা ভীষণ ;
উচ্চ নীচ ভেদ নাই,
সবে র'বে এক ঠাঁই,
এক উপাধানে, এক শয্যায় শয়ন।
এক ভাবে, এক বেশে,
কি এক অজ্ঞাত দেশে,
এক তীর্থ বাসে যা'বে, হেথা সম্মিলন ;
কে তা'দের ভালবেসে,
পথ দেখাইবে এসে ?
এই সেই করুণার পুত প্রস্রবণ
শ্মশান,—পবিত্র-ভূমি পুণ্য নিকেতন !

(৪)

দেখ দগ্ধ বংশ-দণ্ড,
ভগ্ন ভাণ্ড, অস্থি-খণ্ড,
ছিন্নকেশ, জীর্ণ কন্থা শ্মশান-ভূষণ !
ঐ দেখ চারি পাশে,
চর্ম্মহীন মুণ্ড হাসে,
মানবের অভিমান করিয়া দর্শন !
চিতা জ্বলে চারিপাশে !
শৃগাল, শকুনি আসে,
গলিত মানবদেহ করিতে ভক্ষণ ;
স্বর্গে মর্ত্ত্যে একাকার,
এ সংসারে কোথা আর ?
এই সেই করুণার পুত প্রস্রবণ
শ্মশান,—পবিত্র ভূমি পুণ্য নিকেতন !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধ্রুবতারা।

"ধ্রুবতারা"—উপন্যাস গ্রন্থ। সাহিত্য-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহ প্রণীত, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। পুস্তক খানির বাঁধাই অতি পরিপাটী,—প্রায় বাঙ্গলা গ্রন্থে এরূপ সুন্দর বাঁধান পুস্তক দৃষ্টিগোচর হয় না। পুস্তকখানি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

এখন সমালোচনার কথা। ইংরেজী-বাঙ্গলা প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রেই এই পুস্তকখানির অতিমাত্র প্রশংসা পূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে সকলেই সমস্বরে পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন? আমরা তাহারই সম্যক্ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। সকলের সঙ্গে শুধু—"অপূর্ব্ব ও উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে" বলাটা সমীচীন জ্ঞান করিলাম না।

পুস্তকখানি উপন্যাস। অনেকে বলেন,—উপন্যাসের আবার বাহবাই বা কি, উপন্যাসে আবার নূতনত্বই বা কি? উপন্যাস শিক্ষিত লোকে পড়ে না,—পড়ে অল্প শিক্ষিত লোকে। কিন্তু সে কথা সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি,—দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষিত সমাজের আলোচ্য হইলেও উপন্যাস একেবারে উপেক্ষনীয় নহে। উপন্যাস দর্শন-বিজ্ঞান ছাড়া নহে। দর্শন-বিজ্ঞানের কার্য্য অপরোক্ষভাবে, আর উপন্যাসের কার্য্য প্রতক্ষ্য-ভাবে। দর্শন-বিজ্ঞান উপদেশ, উপন্যাস উদাহরণ। দর্শন-বিজ্ঞান অশরীরী, উপন্যাস শরীরবিশিষ্ট। সূক্ষ্মও স্থূলে যে প্রভেদ, এতদুভয়ে আমি সেই প্রভেদ দেখিতে পাই। যাহাকে বুঝিতেছি, অথচ ছুঁইতে পারিতেছি না, তাহাই সূক্ষ্ম। আর যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি নাড়িয়া চাড়িয়া অনুভব করিতে পারিতেছি, তাহাই স্থূল। উপন্যাসকে আমরা সেইরূপ স্থূল মনে করি। বস্তুতঃ স্থূল, সূক্ষ্মের পরমাণু সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে পরমাণু অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভূতির বিষয়ীভূত হইতে পারে না, তাহারই একত্র সমবায় ঘটিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। উপন্যাস দর্শন-বিজ্ঞানের সেইরূপ পরমাণু সমবায় বলিয়াই আমাদের ধারণা। আমরা মোটা জ্ঞানে এই বুঝি যে Philosophy শব্দের যদি Abstract ও

Concrete বলিয়া দুইটা ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উপন্যাস সেই Concrete philosophy ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া। অল্পাধিক পরিমাণে এবং সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে জগতের সকল বস্তুই সেই বৃত্তির উপর কার্য্য করিতেছে। ইহার মধ্যে, যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যত বেশী কার্য্য করে, সেই তত তাহার বেশী আপনার বলিয়া বোধ হয়। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের এই জন্য এত আবশ্যকতা। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন অপেক্ষা মহাভারতের কাহিনী এই জন্য এত মর্ম্মস্পর্শী। সুখ কি, দুঃখ কি, পাপ কি, পুণ্য কি, জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি, এসব তত্ত্ব দর্শন যে ভাবে বুঝাইয়া দেয়, তাহা বুদ্ধির অনধিগম্য না হইলেও বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় একটা কার্য্য করিতে পারে না। উপন্যাস সেই সব তত্ত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা পায়, সুতরাং তাহা সহজে গিয়া বৃত্তির উপরে ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত করে। এই সময়েই আমরা উপন্যাসের কার্য্যকারিতাও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি।

তবে একথা বলিতে পার যে, উপন্যাস হইলেই কি হইল? তাই বলিয়া কি তাহার ইতর বিশেষ নাই? তা কে বলিতেছে? ইতর-বিশেষ আছে বৈ কি। গেটে শকুন্তলা পড়িয়া যাহা বলিয়া ছিলেন, এখন যে-সে বই পড়িয়া কি তাহাই বলিতে পারা যায়? তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, সবই কিছু কালিদাস বা সেক্সপীয়র, গেটে বা হিউগো হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভবভূতি বা বাণভট্ট, লিটন বা ডিকেন্স, ডুমা বা গেবোরিও, স্কট বা ইলিয়টের আদর হইবে না, এমন কিছু কথা নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সংমিশ্রণে যিনি পাঠকের মানসিক বৃত্তির উপর যতটা কার্য্য করাইতে পারিয়াছেন, তিনিই তত কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং সকলের নিকট আদর অভ্যর্থনার পাত্র হইয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি, "ধ্রুবতারা" গ্রন্থে এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়াই সকলের মুখে ইহার প্রশংসা ধরিতেছে না।

দুর্ভাগ্যের কথা, বাঙ্গালায় আ'জ গ্রন্থকারের ছড়াছড়ি। রাধু মাধু সাধু সকলেই এখন মহা মহা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। কিন্তু অধিকাংশ ঔপন্যাসিককে ঔপন্যাসিক পদ সাধিতে বলিলেই পুরাতন ঘৃতের প্রয়োজন হয়। বিলাতী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বা বিলাতী উপন্যাসের "খাপছাড়া" তর্জ্জমা করিয়া এখনকার দিনে অনেকে যশস্বী ঔপন্যাসিক।

যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে যে ভাল বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ সহজে ভাগ্যে ঘটে, সে আশা কাহারও নাই। দুই এক খানি বাহির হয়, তাই তাহার প্রশংসা মুখে মুখে অতি শীঘ্র ঘোষিত হয়। আমাদের বোধ হয়, এই জন্যই "ধ্রুবতারার" প্রশংসা মুখে মুখে।

আমরা তাই এই গ্রন্থখানির একটু বিস্তৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেবল যদি শুধু বাহাবা দেই, তবে সেই বাহবার হেতু, অনেকে বুঝিতে পারিবেন না।

রুচিভেদে, শিক্ষাভেদে, প্রাণভেদে উপন্যাসকার-মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর উপন্যাসকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লেখক কেবল নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা উপন্যাসে প্রতিফলিত করেন, আর এক শ্রেণীর লেখক যাহা কচিৎ দৃষ্ট হয়, কচিৎ যে কাহিনী শোনা যায়, সেই অসাধারণ ভাব উপন্যাসে প্রতিফলিত করেন। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর উপন্যাসকে যথাক্রমে Realistic বা listic এবং Romantic বলে। সমাজ বা সংসারের পাপ বা দোষকীর্ত্তন Realistic বা প্রথমোক্ত লেখকের কার্য্য এবং সমাজ বা সংসারের উচ্চতর আদর্শ প্রদর্শন শেষোক্ত লেখকের কার্য্য। পাপে দুঃখে সংঘর্ষণ প্রথমোক্তের লক্ষণ, পাপ-পুণ্যে সংঘর্ষণ শেষোক্তের লক্ষণ,—ধ্রুবতারাকে আমরা শেষোক্ত লক্ষণের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছি।

ইহার গল্পটি বড় সাদাসিদে,—কিন্তু মহান্ ভাবে পূর্ণ। বিষবৃক্ষে ও চন্দ্রশেখরে যাহা ফুটে নাই, কৃষ্ণকান্তের উইলে যাহা ধরা পড়ে নাই বা ধরি ধরি করিয়া যাহা ধরিতে পারা যায় নাই, অথবা ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিয়া যাহা উঠিতে পারে নাই, এই গ্রন্থে তাহা ফুটিয়া পড়িয়াছে। কথাটা আষাঢ়ে রকমের হইল, কিন্তু প্রমাণে ছিদ্র নাই; তাইতে ত ইহার একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিতে বসিয়াছি। পাঠককে স্বয়ং বিচার করিতে ডাকিতেছি।

কলিকাতায় একটি মেসে ফরিদপুর নিবাসী কয়েকজন যুবক বাস করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিত। সাধারণে সেই মেস্‌টিকে "বাঙ্গাল মেস্" বলিত। উপেন্দ্রনাথ দত্ত তখন এই মেসে থাকিয়া এফ্ এ পড়িতেন। ধ্রুবতারায় তাঁহার এইরূপ পরিচয়ঃ—

"ক্ষুদ্র ফরিদপুর সহরটিকে একটি বৃহৎ পল্লী বলিলেই হয়। তাহার অবিরল সন্নিবিষ্ট স্নিগ্ধছায়া বহুল বটবৃক্ষ শ্রেণী এবং শ্যামল শষ্প মণ্ডিত প্রান্তরের শোভা অতুলনীয়। ফরিদপুরের ঠিক দক্ষিণে "ঢোলসমুদ্র" নামক একটি

প্রকাণ্ড বিল ছিল। এই দশপনর বৎসরের মধ্যে পদ্মার বালী পড়িয়া তাহা ভরিয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল হ্রদ পাড়ি দিতে মাঝিগণ নৌকার "আগা গলু"ইতে "দুধপানি" দিয়া পীরের নামে আধপয়সার সিন্নি মানৎ করিত, আ'জ সেখানে গ্রাম বসিয়াছে। ইহা বিচিত্র লীলাময়ী পদ্মার একটি অদ্ভুত লীলা।

এই ঢোল সমুদ্রের দক্ষিণ পারে ফরিদপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে কাজলপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি খুব প্রাচীন। প্রাচীন বলিয়া আম-বাঁশ-তাল-তেঁতুল-বট প্রভৃতি তরুময় নিবিড় বন-সমাকীর্ণ। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নিতান্ত অল্প। কেবল কাজলপুর বলিয়া নয়, বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এই একই দশা। অনেক পুরাতন গ্রামে বনজঙ্গলের যে পরিমাণে বৃদ্ধি, প্রাচীন বংশ সকলের সেই অনুপাতে ক্ষয়।" রামনাথ দত্তই এ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন গৃহস্থ। গ্রামের তালুকদারও তিনি। ইহাঁরা জাতিতে কায়স্থ।

"তাঁহারা চারি সহোদর ছিলেন—দ্বারকানাথ, রমানাথ, হরিনাথ ও যদুনাথ। ইঁহাদের মধ্যে কেবল রমানাথই জীবিত আছেন, আর তিন ভাই অকালে মরিয়া গিয়াছেন।"

রমানাথ এখন এই পরিবারের কর্ত্তা। মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র তাঁহার পুত্র। এই উপেন্দ্র নাথই এবার ফরিদপুর জেলাস্কুল হইতে এন্ ট্রান্স্ পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেছে, এবং বাঙ্গাল-মেসে" আমরা যে উপেন্দ্র নাথকে পাইয়াছি, তিনিই এই উপেন্দ্রনাথ; এবং ইনিই ধ্রুবতারা গ্রন্থের নায়ক।

উপেন্দ্রনাথের পৈতৃক সংসার একটি উচ্চাদর্শ হিন্দু সংসার। একান্নবর্ত্তীতা, অতিথি-সংকার, সকলের নিরবচ্ছিন্ন একতা ও হৃদয়ের প্রতি-স্নিগ্ধ-ভদ্রতা,—লেখকের লেখনীতে শারদীয় গগনে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠ করিলে ইচ্ছা হয়, আমরাও এমনি একটি সংসার পাতাইয়া দত্ত পরিবারের শান্তি-সুখ অনুভব করি। এতদ্ভিন্ন মানব-মানসের বৃত্তি সকল উৎকর্ষতা লাভ করিলে পরদুঃখ কাতরতা, কারুণিকতা প্রভৃতি যে সকল গুণ মানুষের হয়, তাহা সে পরিবারস্থ স্ত্রী ও পুরুষ সকলের হৃদয়েই পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

এমন পরিমল পূরিত ফুল্ল কুসুমে ধীরে ধীরে কীট প্রবেশ করিল,—ধীরে ধীরে শীতল স্বচ্ছ গঙ্গাজলে আবর্জ্জনা পড়িল,—দেশীয় শিক্ষার স্থলে বিদেশীয় শিক্ষা স্থানাধিকার করিল। বিষমিশ্রিত মিছরির ছুরি ধীরে ধীরে মর্ম্মত্বক্ ভেদ

করিয়া যেমন জীবন নষ্ট করে,—দেশীয় শিক্ষা বিনষ্ট করিয়া কেবল বিদেশীয় শিক্ষা দিলে তেমনি মানবের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষার আগুন বুক যুড়িয়া লহ লহ জ্বলিয়া উঠে। জাতীয় ভাবের গঙ্গাজলে সে আগুন নিভাইতে পারে এমন সৌভাগ্য কয় জনের? অন্ততঃ উপেন্দ্র নাথের সে সৌভাগ্য হয় নাই।

উপেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল। বিবাহ হইল পল্লীগ্রামে,—গ্রন্থকার বিবাহের বর্ণনায় যে দার্শনিকতার, যে কবিত্বের, যে উপমালঙ্কারের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি মধুর—অতি প্রাণস্পর্শী। লেখক লিখিয়াছেন,—"বিবাহের কথা আর কি লিখিব? তাহার মধ্যে নূতনত্বই বা কি আছে? আপনাদের দশজনের বিবাহ যেরূপে হইয়াছে বা হইবে বা হইয়া থাকে, উপেনের বিবাহও সেই ভাবে হইল। তবে সকল বিবাহ-ব্যাপারেই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে,—অর্থাৎ ফটোগ্রাফতোলা। একজন পাঁড়াগেয়ে ভদ্রলোককে চেহারা তুলিবার জন্য কলিকাতায় এক বিখ্যাত ফটোগ্রাফারের দোকানে আনা হইয়াছিল। তিনি এক ঘণ্টা কাল তাহাদের ক্যামেরা-কক্ষে বসিয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফার মহাশয় তাঁহার যন্ত্র ঠিকঠাক ও সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে ছিলেন। সেই পল্লীবাসী ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইয়া ফটোগ্রাফারকে ছবিতোলা শেষ করিবার জন্য বারম্বার তাগিদ করিতে লাগিলেন। ফটোগ্রাফার বলিলেন "মহাশয়! আর একটু সবুর করুন, এই আরম্ভ করিতেছি।" ভদ্রলোকটি আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কি মুস্কিল! এখন পর্য্যন্ত আরম্ভও করেন নাই? তবে শেষ করিবেন কত দিনে?"

ফটোগ্রাফার উত্তর করিলেন—"মহাশয় উদ্বিগ্ন হইবেন না—অপেক্ষা করুন। আমার এদিকে একবার তাকান দেখি—ঘাড় নাড়িবেন না, আর চোখের পাতা ফেলিবেন না।"

ভদ্রলোকটি তাহাই করিলেন। ফটোগ্রাফার বলিলেন—"হয়েছে। তবে এখন আসুন।"

"সে কি মহাশয়? ঠাট্টা করিতেছেন নাকি? ইহার মধ্যেই হইয়া গেল? আরম্ভ করিলেন কখন, আর শেষই বা করিলেন কখন?"

ফটোগ্রাফার হাসিয়া বলিলেন—

"যে মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই শেষ করিয়াছি! পূর্ব্বে যে সময়টা আপনাকে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে কেবল আয়োজনের জন্য।"

বিবাহ-ব্যাপারও সেই ফটোগ্রাফ তোলা নহে কি? যে মুহূর্ত্তে ইহার আরম্ভ, সেই মুহূর্ত্তেই ইহার শেষ। এখন বলুন দেখি, সে মুহূর্ত্তটা কি?

ঐ যে সেই চারি চক্ষুর মিলন। ইহা একটি "অনন্ত মুহূর্ত্ত!" এই মুহূর্ত্তের পর বর দেখেন, তাঁহার হৃদয়-ফলকে একটি অপরিচিত-পূর্ব্ব মূর্ত্তির ফটো অঙ্কিত হইয়াছে—সেটি যেন তাহাকে ফুল্লকৌমুদী-প্লাবিত শারদাকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ করিতে চায়। বধূ দেখেন—তাইত, এ ছবিটা ত কখন এখানে দেখি নাই? এ আবার কোথা হইতে আসিল? কেবল কি আসিয়াছে—আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। বসিয়াছে ত একেবারে মৌরসীপাট্টা করিয়া বসিয়াছে। সে পাট্টার লেখক স্বয়ং প্রজাপতি, তাহার সাক্ষী ধ্রুবতারা, তাহার মিয়াদ দশ বছর বিশ বছর নয়—এক কল্প। বিজলী চমকের ন্যায় এক নিমিষেই যাহার আরম্ভ এবং এক নিমিষেই যাহার শেষ, এরূপ বিশাল বিরাট কল্পান্ত-স্থায়ী ঘটনা আর কি আছে বল দেখি।"

আমরা গোড়ায় বলিয়াছি, দর্শনে যাহা সূক্ষ্ম, উপন্যাসে তাহা স্থূল। এই যে অতি সরল ভাষায়, বড় সোজা ভাবে কথাগুলা পড়া হইল, মনে আছে কি, ইহা তোমার দর্শনের সেই জটিল তত্ত্ব। আত্মা অমর,—মরে দেহ; কর্ম্ম আত্মার সঙ্গে সঙ্গে প্রধাবিত হয়। কর্ম্ম দুই—সকাম ও নিষ্কাম। দাম্পত্য প্রেম নিষ্কাম।

তোমাদের এক দার্শনিক বলিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি কাম বলি তারে,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি প্রেম নাম ধরে।"

দাম্পত্য প্রেমে কাম-গন্ধ নাই। ইহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি। কৃষ্ণ অশরীরী—অনন্ত। স্বামী-স্ত্রী সান্ত;—শরীর বিশিষ্ট। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে—জীবন-যজ্ঞে স্বামী আচার্য্য, স্ত্রী হোতা। জীবনে মরণে, মরণে জীবনে উভয়ে উভয়ের অনুগামী। বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ির মত,—দুইটি শিশিরবিন্দু গলিয়া এক হইবার মত—দাম্পত্য জীবন এক হয়। কত দিন?—অনন্ত বিরাট বিশাল কল্পান্তস্থায়ী। কেবল নবদেহে—সেই পরিচিত মূর্ত্তির ফটো হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া লওয়া। এ ক্ষেত্রে—"উপেনও এইরূপ তাহার হৃদয়-ফলকে একটি ফটো তুলিয়া লইয়া এবং সেই ফটোর আসল মূর্ত্তিটিকে সঙ্গে লইয়া পর দিন বাড়ী ফিরিয়া গেল।

আমাদের দেশের মেয়েলী কথায় আছে,—

"জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।"

একথার মর্ম্ম অন্য দেশের লোকে বোঝে না। বুঝি আমাদের দেশের অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিতেও বুঝেন না। বুঝি বুঝিয়াও অনেকে বুঝিতে চাহেন না,—তাই ইয়োরোপে প্রেমে আত্মদান নাই—আদালতে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। তাই এদেশে পতিপ্রাণা পত্নীর মনে ব্যথা দিয়া সুখান্বেষণে অনেকে বিপথে ছুটাছুটি করেন। তাই রূপতৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য বিবাহিতা পত্নী কালো ভ্রমরকে পায়ে ঠেলিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীতে ধাবিত হইয়াছিলেন,—তাই নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে ফেলিয়া কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত হইয়াছিলেন। ধ্রুবতারার উপেন্দ্রনাথও তাই বিপথে পদার্পণ করিয়া আপনার অশান্তি আপনি ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দলালে আর উপেন্দ্রনাথে অনেক তফাৎ—নগেন্দ্রনাথ আর উপেন্দ্রনাথ অনেক বিভিন্ন। ভ্রমর আর বনলতায় প্রভেদ বিস্তর,—বনলতায় আর সূর্য্যমুখীতে আস্মান্ জমিন ফারাক। কেন, তা ক্রমে বুঝাইব। বনলতা বার বছরের মেয়ে—স্ফুটনোন্মুখী নব কলিকা।

উপেন্দ্রনাথ বনলতাকে ঘরে আনিয়াই বুঝিল, এ বুঝি তাহার "মনের মতন" হইবে না। বিবাহের সময় কলিকাতার মেসের তাহার বন্ধুগণ সকলেই কাজলপুর আসিয়াছিল। ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যাকালে উপেন তাহার বন্ধুদিগকে লইয়া বিলের মধ্যে নৌকায় বেড়াইতে গেল। তখন রাত্রি—ফুল্ল জ্যোৎস্নায় দিগন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। সে আনন্দ—সে উচ্ছ্বাস—সে সখিত্ব—সে কবিত্ব মূল গ্রন্থে পাঠ না করিলে উপভোগ করা যায় না। উপেনের বন্ধু বীরেন রাখালকে বলিল—"আজ উপেনের ফুলশয্যা, একটা ফুলশয্যার গান গাও।"

ধ্রুবতারার কবি রাখালের মুখ দিয়া যে গানটি বাহির করিয়াছেন, একটু নমুনার জন্যে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা আ'জ কা'লকার সৃষ্টি ছাড়া, ভাব ছাড়া, অর্থ ছাড়া, ছন্দ-অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া ভাষার সমষ্টি গানের মত গান নহে। গানটি এই ঃ—

"নীল আকাশে ফুটিছে তারকা
আঁধারে আঁখিটি আবরি।
প্রেম-মুকুল ফুটিছে হৃদয়ে
সরমে মরমে শিহরি॥
কমল কলিকা তুলিও না সখা
ফুটিছে শাখে বিরলে।

নয়ন-আলোকে আকুল ক'রোনা

ফুটা'য়ো না তারে অকালে ॥

ফুল্ল শরতে স্নিগ্ধ তপন

(যবে) উদিবে সুনীল গগনে।

বিকচ নলিনী হাসিবে অমনি

নিমেষ বিহীন নয়নে ॥

এবে সাজাও যতনে, হৃদয়-রতনে

সুরভি কুসুম-ভূষণে।

প্রেমের পরশে নিতি নবরসে

ভাসিবে নবীন যৌবনে ॥"

ধ্রুবতারার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক গান এইরূপ উপদেশ পূর্ণ।

তারপরে যাহা বলিতেছিলাম ;—পল্লিবাসিনী অশিক্ষিতা বনলতা ; পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত নভেল পাঠক উপেনের "মনের মত" হয় নাই। সে যাহা চাহে, বনলতায় তাহা খুঁজিয়া পায় নাই। নৌকায় বন্ধু সহ কথোপ-কথনে উপেন্দ্রনাথের মনের কথা গ্রন্থকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"উপেন রাখালের নিকট বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। রাখাল বলিল,—"কিন্তু তোর বৌ যে সুন্দর, তোকে নিশ্চয়ই ভেড়া বানাইবে দেখিতেছি।"

কুমুদ তাহার দাঁড় রাখিয়া বলিল,—"বাস্তবিকই খুব সুন্দর! ঠোঁটটি যেন একযোড়া Middle-bracket (বঙ্কনী চিহ্ন)। আর কুমারেরা দেবী প্রতিমার চিবুকে একটা বাঁকা রেখা টানিয়া দেয় কেন, আগে তাহা আমি বুঝিতাম না, তোর স্ত্রীর মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছি।"

উপেন। কিন্তু কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য থাকিলে কি হয়? মানসিক সৌন্দর্য্য না থাকিলে কিছুই নয়। চাই Accomplishments (বিদ্যা ও শিল্প-কলা শিক্ষা)।

বীরেন। কেন—যাহাতে মানসিক সৌন্দর্য্য জন্মে তাহাই কর। এখন খুব সময় আছে, মনের মত করিয়া পড়িয়া লইতে পারিবে।

উপেন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"তাহার সুবিধা কোথায়? আমার মনে হয়, যদি তাহাকে কোন বোর্ডিং স্কুলে রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারিতাম, তবে খুব ভাল হইত। কিন্তু আমাদের বাড়ীর সকলে একথা

শুনিলে আমাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, আমার মুখও দেখিবেন না।"

মানুষ অপূর্ণ, কাজেই ভ্রান্ত। মায়ামৃগ দেখিয়া সীতার ভ্রান্তি হইয়াছিল। সীতার ভ্রান্তিতে রামচন্দ্রের ভ্রান্তি জন্মে,—রামচন্দ্র স্বর্ণ মৃগ ধরিতে ছুটিলেন। আর বাঙ্গলা উপন্যাসে দুই জনের ভ্রান্তিতে দুইটি সংসার ছারে খারে গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ লালের। কাব্য বল, উপন্যাস বল, নাটক বল, এই ভ্রান্তিসূত্রেই খেলিয়া থাকে, খুলিয়া থাকে। উপেন্দ্রনাথও ভ্রান্তিতে পড়িলেন। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল রূপের ভ্রান্তিতে মজিয়াছিলেন, উপেন্দ্রনাথ—নব্য-শিক্ষা-বিমুগ্ধ-উপেন্দ্রনাথ নব্য শিক্ষার মোহজালে ভুলিলেন। ভুলিয়া যাহা করিলেন, তাহা ধ্রুবতারার কবি অতি উচ্চভাবে, অতি সূক্ষ্মতম চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। তুলনার সমালোচনায় সাহস করিয়া বলা যায়,—গোবিন্দলালের চেয়ে উপেন্দ্রনাথ, ভ্রমরের চেয়ে বনলতা ফুটিয়াছে ভাল। নগেন্দ্রনাথ আর সূর্য্যমুখী ইহাদের অনেক পশ্চাতে। (বারান্তে প্রকাশ্য।)

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য। *

প্রথম অধ্যায়।

যোগাদি-স্বরূপ কীর্ত্তন।

যাজ্ঞবল্ক্যং মুনি শ্রেষ্ঠং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞান নির্ম্মলম্।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু তত্ত্বজ্ঞং সদা ধ্যান পরায়ণম্॥
বেদ বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞং যোগে চ পরিনিষ্ঠিতম্।
জিতেন্দ্রিয়ং জিতক্রোধং জিতাহারং জিতাময়ম্॥

---

* যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মহাযোগী। তৎপ্রণীত যোগসর্ব্বস্ব গ্রন্থ, "যোগিযাজ্ঞবল্ক্য" নামে অভিহিত। ইহাতে যোগশাস্ত্রের বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য লিখিত আছে। তাই আমরা ইহার মূল ও অনুবাদ অবসরে প্রকাশ আরম্ভ করিলাম। যদিও যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তথাপি তাহা অতি সংক্ষিপ্ত এবং যোগশাস্ত্রের অর্থসঙ্গত নহে। যোগসাধনতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তত্ত্ব ব্যাখ্যা, ক্রিয়াপদ্ধতি ও টীপ্পনী প্রদত্ত হইবে।—অঃ সম্পাদক।

তপস্বিনং জিতামিত্রং ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণপ্রিয়ম্।
তপোবনগতং সৌম্যং সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্॥
ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চ সমাবৃতম্।
সর্ব্বভূতময়ং শান্তং সত্যসন্ধং গতক্লমম্॥
গুণজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু পরার্থৈক প্রয়োজনম্।
ব্রুবন্তং পরমাত্মানমৃষীণামুগ্রতেজসাম্॥
তমেবং গুণসম্পন্নং নারীণামুত্তমা বধূঃ।
মৈত্রেয়ী চ মহাভাগা গার্গী চ ব্রহ্মবিদ্বরা॥
সভামধ্যে গতে তেষাং মুনীনামুগ্রতেজসাং।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ গার্গ্যেতদ্বাক্যমব্রবীৎ॥

একদা সর্ব্বজ্ঞ, নির্ম্মলজ্ঞান সম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, ধ্যানপরায়ণ, বেদ-বেদাঙ্গের রহস্যবিৎ, যোগনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, জিতাহার, জিতামর, জিতশত্রু, তপস্বী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ-প্রিয়, সর্ব্বভূতময়, শান্ত, সত্যসন্ধ, গতক্লম, তপোবনরত, সন্ধ্যোপাসনাতৎপর, গুণবিৎ, সর্ব্বজীবের হিত-সাধন-জীবনৈকব্রত মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য উপবেশন পূর্ব্বক উগ্রতেজোসম্পন্ন ঋষিগণের নিকটে পরমাত্মতত্ত্ব-বিষয়-প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় ব্রহ্মবিদ্-বরেণ্যা রমণী-কুলশ্রেষ্ঠা মৈত্রেয়ী ও গার্গী মহত্তেজবিশিষ্ট মুনিগণের সেই সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মহামুনি যাজ্ঞ-বল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহাতে আমরা দুইটি বিষয় ভালরূপে অবগত হইতে পারিব। মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী গার্গীর প্রশ্নোত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যাজ্ঞবল্ক্যের "যোগ সর্ব্বস্ব" বা "যোগিযাজ্ঞ-বল্ক্য।" যাজ্ঞবল্ক্যের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ, নির্ম্মল জ্ঞান সম্পন্ন' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অতটি গুণসম্পন্ন না হইলে, কেহ উপদেষ্টা হইতে পারেন না। অধিকন্তু তিনি সিদ্ধ-যোগী। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্ত্রী বিদুষী,—বিদুষী রমণীগণও যোগের অধিকারিণী। অনেকের ধারণা, স্ত্রীলোকের পক্ষে কঠোর যোগ-সাধনাদি নিষেধ, তাহা প্রকৃত নহে; মৈত্রেয়ী ও গার্গীর উদাহরণই তাহার দৃষ্টান্ত হইল। আত্মমুক্তির অধিকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই আছে। আর এক ভ্রান্ত ধারণা এই যে, যোগসাধনে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হয়,—কিন্তু মহাযোগী যাজ্ঞ-বল্ক্য প্রভৃতি তাহা করেন নাই। সস্ত্রীকই যোগের পথে সিদ্ধিলাভ করিয়া

ছিলেন। গার্গীও মহত্তপসম্পন্না,—তাই ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরেণ্যা এইরূপ বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে।

গার্গ্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বভূতহিতে রত।
যোগতত্ত্বং মম ব্রূহি সাঙ্গোপাঙ্গং বিধানতঃ॥
এবং পৃষ্টঃ স ভগবান্ সভামধ্যে স্ত্রিয়া তদা।
ঋষীনালোক্য নেত্রাভ্যাং বাক্যমেতদভাসত॥

গার্গী বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ! সর্ব্বভূত হিতকারিন্! সাঙ্গোপাঙ্গ যোগতত্ত্ব আমাকে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। সভামধ্যে ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপ সংপৃষ্ট হইয়া ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য একবার ঋষিগণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই নেত্রপাত অর্থে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ।

শ্রীভগবানুবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গার্গী ব্রহ্মবিদাং বরে।
বক্ষ্যামি যোগসর্ব্বস্বং ব্রহ্মণা কীর্ত্তিতং পুরা॥
সমাহিতমনা গার্গি শৃণু ত্বং গদতো মম।
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠো যাজ্ঞবল্ক্যস্তপোনিধিঃ॥
নারায়ণং জগন্নাথং সর্ব্বভূত আদিস্থিতং।
বাসুদেবং জগদ্‌যোনিং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্॥
আনন্দমমৃতং নিত্যং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
ধ্যায়ন্ হৃদি হৃষীকেশং মনসা সুসমাহিতঃ॥
নেত্রাভ্যাং তাং সমালোক্য কৃপয়া বাক্যমব্রবীৎ।
এহ্যে হি গার্গি সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে॥
যোগং বক্ষ্যামি তত্ত্বেন যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা।
মুনয়ঃ শ্রূয়তামত্র গার্গ্যা সহ সমাহিতাঃ॥
পদ্মাসনে সমাসীনং চতুরাননমব্যয়ম্।
চরাচরাণাং স্রষ্টারং ব্রহ্মণে পরমেষ্ঠিনং॥
কদাচিত্তত্র গত্বাহং স্তুত্বা স্তোত্রৈঃ প্রণম্য চ।
পৃষ্টবানমুমেবার্থং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি॥

দেব দেব জগন্নাথ চতুর্ম্মুখ পিতামহ।
যেনাহং যামি নির্ব্বাণং কর্ম্মণা মোক্ষমব্যয়ং ॥
জ্ঞানঞ্চ পরমং গুহ্যং যথাবদ্‌ব্রূহি মে প্রভো।
ময়ৈবমুক্তো দ্রুহিণঃ স্বয়ম্ভূর্লোকনায়কঃ।
সমালোক্য প্রসন্নাত্মা জ্ঞানকর্ম্মাধ্যভাষত ॥

ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ব্রহ্মবিদ্‌বরণ্যে গার্গি! গাত্রোত্থান কর, তোমার কল্যাণ হউক। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই যোগসর্ব্বস্ব এক্ষণে আমি বলিব, তুমি সমাহিত মনে শ্রবণ কর। ব্রহ্মবিৎগণের শ্রেষ্ঠ তপোনিধি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া, সর্ব্বভূত হৃদয়ান্তর্গত, যোগিগণের ধ্যেয়, আনন্দময়, নিত্য, নিরঞ্জন, অমৃতস্বরূপ, পরমাত্মা, ঈশ্বর, হৃষীকেশ, জগদ্‌যোনী, জগন্নাথ, নারায়ণ বাসুদেবকে সমাহিত চিত্তে ধ্যান করিয়া, গার্গীর প্রতি করুণ-কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—সর্ব্বজ্ঞে! সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞে! নিকটে আইস। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন,—আমিও সেইরূপ যোগতত্ত্ব বলিব; মুনিগণ! আপনারাও সমাহিত চিত্তে গার্গীর সহিত তাহা শ্রবণ করুন। কোন সময়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অব্যয় চতুরানন অবস্থান করিতেছিলেন,—আমি তখন তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম ও স্তব করিয়া যোগতত্ত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। গার্গি! তুমি যে যে বিষয় আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে তখন তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে দেব! হে জগন্নাথ! হে চতুরানন! হে পিতামহ! আমি যে প্রকারে অব্যয় মোক্ষলাভ করিতে পারি, আমাকে সেই গুহ্য জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। প্রশান্তমনা লোক-নায়ক সয়ম্ভু ব্রহ্মা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার প্রতি করুণ-নেত্রপাত করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম-বিষয় বক্ষ্যমান প্রকারে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য জানিতেন, যোগবিষয়ে তিনি যাহা উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা তাঁহার স্ত্রী বিদুষী ও ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরেণ্যা গার্গী ধারণা করিতে পারি-বেন। সেই জন্যই ঐ দুইটি উচ্চ বিশেষণে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন,—নতুবা স্ত্রী-সম্ভ্রম বৃদ্ধির প্রয়াসে ঐরূপ বলেন নাই। যোগতত্ত্ব তিনি উত্তমরূপ জানিতেন,—তিনি নিজে মহাযোগী। তাঁহার গুরু স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। তথাপি তিনি একবার সমাহিত চিত্তে জগদ্‌যোনি বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করিলেন,—সমাধিস্থ হইলেন, তৎপরে সকল কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্তের একতানতা না হইলে, জীবের নির্ম্মল জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। যোগ, অন্তর্ জগতের কথা, জড় বুদ্ধিতে সে তত্ত্বের মীমাংসা হয় না,—তাই মহাত্মা যোগীশ্রেষ্ঠ উপদেশ দানের পূর্ব্বে ভগবানে চিত্তসংযোগ করিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া লইলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—গার্গি! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, বহুদিন পূর্ব্বে আমিও লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে ঐ প্রশ্নই করিয়াছিলাম, পিতামহ! কিসে অব্যয় মোক্ষ লাভ হয়? এখন অব্যয় মোক্ষ কি? কিন্তু অব্যয় মোক্ষ জানিবার আগে, মোক্ষ কি জানিতে হইবে।

মোক্ষ শব্দে মুক্তি বুঝায়। সাংখ্য-মতে—আত্মাতে যে সুখ-দুঃখ-মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। সাংখ্য দর্শনে লিখিত হইয়াছে,—"তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।"—যে কোন প্রকারে হউক, প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরম পুরুষার্থ। ফলকথা এই যে, জড়সম্বন্ধ রহিত হওয়াই সাঙ্খ্যমতের মুক্তি। সর্ব্ব দুঃখ বিমোচনাত্মক কৈবল্য মোক্ষের পর্য্যায়ান্তর অর্থাৎ অন্যনাম। এই কৈবল্য বেদান্তের মুক্তি ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ। অন্যান্য মতের মুক্তিও এইরূপ;—পরন্তু, বেদান্ত মতের মুক্তিতে কিছু আনন্দ সংযোগ থাকার উল্লেখ আছে। আত্মার স্বরূপ স্বভাবতই আনন্দ ঘন, সুতরাং মুক্ত হইলে নির্ব্বিকার ও আনন্দ-ঘন হন। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বর কৃষ্ণ মুক্তাত্মার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন যে,—"তেন নিবৃত্ত প্রসবমর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ।"—অর্থ এই যে, বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহার প্রভাবে প্রকৃতির প্রসবশক্তি নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃতি দর্শন হয়। প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। সুতরাং আত্মা তখন রজঃ, কি তমঃ, কি অন্য কোন গুণে কলুষিত হন না। কেবল একক হন। দর্শক পুরুষের ন্যায় উদাসীন থাকেন, অর্থাৎ মুক্ত আত্মা তখন বন্ধ্যা প্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন,—তাহাতে লিপ্ত হন না।

এখন অব্যয় মোক্ষ কি, তাহাই জানিতে হইবে। অব্যয় শব্দে অক্ষয় বুঝায়। স্বপ্নহীন নিদ্রাকালে জীবের মুক্তাবস্থা আসিয়া থাকে। সাংখ্য বলেন,—"সুষুপ্তিসমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা।" অর্থাৎ জীব সুষুপ্তিকালে ও সমাধিকালে ব্রহ্মরূপ অবস্থিত থাকে। জীব সুষুপ্তিকালে প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখে মুক্ত হয়,—কৈবল্য ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাকেও মোক্ষ বলিতে পারা যায়, কিন্তু

সুষুপ্তির অপগমে আবার বন্ধন—তাই যে উপায়ে অক্ষয় মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হয়,—একবার কেবলীভাব আসিলে, আর অপগত না হয়, তদ্রূপ উপদেশই যোগিজনের প্রার্থনীয়। সেই উপদেশই যাজ্ঞবল্ক্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মর্ষিবরেণ্যা গার্গী মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটেও তাহাই শুনিতে চাহিতেছিলেন।

ব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞানস্য দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পন্থানৌ বেদচোদিতৌ।
অনুষ্ঠিতৌ তৌ বিদদ্ভিঃ প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকৌ॥
বর্ণাশ্রমোক্তং যৎকর্ম্ম কাম-সংকল্প পূর্ব্বকম্।
প্রবর্ত্তকং ভবেদেতং পুনরাবৃত্তিহেতুকম্॥
কর্ত্তব্যমিতি বিধ্যুক্তং কাম-সংকল্পবর্জ্জিতম্।
যেন যৎ ক্রিয়তে সম্যক্ জ্ঞান যুক্তং নিবর্ত্তকম্॥
নিবর্ত্তকং হি পুরুষং নিবর্ত্তয়তি জন্মতঃ।
প্রবর্ত্তকং হি সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তিহেতুকম্॥
বর্ণাশ্রমোক্তং সর্ব্বত্র বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্।
বিধিবৎ কুর্ব্বতস্তস্য মুক্তি র্গার্গি করে স্থিতা॥
বর্ণাশ্রমোক্তং কর্ম্মৈব বিধিবৎ কামপূর্ব্বকং।
তেনৈতৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম গর্ভবাসঃ করে স্থিতঃ॥
সংসার-ভীরুভিস্তস্মাদ্বিধ্যুক্তং কামবর্জ্জিতম্।
বিধিবৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং জ্ঞানেন সহ সর্ব্বশঃ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানলাভ করিবার উপায় দুই প্রকার;—এক প্রবর্ত্তক, দ্বিতীয় নিবর্ত্তক। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই প্রকার ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রমোক্ত যে সকল কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্প পূর্ব্বক সম্পাদিত হয়, তাহাই প্রবর্ত্তক, এবং জন্মান্তরাদির হেতুভূত। আর কামনা ও সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে, জ্ঞান পূর্ব্বক যে সকল বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়,—তাহাই নিবর্ত্তক। নিবর্ত্তক কর্ম্ম দ্বারা জীবের পুনর্জ্জন্ম তিরোহিত হয়। প্রবর্ত্তক কর্ম্ম জীবের সর্ব্বত্রই পুনরাবৃত্তির হেতুভূত। গার্গি! কামনা বর্জ্জন করিয়া বিধি-বিহিত বর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি তাহার করতলগত হয়,—আর যে ব্যক্তি কামনাযুক্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তদীয় পুনর্জ্জন্ম তাহারই করে বিদ্যমান।

এই হেতু সংসার-ভীরু মানবগণের কর্ত্তব্য যে, নিষ্কাম-ভাবে জ্ঞানের সহিত যথাবিধি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

কর্ম্ম জ্ঞান লাভের উপায়। সেই কর্ম্ম দুই প্রকার,—একটি প্রবৃত্তি মূলক ইহাকে প্রবৃত্তি-মার্গ বলে; আর একটি নিবৃত্তিমূলক, ইহাকে নিবৃত্তিমার্গ বলে। প্রবৃত্তি * শব্দের আভিধানিক অর্থ আসক্তি। আরও খুব সরল এবং সহজ ভাবে ইহার ধাতুমূলক অর্থ এইরূপ করা যায় যে, সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তিত হওয়া অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ঘুরিয়া যাওয়া। আর নিবৃত্তি শব্দের ঐরূপ সহজ অর্থ এই যে,—ঘুরিয়া আসা। বহির্জগতের পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমূহ—স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, ফল, পুষ্প, গৃহ, দ্বার টাকাকড়ি প্রভৃতি,—এই সমুদয়ের উপরে আকাঙ্ক্ষা। প্রার্থনার উপরে প্রার্থনা;—যত হইতেছে, ততই তাহার উপরে আমার আমি, আরও সর্ব্বতোভাবে ঘুরিয়া যাইতেছে। নদী-তটের উপরে বর্ষার জল উঠিয়া ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া—শেষে যেমন দাগ রাখিয়া নদীর জল নদীতে যায়, তদ্রূপ আমাদের 'আমি' এই বহির্জ্জগতের উপরে ঘুরিয়া যাইয়া অবশেষে দাগ রাখিয়া চলিয়া যায়,—সেই দাগই সংস্কার। সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া জীবকে ক্রমে ভারী হইয়া জন্ম জন্ম ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ইহাই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম—শাস্ত্রে এই কর্ম্মকে অসৎকর্ম্ম বলে। আর নিবৃত্তি ঐ সকল হইতে ঘুরিয়া আসা অর্থাৎ যখন বহির্জগতের ঐ সকল পদার্থ হইতে 'আমির' ঘুরিয়া আসার উদয় হয়, তখনই নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম সাধন হয়। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মবন্ধন দূর হয় না—আমির ঘুরিয়া আসাই পূর্ণ স্বার্থত্যাগ। ঘুরিয়া আসিলেই জ্ঞানের উদয় হয়। প্রবৃত্তি মূলক কর্ম্ম যে বাসনা, তাহারই দাগ সংস্কার,—সেই সংস্কারই অদৃষ্ট;—অদৃষ্টই পুনর্জ্জন্ম গঠন করে। তাই ব্রহ্মা বলিলেন,—কামনা বর্জ্জন করিয়া বিধি-বিহিত বর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি তাহার করতলগত হয়, আর যে ব্যক্তি কামনাযুক্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তদীয় পুনর্জ্জন্ম তাহারই করে বিদ্যমান। বর্ণাশ্রমোক্ত অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ;—শাস্ত্রে ইহাঁদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুণানুসারেই কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়,—কর্ম্মোৎপত্তি গুণ ক্ষয়ই বর্ণাশ্রমির ধর্ম্ম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অর্জ্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগের ইচ্ছা

---

* ন্যায়-মতে প্রবৃত্তি পঞ্চবিধ। যথা,—কারণ, চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান, ইষ্টসাধনতা জ্ঞান এবং [illegible]

করিলে, একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন— "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" ক্ষত্রিয় হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে গুণের ক্ষয় হয় না,—জ্ঞানেরও উদয় হয় না।

'সংসার-ভয়-ভীরু' একথার অর্থ করিতে গিয়া অনেকে ভব-ভয়-ভীরু লিখিয়াছেন। বাস্তবিক অর্থ তাহা নহে,—সংসার অর্থে ভবধাম নহে। স্বীয় অদৃষ্ট-জনিত যে শরীর ধারণ, তাহারই নাম সংসার *। অতএব এখানে বলা হইয়াছে, অদৃষ্ট জনিত শরীর ধারণে যাঁহারা ভীত, তাঁহারা বিধিবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

জ্ঞানাচ্চ ত্রিষু বর্ণেষু আনুলোম্যেন মানবঃ।
তে দেবানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণামনৃণাস্তথা॥
ঋষিভ্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ পিতৃভ্যশ্চ সুতৈস্তথা।
কুর্য্যাদ্ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ স্বাশ্রমং ধর্ম্মমাচরন্॥
চত্বারো ব্রাহ্মণস্যোক্তাস্ত্বাশ্রমাঃ শ্রুতি চোদিতাঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্ত্বাবেকো বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ॥
অধীত্য বেদং বেদার্থং সাঙ্গোপাঙ্গং বিধানতঃ।
স্নায়াদ্বিধ্যুক্তমার্গেণ ব্রহ্মচর্য্যব্রতং চরন্॥
সংস্কৃতায়াং সবর্ণায়াং পুত্রমুৎপাদয়েত্ততঃ।
যজেতাগ্নৌ তু বিধিনা ভার্য্যয়া সহ তাং বিনা॥
কান্তারে নির্জ্জনে দেশে ফলমূলোদকান্বিতে।
তপশ্চরন্ বসেন্নিত্যং সাগ্নিহোত্রঃ সমাহিতঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই ত্রিজাতির মানবই জ্ঞানপূর্ব্বক অনুলোম ক্রমে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিবে। নিজ নিজ বর্ণোচিত আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, সুতোৎপত্তিদ্বারা পিতৃ-ঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেব-ঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। বেদোক্ত বিধিমতে, ব্রাহ্মণগণের চারিটি, ক্ষত্রিয়ের তিনটি; বৈশ্যের দুইটি ও শূদ্রের একটি মাত্র আশ্রম নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিজগণ যথাবিধি অর্থ বেদ, বেদাঙ্গ ও তাহার উপাঙ্গ পাঠ করতঃ বিধি-কথিত নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। তৎপরে সংস্কার-বিশুদ্ধা স্ববর্ণাস্ত্রীতে অপত্যোৎপাদন করিতে হইবে। পরে ভার্য্যার সহিত কিম্বা ভার্য্যাকে

* স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধঃ শরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ।

পরিত্যাগ করিয়াই হউক, ফল, মূল ও সলিলযুক্ত জনবিহীন কান্তারে অগ্নি-হোত্র সমন্বিত দৈনিক তপশ্চরণ করতঃ ঈশ্বরে মন সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিবে।

মানব মাত্রেই দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিনটি ঋণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে,—অর্থাৎ মানব জন্ম গ্রহণ করিলেই ঐ তিনটি ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। দেবগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণ মানবাত্মাকে তাহার উন্নীত জন্মলাভের জন্য—প্রজ্ঞা সাধনের জন্য যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহারই পরিশোধ জন্য নিজ নিজ বর্ণোচিত আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, সুতোৎপত্তিদ্বারা পিতৃ-ঋণ এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইতে হয়। জীবনের তিনটি আবরণ আছে, তাহা অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ নামে প্রসিদ্ধ। অন্নময় কোষ আমাদের আহার্য্য অন্ন (যাহা ভক্ষণ করা যায় তাহাই অন্ন) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভূলোকের দৃশ্য অংশের ন্যায় কঠিন, তরল ও বায়ব্যাণু দ্বারা গঠিত। অন্নময় কোষের নামান্তর স্থূল দেহ। বাক্ পাণি, পাদ, বায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় যন্ত্র সমুদায় স্থূল দেহেই বর্ত্তমান। ঋষিগণের দ্বারা ইহা উন্নীত অবস্থা বা ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা সে ঋণের পরিশোধ হয়। ব্রহ্মচর্য্য শুক্র ধারণ,—শুক্র শেষ ধাতু। শুক্র অবিচলিত ও অবিকৃত থাকিলে মানব দৃঢ়কায় ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। বুদ্ধি, অধ্যবসায়, একাগ্রতা প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে,—এক কথায় মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। ঋষিশক্তি সেই উন্নত অবস্থা মানবকে প্রদান করিয়া মানুষকে মানুষ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া, সে শক্তি সঞ্চয় করতঃ ঋষি-শক্তির নিকট সে শক্তি পরিশোধ করিতে হয়। অতঃপর প্রাণময় কোষ ও পিতৃঋণের কথা।

প্রাণময় কোষ ভূর্লোকের অদৃশ্যাংশের ন্যায় ব্যোম পদার্থে গঠিত। প্রাণই জীবনশক্তি, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক ও তড়িৎশক্তি সমুদয় ইহারই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জীবনীশক্তিতে তদতীত আরও কিছু আছে;—এই কোষদ্বয় ভুর্লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। মানব পিতৃশক্তি লইয়াই মানব হইয়াছে,—অর্থাৎ পিতৃ-শক্তিতেই মানুষ তাহার জীবনীশক্তি, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক ও তড়িৎশক্তি আদি প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা পিতৃ-শক্তিকে পুনরায় প্রদান করিতে হইবে, তাই পুত্রোৎপাদন করতঃ সে শক্তির দায় বা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

মানব জগৎ হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া না দিলে, সে শক্তিবলে তাহাকে আকর্ষণ করিবে,—বিকর্ষণ করিবে,—পুনঃপুনঃ যাতায়াত করাইবে। অনন্তর মনোময় কোষ ও দেবঋণের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

মনোময় কোষ দুই ভাগে বিভক্ত। উহার মধ্যে ঘনতর অংশ ভুবর্লোকের সহিত সম্পর্কযুক্ত,—ইহাতে কামনা সমূহ অবস্থিত। সূক্ষ্মতর অংশ স্বর্লোকের সহিত সম্পর্কিত—তাহা ভাব ও ভাবনার ক্রীড়াভূমি।

যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয়। যজ্ঞের প্রধান কার্য্য অর্পণ বা নিবেদন। পরের নিমিত্ত আত্মত্যাগ বা আত্মতর্পণই যজ্ঞ,—এই সৃষ্টিকার্য্যই প্রথম যজ্ঞ বা ত্যাগকার্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য অনন্ত ঈশ্বরকে ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসঞ্জিতঃ" যে দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞদ্বারা ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তাহারই নাম কর্ম্ম। ভূত পদার্থে আবদ্ধ হওয়ার অধ্যাত্ম-ভাষায় মৃত্যু শব্দে অভিহিত হয়,—সুতরাং ঈশ্বর আত্মত্যাগরূপ যজ্ঞদ্বারা আপনার অংশকে বহুত্ব প্রদান পূর্ব্বক জীবসমূহ কল্পনা করিয়া প্রকৃতির আবরণ মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম বহুমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রথম যজ্ঞ;—ইহাই যজ্ঞ বিধির মূল। ইহারই দ্বারা আমরা যজ্ঞের বা ত্যাগের প্রকৃত অর্থ অনুভব করিতে পারি। পরের জন্য নিজের প্রাণাহুতিই যজ্ঞ। দেবসত্ত্বা মানবেতর অন্য জাতিতে নাই; মানবে আছে;—তাই মানব দেবগণের নিকটে ঋণী। সে ঋণ যজ্ঞ বা আত্মত্যাগের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ জাত, সুতরাং তাঁহাতে সমস্ত শক্তি বিদ্যমান,—কাজেই তাঁহার সমস্ত আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ধীরতার সহিত সম্পাদন করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় রজস্তমোমিশ্র, তাঁহাকে তিনটি আশ্রমোচিত কার্য্য; বৈশ্য রজস্তমোমিশ্র, তাঁহাকে দুইটি আশ্রমোচিত কার্য্য এবং শূদ্র তমগুণাশ্রিত সুতরাং একটি আশ্রমোচিত কার্য্য করিতেই হইবে;—কিন্তু শক্তি থাকিলে, পারগ হইলে শূদ্রাদিও চারিটি আশ্রমোচিত কার্য্যই করিতে পারেন, এবং করাও কর্ত্তব্য,—বক্ষ্যমান শ্লোকাদিতে সেকথা স্পষ্টতর রূপে বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও জ্বরাসুর।

(প্রতিবাদ।)

বিগত কার্ত্তিকমাসের ৩য় সংখ্যা অবসরে শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত বসু মুনসেফ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ ও জ্বরাসুরের বিবরণে শৈবজ্বরকে আসামের কালাজ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়। শিব তমগুণ, তমগুণ-কৃষ্ণবর্ণ, অতএব শৈবজ্বরই যে কালক্রমে বর্ত্তমান সময়ে কালাজ্বর নামে খ্যাতিলাভ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আসামের গৌহাটী ও তন্নিকটস্থ স্থানই প্রাগ্জ্যোতিষপুর বাণরাজার দেশ বলিয়া স্থির নির্দ্দেশ করিয়াছেন"। মুনসেফ মহাশয়ের এই মত কিন্তু অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথম গৌহাটীর নিকটস্থ স্থানেই প্রাগ্জ্যোতিষপুর এ অনুমান সত্য নহে।

তস্মৈ বিষ্ণুর্দ্দদৌ রাজ্যং কামরূপং মহাফলং।

*   *   *   *

প্রাগ্জ্যোতিষ পুরং খ্যাতং কামখ্যা যোনিমণ্ডলম্॥

যোগিনী তন্ত্র। ১০ম পটল।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যেখানে যোনীপীঠ বিদ্যমান, তাহাই প্রাগ্-জ্যোতিষপুর। গৌহাটীর মধ্যেই নিলাচল, এই পাহাড়েই যোনিপীঠ, অতএব গৌহাটীর নিকটস্থ কোনও স্থান প্রাগ্জ্যোতিষপুর নহে, গৌহাটীরই পৌরাণিক নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর ছিল।

দ্বিতীয়তঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুর বাণাসুরের দেশ ছিল না, উহা পৃথ্বীতনয় নরকাসুরের রাজ্য। পূর্ব্বশ্লোকে তাহারও সমর্থন করিয়াছে, ভাগবতেও লিখিত আছে।

ইন্দ্রেণ হৃত ছত্রেণ হৃত কুণ্ডল বন্ধুনা।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতোভৌম চেষ্টিতম্॥
সভার্য্যোগরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্জ্যোতিষপুরং যযৌ॥

১০ম স্কন্ধ, ৫৯ম অধ্যায়।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকেও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নরকাসুরের রাজ্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরকাসুর নিহত হইলে তৎপুত্র ভগদত্ত রাজা হন। এই বংশ অসুর হইলেও কিন্তু বাণাসুরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, অসুর হিরণ্য কশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি, এবং বলির পুত্র বাণাসুর, বাণের রাজধানী শোণিতপুর।

যেন বামন রূপায় হরয়ে দারি মেদিনী।
তস্যৌরসঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা॥
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ।
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে সরাজ্যমকরোৎ পুরা॥

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৬২ম অধ্যায়।

এই শোণিতপুরেরই বর্ত্তমান নাম তেজপুর। তেজপুর সহর হইতে ২০ মাইল দূরে বালিপারার নিকট ভালুকপাং নামে একটা স্থান আছে, সেখানেই বাণের আবাস ছিল। সিংহদ্বার প্রভৃতি বহুগৃহাদির ভগ্নাংশ নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তেজপুরে উষার অন্তঃপুর ছিল। উষার স্নানপুষ্করিণী, বিবাহের সময় জল তোলা সাতটা পুষ্করিণী, স্নান-শিলা ও পাথরের তাঁতশাল প্রভৃতি বহু নিদর্শন অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছে। বাণাসুর-পূজিত প্রসিদ্ধ মহাভৈরব শিবলিঙ্গ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছেন। দ্বিতীয় কাশীধাম সংস্থাপনার্থে বাণাসুর প্রধান লিঙ্গ বিশ্বনাথের সহিত যেখানে এক কোটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও তেজপুর হইতে ৩২ মাইল দূরে শিবলিঙ্গের নামানুযায়ী বিশ্বনাথ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া রহিয়াছে। এরূপস্থলে মুন্‌সেফ মহাশয় কিরূপে প্রাগ্‌জোতিষপুরকে বাণের দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? তাহা বুঝিতে অক্ষম।

যদি মল্লিখিত প্রমাণেরও কোন ভ্রম ত্রুটী থাকে, মুনসেফ মহাশয় বা অপর কোন বিজ্ঞ পাঠক তাহা সংশোধন পূর্ব্বক প্রকৃত তথ্য জানিতে দিলে বাধিত হইব।

পরিশেষে মুনসেফ মহাশয়ের আরও একটি ভ্রম নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন;—

"বাণ রাজা আপন কন্যা উষার জন্য অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে" একথাও যথার্থ নহে, "অনিরুদ্ধ হরণ" বাণের কৃত, কারিত বা অনুমোদিত ছিল না।

উষা স্বপ্নে কামনন্দনের সহিত প্রেমালিঙ্গন-সম্ভোগ করিয়া উন্মত্তা প্রায় হইয়াছিল। তদীয় প্রিয়তমা সখী চিত্রলেখা আলেখ্য-চিত্র দ্বারা স্বপ্নলব্ধ পুরুষ অনিরুদ্ধ বলিয়া স্থির জানিতে পারিয়া, বিদ্যা প্রভাবে হরণ করতঃ উষার গুপ্ত কক্ষে সংগোপনে রাখিয়াছিল। পরে দাসী প্রমুখ্যাৎ বাণ উহা অবগত হইয়া অনিরুদ্ধকে আবদ্ধ করিয়াছিল। বিশেষরূপে অবগতির জন্য ভাগবত পুরাণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগুণাভিরাম বৈশ্য।

জখলাবান্ধা—আসাম।

সাবধান।

১

বিশাল সাগর-গর্ভ করিয়া মন্থন
উঠেছিল সুধাভাণ্ড পরিণামে যার,
সমস্ত থাকিত যদি দেবতারি ধন,
অসুরে না পে'ত যদি কণামাত্র তার ;—

২

তা'হ'লে হ'তনা বুঝি দুর্ব্বল পীড়ন
পশিত না ইন্দ্রালয়ে উচ্চ হাহাকার,
টলিত না স্বর্গের শুভ্র সিংহাসন
হ'ত না শক্তির খড়্গে অসুর-সংহার !

৩

বিশাল সংসার-হ্রদ করিয়া মন্থন
যে বিমল প্রেমধারা হতেছে উত্থিত,—
সাবধানে ধর্ম্মে দীক্ষা করহ গ্রহণ,
দেখিও, না হয় যেন কভু কলুষিত।

৪

'দেহ লয়ে টানাটানি,'—সে নয় প্রণয়,
প্রেমের প্রতীক্ষা শুধু আত্মায় আত্মায় ;
আসক্তি আকাঙ্ক্ষা মাখা, দেহ-বিনিময়
পরমেশ পাদপদ্মে প্রেমের বিলয়।

৫

বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের সেই যে কথায়,
—"প্রেম কি, বুঝায়ে সখা দাও না আমায়"
বহুক্ষণ চিন্তা করি, অনাদি ঈশ্বর
দিলেন অর্জ্জুনে এই সামান্য উত্তর ঃ—

৬

"কেমনে বুঝাব সখা কারে প্রেম কয়,—
সত্ব-রজ-তম তিনে গঠন আমার ;—
প্রেম (ও) এ তিনে গড়া, ইহা ছাড়া আর
কি যে আছে, খুঁজিবারে, চাই প্রেমে লয়।"

৭

যে প্রেমের সিংহাসন এত উচ্চে রয়,
বিশ্বপতি যার তলে সাধেন সাধনা ;—
তোমরা সংসার-কীট, ঘৃণ্য পশুচয়,
সে প্রেমের দ্বারে কর আত্ম প্রতারণা !

৮

সাবধান ! প্রেম যেরে জলন্ত অনল,
দূরে রও, দূরে রও, ইন্দ্রিয়ের দাস !
কামনা বাসনা ছাড়ি, আন প্রাণে বল
নতুবা, ডাকিবে মিছা আত্ম সর্ব্বনাশ !

৯

সংসার-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, প্রেম-পরীক্ষায়
উত্তরিয়া, মিশে জীব পরম আত্মায় ;
নিভাও বাসনা-বহ্নি তীব্র উপেক্ষায়,
নতুবা, সহস্র বজ্র খসিবে মাথায়।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

কর্ম্মদেবী।

যশল্মীর রাজ্যে ঔরিন্তের শাসনকর্ত্তা মাণিক রায়ের কন্যা কর্ম্মদেবী রূপে গুণে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। মুন্দরাধিপতি রাও চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্য কমলের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, সত্বরই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে; উভয় পক্ষ হইতে তাহার আয়োজনও হইতেছিল। কিন্তু প্রজাপতি ঠাকুরটী ইহার মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য টুকু না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিয়তি-স্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল।

পুগলের অধিপতি রনঙ্গ দেবের পুত্র সাধু তৎকালে মহাপরাক্রমশালী বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সময় সময় তিনি পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ লুণ্ঠন করিয়া অনেক ধন রত্ন আনয়ন করিতেন। একদা তিনি পার্শ্ব-বর্ত্তী একটী নগর হইতে কতকগুলি অশ্ব ও উষ্ট্র জয় করিয়া ঔরিন্তের সীমান্ত প্রদেশ দিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন, সেই সংবাদ পাইয়া মাণিক রায় সসম্মানে সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সাধুও নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক যথা সময়ে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। পানভোজনাদির পর মাণিক-রায় সাধুর নিকট উপবিষ্ট হইয়া তদীয় বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগি-লেন। কর্ম্মদেবী ও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই সকল গল্প শুনিয়া তাঁহারা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া সাধুকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই সাধুর শৌর্য্যবীর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্মদেবী সাধুর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন—বলা বাহুল্য অরণ্য কমলের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ কর্ম্মদেবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। অদ্য সাধুকে দেখিয়া ও তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া কর্ম্মদেবী আর আত্ম সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি সহচরীগণের নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া সাধুকে পতিত্বে বরণ করিলেন। সখীগণ এই কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিল কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। বেগবতী-নদী সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইলে কে তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়? সহচরীগণ কর্ম্ম-দেবীকে রাজ-সিংহাসনের লোভ দেখাইতে লাগিল, তিনি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "সামান্য রাজ-সিংহাসনের আশায় আমি পবিত্র সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে পারিব না। যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তাঁহার দাসী-রূপে বাস করিতে পারিলে যত সুখী হইব, সমস্ত পৃথিবীশ্বরী হইয়াও আমি সেরূপ সুখী হইতে পারিব না।" হায় সে কাল! কর্ম্মদেবীর এই প্রতিজ্ঞার

কথা তাঁহার জনক জননীর কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, ভয় ও দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইল, রাঠোর বংশ কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া উচ্চ কুল গৌরব লাভের আশা এতদিন পোষণ করিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ তাহার বিপরীত হইতে চলিল; অধিকন্তু যদি অরণ্য কমলের সহিত কর্ম্মদেবীর বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, যদি কর্ম্মদেবী অরণ্য-কমলের গলে বরমাল্য প্রদানে অসম্মতা হন, তাহা হইলে রাঠোর বীর চণ্ড ক্রোধান্বিত হইয়া নিশ্চয়ই এক বিষম অনর্থপাতের সুচনা করিবেন। এই সমস্ত চিন্তায় মাণিকরায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে কন্যার মতেই সম্মতি প্রদান করিতে হইল।

মাণিক রায় যথা সময়ে সাধুর নিকট এই ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, সাধু তাহাতে ভীত না হইয়া বলিলেন "যদি যথারীতি নারিকেল ফল পুগলে প্রেরিত হয়, তবে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারি।" নারিকেল ফল প্রেরণ বিবাহ সম্বন্ধের একটী নিদর্শন। এই সমস্ত কথার পর সাধু স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবিলম্বেই মাণিক রায়ের নিকট হইতে বিবাহের সম্বন্ধ সূচক নারিকেল ফল পূগলে প্রেরিত হইল এবং অচিরেই শুভদিনে সাধু ও কর্ম্মদেবীর পরিণয় ক্রিয়া ওরিন্ত নগরে উৎসবের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

যথা সময়ে এই সংবাদ অরণ্যকমলের নিকট পৌঁছিল, অরণ্যকমল ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সাধুর বিরুদ্ধে চারি সহস্র রাঠোর সৈন্যের সহিত উত্থিত হই-লেন। বীরবর সাধু ইতিপূর্ব্বে একটী যুদ্ধে শঙ্কলা মেহরাজ নামক এক ব্যক্তির পুত্রকে নিধন করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ প্রতিশোধ লইবার আয় রাঠোর রাজ কুমারের সহিত মিলিত হইয়া সাধুর পথাবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সাধুর সহিত সাত শত ভট্টিসৈন্য ছিল। বীর প্রবর সাধু সাত শত সৈন্য সহায় করিয়া চারি সহস্র রাঠোর সৈন্য ভেদ করতঃ স্বীয় রাজ্যে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মাণিকরায় চারিসহস্র সৈন্য সাধুর সহিত গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু সাধু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরে মাণিক্ রায়ের বিশেষ আগ্রহ দর্শনে স্বীয় শ্যালক মেঘরাজ ও তাহার অধীনে পাঁচশত মাত্র সৈনিক সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন।

চন্দন নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সাধু শিবির সন্নিবেশ করতঃ বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় অরণ্যকমল সদলে তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃথা

সৈন্য ক্ষয় করা কাহারও ইচ্ছা ছিল না, এজন্য অরণ্য কমল দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব করিলেন, সাধু ও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন, আপনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, আমি দূরে থাকিয়া আপনার যুদ্ধ দর্শন করিব। যদি আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হন, তবে আমিও আপনার অনুসরণ করিব। আপনার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। কর্ম্মদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুর হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তিনি অরণ্য কমলের প্রতি সবেগে ধাবিত হইলেন, সেই সময় অরণ্য কমল ও বেগে অশ্বচালনা করিয়া তৎপ্রতি অগ্রসর হইলেন। উভয়ে উভয়ের শিরোদেশে প্রচণ্ড তরবারি প্রহার করিলেন, বজ্র ভগ্ন মেরু শৃঙ্গের ন্যায় উভয় বীরই তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। অরণ্য কমল মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তিনি কিছু পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হইলেন কিন্তু ভট্টিবীর সাধু আর গাত্রোত্থান করিলেন না, পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

আর কর্ম্মদেবী? তাঁহার সকল আশা ফুরাইল। কোথায় নবপরিণীত পত্নী স্বামী-সহ শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন, স্বামী সোহাগিনী হইয়া কোথায় সুখভোগ করিবেন, না তাহার সেই সুখের সম্বন্ধ-বন্ধন হইতে না হইতেই ছিন্ন হইয়া গেল। আর সেই লাবণ্যময়ীর লাবণ্য নাই, আর সে হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে মনোমোহন হাস্যের ছটা দৃষ্ট হয় না। কমল কোরক সম্যক বিকশিত না হইতেই এক দিনের মধ্যে বৃন্তচ্যুতহইয়া পড়িল। কিন্তু কর্ম্মদেবী বীরাঙ্গণা; তিনিই প্রাণ পতিকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন তাঁহার পতি ধর্ম্মযুদ্ধে রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তাঁহার স্বর্গের পথ পরিস্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত চিন্তাতে তাঁহার পতি-শোকের বেগ অনেক পরিমাণে লঘু হইল, তিনি পতির অনুসরণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার আদেশে রণভূমে একটী চিতা সজ্জিত হইল, চিতা প্রদক্ষিণান্তর কর্ম্মদেবী বাম হস্তদ্বারা স্বীয় দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া শ্বশুরকে প্রদান করিবার জন্য একজন সৈনিক পুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেন—বলিলেন "শ্বশুরকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও যে, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিল" তৎপরে বাম বাহু ছেদন করিবার জন্য জনৈক সৈনিককে আদেশ করিলেন। সৈনিক পুরুষ প্রথমতঃ আদেশ পালনে সম্মত হয় নাই, কিন্তু কর্ম্মদেবীর শরীর হইতে এক অভূত পূর্ব্ব তেজঃরাশি

বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া, সৈনিকের আর আপত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না। তৎক্ষণাৎ বামহস্ত কর্ত্তিত হইলে, তিনি বলিলেন "এই হস্ত আমার পিতৃকুলের ভট্টকবিকে প্রদান করিও।" তৎপরে কর্ম্মদেবী সাধুর মৃত দেহের সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। বৃদ্ধ রণঙ্গদেব যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্মদেবীর সরোবর নামক একটী পুষ্করিণী খণন করিয়া, কর্ম্মদেবীর নিদর্শন স্থাপনা করিলেন। কর্ম্মদেবী বহুদিন হইল অতীতের গর্ভে অন্তর্হিতা হইয়াছেন—এখন আছে কেবল সেই কর্ম্ম-সরোবর। অদ্যাপি সেই সরোবর বীরাঙ্গনার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

সহমৃতা সতী।

১

এস এস মৃত্যু! কৃপা করি আজি
তোরে স্পর্শ করি বিধবা বালা;
মৃত পতি-বক্ষে অনল স্পর্শিয়া
ঘুচাইবে তার বৈধব্য জ্বালা।

২

ভারত-ললনা প্রিয়পতি বিনা
জানেনা জগতে,—কি আছে আর;
জীবন সর্ব্বস্ব— পরম আশ্রয়
এক মাত্র গতি মুক্তি অবলার।

৩

পতি অনুরাগ সতীর স্বরগ
অমৃত তাঁহারি সস্নেহ ভাষা;
তাঁহারি আদর কোটী কোহিনুর
সতী আর কিছু না করে আশা।

৪

তাঁহারি প্রণয় জীবনে জীবনী
পরাণে অঙ্কিত তাঁহারি ছবি;
সতী হৃদাকাশে বিরাজয়ে সদা
প্রিয়-পতি-প্রেম-কনক-রবি।

৫

রমণী জীবন,— সেই পতিধন
অমূল্য রতন হারায়ে এবে;

শূন্য—মরুময়— স্থানে একাকিনী
অভাগী কেমনে রহিবে তবে ?

৬

জীবন জীবনে হারায়ে জীবন
কোন্ সুখে আশা-বাসনা করি ;
জীবন্মৃত হয়ে, রহিবে জগতে
অসহ্য বেদনা হৃদয়ে ধরি।

৭

তাইরে বিধবা সধবার বেশে
মৃত্যুপতি ক্রোড়ে যতনে ধরি,
জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত শরীরে
আনন্দে বিসর্জ্জে অবলা নারী !

৮

দেখ্ রে জগতে ! জগতের লোক !
সতী পতি তরে কি নাহি পারে ?
নিঃশঙ্ক আনন্দে মৃত পতি ক্রোড়ে
মৃত্যুরে আদরে গ্রহণ করে !

৯

এস এস মৃত্যু ! ক্রোড়ে ধর তবে
মৃতপতি সহ সতীর প্রাণ,
তোরে স্পর্শ করি, সতী, পতিসহ
স্বরগ ধামেতে লভুক বিশ্রাম।

শ্রীমতী "কবিতা-হার" রচয়িত্রী।

মাসিক সংবাদ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের মিঃ আর, এন্, গ্রথেরো নূতন প্রদেশে গমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্থানে ডাক্তার কনিংহাম নিযুক্ত হইয়াছেন।

এটোয়া জেলার অন্তর্গত বাথরায় ৩৭৫ জন রাজপুত ঔরঙ্গজেব বাদশার আমলে মুসলমান হইয়া এত দিন মুসলমান বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। সম্প্রতি বুন্দল সহরের রাজপুত সমাজ তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গের সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের বিশাল দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়া কলেরার পূর্ণ প্রকোপ। স্বদেশী মহোদয়গণের এদিকেও একটু একটু নজর রাখা ভাল।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

এবার কংগ্রেস লইয়া বড়ই চলাচলি দলাদলি চলিতেছে। নরমে-গরমে প্রবল বিসম্বাদ। সাধারণের মধ্যেও প্রবল আন্দোলন,—কেহ বলিতেছেন, কংগ্রেস মরিয়া গিয়াছে; কেহ বলিতেছেন, "মরিয়া না মরে কঙ্গরস, এ কেমন বৈরি!" কেহ কেহ বলিতেছেন,—"নরমে গরমে অমন হাতাহাতি মাতামাতি করা মানুষের কাজ হয় নাই।" হিতবাদী বলিয়াছেন,—"কর্ম্মবীর বিশারদ চলিয়া গিয়াছেন, বিপিনচন্দ্র কারাগারে, উপাধ্যায়ও গেলেন, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ ও ক্লান্ত; মাতৃ-পূজার পুরোহিতের অভাব!"—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা এ সকল কথায় বড় একটা নহি! তবে বুঝিতেছি, এতকাল কংগ্রেসরূপ যে সখের বৈঠক বসিত, এবার তাহাতে একটু কর্ম্ম-শক্তি প্রবেশ করিয়াছে। নতুবা সাধের আসরে এমন অশান্তির আবির্ভাব হইবে কেন? সভ্যগণের সুমধুর সংগীতের ধারে এমন বিকট-ভৈরব গলাবাজি তথা মারামারি হইবে কেন? কাজ কর, কাজ কর, রবে গরমের গলা নরমের গলা চাপিয়া ধরিবে কেন? কংগ্রেস যদিই মরিয়া থাকে,—তাহার পুনর্জন্ম হইবে;—হয়ত সেজন্মে কংগ্রেস কাজের হইতে পারে। পরন্তু, সহযোগী হিতবাদীর আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই,—পুরোহিতের পূজা করা চেয়ে যজমানেরা যদি নিজে পূজা করিতে বসে, তবেই ফল হয় ভাল। যজ্ঞ-দীক্ষিত যজমানের সহায়তা করাই পুরোহিতের কার্য্য,—বর্ত্তমান সমাজের আদর্শ পুরোহিতের ন্যায়, পুরোহিতের দ্বারা কোন আশাই নাই। দেশের লোকের মাতৃ-পূজায় দেশের লোক মনঃপ্রাণ সমর্পণ করুন। দরখাস্ত লেখককে আর তাহারা পুরোহিত রাখিতে চাহে না।

খৃষ্ট সহযোগী প্রচার, প্রচার করিয়াছেন,—"জনৈক ইংরেজ নারিকেল-মালা ভস্মের গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বহুতর কলেরা রোগাক্রান্ত রোগীকে নারিকেলমালার ভস্ম ঔষধ রূপে সেবন করাইয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।"—ঔষধের মাত্রা কতটুকু তাহা লিখিত হইলে ভাল হইত।

সম্মুখে দোলপর্ব্ব আসিতেছে। সর্ব্বত্র আবীর বা ফাগের প্রয়োজন। উহা প্রস্তুতের উপায় এস্থলে লিখিত হইল,—প্রয়োজন হইলে, বা ব্যবসায়ার্থে ইহা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ,—দুই কাঁচ্চা ওজনের গোলেলা অথবা লাল ম্যাজেণ্টা ও আড়াইসের এরারুট লইবে। প্রথমে গোলেলা বা লাল ম্যাজেণ্টা খানিকে এরূপ জলের সহিত গুলিয়া লইবে, যাহাতে সেই রঙ্গের জলে এরারুটখানি মাখান যায়; তৎপরে ঐ রঙ্গের জল এরারুটে উত্তমরূপে মাখাইয়া রৌদ্র-শুষ্ক করিয়া লইবে।

আমরা জানিতে পারিলাম,—জগন্নাথধামে পুরীর জগন্নাথ দেবের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একখানি মুকুট প্রস্তুত হইতেছে। সংবাদে খ্রীষ্ট সহযোগী প্রচার দুঃখিত হইয়াছেন। কেন না, উড়িষ্যায় শত সহস্র দরিদ্র লোক অন্নাভাবে নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতেছে, শত শত লোক অনাহারে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে। এই পঞ্চাশ হাজার টাকায় অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার লোকের এক সপ্তাহ অন্নসাস্থান হইত।” কোন হিন্দুও এই কার্য্যে সন্তুষ্ট নহেন,—ভগবান্ জগন্নাথদেবও যে, পঞ্চাশ হাজার টাকার মুকুট মাথায় দিয়া মহা আনন্দিত হইবেন, সে আশাও নাই। তিনি জগন্নাথ—জগৎ তাঁহার, তিনি জগতের। তাঁহার শত শত মূর্ত্তি অন্নাহারে ক্লিষ্ট, তিনি মুকুট মাথায় দিয়া সুখী হইবেন কেন? গীতায় তিনি স্বমুখে সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—“আমিই জীবের অন্তরে বাস করি,—আমিই জল স্থল মরুদ্ব্যোম ব্যাপিয়া আছি।” জগত্তুষ্টিতে, তাঁহার তুষ্টি। জগতের ক্রন্দনে, তাহার ক্রন্দন।”

স্থায়ীত্ব।

“যুবতীর বুকে রূপ—লাবণ্য-যৌবন”
রহে আজীবন,—
প্রেমের কুম্ভকে বসি,
ডাকিলে স্মরণ!

মাঘে।

(১)

আজিকে ঘন আঁধার ঘোর
দারুণ শীত রাতি রে,
সাজান মম কুটীর খানি
মলিন দীপ-বাতি রে,
নাহিক কেহ নাহিক কেহ
রয়েছি আমি একাকী,
এমন রা'তে তাহার সাথে
হবে না মোর দেখা কি ?

(২)

উষ্ণ মম শয়ন খানি
বক্ষ মম শূন্য রে
রয়েছে চাহি কাহার আশে
নয়ন দুটী ক্ষুণ্ণ রে
স্বনিছে বায়ু দুয়ার পাশে
বলিছে যেন কে ডাকি
একাকী আছ একাকী থাক
রহিতে হবে একাকী (ই)।

(৩)

কপোতী আ'জ কাঁপিয়া শীতে
বলিছে ডাকি কপোতে—
দারুণ শীত এসো গো, এসো,
আরো বুকের কাছেতে।
কোকিল বধূ স্বপন দেখি
সভয়ে উঠি কুহরি
সলাজে ধীরে লুকায় মুখ
বঁধূর কোলে শিহরি।

(৪)

কোন দূরে কাঁদিয়া ফেরে
বিধুরা চকাচকী রে,
শীতের রাতে আমরা শুধু
ওদেরি সম দুখী রে!
ও পারে প্রিয়া এপারে আমি
বহে বিরহ বাহিনী,
দুজনে কাঁদি দোঁহার লাগি
ধরিয়া সারা যামিনী।

(৫)

শুনেছি শীতে জড় জগতে
আপন টানে আপনে,
দীরঘ রাতি দামিনী গতি
কাটে বাসর যাপনে।
অণুর কোলে অণুকা আসে
মিলন যাচে সকলি,
বিয়োগী টানে আপন জনে
বুকের মাঝে কেবলি।

(৬)

শুনেছি গাহে বৈজ্ঞানিকে
হিমের গুণ গীতিকা,
বলে যে, "হিম, দেয় গো আনি
কণার কাছে কণিকা,"
সে যদি আনে প্রণয় টানে
অণুর কাছে অণুরে,
পারে না সে কি আনিতে কভু
তনুর কাছে তনুরে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, এম্, এ।

গ্যালভিনির আবিষ্কার।

বহুদিন পূর্ব্বে যখন "ষটচক্র" নিরূপণনামক গ্রন্থখানি পাঠ করি, তখন মনে হইয়াছিল, এই গ্রন্থে সূক্ষ্ম শারীর-বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থে স্নায়ুমণ্ডলের অনেক নূতন কথা লিখিত দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত ইহাতে বজ্রাখ্যা নাড়ী ও চিত্রিনী নাড়ীর বিবরণও অতি সূক্ষ্ম। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও ইহাদের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই। বজ্রাখ্যা নাড়ীটী, দীপশিখার ন্যায় প্রদীপ্তা। এই নাড়ী অধোদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বজ্রনাড়ীর মধ্যস্থলে চিত্রিনী নাম্নী আর একটী নাড়ী আছে। এই নাড়ী লতাতন্তুবৎ সূক্ষ্ম। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে এই নাড়ী দেখিতে পাই না। ইহা যোগিগণের যোগ জ্ঞানগম্য। এই চিত্রিনী নাড়ীর মধ্যে আর এক নাড়ী আছে,—উহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, এই নাড়িটি—

"বিদ্যুন্মালাবিলাসামুনিমনসিতাত্তন্তুরূপাসুসূক্ষ্মা"।

এই নাড়ী বিদ্যুন্মালাবিলাসা, এবং সুসূক্ষ্মা। ষটচক্রনিরূপণ গ্রন্থের এই সকল কথা পাঠ করিয়া, আমাদের মনে অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। স্নায়ু পদার্থে তড়িৎ শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না জানিবার জন্যে চিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হয়। এ আজ কুড়িবৎসরের কথা। এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত সিদ্ধযোগীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন মহাত্মার দর্শন না পাইয়া, অবশেষে স্থূল বিজ্ঞানের নিকট এই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হই। কয়েকখানি ফিজিওলজীতে এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারিলাম না। একদিন দৈবাৎ এক ফেরিওয়ালার নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি ষান্মাসিক পত্রে প্রফেসর গ্যালভিনির কৃত "জীবদেহে তাড়িতশক্তির প্রভাব পরীক্ষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারিলাম। ১৮৭৬ সালে উহাঁর মনে একটি ঘটনা বিশেষে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল। তিনি এসম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধানও করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

গ্যালভিনী একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। ইনি ১৮৭৬ সালে বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনাটমী ও ফিজিওলজীর অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এই

সময়ে ইঁহার বাস গৃহে সদতই ঘর্ষণ-তাড়িত-যন্ত্রের সাহায্যে অনেক প্রকারে পরীক্ষা হইত। এক দিবস গ্যালভিনি যন্ত্র-যোগে তড়িৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী সেই গৃহেরই এক পার্শ্বে বসিয়া ভেকের পা দিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। গ্যালভিনির স্ত্রী দেখিতে পাইলেন, যখনই তাঁহার পতির তাড়িত যন্ত্র হইতে তাড়িত আলোক উদ্ভাসিত হইতেছে, আর অমনি মৃত ভেকের পদগুলি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পতিকে ডাকিয়া এই ঘটনা দেখাইলেন। গ্যালভিনি ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া, জীবদেহে তাড়িৎ শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্যালভিনি প্রথমতঃ গগনস্থতড়িৎ দ্বারা ভেকের দেহ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। এক দিবস আকাশে মেঘ দেখা দিল, উহা হইতে বিদ্যুৎ স্ফূরণ হইতে লাগিল, গ্যালভিনি মনে করিলেন, এই উপযুক্ত সময়। তিনি এই সময়ে কয়েকটী ভেকের পদের চর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া উহা তাম্র তার দ্বারা তাঁহার ছাদের সংলগ্ন লৌহ-জালে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিলেন। বায়ু-প্রবাহে ভেকের পদ লৌহ-তারে সংযুক্ত হওয়া মাত্রই উহার মাংসপেশীগুলি সঙ্কোচিত হইতেছিল। এই ঘটনা দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, জীবদেহের উপাদান বিশেষ হইতে তড়িৎ ক্ষরিত হইয়া থাকে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ায় অতি অল্পকালের মধ্যেই পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলাজীর প্রফেসর ভল্টা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "গ্যালভনির সিদ্ধান্ত অতি অশ্রদ্ধেয়। জীবদেহে তড়িৎ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। তবে প্রফেসর গ্যালভনি যে, পরীক্ষায় ভেকের পদে তড়িৎ ক্রিয়া দেখিতে পাইয়াছেন, উহা উহার দেহগত তড়িতের কার্য্য নহে। লৌহ ও তাম্র-তার সংযোগে যে কৃত্রিমতাড়িৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহারই প্রভাবে ভেকের পদ সঙ্কুচিত হইতে দেখা গিয়াছে। ফলতঃ জীবদেহে আদৌ স্বতন্ত্র কোন তড়িৎ নাই।" ১৭৯৮ সাল পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়। এই সালেই গ্যালভিনের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রফেসর গ্যালভিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন যে, জীবদেহে তড়িৎ আছে। তিনি লৌহ বা তাম্র ইহার কোনও পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকেও তাড়িতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি দুইটী সদ্যোহত বলিষ্ঠ ভেকের স্নায়ু-সমবেত এক টুকরা মাংসের

স্নায়ু সমন্বিত অপর একটুকরা মাংসের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়াও উহাদের সঙ্কোচন ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাঁহার এই প্রক্রিয়ায় প্রফেসর ভল্টার প্রতিবাদ-নিনাদ একেবারেই নিরস্ত হইয়া পড়ে। মাংশপেশীতে যে তাড়িৎ প্রবাহ বিদ্যমান, তাহা "গ্যালভিনোমিটার" এবং "ইলেক্‌ট্রোমিটার" দ্বারাও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

গ্যালভনির গবেষণার পূর্ব্বে জীবদেহের তড়িৎ-শক্তি অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইউরোপে ওয়ালস্ ও ইংঘেনহস্ নামক দুইজন পণ্ডিতও যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন। উহাঁরা টর্‌পিডো মৎস্য এবং ইল নামক মৎস্যে তড়িৎ শক্তির প্রভাব দেখিতে পান।

ইহাদের দেহের সহিত অন্য কোন জীবের দেহ সংস্পর্শ ঘটিলেই তড়িৎ-শক্তি প্রভাবজনিত অভিঘাত অনুভূত হইয়া থাকে। ১৭১৯ সালে ইহাঁরা এই তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহারা দেখিতে পান এই মৎস্যগুলির দেহে এক প্রকার তাড়িৎ-যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রগুলি মাংসপেশী-বিনির্ম্মিত। এই যন্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত হয় এবং উহাদের দেহের তাড়িৎ অন্য দেহ স্পর্শে তদ্দেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শারীর-তত্ত্বের আধুনিক পণ্ডিত ডাক্তার হ্যালিবার্টন, মৎস্যের তাড়িতাধার যন্ত্র সম্বন্ধে অনেক গুহ্য তথ্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই সকল মৎস্য স্বেচ্ছামত এই শক্তির ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু কিয়ৎকাল ব্যবহারের পর শক্তিময় হয়, পুনর্ব্বার শক্তি-সংগ্রহের কোনও বিশ্রাম এবং তদুপযুক্ত পোষক-খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যদি মস্তিষ্ক পদার্থ হইতে তাড়িত স্নায়ু বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে মস্তিষ্কের কার্য্য রুদ্ধ হয়। দেহের চেতনা শক্তির লোপ হয়। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশের প্রান্তভাগ উত্তেজিত করিলে উহাতে সঙ্কোচনা ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ষ্ট্রিকনিয়া নামক কুচিলাসার বিষ প্রয়োগেও স্নায়ু-মণ্ডল, এই প্রকারে মাংসপেশীর সঙ্কোচন সাধন করে।

তড়িতের সকল প্রকার গুণই এই জৈব-তড়িতে বিদ্যমান। ইহার প্রভাবে সূচী চুম্বকে পরিণত হইতে পারে, রাসায়ণিক মিশ্র পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে এবং উহা হইতে তাড়িৎ-আলোককণাও উদ্ভাসিত হইতে পারে। "রয়াল ন্যাচারল হিষ্টরী" নামধেয় গ্রন্থেও এই বিষয়ে অনেক প্রকার পরীক্ষার ফল লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে অনায়াসেই বুঝা যায়, সজীব জৈব-পদার্থে তড়িতের অস্তিত্বের

যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে। মাংসপেশীর গঠন বিশেষেই উক্ত প্রকার মৎস্যাদির দেহস্থ তাড়িত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, মাংসপেশীর ক্রিয়ার ন্যায় উহাদের ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং স্নায়ুমণ্ডলের প্রভাবেই এই জৈব-তাড়িত-যন্ত্রের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

যদিও স্নায়ু মণ্ডলের সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে অনেক প্রকার গবেষণা পরিলক্ষিত হইতেছে কিন্তু স্নায়ুশক্তি কি, তাহার তথ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও নীরব। স্নায়ুর অভ্যন্তরে এমন কি শক্তি নিহিত আছে, যে শক্তি স্নায়ুপথে প্রবাহিত হইয়া মাংসপেশীগুলিকে সঙ্কোচিত করে তাড়িতাধারকে সমুত্তেজিত করিয়া উহা তাড়িত শক্তিকে বহির্নিঃসৃত করে—আমরা আধুনিক বিজ্ঞান পাঠে এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। ষট্‌চক্র-তত্বজ্ঞ যোগিগণের নিকটে সম্ভবতঃ ইহার সুমীমাংসা অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাও আমাদের অধিগম্য নহে। স্থূলবিজ্ঞানই আমাদর বর্ত্তমান ভরসা। কিন্তু স্থূলবিজ্ঞানের উত্তর বড় সন্তোষজনক নহে।

ফিজিওলজীর পণ্ডিতগণ বলেন, যদিও স্নায়বীয় পদার্থ তাড়িত পদার্থতুল্য বটে, কিন্তু উহা ঠিক তাড়িৎ পদার্থ নহে। স্নায়ু পদার্থের গতি তাড়িত পদার্থের অপেক্ষা অতি কম। কিন্তু স্নায়ু পদার্থের গতি যে, ইহার বিকম্পনের প্রকারভেদ মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হ্যামি-বার্যণ বলেন, যখন কোন স্নায়ুকে উত্তেজিত করা যায়, তখন উহাতে এক প্রকার গতি উপস্থিত হয়। এই গতি স্নায়ু-পথে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলেই চেতনা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতি এবং অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থিযন্ত্রের ক্রিয়া প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে আমাদের স্পর্শবোধ জন্মে, ইহাতে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, ইহারই প্রভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির রস ক্ষরিত হইয়া থাকে। স্নায়বীয় শক্তির প্রভাবে দেহরাজ্যে এতটা বিশাল পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, স্বয়ং স্নায়ুতে কিন্তু বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। স্নায়ুসমূহের আকারে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, অতি সূক্ষ্ম তাপ-পরিমাপক যন্ত্র (থার্ম্মোপাইল) দ্বারাও স্নায়ুতে তাপোৎপত্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কোন রাসায়-নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না, তাহাও কোনও ক্রমে জানা যায় না। এই ব্যাপার অতীব বিস্ময়জনক ও মানব বুদ্ধির অগোচর। যে শক্তি প্রবাহে সুবিশাল দেহরাজ্যে বিপুল পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ লক্ষিত হয়, সেই শক্তির উদ্ভব, স্থান একেবারেই নীরব ও নির্ব্বিকার। ব্রহ্মশক্তি হইতেই জগতের উদ্ভব

স্থিতি ও প্রলয়, কিন্তু ব্রহ্ম নীরব নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার,—এ সকল তত্ত্ব মানুষের জ্ঞানের সীমাতীত বলিয়াই মনে হয় নাকি?

যদিও স্নায়বীয় পরিবর্ত্তন আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের দুর্লক্ষ্য, কিন্তু উহাতে যে তড়িদ্বিলাসময় পরিবর্ত্তন অনবরতই সংঘটিত হইতেছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের স্থির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত এখন একপ্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত। গ্যালভ্যানো-মিটার-সূচী দ্বারা স্নায়বীয় পদার্থে গতির ক্রিয়া অতি স্পষ্টরূপেই দেখা যায়, ইহা আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

ডাক্তার—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

এম-এ, বি-এল, এম্-ডি; পি, এচ্, ডি।

পাটের চাষ।

আমাদিগের জন্মভূমি শস্য-সম্পদ-শালিনী এই বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসরই পাটের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কৃষকগণ নগদ টাকার লোভে—বড়লোক হইবার আশায়, ধানের আবাদ উপেক্ষা করিয়া পাটের চাষের অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ফলে দেশে ধানের আবাদ কমিতেছে। পাট চাষের এইরূপ অতি বৃদ্ধিতেই দেশের সর্ব্বনাশ করিবে, এখনই তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পাট চাষের অতি বৃদ্ধিতে দেশের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের বিষয় অশিক্ষিত কৃষকগণের বুদ্ধির অগম্য। তাহাদিগকে হিতোপদেশ দিয়া সুপথে পরিচালিত করিতে কাহাকেও দেখি না। বরং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্বজাতি বণিক্‌বৃন্দের হিতার্থে বঙ্গের কৃষকগণকে পাটের চাষে উৎসাহ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। "বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগ" হইতে ঐ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্‌টার এফ, স্মিথ B. S. C. স্বাক্ষরিত "পাট বা কোষ্ঠার পরীক্ষা" বিষয়ক পুস্তিকা গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ প্রেসিডেণ্টগণের দ্বারা কৃষকগণের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে। কৃষকেরাও গবর্ণমেণ্টকে পাট চাষের পৃষ্ঠপোষক ভাবিয়া উৎসাহিত ও ভাবী সুখের আশায় উৎফুল্ল হইয়া কেবলই পাটের চাষ বাড়াইতেছে। এ অবস্থায় দেশের সর্ব্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসর বঙ্গদেশে পাটের চাষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটি জেলায় কিরূপ হইয়াছে দেখুন।

জেলা	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর।	
নদীয়া	৯০০০০	৯৩০০০	একর।
যশোহর	৭০৫০০	১৪২৮০০	”
হুগ্‌লী	৪২২০০	৭১২৮৯	”
মেদিনীপুর	৯৪০০	১০৮০০	”
মালদহ	৩২৭০০	৪৫০০০	”
রঙ্গপুর	৩৮৮০০০	৪৫৫৮০০	”
জলপাইগুড়ি	১০৮৫০০	১২৫৫০০	”

সরকারি কৃষি বিভাগের ডাইরেক্‌টার মিঃ সি, এ, ওলড্‌হাম সাহেব এবার পাটের যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গ, বিহার ও আসামে ৩৮৮৩২০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, গত বৎসর ৩৪৮২৯০০ একর ভূমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ৪০০৩০০ একর অধিক ভূমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট শস্যাদির হিসাব গ্রাম্য চৌকীদার দফাদার প্রভৃতি নিরক্ষর ও দায়ীত্ব জ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া থাকেন; সুতরাং হিসাব ঠিক হয় না। অনেকস্থানে দেখিয়াছি, কৃষকেরাও কত জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে, তাহা ঠিক বলে না, গোপন করে। এবং দফাদার চৌকীদারগণও ঘরে বসিয়াই এই সকল হিসাব প্রস্তুত করিয়া থানায় দাখিল করে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উক্ত পাটের হিসাব যে, কতদূর নির্ভুল তাহাও বিবেচ্য।

পাটের আবাদ বাড়াইবার জন্য “বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগ” হইতে কৃষকদিগকে আউশ ও আমন উভয় প্রকার ধানের জমিতেই পাট বপন করিবার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত কৃষিবিভাগের “সিদ্ধান্ত” এই যে, “আমন ধান ও আলুর সহিত পাল্‌টা পাল্‌টিতে পাট উত্তমরূপ জন্মে। একই বৎসরে পাটের পর নিম্ন জমিতে আমন ধানের একটি ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে ও উচ্চ জমিতে যাহাতে ছেঁচ দিবার সুবিধা আছে তাহাতে আলুর চাষ হইতে পারে।” এই “সিদ্ধান্ত” অনুসারে চাষ করিতে আরম্ভ করিলে, পূর্ব্বে যে সকল উচ্চ জমিতে আউশ ধান ও পরে আলু উৎপন্ন হইত, এখন তাহাতে ধানের পরিবর্ত্তে পাট বপন করিতে হইবে। তাহা হইলেই পাটের আবাদ বাড়িবে। গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে এই অমূল্য (!)

উপদেশ প্রচারিত হইতেছে! যদি বাংলাদেশের সমস্ত ধানের জমিতেই পাট বপন করা হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পাট পচাইবার উপযুক্ত জলাশয় বাঙ্গলায় আছে কি? "বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগ" এ বিষয়ে নীরব কেন? পাটের আবাদ অযথা বৃদ্ধি করিতে যাহারা পরামর্শ প্রদান করিতেছেন, পাট পচা জলের অপকারিতার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত কেন?

অনেক শিক্ষিতাভিমানী ধনবান, গবর্ণমেণ্টের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পাটের চাষের জন্য দরিদ্র কৃষকগণ ক্রমে ধনবান হইতেছে; সুতরাং পাটের চাষ বৃদ্ধি হওয়ায় বাঙ্গলার লাভ ভিন্ন লোকসান্ নাই। আমরা দেশের অবস্থা ও অল্পবিত্ত ব্যক্তি বৃন্দের অন্নকষ্ট প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া, ঐ কথায় কোন প্রকারেই আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা। দেশের সকল ব্যক্তিই কৃষক নহে এবং সকল কৃষকেও কিছু পাটের আবাদ করে না। সুতরাং পাটের চাষের লাভের টাকাটা দেশের সকল লোকেই পায় না। পায় কেবল যে কয় জন কৃষক পাটের আবাদ করে। যদি পাটের চাষই বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গবাসীর আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে সমাজের গুরু পুরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়া মুটে মজুর পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক বিদেশী বণিক বৃন্দের লাভের জন্য, পাটের চাষ করিতে আরম্ভ করুক,—বঙ্গের বন জঙ্গল হইতে গোচারণ স্থানটুকু পর্য্যন্ত পাটের গাছে পূর্ণ হইয়া যাউক,—খাল, বিল, পুকুর, দীঘি, নালা ডোবা প্রভৃতি বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র জলাশয় পর্য্যন্ত সকল গুলিতেই পাট পচান হউক, বঙ্গের আর্থিক উন্নতি হইবেই হইবে!

শুনিয়াছি, এই সোণার বাঙ্গলা ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন স্থানেই পাট জন্মায় না। তাই যদি হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার কৃষকগণ নিজেদের ইচ্ছা-নুসারেই উচ্চমূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে। বিদেশী বণিকগণকে যদি এই বাঙ্গলা দেশ হইতেই পাট ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার কৃষকগণ পাটের মূল্য আপনারাই স্থির করেনা কেন? গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে পাটের মূল্য অল্প হওয়ায় কৃষকগন চিন্তিত হইয়াছে, অনেক এদেশী ক্ষুদ্র মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কিন্তু যদি কৃষকগণের মধ্যে একতা থাকে, মহাজনদিগের ব্যবসা-বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে এরূপ চিন্তা ও ক্ষতির কারণত কিছুই দেখিনা। কৃষকেরা চেষ্টা করিলে, একশত বিঘার পাটে যে টাকা পাইত, দশ বিঘার পাটে সেই টাকা পাইতে পারে। এরূপ

করিলে ধানের আবাদ ও কমেনা, জলও পচেনা; অথচ পাট বিক্রয় করিয়া টাকাও পাওয়া যায়। "কৃষিবিভাগের সিদ্ধান্ত" ছাড়িয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা উচিত।

পাটের চাষে যে কেবলই লোক্সান্, লাভ কিছুই নাই, এরূপ কথা আমরা বলিনা। তবে আমাদিগের বিবেচনায় লাভ অপেক্ষা ক্ষতির ভাগেই অধিক, তাই আমরা পাটচাষের পক্ষপাতী নহি। আমরা বাঙ্গলায় পাটের চাষ বন্ধ করিতে বলিনা, নিয়মিত করিতে বলি। এখন পাট চাষের লাভ লোক্সানের একটা হিসাব দেখা যাউক।

কুড়িবৎসর পূর্ব্বে এই বাঙ্গলা দেশে গড়ে দুই টাকায় একমণ চাউল পাওয়া যাইত, তখন পাটের মণও ৩৲ তিন টাকা ছিল। অর্থাৎ একমণ পাটের পরিবর্ত্তে ১॥০ দেড়মণ চাউল পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে গড়ে ৬৲ ছয় টাকার কমে একমণ চাউল পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্বের সহিত তুলনায় একমণ পাটের মূল্য, ১॥০ দেড়মণ চাউলের মূল্যের সমান হওয়া উচিত। তাহার কম হইলে পূর্ব্বের অনুপাতে কৃষকের ক্ষতি, অধিক হইলে লাভ। বর্ত্তমান সময়ে গড়ে ছয় টাকার কমে একমণ চাউল পাওয়া যায় না। কিন্তু এবার কৃষকেরা কেহই ৬৲ ছয় টাকার অধিক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে নাই। সুতরাং পূর্ব্বের হিসাব অনুসারে তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিতে হইবে। যদিও পাটের চাষে কয়েক জন কৃষকের হাতে আপাততঃ কিছু নগদ টাকা আসিতেছে বটে, কিন্তু সে টাকায় তাহারা কতদূর ধনবান হইতেছে, তাহা বিবেচ্য। খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এখন টাকার মূল্য কমিয়াছে; সুতরাং সংখ্যায় অধিক হইলেও, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক নহে। আরও একটা কথা এই যে, কৃষকেরা যখন হাতে নগদ কিছু টাকা পায়, তখন তাহাদিগের প্রাণে বিলাস-বাসনা চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়া থাকে। তাই তাহারা বিদেশী বিবিধ বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এই বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিতেও তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়গুণ শস্য বা তদ্‌বিনিময়ে লব্ধ অর্থ হস্তান্তর করিতে হয়। পূর্ব্বে যে বিদেশী বিলাস-দ্রব্যের মূল্য ১০ দশ টাকা ছিল, এখন তাহা পনর টাকা না দিলে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেননা আমাদিগের রাজা আইন করিয়া স্বর্ণ মুদ্রার ঐ রূপ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে বিদেশী বণিকগণ এদেশ হইতে যে দ্রব্য ১ এক পাউণ্ডের বিনিময়ে গ্রহণ

করিতেন, সেই দ্রব্য গ্রহণ করিতে এ দেশের লোক ১০ দশ টাকা দিত। এখন বিদেশী বণিকগণ যে দ্রব্য সেই ১ এক পাউণ্ড মূল্যেই গ্রহণ করেন, সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে এ দেশবাসীকে এখন ১৫৲ পনর টাকা প্রদান করিতে হয়। অথচ কাপড় হইতে সূচ সুতা-টুকু পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই বিদেশীর নিকট না লইলে গত্যন্তর নাই! আজ' কা'ল এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনেও কৃষকগণকে বিদেশী দ্রব্যই গ্রহণ করিতে হয়; কেননা, দেশী দ্রব্য এখনও বিদেশী দ্রব্যের মত বঙ্গের পল্লীপ্রদেশে প্রবেশ করে নাই। সুতরাং কৃষকগণ পাট বিক্রয় করিয়া, আপাততঃ যে টাকা কয়টা প্রাপ্ত হয়, তাহার অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া যায়, ঘরে প্রায়ই কিছু থাকে না। যদিও স্বীকার করা যায় যে, পাটের চাষ করিয়া কয়েক জন কৃষক আপাততঃ কিছু টাকা সংগ্রহ করিতেছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে দেশের দারিদ্র্য দূর হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। পাট বিক্রয়ের টাকা কয়েক জন কৃষকের সিন্দুকেই থাকিল, সময় মত তাহা বিদেশী বণিকগণ হস্তগত করিবে। সুতরাং তদ্দ্বারা দেশের সাধারণ লোকে কি উপকার প্রাপ্ত হইল? কোটী কোটী সুবর্ণখণ্ড সমগ্র দেশের দু'দশ স্থানে স্তূপাকারে রাখিলে, দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে পারিলেও, দেশের সর্ব্বসাধারণের পেটের জ্বালা তাহাতে কমে কি? তাই বলিতেছি, পাটের চাষের লাভত ঐ কয়টি টাকা মাত্র, তাও দেশের সকলে পায় না, কৃষকদিগের মধ্যে দু'দশ জনে পায়। যাহারা পায়, তাহারাও তা' রাখিতে পারে না, বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে ব্যয় করিয়া, আবার টাকার লোভে পাটের চাষ বাড়াইতে মনোযোগী হয়। লাভ ত ঐ পর্য্যন্ত! এক্ষণে ক্ষতির দিক্‌টা দেখা যাউক।

পাটের চাষের প্রসার বৃদ্ধিতে দেশে ধানের আবাদ যে ক্রমেই কমিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, যে সকল জমিতে পূর্ব্বে আউস ধান উৎপন্ন হইত, এখন সে সকল জমিতে পাট উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং ধানের আবাদ কমিতেছে। ঐ কারণে আউস ধানের আবাদ অল্প হওয়ায় গো জাতিরও খাদ্যাভাব হইয়াছে। পাটের আঁশ বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ পাট গাছের কাষ্ঠাংশ যাহাকে পাকাটি বলে, তাহা গোজাতির খাদ্য নহে। যখন এ দেশে পয়সা যোড়া সেফ্‌টি ম্যাচের আমদানি ছিল না, তখন ঐ পাকাটির অগ্রভাগে গন্ধক সংলগ্ন করিয়া দীপশলাকা প্রস্তুত করা হইত। এখন এই উন্নতির যুগে বিদেশ হইতে

দীপশলাকা আমদানি হইতেছে, সুতরাং পাকাটির ব্যবহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঐ সকল জমিতে যদি আউস ধান উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে মনুষ্য এবং গোজাতির খাদ্যাভাব ঘটিত না। আমাদের দেশে যখন আউস ধান কর্ত্তন করা হয়, তখন নিম্ন শ্রেণীর অসহায়া দরিদ্রাগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধানের শীষগুলি সংগ্রহ করে, এবং এইরূপ ধান্য সংগ্রহ করিয়া তাহারা দু'এক মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু দেশে আউস ধানের জমিগুলি পাটের জমিতে পরিণত হওয়ায়, ঐ সকল নিরাশ্রয়া দরিদ্রাদিগের ঐ প্রকারে ধান্য সংগ্রহের আর উপায় নাই। অধিকাংশ আউস ধানের জমি এবং অনেক স্থানে আমন ধানের জমি গুলিতে ধানের পরিবর্ত্তে পাট বপন করায় দেশে ধান্য অল্প উৎপন্ন হইতেছে। এই অল্প-ধান্য অবাধ-বাণিজ্যের কল্যাণে অন্যদেশের অভাব মোচনের জন্য প্রেরিত হইয়া, দেশে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা দেশের পক্ষে প্রচুর নহে। তাই এখন বাঙ্গালার দেশে বর্ম্মার চাউল আমদানী হইতেছে! আর গবর্ণমেণ্ট আউসের জমিতে পাট ও আলুর আবাদ করাইয়া বঙ্গের কৃষক দিগকে বড় লোক করিবার চেষ্টায় আছেন!

পাটের চাষের অতিবৃদ্ধিতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি বৎসর বৎসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেশ রসাতলে দিতে উদ্যত হইয়াছে। বঙ্গের শক্তিমন্দির স্বরূপ পল্লীগ্রামগুলি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের অনাদরে দিন দিন শ্রীহীন ও জনশূন্য হইতেছে, তার উপর এই পাটচাষের অতিবৃদ্ধিতে সেই শ্রী-সম্পদ শূন্য পল্লীপ্রদেশ যে শীঘ্রই শ্মশানে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা বঙ্গের পল্লীগ্রামের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহারা এ বিষয় বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিবেন। পল্লী অঞ্চলের অপ্রচুর পানীয় জলে পাটপচানর জন্য, জল দূষিত হইয়া থাকে। দরিদ্র জন-সাধারণ উপায়ান্তর না থাকায় সেই পচা দুর্গন্ধ যুক্ত জলই স্নান-পানের জন্য ব্যবহার করে। রেল পথে ভ্রমণ কালে বর্ষায় কয়েকমাস পাটপচার দুর্গন্ধ বোধ হয় অনেকের নাসারন্ধ্রেই প্রবেশ করিয়াছে। ঐ রূপ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু সেবন করিয়াই বর্ষার কয়েক মাস পল্লীগ্রামের লোকদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। পাটের চাষের প্রলোভনে ভুলিয়া বঙ্গের নির্বোধ কৃষককুল নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছে—সুধাভ্রমে বিষ খাইতেছে! তাহারাই তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণকে ভীষণ ম্যালেরিয়ার মুখে তুলিয়া দিতেছে—

তাহারাই তাহাদিগের শিশু সন্তান দিগের জন্য দুশ্চিকিৎস্য প্লীহা-যকৃতের পীড়া ডাকিয়া আনিতেছে! এই জন্যই আমাদিগের বিবেচনায় পাটের চাষ নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে প্রথম হইতে দূরে পাট পচাইবার উপায় আছে,—যে স্থানে পানীয় জলের জন্য পৃথক জলাশয় আছে, সেই সকল স্থানেই পাটের চাষ হউক। যে স্থানে গ্রামের নিকটে পাট পচাইতে হয়, যে স্থানে পাট পচাইয়া পানীয় জল নষ্ট করা হয়, সেই সকলস্থানে পাটের চাষ না হওয়াই কর্ত্তব্য। জীবনরক্ষার জন্যই অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু দু'দশ জনের অর্থোপার্জ্জনের জন্য যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের জীবন যায়, তাহা হইলে উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিবে কে? খাদ্যাভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি লোক জীর্ণ-শীর্ণ হউক, ম্যালেরিয়ার জন্য দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে যম-যন্ত্রণা ভোগ করুক, তথাপি দেশে ধনবৃদ্ধির আশায় ধানের আবাদ কমাইয়া পাটের আবাদ বাড়াইতে হইবে—পানীয় জল দূষিত করিয়া দেশের সর্ব্বত্র পচা গন্ধ ছড়াইতে হইবে, অর্থনীতি-তত্ত্বের এরূপ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

পাট চাষের কল্যাণে কৃষক ও কৃষি-মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যে পানদোষাদির অতিবৃদ্ধিতে তাহাদিগের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। বর্ষাকালে জলে দাঁড়াইয়া পাটের আঁশ বাহির করিতে হয় বলিয়া অনেকেই গাঁজা ও মদ্যভক্ত হইয়া উঠিতেছে। সমাজমধ্যে এইরূপে মাদক দ্রব্যের প্রচলন হওয়া কোন ক্রমেই শুভপ্রদ নহে।

পাটের চাষে বাঙ্গলা দেশে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক হইতেছে, বোধ হয় তাহা এতদিনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা গিয়াছে। খাদ্যাভাব শারীরিক অসুস্থতা এবং নৈতিক অবনতি ইহার কোন একটিও সমাজ রক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে; কিন্তু দেশের লোকের ধনবান হইবার প্রবল ইচ্ছায় ঐ তিনটিই এককালে আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও ভাই, তাহা হইলে খাদ্যের সংস্থান কর, স্বাস্থ্যলাভের উপায় কর, এবং নৈতিক বল সঞ্চয় কর।—পরিশ্রমলব্ধ সারশস্য বিদেশীর হাতে দিওনা; দেশের শিল্পীকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশী শিল্পীকে বড়লোক করিও না, বৃথা বিলাস-বাসনায় মুগ্ধ হইয়া অমিতব্যয়ী হইও না। চিত্ত সংযত কর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসী হও, আর ভক্তি ভাবে জপ কর—বন্দে মাতরম্!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়-ভরা উচ্ছ্বাস লইয়া খড়িয়া নদী সাগরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল। দূরে—অতি দূরে মুড়াগাছা প্রভৃতি ভদ্র পল্লী;—তার পরে ধূ ধূ প্রান্তর। নদীর উভয় তট হইতে আরম্ভ করিয়া যোজনব্যাপী কসাড় বাগান,—বাগানের উত্তরে দক্ষিণে—দূরে দূরে পল্লীগ্রাম। তখন রাত্রি অনেক—গ্রামগুলি সুপ্ত। খড়িয়া নদীর তীব্র স্রোতে একখানি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল,—নৌকায় মাঝী-মাল্লা কেহ ছিল না,—স্রোতোমুখে সে নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল।

সে দিন কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথি। তখন কেবল রজত কিরণ ঢালিয়া দিয়া চন্দ্রদেব উদিত হইতেছিলেন,—খড়িয়া নদীর নীল জলে, কর্ণধার বিহীন নৌকার ছাদে সে কিরণ পতিত হইতেছিল।

সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। দূরে দূরে গ্রামগুলি—তাহার বহিরাবরণ শ্যাম-সবুজ বৃক্ষ-বল্লরী গুলিকে লইয়া সুপ্তি-সুখে নিমগ্ন;—কসাড় বাগান তাহার অলস অভ্যস্ত অসাড়তা লইয়া নিস্তব্ধ;—প্রান্তর তাহার চির সখা—কৃষকগণকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া নিস্তব্ধ,—সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। কেবল কচিৎ কোন উড্ডীয়মান নিশাচর পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালন শব্দ, কচিৎ দূর পল্লীর কোন গৃহস্থের গৃহপালিত সারমেয়ের ক্ষণিক উদ্দীপনা জনিত দীর্ঘ স্বর-শব্দ। কচিৎ গ্রামোপান্তস্থিত সুপক্ক সুপারি-বাদাম প্রভৃতি ফলের রস-পান-স্ফূর্ত্তি-জনিত আনন্দ কাষ্ঠ বাদুড়ের কণ্ঠধ্বনি, কচিৎ জ্যোৎস্নাফুল্ল নদীজলে মৎস্যের উল্লম্ফন ধ্বনি,—কচিৎ কসাড়-বনবিহারী শৃগাল শূকর প্রভৃতি জন্তুর গতি-ধ্বনি।

নদীতটের উপরে কসাড় বন,—কসাড় বনের উপরে নদীর পাউড়ী। পাউড়ী সুউচ্চ। সেই সুউচ্চ পাউড়ীর উপর দিয়া একটি ক্ষীণকায় পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের পার্শ্বেই কৃষকের কৃষি-ভূমি পুষ্পফলভারাবনত শস্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

সেই নিশিথ সময়ে দুইজন পথিক সেই পথ বহিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের গতি অতি দ্রুত,—কিন্তু কেহ কোন কথা কহিতেছিল না,—উভয়েই নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল।

সহসা পশ্চাতের পথিক নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল, এবং অগ্রগামী পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"গোপাল, দাঁড়াও।"

অগ্রগামী পথিক আমাদের পরিচিত গোপাল চন্দ্র। পশ্চাতে গিরীশ চন্দ্র।

গোপাল চন্দ্র দাঁড়াইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইয়াছে?"

নদীবক্ষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গিরীশ চন্দ্র বলিলেন,—"ঐ দেখ একখানা ছইঘেরা নৌকা স্রোতাভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে। বোধহয় উহাতে আরোহী ছিল,—যাত্রীমাল্লা ছিল; পথে কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে, এবং সেই ঘটনায় তাহারা মরিয়া যাইতে পারে—আর এমনও হইতে পারে, আহত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় উহার মধ্যে এখনও কেহ থাকিতে পারে,—একবার অনুসন্ধান লইলে হইত।"

গোপাল চন্দ্র নৌকাখানি উত্তমরূপে দর্শন করিয়া বলিলেন,—"সম্ভব। নবাবের রাজত্বে সর্ব্বত্রই বিভীষিকা। নবাব অত্যাচারী—নবাবের কর্ম্মচারিগণ অত্যাচারী, দস্যু-তস্করে দেশ পূর্ণ—তাহারা অশাসনে সর্ব্বত্র অত্যাচারের পূর্ণ অবতার। গৃহস্থের সর্ব্বত্র বিপদ। একবার অনুসন্ধান করিতে হইল। আমি জলে নামি।"

গিরীশ চন্দ্র নিষেধ করিলেন। বলিলেন,—"না, তোমার নামিয়া কাজ নাই, জলে আমি নামিতেছি।"

গো। কেন?

গি। তোমার চেয়ে আমার জীবনে প্রয়োজন কম।

গো। কিসে?

গি। জগতে আমার কেহ নাই,—কেহ আমার প্রত্যাশা করে না।

গো। আর আমার?

গি। তোমার স্ত্রী-পুত্রাদি বর্ত্তমান। তুমি মরিলে তাহাদের অনুপায়।

গো। ভগবানের বোধ হয় সে বিধান নয়। একজন মরিলে আর দশজনের অনুপায় হইলে, লোক প্রয়োজন ও সুযোগ মতে মরিতে পাইত। শিশু সন্তান রাখিয়া, মাতা ও স্ত্রীকে কাঁদাইয়া, কেহই মরণের অধীন হইত না। বিধির বিধান এই যে, জগতে সবাই একা একা। কিন্তু অণু সকল অমিশ্র পদার্থ হইলেও যেমন তাহাদের সমষ্টি অবশ্যম্ভাবী ও অন্য পদার্থের উৎপাদক,

অবশ্যম্ভাবী ও আনন্দের উৎপাদক। মনুষ্য জগতে যাহা করিবে, তাহা তাহার কর্ত্তব্য বলিয়াই করিবে। আর্ত্ত-ত্রাণমানবের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং আনন্দ দায়ক। আমি আর্ত্তের ত্রাণ করিতে গেলে, আমার অবস্থা কি হইবে, আমার স্ত্রী-পুত্রের অবস্থা কি হইবে,—আমাকে লোকে ভাল বলিবে কি মন্দ বলিবে—সে সকল চিন্তা, সে সকল ভাবনা ভাবিতে নাই। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে হয়।

গি। আর্ত্তত্রাণের আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমি জলে নামিয়া দেখিয়া আসি।

গিরীশচন্দ্র লম্ফ দিয়া সেই কসাড়বাগানের মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। সে শব্দে একটা বন্য শূকর ভীত হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল—জ্যোৎস্নালোকে উপর হইতে গোপালচন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন। চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে, তিনি শূকরকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বন্দুক ছুড়িলেন,—লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। শূকর আর একবার ভীষণ শব্দ করিয়া ভূতলশায়ী হইল। গিরীশচন্দ্র ততক্ষণ খড়িয়া নদীর উচ্ছ্বসিত জলমধ্যে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

গিরীশচন্দ্র সাঁতার দিয়া দ্রুত গতিতে চলিলেন,—নৌকাও তখন স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিল। তাঁহারা যে দিকে যাইতেছিলেন,—নৌকা তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছিল, সুতরাং গিরীশচন্দ্র সাঁতার কাটিয়া যে দিক্ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিকেই ফিরিয়া চলিলেন। গোপালচন্দ্রও ফিরিলেন, এবং নৌকা ও গিরীশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

গোপালচন্দ্র জ্যোৎস্নালোকে নৌকা ও গিরীশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন,—এতক্ষণে দেখিলেন, গিরীশচন্দ্র নৌকার উপরে উঠিয়া বসিলেন। তারপরে দেখিলেন, গিরীশচন্দ্র নৌকার ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপরে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—গিরীশচন্দ্র বাহির হয়েন না। গোপালচন্দ্র নৌকা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। নৌকাও স্রোতাভিমুখে যেমন ভাসিয়া যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গিরীশচন্দ্র বাহির হইয়া নৌকার হাইল চাপিয়া ধরিয়া বসিলেন,—এবং চেষ্টা করিয়া কূলে লাগাইলেন। নৌকা তীরে আসিল দেখিয়া গোপালচন্দ্র কূলে নামিলেন। যেখানে নৌকা লাগিল, সেখানে একটা

অপরিচ্ছন্ন ঘাট ছিল,—সম্ভবতঃ মাঠের কৃষকেরা আসিয়া এখানে জলপান আদি করিত।

তখন ফুল্ল জ্যোৎস্নাকিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"নৌকার মধ্যে কি দেখিয়াছ?"—ব্যস্ত হইয়া গোপালচন্দ্র গিরীশচন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

গিরীশচন্দ্র বলিলেন,—"ভয়াবহ দৃশ্য! দুইটি সাংঘাতিক আহত রমণী, আর একটি পুরুষের মৃত দেহ। রক্তে নৌকাগর্ভের সমস্ত জল রক্তময় হইয়া গিয়াছে।"

গোপালচন্দ্র লম্ফ দিয়া নৌকার উপরে উঠিয়া পড়িলেন, এবং দ্রুতপদে ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে ভয়াবহ দৃশ্য। একটি পুরুষের রক্তমাখা মৃতদেহ গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহারই পার্শ্বে একটি সুন্দরী যুবতী রমণী রক্তাক্ত কলেবরে গোঙড়াইতেছে। তাহারও সমস্ত দেহ—সমস্ত বসন রক্তাপ্লুত। আর একটি রমণী একটু দূরে পড়িয়া আছে—সেও যুবতী, সেও সুন্দরী। গোপালচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, রমণীদ্বয়ের দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু সাংঘাতিকরূপে আহত।

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"গিরীশ, ভাই; এখন উপায় কি?"

গি। রমণী দুইটির শুশ্রূষা করিলে বাঁচিতে পারে।

গো। কিন্তু এখন উপায় কি?

গি। আমরা ইহাদিগকে নৌকা করিয়া লইয়া যাই,—কোন গ্রামে গিয়া চিকিৎসা করাইব। আপাততঃ তুমি উহাদিগের শুশ্রূষা করিতে থাক,—আমি নৌকা বাহিয়া লইয়া যাই। এখান হইতে তিন ক্রোশ যাইতে পারিলেই গ্রাম পাইব।

গো। তাহাতে বাধা আছে।

গি। কি?

গো। এই নৌকায় করিয়া এইরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে লইয়া যাইতে দেখিলে, লোকে আমাদিগকেই হত্যাকারী বিবেচনা করিতে পারে।

বিশেষতঃ দেশে যেরূপ সুবিচার—ইহার জন্যে আমাদিগকে বন্দী করিতেও পারে।

গি। কিন্তু প্রাণাভাব। আর এই দুইটি স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি অন্ততঃ একটিও বাঁচে, সে আসল কথা বলিতে পারিবে।

গো। তাহা হউক,—কিন্তু এই ব্যাপারে রাজকীয় কোন কর্ম্মচারী আমাদিগের সন্ধান পাইলে, বন্দী করিবে; এবং কয়েদ-ভাঙ্গা মোকদ্দমায় আসামীরূপে হয়ত প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

গি। এই যে, একটু আগে আমায় বলিলে, নিজের প্রাণের জন্য আর্ত্ত-ত্রাণে অবহেলা করিতে নাই।

গো। হাঁ, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু যেস্থলে প্রাণরক্ষা করিয়া আর্ত্ত-ত্রাণ করা যাইতে পারে, সে স্থানে প্রাণদানে পৌরষ নাই।

গি। তবে যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।

গো। রমণী দুইটিকে স্কন্ধে ফেলিয়া লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়।

গি। কত দূর?

গো। আমাদের গন্তব্য স্থানে।

গি। ততক্ষণ শুশ্রূষা না হইলে মরিয়া যাইতে পারে।

গো। আমরা এখনও প্রায় দুই ক্রোশ পথ নদীতীর বহিয়া যাইব,—অতএব নৌকা ফিরাইয়া আমাদের গন্তব্য দিকে লও। ততক্ষণ উহাদের শুশ্রূষা করা যাউক,—তারপরে স্কন্ধে করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিব।

গি। উত্তম পরামর্শ।

তখন গিরীশচন্দ্র নৌকা ঘুরাইয়া লইয়া বাহিতে লাগিল,—গোপালচন্দ্র ছই'য়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণী দ্বয়ের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। স্রোতের বিপরীত মুখে নৌকা চালান একা গিরীশচন্দ্রের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু এই সময় অনুকূল পবন বহিল,—ছইয়ের উপরে পাইল ছিল, গিরীশচন্দ্র তাহা উঠাইয়া দিয়া, হাইল ধরিয়া বসিলেন। নৌকা তখন পক্ষিনীর ন্যায় বেগে চলিতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিতা রক্তাক্ত কলেবরা রমণী দুইটিকে একস্থানে স্থাপন করিলেন। নৌকার চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, একটি ভাঙ্গা ও লুণ্ঠিতদ্রব্য বাক্সের নিকটে চকমকি পড়িয়া আছে। তিনি তাহা ঝাড়িয়া আগুণ বাহির করিলেন, এবং দুই খানি শয্যা

তুলিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া জ্বালিয়া লইলেন, এবং সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-তাপে তাহাদের দেহ সেঁকিতে লাগিলেন।

গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে যত সময় লাগিবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, অনুকূল পবন প্রবাহিত হওয়ায়, তাহার অর্দ্ধেক সময়ও লাগিল না। অতি শীঘ্র তাঁহারা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন।

গিরীশচন্দ্র বলিলেন,—"এইত সেই আম্র বাগানের নিকট আসিলাম। রমণী দ্বয়ের সংবাদ কি?"

গো। সংবাদ ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে,—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ারম্ভ হইয়াছে। যথেষ্ট শুশ্রূষা হইলে বাঁচিতে পারে।

গি। রাত্রি আর অধিক নাই। পূর্ব্ব গগনে প্রভাতের তারা উঠিয়া পড়িয়াছে। গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে সম্পূর্ণরূপে দিবালোক প্রকাশ হইবে।

গো। কৈ, যাহাদিগের আসিবার কথা ছিল, তীরে তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক, আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

গি। এখন কি করিব?

গো। তুমি ছইয়ের মধ্যে আইস।

গিরীশচন্দ্র ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ, নৌকার মধ্যে ইহাদিগের কোন দ্রব্যাদি আছে কি না!"

গি। কৈ, কিছুইত দেখি না। বোধহয়, ইহাদের নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছিল। ভয়ে মাঝী-মাল্লারা পলাইয়া গিয়াছিল,—লোকজন যদি সঙ্গে থাকিয়া থাকে, তবে তাহারা হয় মৃত, না হয় পলায়িত হইয়াছিল। অবশেষে ডাকাতেরা ভদ্রলোকটিকে নিহিত ও রমণীদ্বয়কে আহত করিয়া, নৌকাস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্য উদ্দেশে এ ব্যাপার ঘটিলে, দ্রব্যাদি অপহৃত হইত না।

গো। সম্ভবতঃ তাহাই।

গি। কতকগুলা কাগজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।

গো। কুড়াইয়া সঙ্গে লও,—রমণীদ্বয় যদি বাঁচে, এবং যদি উহা উহাদিগের কোন কাজে আসে। কাগজ দেখিয়া দস্যুগণ বোধহয় উহা ফেলিয়া গিয়াছে। তারপরে, রমণী দুইটিকে দুই জনে স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাই।

গি। কথাটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নহে। এক এক জন ওজনে দেড়মণের কম নহে।

গোপালচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"দড়মণ বোঝা ঘাড়ে করিতে না পারিলে, বিশ্ব-হিতৈষণারূপ মহান্ মহীরুহ স্কন্ধে করিয়াছ কি প্রকারে?"

গি। পারিলে আপত্তি নাই।

গো। চেষ্টা করিয়া দেখ।

গিরীশচন্দ্র একটি স্ত্রীলোককে টানিয়া স্কন্ধোপরি লইলেন।

"এইত পারিলে"—এই কথা বলিয়া, গোপালচন্দ্র অপর স্ত্রীলোকটিকে স্কন্ধে লইলেন। তারপরে উভয়ে ধীরে ধীরে কূলে নামিয়া ঘাট হইতে তীরে উঠিলেন।

অদূরে একটি বৃহৎ আম্রবাগান উষার কুঝটিকা মাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভাত-চন্দ্রের নিষ্প্রভ-কিরণ সেই কুয়াসাচ্ছন্ন শ্যাম পত্রাবলীর উপরে পড়িয়া আবিলভাবে আপ্লুত হইতেছিল।

গিরীশচন্দ্র অগ্রে অগ্রে, এবং গোপালচন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই আম্রবাগান লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন।

যখন তাঁহারা বাগানের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন একজন বিকটাকার পুরুষ একখানি বর্ষা লইয়া তাঁহাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। দূর হইতে গোপালচন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন। ব্যস্তভাবে বলিলেন—"গিরীশ, সাবধান!"

তারপরে তাড়াতাড়ি স্কন্ধলম্বিত রমণীকে সেই প্রান্তরোপরি নামাইয়া রাখিয়া, ঝুলি হইতে বন্দুক বাহির করিয়া উত্তোলন করিলেন এবং দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—"সাবধান! এই বন্দুকের গুলিতে নিমিষে সংহার করিব।"

যে আসিতেছিল, সে আরও নিকটে আসিয়া বর্ষা উত্তোলন করিল।

গিরীশচন্দ্রের স্কন্ধে অপূর্ব্ব সুন্দরী মূর্চ্ছিতা। তাহার পৃষ্ঠ বহিয়া নিবিড় কৃষ্ণ কেশদাম ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মৃণাল বাহুদ্বয়ের একখানি পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছে, অপর খানি গিরীশচন্দ্রে কণ্ঠবেষ্টিত। গিরীশচন্দ্র বামহস্তে বক্ষলম্বিত তাহার উদরদেশ ধরিয়া রাখিয়াছেন।

গিরীশচন্দ্রও বিপৎপাত দেখিয়া রমণীকে ভূমিতে রাখিতে যাইতেছিলেন,—এমন সময় একজন বৃদ্ধ পুরুষ দূর হইতে দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া

বর্ষাধারী পুরুষকে নিরস্ত হইতে অনুজ্ঞা করিল। সে তৎক্ষণাৎ বর্ষা নামাইল,—গোপালচন্দ্রও বন্দুক নামাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ আসিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। হাসিয়া বলিল,—"কি কর্ত্তামশাই, এ দুটা মেয়ে মানুষ কারা? এঁরা অজ্ঞান হইলেন কি প্রকারে?"

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"মোড়লের পো, ভাল সময়েই আসিয়া উপস্থিত হয়েছিলে, নতুবা একটা খণ্ডপ্রলয় হইয়া যাইত।"

বৃ। খণ্ড পর্‌লয় কারে বলে কর্ত্তামশাই? লড়াই বুঝি?

গো। ঘটিত লড়াই, কিন্তু অর্থ পৃথক্।

বৃদ্ধের নাম সাধু বিশ্বাস। সাধু জাতিতে কৈবর্ত্ত,—তাহার বাড়ী বাজিতপুর। সে কৈবর্ত্তের মধ্যে পরামাণিক ঘর; দুই শত সাতাইশ মৌজার কৈবর্ত্তজাতি লইয়া যে সমাজ গঠিত,—সাধু তাহার চাঁই, অর্থাৎ সমাজপতি। সাধুর আর্থিক অবস্থাও ভাল। চারি পাঁচশত বিঘা গাঁতির জমি,—গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, বাগান ভরা আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি বহুবিধ ফল ছিল। তদ্ভিন্ন বাক্সভরা অনেক অর্থও ছিল। সাধুর চারিটি পুত্র, তাহারা প্রাপ্ত বয়স্ক,—তিনটি কন্যা। পুত্র-কন্যাগণেরও সন্তান-সন্ততি হইয়াছে।

সাধু বিশ্বাস বলিল,—"তুমি ঠাকুর, লাশটা ঘাড়ে করেই দাঁড়িয়ে থাকিলে কেন? ওটাকে নামাও।"

গিরীশচন্দ্র বলিলেন,—"মাঠের মধ্যে ভিজা মাটিতে নামাইলে ইহার অবস্থা খারাপ হইতে পারে।"

গোপালচন্দ্রও মৃত্তিকা হইতে মূর্চ্ছিতা রমণীকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ স্কন্ধে করিলেন, এবং সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ ব্যক্তি কে? আমাদিগকে বর্ষা হানিতে উদ্যত হইয়াছিল কেন? আর এই বাগানের কাছে দুই এক-জন লোক রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহাই বা রাখ নাই কেন?"

সা। ঐ লোকটাকে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এখানে রেখেছিলাম। সময় উৎরে গেল দেখে, আমিও উঠে, এখন এই দিকে এলাম।

গো। হাঁ, আমাদের আসিয়া পঁহুছিতে এই বিলম্ব ঘটিয়াছে,—তার কারণ বলিতেছি। ভাল, ঐ লোকটাকে যদি তুমি আমাদের পথ চিনাইয়া গ্রামে লইবার জন্য রাখিয়াছ, তবে ও আমাদিগকে বর্যা-বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল কেন ?

সাধু বর্যাধারী ব্যক্তির মুখপানে চাহিল। সে চাহনির অর্থ, সে তাহার কথা নিজেই বলুক।

বর্যাধারী ব্যক্তি বলিল,—"আমি আপনাদিগকে চিনিতে পারি নাই। রাত্রে নদীর মধ্যে ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে,—একজন ভদ্রলোক জনদুই স্ত্রীলোক ও অনেক টাকা কড়ি লইয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন,—নৌকায় ডাকাত পড়িয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা খবর পাইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধান করিতে পারি নাই। এখন দুইটি অজ্ঞান স্ত্রীলোককে লইয়া যাইতে দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল,—আপনারা ডাকাত; আর স্ত্রীলোক দুটাকে লইয়া পলাইতেছেন।"

গোপালচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"তোমাকে ধন্যবাদ! আমার বোধহয়, তোমার কথিত নৌকারোহী সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল,—এই দুইটিই সেই।"

সাধু জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা ইহাদিগকে কোথায় পাইলে ?"

গোপালচন্দ্র সমস্ত কথা বলিলেন।

তখন সাধু বলিল,—"আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। চল গ্রামের মধ্যে যাই,—অসুদ-পথ্যির ব্যবস্থা ক'রে যাতে মেয়ে দুটো বাঁচে, তা কর্‌তে হবে।"

অতঃপর তিনজনে সম্মুখের গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল,—বর্যাধারী পুরুষটি ফিরিয়া অন্যত্র গমন করিল।

তাহারা যখন বাজিতপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ঊষার আলোক সর্ব্বত্র ফুটিয়া পড়িয়াছে। বাজিতপুর কৃষকপল্লী—প্রায় তিনশত ঘর কৃষক সে গ্রামে বাস করিত। ব্যবসায়ী ও অন্যোপজীবির সংখ্যা সে গ্রামে খুব অল্প,—সর্ব্ব সমেত পঞ্চাশ ঘরের অধিক হইবে না।

সেই নববিকশিত ঊষার আলোকে কৃষকগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক গাভীকুলকে আহার প্রদান করিতেছিল,—কেহ বা তাহাদের আহারের উদ্‌যোগ করিতেছিল, কেহ কেহ বা আপন

আপন কার্য্যক্ষেত্র মাঠের দিকে চলিয়া যাইতেছিল। পরিশ্রম-পুষ্টাঙ্গী কৃষক-বধূগণ কেহ বা স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে গৃহ-যজ্ঞে স্বামীর হোতৃ-রূপে কার্য্য করিতেছিল; কোন কামিনী বা মৃৎকুম্ভ লইয়া নদী হইতে জল আনিয়া গাভীগণের আহার্য্যাধারে ঢালিয়া দিতে ছিল, কেহ বা দাবায় গোময় লেপন করিতেছিল। কেহ কেহ বা নিদ্রোত্থিত সন্তানকে স্তন্যপানে শান্ত করিতেছিল।

সাধু আগে আগে—পশ্চাতে পশ্চাতে গোপালচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র রমণী-দ্বয়কে স্কন্ধে লইয়া সেই উষালোকোদ্ভাসিত পল্লীপথে গমন করিতেছিল। পল্লী-বৃক্ষ-বিহারী পক্ষীকুল প্রভাতী গাথায় তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইতেছিল,—কিন্তু পথিপার্শ্ব-শায়িত ধূলি-ধূসারিতাঙ্গ সারমেয়কুলের বড় বড় লাগিতেছিল না,—তাহারা ডাকিয়া ডাকিয়া বড় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিল। তাহাদের ডাকে ঈষদৌৎসুক্য হইয়া ক্বচিৎ কোন কৃষক, ক্বচিৎ কোন কৃষকবধূ পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। গ্রামের অনেকে সাধু বিশ্বাসের সঙ্গে ঐরূপ দুইটি রমণীস্কন্ধ পুরুষকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল, কিন্তু কল্পনাপ্রিয় উপন্যাস পাঠক পাঠিকাগণের ন্যায়, কল্পনা বলে তাহাদের সম্বন্ধে বৃহৎ একটা গল্প সৃজনে তাহারা ব্যস্ত হইতেছিল না। তাহারা নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছিল যে, মোড়লেরপো যখন উহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে, তখন আমাদিগকে ঐ সম্বন্ধে এখন কোন অনুসন্ধানই লইতে হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, মোড়লেরপো তাহা জানাইবে। কর্ত্তৃপক্ষের উপরে এ আত্মনির্ভরতা এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন সাম্য ও স্বাধীনতা আসিয়াছে,—সে সাম্য ও স্বাধীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।

তাহারা সাধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সে বাড়ী প্রায় চারি বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত,—কিন্তু শ্রেণীবিন্যস্ত নহে। মাটীর ঘর—মাটীর প্রাচীর—দূরে দূরে,—অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। দূরে দূরে গোয়াল ঘর, দূরে দূরে মরাই সাজান। কোথাও গাভী-কুলের আহারালয়।

সাধু একটা গৃহ-দাবায় উঠিয়া "ষষ্ঠে" বলিয়া ডাক দিল। ষষ্ঠে ওরফে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া হাজির হইল। ষষ্ঠীচরণ সাধুর মধ্যম পুত্র, তাহার বয়স অনুমান ত্রিংশৎ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সাধু বলিল,—"শীগ্‌গির, বাড়ীরমদ্দির দরোজা খুলে দে; আমরা যাব।"

ষষ্ঠীচরণ যে গৃহের দরোজা খুলিয়া আসিয়াছিল,—সে পিতৃ-আজ্ঞা পাইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ সে গৃহ-পথে চলিয়া যাইয়া বাটীর দরোজা খুলিয়া দিল।

বৃহৎ বৃহৎ আট দশখানি গৃহশ্রেণী লইয়া তাহাদের বাস-ভবন। সেই কয়খানি গৃহের যাহা একটু শ্রেণীবদ্ধ ভাব আছে, তদ্ভিন্ন আর চারি বিঘা জমির উপরে যত গৃহাদি ছিল সে সমস্ত অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খলিত।

সাধুচরণের সহিত সকলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গোময়লিপ্ত পরিষ্কার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ,—প্রাঙ্গণে নিশির শিশির পড়িয়া আর্দ্র হইয়া ছিল।

সাধুচরণ দক্ষিণদ্বারী একখানা আটচালা গৃহের সুবিস্তৃত দাবায় উঠিয়া একটা খুব বড় মাদুর টানিয়া পাতিয়া দিল। গোপালচন্দ্র ও গিরীশ-চন্দ্র গৃহের মৃত্তিকা সোপান দিয়া তথায় যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—তখন সাধু ও সাধুর পুত্র ষষ্ঠীচরণ তাঁহাদিগের সহায়তা করিল,—তাঁহারা উপরে উঠিয়া স্ত্রীলোক দুইটিকে মাদুরের উপরে শয়ন করাইলেন।

সাধু বলিল,—"চল ঠাকুর, আমরা এখন বাহিরের ঘরে যাই, মাগীরা এসে, এদের সেবা করুক;—ওসব কাজে তারা যেমন তুখোড়—আমরা তেমন নই।"

একটি স্ত্রীলোক তখন পাশমোড়া দিয়া শয়ন করিল। গোপালচন্দ্র স্ত্রীলোক দুইটির নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

সাধু বলিল,—"কি বুঝচো ঠাকুর?"

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, বাঁচিবার আশা হইয়াছে।"

সাধু বলিল,—"ষষ্ঠে, তোর মাকে ডেকে বলে দে, এই দুটো মেয়ের যাতে প্রাণ বাঁচে,—তা যেন করে। এরা বড় বিপন্ন। ভাল রকমে যত্ন না করতে পারলে মারা যাবে। আর তুই একটা গরু দুয়ে খানিক দুধ এনে দে। তোর মা যেন সেই দুধ, খানিক খানিক এদের খাইয়ে দেয়।"

অনন্তর সাধুচরণ, গোপালচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠেরমা ওরফে সাধুচরণের স্ত্রী, তস্য ওরফে গৃহকর্ত্রী অনেকগুলি যোষিৎ সঙ্গে গৃহান্তরালে দণ্ডায়মানা হইয়া কৌতূহলোৎসুক্য মনে এই

ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিলেন,—এতক্ষণে অবসর পাইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন, অর্থাৎ যেখানে অম্লান পঙ্কজ মালিকাদ্বয়ের ন্যায় মূর্চ্ছিতা যুবতীদ্বয় পড়িয়াছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী একবার মূর্চ্ছিতা রমণীদ্বয়ের প্রতি চাহিয়াই সঙ্গিনীগণের মধ্যে কাহাকেও আগুণ জ্বালিয়া সেক দিতে বলিলেন,—কাহাকেও তাহাদের বুকের পীঠের ও মস্তকের বস্ত্র সরাইয়া ফেলিয়া দিয়া গাত্রে হস্ত মার্জ্জনা করিতে বলিলেন,—ততক্ষণ ষষ্ঠীচরণ দুধ আনিয়া দিল,—একজনকে তাহা গরম করিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এবং মূর্চ্ছিতা যুবতীদ্বয়ের চৈতন্যোৎপাদনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণের ছোট মেয়ে পুঁটী, তাহার পিতামহীকে অন্যের প্রতি এতাদৃশী করুণাবতী দেখিয়া বড় অধিক সন্তুষ্ট হইল না। দাবার উপরে 'মেনি' শুইয়াছিল,—দৌড়িয়া গিয়া তাহার লেজ ধরিয়া টান দিল। অকস্মাৎ আক্রান্ত ও লেজে ব্যথা পাইয়া বিড়ালটা ক্রুদ্ধ হইয়া পুঁটীর হাতে কামড়াইয়া দিয়া মেও মেও রবে বিরাট গর্জ্জন করিয়া গৃহচালে লম্ফ দিল। মেনির দংশনে ব্যথিত হইয়া পুঁটীও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কান্না তাহার থামে না,—তখন তাহার পিতামহী বৌমাকে ডাকিয়া পুঁটিকে লইয়া যাইতে বলিলেন। পুঁটি কিছুতেই যাইবে না,—দংশন-যন্ত্রনা যত কমিয়া যাইতে লাগিল,—সে তত অধিক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আর্ত্তনাদে কোন ফল হইল না,—তাহার পিতামহী মূর্চ্ছিতাদ্বয়ের শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন না;—তখন অনন্যোপায় হইয়া সে মেনিকে মারিয়া জব্দ করিবার ব্যপদেশে এক লগুড় লইয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বহির্ব্বাটীতে গমন করিয়া সাধুচরণ, গোপালচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্রকে একখানা খট্টার উপরে উপবেশন করাইল, এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খোলো হুঁকা গোপালচন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিল,—"ঠাকুর, কি কর্ত্তে চাও? সে দিন যে সকল কথা আমাকে বলে গিয়েছিলে, আমি তা আমাদের কতক কতক লোককে বলেছিলাম।"

গো। আমি কি করিতে চাই,—একথা জিজ্ঞাসা কেন করিতেছ মোড়লেরপো? আমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আমি যাহা করিতে চাই, তাহা করিবার শক্তি আমার কোথায়?

সা। তবুও তোমার মনের ইচ্ছাটা শোনার দরকার।

গো। যাহাতে দেশের মানুষের উপরে—আমাদের স্বজাতিয়ের উপরে অত্যাচার না হয়, তাহাই করিতে চাই।

সা। অত্যাচারী কে?

গো। যে অত্যাচার করে,—সেই অত্যাচারী। অত্যাচারের হস্ত হইতে অত্যাচারিতের উদ্ধার করাই আমার ইচ্ছা; এবং সেই ধর্ম্মে—সেই কর্ম্মে তোমরা সকলে দীক্ষিত হও, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

সা। অত্যাচার নয় কোথায় ঠাকুর?—নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যাচারী,—তাঁর কর্ম্মচারীরা অত্যাচারী,—জমিদারেরা অত্যাচারী,—আর দুর্ব্বল আমরা—গরীব আমরা—আমরা-তাহার কি করিব?

গো। তোমরা-আমরা—অর্থাৎ গরীব-দরিদ্র লইয়াই দেশ। দেশে কয়জন সিরাজদ্দৌলা—কয়জন রাজা-জমিদার আছেন? আমরা যদি আমাদের কাজ করিয়া যাই,—আমরা যদি আমাদের মধ্যে অত্যাচার করিতে না দেই,—কখনই দেশে অত্যাচার হইতে পারে না।

সা। না ঠাকুর, তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না। তুমি বলিয়াছ, নবাবের লোক ঐ ঠাকুরের বৌটিকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং সে সতী মেয়ে নবাবের পাপ কথায় সম্মত না হওয়ায়, তাঁহাকে ইঁটে গাঁথিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু এমন সাধ্য কার আছে—যে, নবাবের সে অত্যাচার নিবারণ করে?

গো। যদি আমরা অত্যাচার নিবারণ করিব বলিয়া সংকল্প করি—আমাদের মধ্যে একতা থাকে, তেমন অত্যাচার সহজেই নিবারিত হয়।

সা। কেমন করিয়া হয়, আমাকে তা' বুঝিয়ে দাও দিকি?

গো। যখন অমন কোন দরিদ্রের বুকে অত্যাচারের বিষ মাখা ছোরা বসাইয়া দিয়া, তাহার স্ত্রী-কন্যা বা ভগিনীকে হরণ করিতে আসে, তখন সকলে যদি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া—আপন ভুলিয়া, তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা যায়,—নিশ্চয়ই সে রক্ষা পায়। আমাদের সমগ্র সমাজকে একটি বৃক্ষরূপে পরিণত করা চাই। বৃক্ষের যেমন কোন শাখা বা

প্রশাখাকে নাড়িয়া দিলে, সমগ্র বৃক্ষে কম্পন উপস্থিত হয়, তদ্রূপ একটি মানবের প্রাণে ব্যাথা দিলে, সমগ্র মানবের প্রাণে ব্যথা লাগা চাই।

সা। তা কি করিয়া হবে? মানুষ সবাই আপন লইয়া ব্যস্ত।

গো। ঠিক বলিয়াছ মোড়লের পো; মানুষ সবাই আপন লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু তাহাতেইত মানুষ দুঃখ পায়,—কষ্টপায়—মানুষ হইয়া মনুষ্যোচিত সুখলাভ করিতে পারে না। মানুষ তাই, পশুর মত কষ্ট পায়। হায়, মোড়লেরপো; কেহ এই পত্নীহারা অত্যাচার-পীড়িত যুবকের মর্ম্মবেদনা বুঝিল না—ইহার নয়নের শোকাশ্রু দেখিয়া কাহারও নয়নে জল আসিল না। কিন্তু কেবল এই হতভাগ্য নহে,—বঙ্গের অনেক যুবক, অনেক প্রৌঢ়, অনেক বৃদ্ধ ইহার মত হাহাকার করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে। যাহারা জ্বলে নাই,—তাহারা যে ভবিষ্যতে জ্বলিবে না, তাহাই বা কে বলিল!

সা। বুঝিলাম ঠাকুর, কিন্তু আমি সামান্য মানুষ,—আমি লেখা পড়া জানিনা,—ছোটজাত, আমি কি করতে পারি?

গো। ওকথা বলিওনা মোড়লেরপো,—তুমি সামান্য মানুষ নহ,—বহুলোক তোমার আজ্ঞাবহ;—লেখাপড়া না জানিলেও তোমার হৃদয়ে মনুষ্যত্ব আছে। আর ছোটজাতি বলিয়া আপনাকে কর্ত্তব্যহীন বিবেচনা করিতেছ কিসে? আমি শুনিয়াছি,—বিশেষতঃ তোমাদের জীবিকা-বৃত্তি দেখিয়া স্থির করা যায়, তোমরা পবিত্র বৈশ্যজাতি। জাতি স্থির বৃত্তি দেখিয়াই করিতে হয়। কৃষি, গোরক্ষা ও পালন, ধনোপার্জ্জন এবং বাণিজ্য বৈশ্যেরই বৃত্তি। কৈবর্ত্ত জাতিভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কোনও জাতির মধ্যে এই বিশুদ্ধ বৈশ্যবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব মোড়লেরপো, দেশের বড় দুরবস্থার সময় তুমি বৈশ্য-সমাজপতির কাজ কর,—স্বদেশ ও স্বজাতিকে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা রক্ষা কর।

সা। কি করতে হবে?

গো। তুমি তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া বল—দেশের এই অত্যাচারের প্রবল দহনকালে সকলে অত্যাচারিতের রক্ষা করেন, ইহা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম।

সা। আর?

গো। আর যে সকল লোক স্বদেশ ও স্বজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা খাটিয়া ফিরিতেছে,—তোমাদের কৃষিলব্ধ ধন হইতে কিছু কিছু তাহাদের পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণ জন্য প্রদান করিতে হইবে।

সা। তা একটা পড়্তা করা যাবে। আর ?

গো। প্রয়োজন হইলে, যোয়ান ব্যক্তিদের আমাদের সঙ্গে দেশের কাজে লাঠি ধরিতে হইবে।

সা। তাও অনেকে স্বীকার আছে।

গো। আর একটি কাজ আছে।

সা। সে কাজ কি ?

গো। আর যে কাজ আছে, তাহাই প্রধান। তাহাই প্রকৃত স্বদেশীর কাজ।

সা। তবে তাহা বল ?

গো। সে কাজ অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচারিতের রক্ষা।

সা। কেমন করিয়া করিতে হয় ?

গো। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কোন ব্যাক্তি যে কোন প্রকারে যে কাহারও দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, আপন ভুলিয়া তাহার রক্ষা করা চাই।

সা। সাধ্যমতে সে উপদেশ সকলকে দিব। আর কোন কথা আছে ?

গো। আছে।

সা। কি বল ?

গো। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে, তোমরা কোন্ পক্ষে থাকিবে, তাহাও স্থির করিও।

সা। সে কথা আমরা আগেই শুনিয়াছি,—সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে।

গো। কি হইয়াছে ?

সা। দুইটা দল হয়েছে। একদলের মত, দেশের রাজা, প্রজার মা-বাপ ; তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তাহারা নয়। যদি নবাব ডাকেন,—যদি নবাব তাহাদিগকে স্বপক্ষে থাকিতে বলেন, তবে তাহারা তাহাতেও প্রস্তুত আছে।

গো। আর এক দল ?

সা। সে দলের মত এদিকেও না, ও দিকেও না। তারা বলে—নবাব সিরাজদ্দৌলা বড় অত্যাচারী, সে যদি যায়, যাক্ ; তবে তারা এদিকেও না, ওদিকেও না।

গো। এরকমের কাজ নয়,—তুমি সকলকে বুঝিয়ে দাও, রাজা অত্যা-

চারী হইলে, তাহার নিপাত আবশ্যক। দেশের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে—দেশের লোকের ধন, আর রমণীর সতীত্ব লুণ্ঠিত হইতেছে, তথাপি তোমরা যদি নিশ্চিন্ত থাক—তোমরা যদি নিদ্রিত থাক,—তবে কে রমণীকুলকে রক্ষা করিবে? রমণীত পুরুষের দ্বারাই রক্ষিত।

সা। তা' সকলেই বলে। নবাব সিরাজদ্দৌলার নামে শিহরিয়া না উঠে, এমন স্ত্রীলোক নাই।

গো। তবে পুরুষেরা আবার কি করিয়া, তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইবে?

সা। শোন কর্ত্তামশায়,—কলিকাতায় যে ইংরেজের কুঠি আছে, সেই ইংরেজদের সঙ্গে না কি আমাদের দেশের বড় বড় লোকে পরামর্শ কচ্চে?

গো। হাঁ, একদল তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে।

সা। কি পরামর্শ কচ্চে?

গো। তাহাদের সহায়তায় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে।

সা। তারা ব্যবসাদার মানুষ—সুতো, কাপড়, তামাক লইয়া তাহাদের ব্যবসা;—তারা নবাবের সঙ্গে লড়াইতে পারিবে?

গো। দেশের লোক যদি তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে পারিবে।

সা। না কর্ত্তামশায়, তা করো না। তারা হ'ল ব্যবসাদার মানুষ;—নবাব সিরাজদ্দৌলার যেমন লোকের বউ-ঝির উপরে ঝোঁক,—তাদেরও তেমনি লোকের সুতো, কাপড়, তামাক, যব, গমের উপরে ঝোঁক,—তারা রাজা হ'লে ওসকল কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। এখন নবাবের আমলে বৌ-ঝি হারিয়ে কান্‌তে হ'চ্চে, তখন যুব গম তামাক কাপড় সুতো হারিয়ে কান্‌তে হবে।

গো। কথা ঠিক। কিন্তু তারা নবাব হবে না,—নবাব এদেশেরই কেউ হবে।

সা। তারা যদি জান্‌তে পায়, আমাদের বলেই দেশ রক্ষা হয়, তখন তাদের প্রতাপ বাড়বে।

গো। সাধুচরণ, তুমি খুব বুদ্ধিমান্ আর পরিণামদর্শী,—কিন্তু তোমার মত অনেকেই সে মতে মত দিতেছে না। তারা নবাব সিরাজদ্দৌলার এক আত্মীয়কে নবাব করিতে চাহিতেছে,—আর একদল ঘেসেটি বেগমের

পালিত পুত্রের পুত্রকে নবাব করিবার জন্তে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ;—ঠিক কি হইবে, এখনও তাহার স্থির হয় নাই।

সা। তবে হয়ত কিছুই হইবে না।

গো। কেন ?

সা। যে দেশের লোকের মধ্যে এই বিপদকালেও এত মতভেদ, সে দেশে কি কিছু হয় ?

গো। না সাধুচরণ, সে জন্ত ভাবিও না। দেশের কার্য্যে সমাজ-যন্ত্র যখন প্রচালিত হয়, তখন এইরূপই আবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া থাকে। যে কার্য্যে বহুজনের মতামত প্রয়োজন, সে কার্য্যে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই মতভেদের মধ্যে একটা আসল কার্য্য স্থিরতর থাকে,—তাহা আপনিই ঘটিয়া উঠে।

সা। আমরা চাষা মানুষ, আমাদিগকে যেমন বলবেন, যেমন বুঝাবেন, তেমনই বুঝব—তেমনিই করব। তবে বউ-ঝি নিয়ে বাস করা অসম্ভব হয়েছে, এর একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়ায় দরকার। বেলা অনেক হ'ল, চল আমরা স্নান করিগে। তোমাদের আবার রেঁধে খেতে হবে।

এই সময় ষষ্ঠীচরণ একটা কাঁসার বাটিতে করিয়া খানিক তৈল ও একটা গাড়ুতে করিয়া জল আনিয়া দিল।

গোপালচন্দ্র জিজ্ঞসা করিলেন,—"সে দুটি স্ত্রীলোক কেমন আছে ?"

ষষ্ঠীচরণ বলিল,—"একটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। আর একটি এখনও উঠিয়া বসে নাই, তবে জ্ঞান পাইয়াছে।" ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃত নাটকের মৌলিকতা।

অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে সংস্কৃত নাটক ভারতীয় সভ্যতার ফল নহে, কিন্তু গ্রীক সভ্যতা ভারতে যখন সুন্দর রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তখনই ভারতে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণের এমনিই পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা ছিল যে, তাঁহারা অনেক বিদেশীয় জিনিষ

দেশীয় করিয়া লইয়াছেন, অথচ তাহাতে একটুও বিদেশীয় গন্ধ পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃত নাটক দেখিয়া স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রথম নাটকখানিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও আশ্চর্য্য কৌশলে বিরচিত এরূপ নাটকীয় নৈপুণ্য কোথা হইতে আসিল? * সংস্কৃত নাটকে "জবনিকা" দেখিতেছি, এবং গ্রীকগণকেও "জবন" বলিয়া জানিতেছি। গ্রীক জাতির সহিত জবনিকার সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। নাটকের মধ্যে সংস্কৃত এবং গ্রীক নাটকই সর্ব্ব প্রাচীন। এই উভয় নাটকের গঠন প্রণালী প্রায় একরূপ। সংস্কৃত নাটক যেমন অঙ্কে অঙ্কে ও দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত, গ্রীক নাটকও সেইরূপ। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় গ্রীক নাটকেরও প্রথমে একটী প্রস্তাবনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, গ্রীক নাটকেও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকও গ্রীক নাটকের ন্যায় বসন্তকালে অভিনীত হইত। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সংস্কৃত নাটকের অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহারা সংখ্যায় পাঁচ জন হইবে—যথা—সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক, বিট, শকার ও বিদূষক; গ্রীক নাটকেও পুরুষ অভিনেতৃর সংখ্যা পাঁচজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গঠন প্রণালী সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একজাতি অন্যজাতির নিকট ঋণী।*

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্য শাস্ত্র। ভরত যদি গ্রীক অধিকারে না জন্মিয়া তাহার পূর্ব্বে জন্মিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংস্কৃত নাটক বিজয়ী হইত। ভরত মুনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত মাগধী, অর্দ্ধ মাগধী, সৌরশেনী, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি সাতটী কথিত ভাষার মধ্যে বাহ্লীক ভাষাও গ্রহণ করিয়াছেন। † সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজীর ন্যায় ভরতের সময়ে বাহ্লীক ভারতবর্ষের একটী কথিত ভাষা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় নাটকে ইংরেজী actor প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভরতের

---

* Prof-A, weler, in his History of Indian literature.

† Dr. Von Ernst Windisch, in the Congress of the Orientalists held at Berlin in 1882.

‡ মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা সুরসেনর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্তভাষা প্রকীর্ত্তিতা॥

সময়ে সংস্কৃত নাটকে বহ্লীক ভাষী অভিনেতা ছিল। ইঁহারা গৌরবর্ণ ছিলেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে বাস করিতেন। *

ভরত বলেন, কেতুমাল দেশের লোক নীলবর্ণ ও অবশিষ্ট দেশীয় লোক গৌরবর্ণ। নাটকাভিনয়ে তিনি ইহাদিগকে যে বর্ণেই অভিহিত করুন না কেন, ইটালী দেশকে "কেতুমাল" দেশ বলিত, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত শিরোমণির "পশ্চিম কেতুমালাক্ষেৎ রোমকাখ্যা মহাপুরী" প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানিতে পারি।

পাণিনি মুনি তাঁহার সূত্রে দুই জন নট সূত্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে ইঁহাদের অন্যতর ইশলাবিণ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। নট-সূত্র ও নাট্য শাস্ত্র ঠিক একই পদার্থ কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতাদিতে যে নৃত্যগীতাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে নিয়মাবলীও ইহার বর্ণনীয় বিষয় হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু রামায়ণের "নাটকন্যাপরে স্বাহুর্হাস্যানিবিবিধানি চ" প্রভৃতি শ্লোকে যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত মনে না করেন, তাঁহারা বলেন, পুরাকালেও ভারতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। কিন্তু এই নাটক বর্ত্তমান আকারে ছিল কি না, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।

বোধ হয়, সংস্কৃত নাটক ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেই প্রথম প্রচার লাভ করিয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে নট শব্দটি প্রাকৃত উষিশ হইতে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত নাটকের সর্ব্ব প্রথম প্রণেতা হইলে কখনই ইহাকে প্রাকৃত নামে অভিহিত করিতেন না। নাটকে দ্বিজেতর জাতি ও স্ত্রীলোকেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিত। বিদূষক ব্রাহ্মণ, অথচ তাহাকে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলান হইয়াছে। বিদূষক নামের অর্থ দেখিলে

---

* প্রাচ্যা বিদুষকাদীনাং ধূর্ত্তা চ নামপ্যন্তিজা।
নায়িকানাং সখিনাং চ শূরসেনাবিরোধিনা॥
যোধনাবারকাদীনাং দক্ষিণাত্যাশ্চ দীব্যতাম্।
বহ্লীক ভাষোদীচ্যানাং খসাসানাং স্বদেশজা॥
ইত্যাদি।

শকাশ্চ জবেনাশ্চৈব পাহবা (পহ্লবা) বহ্লীকা শ্রয়াঃ।
প্রায়েণ গৌরাঃ কর্ত্তব্যাঃ উত্তরাং পশ্চিমাং দিশম্॥
নাট্যশাস্ত্র।

বোধ হয়, দোষ কীর্ত্তনই যেন ইহার ব্যবসায় ছিল। ভরত মুনি ইহার আকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি হাস্যজনক। তিনি বলেন, বিদূষক, বামন, কুব্জ, বিকৃত মুখ, বড় বড় দন্ত বিশিষ্ট, খলিত মস্তক (টাক পড়া) পিঙ্গল চক্ষু অথচ ব্রাহ্মণ হইবেক। সে খঞ্জ না হইলেও অভিনয় করিতে করিতে কখনও খঞ্জের ন্যায়, কখনও কখনও বক পাখীর মত গমন করিবে; কখনও বাতুলের ন্যায় কথা বলিবে, কখনও বা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিবে। এইরূপে কখনও বা বিকৃতাঙ্গ, কখনও বিকৃত ভাষা এবং কখনও বিকৃত পরিচ্ছদাদি দ্বারা সে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্যতিত ব্রাহ্মণ সন্তানের এরূপ অপমান ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষায় হিংসা অর্থে নট ধাতুর প্রয়োগ অতি কম দেখা যায়, অথচ নট ধাতুর অর্থ হিংসা করা; ইহাতেও হয়ত কিছু রহস্য আছে। Sir Philip Sydney বলিয়াছেন * নাট্যমঞ্চের দুই ঘণ্টার অভিনয়ে নাটকের নায়ক নায়িকার বাল্য হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনের ঘটনা বিবৃত করায় নাটকীয় নিয়মের লঙ্ঘন করা হয়। কেননা, গ্রীক পণ্ডিত Aristotle-এর ইহা অনুমোদিত নহে। এরূপ অভিনয় দর্শকমণ্ডলীর পক্ষেও বিরক্তিকর। তিনি হয়ত একটুও ভাবেন নাই যে, তাঁহার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেক্সপিয়র নামে একজন কবি আবির্ভূত হইবেন, যিনি Sir Philip অথবা Aristotle-এর প্রবর্ত্তিত নিয়মে কর্ণপাতও করিবেন না, অথচ তাঁহার দৃশ্য কাব্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, অথচ তাহা দর্শকে অথবা শ্রোতৃগণের পক্ষে বিরক্তিকর হইবে না। † আর তিনি একটুও জানিতে পারেন নাই যে, কালিদাসের পূর্ব্বে ভরত নামে একজন নটশাস্ত্রকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও Aristotle এর ন্যায় দীর্ঘকালের ঘটনা নাটকে বিবৃত হইতে পারে না, এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, অথচ কালিদাস তাহা উপেক্ষা করিয়াও নাট্যজগতে অদ্বিতীয় হইয়া গিয়াছেন। ‡ কালিদাসের কাব্য

---

* Apology and Poetry.

† Shakespear এর কোন্ নাটক কত দিনের ঘটনায় পূর্ণ, তাহা "Transaction of the New Shakespearian Society 1878" হইতে অতি সহজে জানা যায়।

‡ অহশ্ছেদং মাসকৃতং বর্ষসঞ্চিতং বাপিতৎসর্ব্বং
কর্ত্তব্য বর্ষদূর্দ্ধাচ নতু কদাচন। নাট্যশাস্ত্র।

সেক্সপিয়রের জানা অসম্ভব, কিন্তু Aristotle এর বিষয় ভরতের পক্ষে অবগত হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Dr. Windisch বলেন (১) Plautus রচিত নাটক Curents এর সহিত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম পাঠক মৃচ্ছকটিকের যে কেবল বর্ণনীয় বিষয়েরই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে; প্রত্যুত গ্রীক নাটকের parasitus edax, miles glorious ও Servees Currens যথাক্রমে মৃচ্ছকটিকে বিটশাষার ও বিদূষক নামে পরিচিত হইয়াছে। আর কুমারী চরিত্রের কলঙ্ককারিণী গ্রীক নাটকের Lenaই যেন মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার জননী বলিয়া ভ্রম হয়। অকৃত্রিম ভালবাসার প্রভাবে বসন্তসেনার নীচ হইতে সম্ভ্রান্ত অবস্থায় উন্নতি তাহাও Plautusএর Cistellaria নাটকের Si nium এর গল্পের স্থায় বোধ হয়। আর মৃচ্ছকটিক (Toycarl) নামটাই যেন Plautine নাটক Aulularia ও Ceistellaria নামের অর্থ স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন, ভারতে যখন গ্রীকসভ্যতার পূর্ণ প্রভাব; তখনই মৃচ্ছ-কটিক রচিত হইয়াছিল, সুতরাং উক্তরূপ সাদৃশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কয়েকটি বিষয়ে সংস্কৃত নাটকের সহিত সেক্সপিয়রের নাটকের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় নাটকে Lones Laleours Losএর Nine warthies এর Intrlneede এবং Widsnm মধ্যে Nights dreaen এর Pyramas Tnisly অভিনয় নাটকের ভিতর নাটকাভিনয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত; এবং এই নাট্য কৌশল Kyd's Spanish Tragedy অথবা green's james the fourth এর পূর্ব্বে বোধ হয় কেহ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে এই নাট্যকৌশল প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। সপ্তম শতাব্দীতে বিরচিত শ্রীহর্ষদেবের প্রিয়দর্শিকার তৃতীয় অঙ্ক, অষ্ট শতাব্দীতে বিরচিত, ভবভূতির উত্তর চরিতের ৭ম অঙ্ক এবং নবম অথবা দশম শতাব্দীতে বিরচিত; রাজ শেখরের বালরামায়ণের সীতাস্বয়ম্বর নামক গর্ভাঙ্ক নাটকের ভিতর নাটকাভিনয়ের সর্ব্ব প্রধান দৃষ্টান্ত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে পত্রের অতি প্রচার ছিল, সুতরাং সেক্স-পীয়র তাঁহার Hemnlet ও Othelo প্রভৃতির অভিনয়ে যে পত্রের ব্যবহার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে পত্রাদির বিরল প্রচার সত্ত্বেও কালিদাস, শকুন্তলা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি রমণীগণের দ্বারা চিঠি

(১) Congress of the Orientelists held at Berlin in 1882.

দেখাইয়া যে, কেবল নাটকীয় সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; তৎকালিক সামাজিক সভ্যতারও আভাস দিয়াছেন।

সুরাপান ইউরোপীয় সভ্যতার একটি অঙ্গ হইলেও নাটকাদিতে ইহার প্রচলন খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। সেক্সপীয়র Othelo তে Cassina এর মুখে মত্ততা প্রযুক্ত অন্য শব্দ প্রলাপের পর যে আত্মভৎর্সনা করাইয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিলটনের Consees সুরাই অবতার বিশেষ। মদ্যপান মধ্য যুগে হিন্দু সভ্যতার হয়ত একটা অঙ্গ ছিল। নতুবা আমরা নাগানন্দকে ও শেখরককে সুরাপাত্র বহন করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতে দেখিতাম না। শ্রীহর্ষদেব এই স্থলে শেখরককে কখন ঘূর্ণন, কখন প্রস্খলন কখনও বা বিদূষককেই স্বীয় প্রণয়ণী বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া, বেন্ জন্সনের ন্যায় অনেকটা পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। মালবিকাগ্নি-মিত্রে ও রাজমহিষী ইরাবতী নাট্যমঞ্চে অতি সতর্কতার সহিত বেড়াইতে চাহিলেও মত্ততা প্রযুক্ত সফল হন নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষে একটি উন্মত্ত দৃশ্যের অবতারনা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেক্সপীয়র Prospus এর হাতে যাদুকরী লাঠি দিয়া Ferdinand ও Mirand কে যতদূর আশ্চর্য্য করিতে না পারিয়াছিলেন, শ্রীহর্ষদেব রত্নাবলীতে ঐন্দ্র-জালিক সম্বরসিদ্ধির হাতে ময়ূর-পুচ্ছ প্রদান করিয়া রাজদম্পত্তি যেন, সমুদয় দর্শকমণ্ডলীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সম্বরসিদ্ধি দম্ভ করিয়াই বলিয়াছিল যে, সে—

"ধরায় শশাঙ্ক কিম্বা ব্যোমে গিরিরাজ
সলিলে অনলে কিম্বা মধ্যাহ্নেতে সাঁজ।"

দেখাইতে পারিবে, তাহা নহে। প্রত্যুত সকলে দেখিয়াছিল,—

"হর্ম্ম্যোপরিজলে শিখা
কনকশিখর শোভাধরি
জলিয়া উদ্যান তরু
তীব্র তাপে দিক্ যায় ভরি।
কোথাও বা ক্রীড়া গিরি
ধূমযোগে জলদ শ্যামল
ত্রাহ-ভয়াকুলা নারী
অন্তঃপুরে ভীষণ অনল।"

আর Marlowe doctor Faustus কে Helen of Troy এর দৃশ্য দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজশেখর তাঁহার কর্পূর মঞ্জরিতে ঐন্দ্রজালিক ভৈরবানন্দ দ্বারা যে কৃত্রিম রমণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে নৃপবরের ভালবাসা পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস ; এম্, এ, বি, এল্।

বাণী।

বাণী বিদ্যাদায়িনীং
নমামি ত্বাং।

মানস-সরস-জলে মরাল খেলিছে কিবা
দুলাইয়া শুভ্রদেহ ঈষৎ হেলায়ে গ্রীবা!
নামিছেন শ্রান্তরবি পশ্চিম সোপান দিয়া
চঞ্চল তরঙ্গ চূড়ে স্বর্ণ রশ্মি ছড়াইয়া!
নব দূর্ব্বাদল শির সমীর চুমিয়া যায়
কোমল পরশে তার কাঁপিয়া উঠিছে কায়!
স্নিগ্ধ সুশীতল ধরা; প্রস্ফুটিত কমলিনী
সে ফুল্ল-কমল দলে, কে গো জ্যোতিস্বরূপিনী?
আলু থালু কেশদাম, নিমীলিত আঁখি পাতা,
সুরঞ্জিত ওষ্ঠাধর হৃদয়েতে ভাব গাঁথা
মৃণাল-আসনে বসি ঝঙ্কারিছ বীণা-তার,
উঠিছে সঙ্গীত-সুধা উথলি স্বরগ-পার!
মধুর বীণার রবে, কমল-সরসী-জলে,
পড়িছে সোহাগে ঢলি তোমার চরণ তলে,
নীরবে শুনিছে পাখী বীণার পূরবি তান,
দ্রবীভূত আত্মহারা বাল্মীকি-পাষাণ প্রাণ।
মুকতি দিয়াছ যারে আঁধারে ধরিয়া হাতে
ফুটায়ে কনকজ্যোতি হৃদয়ের পাতে পাতে!
পঙ্কজ-কাননে বসি যাহারে করুণা কর
অতৃপ্ত হিয়ার মাঝে সেই পায় শুভ বর!

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

দীপনির্ব্বাণ।

সরাও সরাও দেব!
　　বাসনার দীপমালা,
নিভাও নিভাও ত্বরা
　　কামনা-বহ্নির জ্বালা,
শতরজ্জু বাসনার, শতমুখী গতি তার,
　　শতেক বাঁধনে প্রাণ করে আনচান।
মিটাও এ তৃষানল, ভুলে যাও এ সকল,
　　হরিপদ শান্তি জলে কর নিরবাণ।
রহে যদি এ আগুন, বাড়িবে যে শতগুণ,
　　জীবনের ব্রত তবে হবে না পূরণ,
নিভাইয়ে এ অনল, জীবন কর সফল,
　　প্রাণেশের প্রেম-সুধা কর আস্বাদন।

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী।
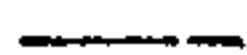
মানময়ী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পথে বিপদ।

রমেশবাবু ও মানময়ী সহ গাড়ী ক্রমে লোকশূন্য বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল,—পথের দুই দিকেই যতদূর দৃষ্টি যায়,—কেবলই মাঠ,—বোধ হয়, দুই। তিন ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম নাই।

পথেও এমন লোক নাই,—বেলা দুইটা বাজে,—প্রখর রৌদ্রের তাপে চারিদিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছে,—কাহার সাধ্য এই রৌদ্রে বাহির হয়,—

দুই একটি গরু বাছুর যাহা মাঠে চরিতেছিল,—তাহারাও বৃক্ষ ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে।

পথের ধারে কয়েকটি বড় বড় অশ্বত্থ গাছ,—এই গাছের পার্শ্বে এক বৃহৎ পুষ্করিণী,—কোচম্যান এই গাছের ছায়ায় গাড়ী দাঁড় করাইল,—বলিল, "বাবু, এ রৌদ্রে ঘোড়া যাইতে পারিবে না,—আমি তো ঘোড়া মারিতে পারি না,—বেলা পড়ুক যাইব।"

এ কথার উপর কথা নাই,—কিন্তু রমেশবাবুর একটু সন্দেহ হইল। প্রায় আধক্রোশ আগে একটা চটি ছিল,—সেই খানেই সকল লোকজন ও গরুর গাড়ী বিশ্রাম করিতেছিল,—গাড়োয়ান সেখানে গাড়ী দাঁড় না করাইয়া এখানে, এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল কেন। তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে, এ একেবারে দমদমায় গিয়া জিরাইবে,—তাহতেই তখন কোন কথা বলেন নাই। এখন হঠাৎ এই নির্জ্জন পুষ্করিণী তীরে গাড়ী দাঁড় করানয় তাহার সন্দেহ হইল,—কারণ থাকুক আর নাই থাকুক—তাহার আজ প্রতি পদেই সন্দেহ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "চটিতে দাঁড় করাইলেই ভাল হইত,—চল দমদমায় গিয়া বিশ্রাম করিবে।"

গাড়োয়ান বলিল, "আমার ঘোড়া এই রোদে আর এক পাও যেতে পারিবে না,—আপনার জন্যে ঘোড়া মেরে ফেল্‌তে পারি না।"

এই বলিয়া সে ঘোড়াকে জল খাওয়াইবার জন্য বালতি লইয়া পুষ্করণীর দিকে চলিল।

কানাই রমেশবাবুর নিকট আসিয়া বলিল, "বাবু, গতিক ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

রমেশবাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কেন,—কি হইয়াছে ?"

"দেখিতেছেন না,—জনকত লোক পুকুরের ঐ দিকে লুকাইয়া আছে,—আরও গাড়ীর উপর থেকে আমি দেখিলাম, একখানা পাল্কিও লুকান রহিয়াছে। লাঠিখানা বাগিয়ে রাখুন।"

রমেশবাবু সত্বর লাঠি লইলেন,—গাড়ীর দরজার নিকটস্থ হইয়া দাড়াইলেন। বলিলেন, "কানাই, তুমি এখান থেকে এক পাও নড়িও না,—"

"প্রাণ থাকিতে নয়।"

"তুমি কি মনে কর ইহারা আমাদের উপর পড়িতে সাহস করিবে।"

"সেই জন্যই এসেছে ?

"কেন? এরা কি ডাকাত।"

"না—জমিদারের লোক।"

"জমিদারের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া কি?"

"কেন?" "আমার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া আছে।"—

"তা জানি না—বাবু হুঁসিয়ার।"

এই সময়ে আট দশ জন লোক বড় বড় লাঠি লইয়া সেই দিকে ছুটিয়া আসিল। কানাই গোয়ালা—শরীরে অসীম বল,—"আর শালারা," বলিয়া সে গিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে একলাই দুই চারিটাকে ধাই করিল,—গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইতে উদ্যত হইলে,—রমেশবাবু লঘুড়াঘাতে তাহাকে ভূমিসাত করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া নিমিষ মধ্যে কোন্ দিকে অন্তর্হিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আগমনী।

তখন কানাই বলিল, "বাবু,—এখানে আর এক মিনিটও নয়,—গাড়ীতে উঠুন আমি গাড়ী হাকাইতে জানি।"

বিনা বাক্যবয়ে রমেশবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কানাইয়ের নির্ম্মম কষাঘাতে গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। রমেশ দেখিলেন, মানময়ী বংশ পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে!

তিনি কোন কথা কহিলেন না,—গাড়ী দমদমা পার হইয়া কলিকাতায় প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে গাড়ী ভবানীপুরে তাহার বাড়ীর দরজায় লাগিল.—কানাই অশ্বের উপর বিন্দুমাত্র মায়া প্রকাশ করে নাই। কেবল লেজ্ঝ ঘোড়া বলিয়াই তাহারা এ যাত্রা মরিল না।—

স্ত্রীর নিকট মানময়ীকে রাখিয়া রমেশবাবু তখনই থানায় সম্বাদ দিলেন। তাহারা এ ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য তখনই বারাসতের পুলিসকে লিখিলেন। সুতরাং রমেশবাবু জানিলেন, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান হইবে,

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, কানাই ঘোড়াদের আহারাদি দিয়াছে। রমেশ-বাবু এই গাড়ীতেই কালই আবার অবিনাশের বাড়ী যাওয়া স্থির করিলেন। এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত না করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না।

তিনি রাত্রে আবার একবার মানময়ীকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে কোন কথাই বলিল না। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় সে বলিল, "আমি কিছু জানি না,—তাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

তিনি রাত্রে কানাইকেও এ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে সকল কথারই উত্তরে বলিল, "আমি গরিব মানুষ—আমি কি জানি।"

"তুমি বলিয়াছিলে তাহারা জমিদারের লোক—কিসে জানিলে? তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি?"

"কেমন করিয়া চিনিব, দেখিলেন না,—তাহাদের সকলের মুখেই কাপড় বাঁধা ছিল।"

"হাঁ—সে কথা ঠিক।—এই গাড়োয়ানটাকে ধরিতে পারিলেই আর সকলে ধরা পড়িবে,—তার এদের সঙ্গে যোগ ছিল, তাহাই গাড়ী চটিতে না দাড় করাইয়া সেই নির্জ্জন পুকুর ধারে আসিয়াছিল।"

"ইহাকে ধরা শক্ত হইবে।"

"কেন?—এ গাড়ী কাহার তাহা জানা শক্ত হইবে না।"

"এ গাড়ী কোথাকার তাহা জানি না,—আমাদের গাঁয়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, বলিয়াছিল বারাসতে শোয়ারি যাইয়া ফিরিয়া কলিকাতায় যাইতেছে—"

"তাহা হউক, এ গাড়ী কার শীঘ্রই জানা যায়।"

একথায় কানাই বোধ হয় মত দিল না। তবে সে কোন কথাও কহিল না।

রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে অবিনাশের জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া আছে—কিসে জানিলে?"

"শুনিয়াছিলাম।"

"কিসের জন্য ঝগড়া?"

"তা ঠিক—জানি না,—বোধ হয় জমি-জায়াত লইয়া।"

রমেশবাবু বুঝিলেন, সমস্তই তাহাকে স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে, ইহাদের কাহারও নিকট হইতে কিছুই জানিবার সম্ভবনা নাই।

তবে কানাইয়ের নিকট জমিদারের নাম শুনিয়া তাহার উপর সন্দেহ

হইল। পাড়াগাঁয়ের জমিদার প্রায়ই অত্যাচারী হয়,—যে কোন কারণে অবিনাশের উপর রাগত হইয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে যে চেষ্টা পাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

তিনি প্রথমে পলিশে গিয়া সকল কথা বলিয়া, একজন বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভের সাহায্য লইবেন ইহাই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক ভাবিয়া সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। এবং অনেক ভাবিয়াও ব্যাপারটা যে কি তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ]

বঙ্গে দুর্দ্দিন।

বঙ্গভূমিতে বিষম দুর্দ্দিন আসিয়াছে, কিন্তু এই দুর্দ্দিনের মধ্যে ভাবী সুখ-সমৃদ্ধি নিহিত রহিয়াছে। এই যে 'স্বদেশী' বিলাতী-বর্জ্জন বা 'বহিষ্কার' লইয়া দুই বাঙ্গলা যুড়িয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এতদিন আমরা নিশ্চেষ্ট ছিলাম এবং দাসাবৃত্তিই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে সে দিন গিয়াছে। দাস্যে লোকের আর তেমন স্পৃহা নাই, তাহা ব্যতীত দাস্যও মিলে না এবং মিলিলেও তাহাতে আর পেট ভরে না। এই জন্য মধ্যবিত্ত লোকের দারিদ্র ও অনাটন অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় লোকে যতই প্রচার করুন যে, ইংরাজের আমলে ভারতবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের ঘরের খবর জানেন না।

এই দুর্দ্দিনে আমাদিগের যুবক সম্প্রদায়ের আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত ও মনঃক্লিষ্ট হইতে হয়। কেবল 'বন্দেমাতরম্' করিয়া হৈ-চৈ করিলে দেশ উদ্ধার হয় না—কোন দেশে কোন কালে হয় নাই। দেশোদ্ধার মুখের কথা নহে। যাহার ঘর নাই, যাহার ঘরে ভাত নাই, তাহার কি স্বদেশ হিতৈষণা শোভা পায়? যে সকল প্রতিভাশালী—নেতৃবর্গ স্বদেশের মঙ্গলার্থে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, স্বদেশের কল্যানের জন্য আত্মবলিদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যে সহায়তা করা সাধারণ লোকের কার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য কি, এবং কি উপায়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারা যায়, ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দেশের পুনর

আনা তিন পাই লোক নিরক্ষর, দুঃখ-কষ্টে জর জর ;—তাহাদিগের নিকট রাজনীতীক আন্দোলনের কথা বলা কি লজ্জার কথা নহে। তাহাদিগকে "বন্দে মাতরম্" করিয়া তোলা কি বিড়ম্বনা নহে! বাস্তবিকই যদি দেশের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, সত্যই যদি দেশকে তুলিতে চাও, জগজ্জননীর নামে শপথ করিয়া দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ কর, আপনাকে ভুলিয়া যাও। দেশের মঙ্গল কামনা যদি বস্তুতঃই তোমার হৃদয়োদ্ভুত হয়, তাহা হইলে,—হে অবিবাহিত বঙ্গীয় যুবক! চির কৌমার ব্রত অবলম্বন কর, উপার্জ্জন ক্ষম হও এবং উপার্জ্জিত তাবৎ অর্থ দেশের হিতকার্য্যে অর্পণ কর। আর যিনি সংসারী, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য সংসারকে সচ্ছল করা, আত্মীয় পরিজনের ক্লেশ মোচন করা। সন্তান সন্ততি বা আত্মীয় পরিজনকে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশ হিতৈষণাকে ত্যাগ স্বীকার বলা যায় না, অপরন্তু তাহা অর্ব্বাচীনতা ভিন্ন কিছুই নহে।

কোমরে বল না থাকিলে মানুষ সরল ভাবে দাঁড়াইতে পারে না এ জন্য কোমরে বল থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোমরকে শক্তিশালী করিতে হইলে প্রথমতঃ নিজের অভাব মোচন করা চাই। অভিভাবকগণের তাঁহারা পিতামাতা হউন বা অপর আত্মীয় অন্নধ্বংস করিয়া স্বদেশ উদ্ধার হয় না। যে ব্যক্তি নিজে পরান্নজীবী, পরকৃপাভিখারী তাহার দ্বারা দেশের কি উপকার সম্ভবে? এই জন্য আমরা সকলকে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবার জন্য সাগ্রহে অনুরোধ করি। কেহ কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া হইয়া; সকলে নিজ নিজ পদোপরি ভর দিয়া দণ্ডায়মান হওয়াই স্বদেশের দুঃখ মোচনের প্রথম ও প্রধান সোপন। মুখে যেরূপ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতেছ, অস্থি-মজ্জায় তাহা হৃদয়ঙ্গম কর, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ কর। সাধারণের কার্য্য—কাজ করা; নেতৃগণের কার্য—সকলকে উদ্বোধিত করা,—পথ প্রদর্শিত করা। কেবল বাক্যব্যয় করিয়াইত আমরা উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিলাম, কিন্তু ভগবৎ কৃপায় যখন শেষ মুহূর্ত্তেও চৈতন্য লাভ করিয়াছি, তখন আর কালহরণ করিয়া বেড়াই কেন? এক্ষণে সকলের এক মন্ত্র হউক,—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" খাটিতে খাটিতে মরিয়া যাওয়া লক্ষগুণে স্পৃহনীয়; কিন্তু দেশের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করা অতি ঘৃণার বিষয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে; এফ্, আর্, এইচ্, এস্।

অন্তিমে।

ওগো! বেলাত পড়ে এল
সময় হয়ে এল
রেখোনা আর মোরে ধরিয়া,

ওগো! করোনা হাহাকার
ফেলোনা আঁখি ধার
নয়ন ফেল আজি মুছিয়া।

আজি সারাটী জীবনের
কাজের হিসাবের
অতীত কথাগুলি স্মরিয়া—

বড় কাঁদিছে প্রাণ মোর,
জীবন হ'ল ভোর
বৃথায় ধূলাখেলা লইয়া।

তুমি নীরবে কাছে বস,
বারেক মৃদু হাস
আজিত নহে দিন কাঁদিবার,

আজি পাপের সাজা পাব
মাথায় তুলে নিব
বিহিত হয় যাহা সে রাজার।

দেখ— নাচিছে প্রাণ মোর
তবুও আঁখি লোর
বহিছে কেন দুটী নয়নে!

ওগো! তোমারি মায়া ডোরে
বেঁধেছে আজি মোরে
বিদায়ে বাজে তাই পরাণে!

আমি—এসেছি কি কারণ
কি হেতু এ জীবন
ভাবিনি তার কিছু ভাবনা,

আমি—কি লয়ে যাব আজ
কেমন কিবা সাজ,
কাজের নাহি কিছু ঠিকানা॥

আমি—কি দিয়ে হ'ব পার
নাহিত কড়ি তার
বহিছে দু'নয়নে ঝরণা,

আজি—রেখোনা আর ধরে
দিওনা আর মোরে
বাঁধিয়া মায়া ডোরে যাতনা,

ওগো!—ওপারে কে আমায়
ডাকিছে—'আয়! আয়!'
আসিছে স্বর ভেসে পবনে,

ওগো! আরত নাহি দেরী
শ্রীমুখে 'হরি হরি'
শুনাও, দুটী মোর শ্রবণে।

তুমি— নীরবে কাছে বস
বারেক মৃদু হাস
মুছিয়া ফেল তব দু'নয়ন,

আজি—মুক্তি হ'ল মোর
বন্দী ছিনু ঘোর
ভাঙ্গিল আজি মোর কুস্বপন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সংন্যসেদ্বিধিনা ততঃ।
সন্ন্যাসাশ্রম সংযুক্তো নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যাবৎ ক্ষেত্রী ভবেত্তাবত্ত্যজেদাত্মানমাত্মনি।
ক্ষত্রিয়শ্চ চরেদেব মাসং ন্যাসাশ্রমাৎ সদা॥
বানপ্রস্থাশ্রমাদেবং চরেদ্বৈশ্যঃ সমাহিতঃ।
শূদ্রঃ শুশ্রূষয়া নিত্যং গৃহস্থাশ্রমমাচরেৎ॥
শূদ্রস্য ব্রহ্মচর্য্যোক্তং মুনিভিঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অনুলোম প্রসূতানাং ত্রয়াণামাশ্রমাস্ত্রয়ঃ॥
শূদ্রবচ্ছূদ্রজাতানামাচারঃ কীর্ত্তিতো বুধৈঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাস্থানামহন্যহনি নিত্যশঃ॥
বিধ্যুক্তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতম্।
তস্মাত্ত্বমপি যোগীন্দ্র স্বাশ্রমং ধর্ম্মমাচরন্॥
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ সম্যক্ জ্ঞানকর্ম্মসমাচর।
ইতি মে কর্ম্ম সর্ব্বস্বং যোগতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বতঃ।
উপদিশ্য ততো ব্রহ্মা যোগনির্চোঽভবৎ স্বয়ম্॥

অনন্তর শ্রৌতাদি অগ্নিকে দেহস্থ করিয়া, ভস্মপানাদি দ্বারা বিধি-বিহিত-বিধানে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে ;— কিন্তু সে সময়েও নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আত্মাকে পরমাত্মায় অর্পণ করিয়া অবস্থান করিবে। ক্ষত্রিয় গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের আচরণ করিবে। বৈশ্য বানপ্রস্থ ও গার্হস্থধর্ম্মের আচরণ করিবে। আর শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষা করতঃ কেবলমাত্র গার্হস্থ ধর্ম্মেরই আচরণ করিবে। কোন কোন মুনির মতে শূদ্রগণেরও ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার আছে। অনুলোমজাত দ্বিজাতি ত্রিবর্ণেরই ত্রিবিধ আশ্রমে অধিকার আছে। সুধিগণ ব[illegible]হেন, শূদ্রজাত ব্যক্তিগণের আচার শূদ্রের আচারের ন্যায়। এই আশ্রম চতুষ্টয়েই কামনাশূন্য ও সঙ্কল্পবিহীন হইয়া সর্ব্বদা বিধি-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। অতএব

হে যোগিবর ! তুমিও বিধি-নির্দ্দিষ্ট আশ্রমোক্ত ধর্ম্ম সকল শ্রদ্ধাসহকারে ও যথাবিধানে জ্ঞান-কর্ম্মের আচরণ কর। ব্রহ্মা আমাকে এইরূপে কর্ম্ম-সর্ব্বস্ব ও যোগতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করতঃ নিজে যোগানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। তদর্থে শ্রৌতাদি অগ্নিকে দেহস্থ করিতে হইবে। শ্রৌতি শব্দের অর্থ শ্রুতিবিহিত ধর্ম্ম,—অতএব শ্রুতি বা বেদবিহিত ধর্ম্ম সমুদয়কে দেহে সংন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া তাহাতে নিরস্ত হইবে, এবং ব্রহ্ম-চিন্তাপরায়ণ হইবে। আবার শ্রৌত শব্দের অর্থ—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি—এই ত্রিবিধ অগ্নি। এই ত্রিবিধ অগ্নি দেহে আরোপণ করা সহজ কথা নহে,—তবে সন্ন্যাসিগণ আত্মদেহ রক্ষার্থে সংস্কারবিশুদ্ধ অগ্নিত্রয়ের কুণ্ড করিয়া থাকেন, এবং তৎভস্ম পান করেন। কিন্তু অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—বেদবিহিত যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্ম সকল শরীরে লইয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহা ভস্ম করিবে, এবং তাহাই পান করিবে। তখন যে কর্ম্ম করিবে, তাহা ভস্ম,—অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ,—সে কর্ম্ম হইতে আর কর্ম্মের উৎপত্তি হয় না, তাহার বীজ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ। কিন্তু নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে না—তবে তাহা ফলদানে সক্ষম হইবে না,—সে ভাজা শস্যের মত নিবীর্য্য।

যত দিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আত্মাকে পরমাত্মায় অর্পণ করিয়া রাখিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে,—দেশ, কাল ও অন্যান্য দৃশ্য বস্তু যাঁহার পরিচ্ছেদ (ইয়ত্তা) করিতে পারে না, সেই পূর্ণ পরমাত্মা হইতে পূর্ণ (জীব) উৎপন্ন হইয়াছে। জনক পূর্ণ পরমাত্মা,—জন্য পূর্ণ আত্মা বা জীব। পূর্ণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বিজ্ঞগণ সেই উৎপন্ন পূর্ণকে (জীবকে) পূর্ণ-সংজ্ঞা প্রদান করেন। আবার এই উৎপন্ন পূর্ণ হইতে সেই পূর্ণ উদ্ধৃত হন, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মই স্বাবিদ্যা দ্বারা জীব হন, জীব আবার স্বাত্ম-বিদ্যার দ্বারা আপনার জীবত্ব পরিহার করিয়া পুনঃ পূর্ণ (ব্রহ্ম) হন। পূর্ণ পূর্ণে অবস্থিত হইলে মূলীভূত পূর্ণানন্দ অবশেষিত হয় ; অর্থাৎ অদ্বয় চিৎসদানন্দ ব্রহ্মাত্মভাব স্থিরীভূত হয়। পরমাত্মা হইতে প্রথমে আপের অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের, তৎপরে তাহা হইতে সলিলের অর্থাৎ স্থূলভূতের ও স্থূলদেহের সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর সেই স্থূলদেহের মধ্যে আকাশে দুই দেব (এক পরমাত্মা, অপর জীবাত্মা)

পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন,—এই দুই দেব দশ দিক আক্রম করতঃ পৃথিবী ও দিক্ ধারণ করিতেছেন। পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, অর্থাৎ কর্ম্মফলানুরূপ সুখ-দুঃখপ্রদ ভৌতিক দেহ বহন করিতেছেন। দিক্ ধারণ করিতেছেন, অর্থাৎ দ্যোতমান বা স্বপ্রকাশ আত্মস্বভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, তিনি জীব; যিনি দিক্ ধারণ করিতেছেন, তিনি পরম। বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্ব জীব ও বিশ্বভূত নিত্য চিৎ পরম। এতাবতা বুঝিতে পারা গেল, সংসারে পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত আছেন। হংস যেমন সলিলের ঊর্দ্ধে বিচরণ করে, পরমাত্মা তদ্রূপ সংসাররূপ সলিলের ঊর্দ্ধে বিচরণ করেন, কিন্তু তিনি সংসারমুক্ত থাকিলেও একটি পাদ (জীবনামক পাদ) উৎক্ষিপ্ত করেন না, অর্থাৎ তুলিয়া লয়েন না। সতত ঋত্বিক্ অর্থাৎ সর্ব্বদা কর্ম্মকারী জীবরূপ পাদটি যদি উৎক্ষিপ্ত করিতেন, তবে মৃত্যু ও অমরত্ব বলিয়া কিছু থাকিত না। অতএব পরমাত্মাই সংসারে জীবরূপে একপাদে ও সংসারের ঊর্দ্ধে চিৎসদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মরূপে ত্রিপাদে বিরাজিত। পরমাত্মা, লিঙ্গ শরীররূপ উপাধিতে জীব। সেই অদ্বিতীয় চিৎসদানন্দ পরমাত্মা সমুদায় ভূতের অন্তরাত্মরূপে বিরাজিত। তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ হইলেও লিঙ্গ সংযোগে (লিঙ্গ = অন্তঃ করণ) অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ। আত্মাকে পরমাত্মায় অর্পণ করিবার প্রণালী এইরূপ যে, বুদ্ধিতত্ত্বের সহযোগে চিন্তা করিবে যে, জীবাত্মা পরমাত্মায় সংযুক্ত হইয়া আছেন,—এইরূপ চিন্তা ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত তাঁহাতে লয় করিয়া রাখিবে। পরে বক্ষ্যমান প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি (বুদ্ধি পর্য্যন্তের বিলয়) সম্পাদন করিয়া স্বতঃসিদ্ধ চিৎসদানন্দ ব্রহ্মাত্মা হইয়া অবস্থিতির কথা বলা হইবে।

কোন কোন মুনির মতে শূদ্রাদির ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে, কতকগুলি মুনি এক বিষয়ে মত প্রদান করিলেন না, অপর কতকগুলি মুনি সেই বিষয়ে মত প্রদান করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, শূদ্রাদি তমো-মলিন,—যাহারা তমোমলিপ্ত, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণাদি সত্ত্বগুণের সাহায্যে উৎকর্ষত্ব প্রাপ্ত করিবে, আর যাহারা উন্নত গুণাশ্রিত, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম আচরণে নিযুক্ত হইবে। তাই এই সবিকল্প ব্যবস্থা। শূদ্রজাত ব্যক্তিগণ অর্থে অনুলোম ক্রমে শূদ্রা কন্যাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়োৎপন্ন জাতি সমুদায়।

শ্রুত্বৈতৎ যাজ্ঞবল্ক্যোক্তং বাক্যং গার্গী মুদান্বিতা।

পুনঃ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠমৃষিমধ্যে তপোধনা॥

যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত এই সকল বাক্য শ্রবণে আনন্দোৎফুল্লা গার্গী, ঋষিগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তপোধনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

গার্গ্যুবাচ।

জ্ঞানেন সহ যোগীন্দ্র বিধ্যুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।

ত্বয়োক্তং মুক্তিরস্তীতি তয়োর্জ্ঞানং বদপ্রভো॥

ভার্য্যয়া হ্যেবমুক্তস্তু যাজ্ঞবল্ক্যস্তপোনিধিঃ।

স তামালোক্য কৃপায় জ্ঞানরূপমভাষতঃ॥

হে প্রভো! আপনি কহিলেন, জ্ঞানের সহিত বিধি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, মুক্তিলাভ হয়,—কিন্তু জ্ঞান কি তাহা জানি না,—অতএব সেই জ্ঞানবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন।

যোগীশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ভার্য্যা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, তৎপ্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিয়া জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সংবাদ।

হাইকোর্টের জজ গীট সাহেব বিদায় ও পেন্সন লইয়া আগামী গ্রীষ্মকালে স্বদেশে গমন করিবেন।

অর্দ্ধোদয় যোগে এবার বঙ্গবাসী যে মহত্ত্ব—যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়,—আমরা বুঝি জাগিয়াছি। স্বদেশের সেবা—স্বদেশীয়ের পরিচর্য্যা কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা এবার আমাদের বালকেরা—আমাদের যষ্টিধরেরা সুন্দর ভাবেই দেখাইয়াছে। ইংলিসম্যান তথা কলিকাতার পুলিস কমিসনার সাহেবও দেশীয় ভলেন্টিয়ারদের প্রশংসা করিয়াছেন। এমনি করিয়াই ত দেশের কাজ করিতে হয়।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

এবার পাবনায় যে, কনফারেন্স বা প্রাদেশিক সমিতি বসিয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য বিষয়-নিষ্পত্তি ও মীমাংসিত হওনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নমঃশূদ্র জাতিকে উন্নত ক্ষমতা ও ধোবা নাপিত চল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দিয়াছেন, বিলাতফেরত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ব্রাহ্ম-কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম-গন্ধও সেখানে ছিল না;—রাজনীতির আবেদন লিখিতে লিখিতে কি হঠাৎ ইহাঁরা হিন্দু সমাজেরও চালক পালক হইয়া পড়িলেন? বেঙ্গলীর এই সুরেন্দ্রনাথইত ইংলিশম্যানের সুরে সুর মিলাইয়া বগল বাজাইয়া বলিয়াছেন—অৰ্দ্ধোদয় যোগে স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য দেখিয়া প্রীত হইলাম,—ইহাতে দেশের জাতিভেদ গিয়াছে বলিয়া আরও আনন্দিত হইলাম!

নমঃশূদ্রজাতি উন্নত হয়েন, আমাদের তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, বরং আনন্দই আছে। হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুধৰ্ম্মপরায়ণঃ"—হরিভক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্তি হইলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হয়। কিন্তু সুরেন্দ্র-রবীন্দ্র ব্যবস্থা দিতে পারেন, সমাজে চালাইতে পারেন না। তাঁহারা যতই ভাবুন—হিন্দুসমাজের অনেক দূরে তাঁহারা অবস্থিত।

বিলাতে এক আইন হইয়াছে,—তাহাতে ষোল বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকেরা তামাক থাইতে পাইবে না। খাইলে পুলিশে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া সংশোধনী কারাগৃহে প্রেরণ করিবে। আমাদের দেশে এ আইন হয় না? এ দশের অনেক ছেলে গর্ভবাসের পরেই সিগারেট ধরিতেছে!

অবসর পত্রের কার্য্যালয় হইতে "অনুশীলন" নামক যে সাপ্তাহিক পত্রের [প্র]কাশ হইতেছে, তাহার উপহার পুস্তকত্রয়ের রচনা, ছাপা, বাঁধা কার্য্য শনৈঃ শনৈঃ চলিতেছে। অবসর যেমন মূল্যে, উপহার এবং বিষয়ের গুরুত্বে সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল,—অনুশীলনেও তেমনি হইতেছে। অবসরের গ্রাহক মহোদয়গণ অনুশীলনের গ্রাহক হয়েন, ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

বিরহিনী রাধা।

কেন সখি তারি তরে,
দিবা নিশি আঁখি ঝরে,
হায় সখি! কেন তারে বাসি এত ভাল!
কি আছে সে রূপে তার,
কি মোহিনী সুধাধার,
কেন বা সে কালরূপে করে হৃদি আলো?
তমালের তলে বসি,
করেতে মোহন-বাঁশী,
বাজাত সে "রাধা" ব'লে, মরমে আমার।
সে সুধা মাখা'নো স্বর,
বাজিতেছে নিরন্তর,
হায় সখি! সে ত' মোরে ডাকিবেনা আর!
গিয়া যমুনার ধারে,
চাহি ফি'রে চারি ধারে,
আশা মনে, দেখা পাব সে কাল বরণ।
নিরাশ অধীর প্রাণে,
বসি হায়! সেই খানে,
হৃদয়েতে করি ধ্যান, মুদিয়া নয়ন।
একে একে গাভীগুলি,
গোঠে যবে যায় চলি,
পশ্চাতে চাহিয়া থাকি, সতৃষ্ণ-নয়ন।
ভাবি বুঝি—এইবার,
দেখা আমি পা'ব তার,
কিন্তু হায়! বৃথা আশা, সকলি স্বপন।
বুঝিয়াছি সুনিশ্চয়,
সে একা আমার নয়,

আমি কিন্তু সুধু তার,
আমার কি আছে আর ?
তথাপি এ পোড়া-মন বুঝাইতে নারি।
নয়ন মুদিত করি,
সেরূপ হৃদয়ে হেরি,
সখিরে! আকুল হই ধরিতে চরণ।
হাত বাড়াইয়া যাই,
ধরিতে নাহিক পাই,
পশে যেন কাণে ধীরে মধুর বচন,—
"তোমা ছাড়া নই আমি,
এক আত্মা তুমি আমি,
বিরহের পরপারে—অনন্ত মিলন।
কিছুদিন থা'ক ল'য়ে, এ ছায়া স্বপন!"

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

স্বদেশ-প্রেম

ও

কবিবর হেমচন্দ্র।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিবর হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অনেক টুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সুতরাং অনেকস্থলে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি পাশ্চাত্য জাতির বিশ্ববিস্ময়কারী উন্নতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য জাতির আচার ব্যবহারাদির প্রতিও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন! তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মত্ততায় একেবারে আত্মহারা হইয়া সমাজ ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই সত্য, সন্তরণানভিজ্ঞ বালকের ন্যায় উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শক্তি এবং সাধ্যের অতীত বা গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া নিমগ্ন হন নাই সত্য, তথাপি তিনি পাশ্চাত্য জাতির সামাজিক রীতি-চরিত্রের

অনেকাংশে পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান আর্য্য সমাজে স্ত্রীজাতির দুর্গতি দেখিয়া, অতীত যুগে স্ত্রীজাতির সমুন্নত অবস্থা ভাবিয়া এবং চক্ষের সম্মুখে ইউরোপীয় মহিলা-মণ্ডলীর স্বাধীন সতেজ ভাব দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাবে ভারতবাসীর অধঃপতন অনেক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে।

তিনি এই জন্য হিন্দুজাতিকে ধিক্কার দিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য মহিলাগণের আদর্শে আর্য্যরমণীগণকে অবাধ স্বাতন্ত্র দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় মহিলামণ্ডলীর দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিতেছেন ;—

দেখ চেয়ে হেথা একবার,
প্রফুল্ল কোমল কুসুম-আকার
যুনাণী মহিলা হয় পারাপার
অকুল জলধি অকুতোভয়ে।
ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিতচিতে
কানন-কন্দর উন্নত গিরিতে
অপ্‌সরা-আকৃতি পুরুষ-সেবিতা
সাহিত্য-বিজ্ঞান-সঙ্গীত-ভূষিতা
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে॥
আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবেরে অঙ্গনা-মহিমা-প্রচার ?
পেয়ে নিজ মান প'রে নিজ বেশ
জ্ঞান-দম্ভ-তেজে পুরে নিজ দেশ
বীরবংশাবলী-প্রসূতি হয়ে ?
এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ডমাঝে
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?

কবি বিশুদ্ধ স্বদেশহিতৈষণারই বশবর্ত্তী হইয়া এ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির উপর সমাজের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ; তাহার উপর পারিবারিক প্রভাবও অল্পকার্য্যকর হয় না। মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি রমণীগণের রমণীয় চরিত্রের প্রভাব শিশু-হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়—তাহা চির জীবনেও বিলুপ্ত হয় না। সুতরাং স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত, অজ্ঞ, ক্ষুদ্র হৃদয় হইলে—পুরুষ জাতির উন্নতির পথে অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু কবি যে আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিতেছেন, তাহা ভারতবাসীর অনুকরণ যোগ্য কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। অশ্বারোহণ-সুনিপুনা, সাহিত্য-বিজ্ঞান-সঙ্গীত-ভূষণা-স্বৈরবিহারিণী কুসুমকুমারী, যুনাণীললনা কবিকল্পনার সুন্দর আলেখ্যরূপে গৃহিত হইতে পারে, কিন্তু সমাজ সাধারণ

ভাবে এরূপ মহিলা দ্বারা কত দূর উপকৃত হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ছিল বটে, একদিন, যখন,—

এই আর্য্য-ভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে,
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া,
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া,
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হ'য়ে।
কোথা সে এখন অসি-ভল্লধারি
মহারাষ্ট্র বামা রাজবোরা নারী,
অরাতি-বিক্রমে পরাজিত হ'লে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে,
পতি-পিতা-সুত সংহতি লয়ে॥
বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা কিরণে জগত ভাতিল,
কোথা এবে তারা কোথা সে কিরণ,
আনন্দ কানন ছিল সে ভুবন,
নিবিড় অটবী হবেরে এবে।
আর কি বাজে বীণা সপ্ত সুরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা ভরা,
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা সাহস-বিভাস,
সে সব রমণী কোথারে এবে?

ভারতে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা কখনও থাকে নাই। তবে দেশের ভীষণ বিপদের কালে, মুর্ত্তিমতী শান্তিরূপিণী গৃহললনাগণও কখনও কখনও রণচণ্ডী বেশে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; দেশের জন্য, সময়ের প্রয়োজনে, তাঁহারা পুরুষ সুলভ পৌরষ-প্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত যেরূপ উজ্জ্বল, সেইরূপ বিরল। একটি কর্ম্মদেবী, একটি অহল্যাবাই, একটি পদ্মিনী স্ত্রী-চরিত্রের এক একটি বিরল আদর্শ। তাঁহারাও এই স্ত্রী-স্বাধীনতাহীন সমাজ হইতে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। আর্য্যসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই বা ছিল না, একথা বলা যায় না, তবে সে স্বাধীনতা একবারে অসংযত স্বাধীনতা নহে। আর্য্যসমাজে স্ত্রীজাতির সংযত, স্বাতন্ত্র, সুচিন্তিত, সুপরীক্ষিত, অভিজ্ঞতা-প্রসূত সুফল। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক কোমলতা প্রাকৃতিক দুর্ব্বলতা ও দৈহিক অপটুতা, তাহাদিগকে একপক্ষে যেরূপ পুরুষোচিত কঠোর পরিশ্রমের, অন্যপক্ষে সেই পুরুষ সুলভ স্বাধীনতার অযোগ্য করিয়াছে। যাহা হউক বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে আমরা কবির সহিত একমত হইতে পারি নাই এবং আমাদের মনে হয় পরিণত বয়সে কবিও স্বয়ং এইরূপ মতের উপাসক ছিলেন না। কিন্তু ইহাতেও কবির স্বদেশ-প্রীতিই প্রকটিত হইতেছে। তিনি কেবল পাশ্চাত্য

স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিয়াই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন নাই, তিনি আর্য্যজাতির গৌরবময় অতীতের ইতিহাসে সমরাশ্বসমারূঢ়া যোদ্ধৃবেশধারিণী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া রমণীগণের স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি পতিপদাঙ্কানুবর্ত্তিনী সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর কথা ভাবিয়া একান্ত সুদ্ধান্তঃপুরবাসের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন—তিনি বর্ত্তমান সমাজের কতকগুলি নিন্দনীয় দোষের উচ্ছেদ কামনায় "সমাজের করাল প্রচণ্ড জাল"কে ক্ষতবিক্ষত করিতে উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজিয়াছিলেন।

কেবল পাশ্চাত্য-জাতীর স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতিই যে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; তাহা নহে। পাশ্চাত্য-উন্নতীর মূল সূত্রও তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন, বিজ্ঞানসেবা হইতেই পাশ্চাত্য জাতির শক্তি,—যে শক্তির নিকট অপর সকল জাতিই মস্তক অবনত করিতেছে; বৈজ্ঞানিক অস্ত্র শস্ত্র বাহুবলকে অনায়াসে পরাস্ত করিতেছে—বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি অশেষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিদান হইয়াছে। রণক্ষেত্রে বিজ্ঞান, বানিজ্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞান—মানুষের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল প্রয়োজনে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান অনন্ত সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির প্রসূতি। বৈজ্ঞানিক উন্নতিই পার্থিব সম্পদ বা ঐশর্য্যের জনয়িত্রী, সেই জন্য কবি নিদ্রিত দেবমণ্ডলীর মাঝে "মানব কুমার"কে লইয়া গিয়া এক মহা সঙ্গীত শুনাইলেন—মানবকুমার শুনিলেন, "জ্যোতির্ম্ময়-আকৃতি প্রাণী কয়জন প্রফুল্ল নয়ন" গাহিতেছেন;—

ফিরাব বেগেতে পবনের গতি
তরল বায়ুতে শব্দ-শকতি
রাখিব স্থাপিয়া দেখিব খুলিয়া
রবির কিরণ গঠন-প্রথা।
আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে বাসশিবঙ্গিনী
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা।

বিজ্ঞান-সাধনার এইরূপ সঙ্কল্পবলে, বিজ্ঞান-চর্চ্চার অমৃতময় ফলে, পাশ্চাত্য জাতি এক্ষণে জগতের অগ্রণী হইয়াছে। ভারতবাসীও এই বিজ্ঞান-যুগে বিজ্ঞানসেবায় আত্মোৎসর্গ না করিলে কিছুতেই জয়ী হইবেনা, ইহাই কবির অভিপ্রায় বা উপদেশ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী।

মুকুর।

তখনও সুখময়ী উষার সুন্দর সীমন্তে বালার্কসিন্দুর ফোঁটা রঞ্জিত হয় নাই, তখনও বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র শেষ ক্ষীণ রশ্মি বিকীরণ করিতেছিল, তখনও কোকিলের কুহুস্বরে প্রণয়ীর গাঢ় আলিঙ্গন বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তখনও বিহঙ্গমের অস্পষ্ট ঝঙ্কার প্রকৃতির নীরব নীস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাই—দুই ভাই হাত ধরাধরি করিয়া পূণ্যতোয়া জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়াছিল। দুই ভাইয়ের মুখে স্নেহমাখান অনির্ব্বচনীয় ভাব ফুটীয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃ পূর্ব্বদিক লোহিত, পীত, হরিত, নবনব রাগে রঞ্জিত হইতে লাগিল—সে যেন প্রকৃতি-দেবীর সযত্ন অঙ্কিত চিত্র কৌশল! ক্রমে ভগবান কুমদিনী-নায়ক অস্ত-চূড়াবলম্বী হইলেন, কোকিলের ঝঙ্কার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, পাখীরা কুলায় ত্যাগ করিয়া খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইল। পৃথিবী-সজীবতা-পূর্ণ, আধ-উদিত সূর্য্যদেবের লোহিত রশ্মি জাহ্নবীবক্ষে প্রতিভাত,—যেমন নয়ন বিমোহন তেমনই প্রাণস্পর্শী!

দুই ভাই স্থির নিশ্চল নেত্রে প্রকৃতির সতত পরিবর্ত্তনশীল সজীবতার মাঝে যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। পরে ছোটটি বলিল 'দেখ দাদা এ দিকে সূর্য্য উঠ্‌ছে আর ওদিকে ধীরে ধীরে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে'। নগেন্দ্র কিছুক্ষণ পরে বলিল 'ভাই নরেন, পৃথিবীর সুখদুঃখ ঐরূপ পরিবর্ত্তনশীল, কেহই চিরস্থায়ী নয়। এই চন্দ্রসূর্য্যের যুগপৎ তিরোধান আবির্ভাবের ন্যায় কখনও বা দুঃখের তপ্তোশ্বাস, কখনও বা আনন্দের লহরী-লীলা এ সংসারে বিরল নয় বুঝিয়া দুঃখে মুহ্যমান বা সুখে আত্মহারা হইও না। আর এই শুভ-মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের প্রবেশ-দ্বারে শপথকর যেন উত্তপ্ত জীবনের প্রতিকুল বাসনার ঘাত-প্রতিঘাতে পবিত্র ভ্রাতৃস্নেহ-পাশ ছিন্ন না হয়, তুচ্ছ স্বার্থের কুটীল সংঘর্ষণে যেন ভ্রাতৃস্নেহের পরাজয় না হয়।'

নরেন শুধু বলিল "এর জন্য শপথ কেন দাদা, আমি তোমার যে ছোট ভাই সেই ছোট ভাই চিরদিন থাকিব, কালের প্রভাব কখনও ভ্রাতৃস্নেহকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, তারপর দুই ভাই হাতধরাধরি করিয়া গৃহাভি-মুখে চলিয়া গেল। ইহাঁরা নবাবগঞ্জের ৺আনন্দমোহন রায়ের পুত্র। প্রাতঃকালীন ভ্রমন করিতে আজ উভয় ভ্রাতা গঙ্গাতীরে আসিয়াছিল।

(২)

পাঁচটি পরমায়ুহীন বৎসর মানুষের সুখের দুঃখের কথা বহন করিয়া অবাধে অনন্তকালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সাধু চোর হইয়াছে, কোমল দেবহৃদয় পাষাণ স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে আর দুই বৎসর হইল তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে দুই ভাইয়ের অনেক পরীবর্ত্তন হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া, বিদ্যা অর্জ্জন হউক বা না হউক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রস্ত হইয়া স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৬০৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন। নরেন্দ্রনাথের সেরূপ বিদ্যালাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই সেজন্য তিনি আপাততঃ বাটী বসিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামের বৃদ্ধা প্রতিবাসীনীরা সকলে সমস্বরে বলিতেন 'আহা ছেলে ত নগেন্দ্রনাথ, রূপে গুণে সব সমান।"

নগেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ কনিষ্ঠের উপর ঈর্ষাপোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি উপার্জ্জন করিতেছেন, নরেন্দ্র বসিয়া খাইতেছে, ইহা তাঁহার চক্ষুশূল। স্ত্রী-সহধর্ম্মিনী, অতএব নগেন্দ্রনাথের পত্নী চারুশীলা সহধর্ম্মিনীর ধর্ম্ম পালন করিতে কদাপি ত্রুটি করিতেন না কারণ তিনি শিক্ষিতা সহধর্ম্মিনীর উচিত ধর্ম্ম যে স্বামীকে সহায়তা করা, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সেজন্য তিনি স্বামীর ঈর্ষাবহ্নিতে মাঝে মাঝে ফুৎকার দিয়া পাতিত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

কিন্তু দুই বৎসরের অবোধ শিশু নলিন্, সর্ব্বদা কাকার পিঠে ঘাড়ে ঝুলিত। যেখানে নরেন্দ্রনাথ সেখানে নলিন্। শৈশবের নিষ্পাপ হৃদয় এখনও স্বার্থের দাগে কলুষিত হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধুর ঈদৃশ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সরল হৃদয়ে সে চিন্তা অধিকক্ষণ স্থান পাইত না। ক্ষুদ্র শিশুর সুমধুর আধ হাস্যে আধ আদরে তাঁহার সে চিন্তা ডুবিয়া যাইত।

একদিন ছুটীতে নগেন্দ্রনাথ বাটীতে আছেন, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রে পীড়িত হইয়া একজন অতিথি দ্বারে আসিয়া কাতরস্বরে বলিল "বাবা আজ আমি দুদিন খাই নাই, আমাকে কিছু খেতে দাও বাবা। নরেন্দ্র দ্বারে বসিয়াছিলেন, বাটীর ভিতরে আসিয়া বলিলেন বৌ দিদি একজন অতিথি

এসেছে, সে দুদিন খায় নাই, তাকে চারটী ভাত দাও।” বৌদিদি ঘরে ছিলেন, অমনি ‘আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং।’ ঘোমটা টানিয়া নলিনকে উপলক্ষ করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, “আমরা ত আর অন্তর্যামিনী নই যে অতিথ আস্‌বে বলে ভাত রেঁধে রাখবো।” দেবরের সমক্ষে বোদিদির এইরূপ লজ্জা-শীলতা ব্যাপার চলিত।

বৌদিদির উত্তর শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, “আহা বেচারা বড় ক্ষুধায় কাতর হয়েছে এখন ত ওকে দাও. আমরা না হয় কম করে খাবো এখন।” এবার কিন্তু বৌদিদির উত্তর দিতে হইল না। দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত ধূমায়মান বহ্নি একটা প্রবল ফুৎকারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নগেন্দ্রনাথ ঘরে ছিলেন বলিলেন “দেখ নরেন্ অত যদি পরদুঃখে কাতর হইয়া থাক, পয়সা উপার্জ্জন করে অতিথিশালা খুলিতে হয়, আমি একা এতগুলি কুপোষ্য লইয়া কি করিয়া সংসার চালাই।”

নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে দারুণ ব্যাথা পাইলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। নিজের ভাতবাড়া হইয়াছিল থালা শুদ্ধ লইয়া অতিথির সম্মুখে ধরিলেন। সে দিন আর তাঁহার কিছু আহার হইল না। দারুন মনস্তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এতগুলি ‘কুপোষ্যের’ মধ্যে তিনিই যে একমাত্র লক্ষ্যস্থল তাহা বুঝিতে আর বাকি রহিল না। সেই পূর্ব্বের স্নেহময় ভ্রাতার ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

(৪)

আজ নলিনই কেবল নরেন্দ্রের অকূল দুঃখ সাগরের মঙ্গলকিরণবর্ষী একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্র! সন্ধ্যাকালে নরেন্দ্র বাটী যাইলে, নলিন বলিল “কাকা, আজ কি তোমার অসুক করেছে, তুমি অমন করে রয়েছ কেন কাকা!” নরেন্দ্রের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতেছিল সামলাইয়া বলিলেন ‘না বাবা আমার অসুখ করে নাই, এস তুমি আমার কোলে এস।’ অন্যদিন যে নলিন কাকাকে অজস্র প্রশ্নে বেদখল করিয়া তুলিত আজ সে চুপ করিয়া গিয়া কোলে বসিল। নগেন্দ্রনাথ সে দিন হইতে কনিষ্ঠের সহিত কথা বন্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু বাহিরে লোকের নিকট তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহের পসার ছিল বলিয়া আজও অনুগ্রহ করিয়া পৃথক্ করিয়া দেন নাই, ইহাতে শত্রুকেও

নরেন্দ্র এক একবার মনে করিতেন যে সংসারে তাঁহার কোন বন্ধন নাই, মা নাই, বাপ নাই, এতদিন শুধু স্নেহময় ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়াছিলেন, তিনিও কাল-মাহাত্ম্যে এখন বিরূপ, তবে আর একটা অসহ্য যন্ত্রনা বুকে লইয়া কার মুখ পানে চাহিয়া থাকিবেন। কিন্তু বন্ধুদের একান্ত অনুরোধ ও উপদেশ আর নলিনের ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্নেহমাখান কথা তাঁহার সকল যন্ত্রনা দূর করিয়া দিত। ক্ষুদ্র শিশু তাহার স্নেহবাহু-সঞ্চালনে নরেন্দ্রের উত্তপ্ত ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়া দিত, নরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র শিশুর সেই স্নেহটুকু পাথেয় করিয়া দুর্ব্বহ জীবন পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

দিন এইরূপ কাটিতেছিল। একদিন নরেন্দ্রনাথ বাটী আসিয়া দেখিলেন নলিনের ভয়ানক জ্বর। ডাক্তার ডাকা হইল, ডাক্তার আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু দুদিনেও জ্বর কমিল না। তিন দিনের দিন ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া বলিলেন রোগীর অবস্থা খারাপ, জ্বর মন্দভাব ধারণ করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ এ তিন দিন বাটীর বাহির হন নাই, নলিনের মাথার কাছে বসিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথও সে দিন স্কুলে যাইলেন না বাটীতেই রহিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তৃতীয় বয়স্কের নিষ্পাপ শিশু বাটীর সকলকে কাঁদাইয়া পাপপঙ্কিল জগতের পাপরাশি তাহার পবিত্র শৈশবকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে কোন্ অজানা পুণ্যময় দেশে চলিয়া গেল। পিতামাতার করুণ ক্রন্দন, নরেন্দ্রের সুদৃঢ় স্নেহ আবরণ নিয়তির কঠোর গতি রোধ করিতে পারিল না।

(৫)

সে দিন নরেন্দ্রের চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না। রাত্রিশেষে নরেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন। ভগবান আজ তাহার সংসারের শেষ অবলম্বনটুকু কাড়িয়া লইয়াছেন, হৃদয়ে একটা দুর্ব্বিসহ বেদনা লইয়া পথ বহিয়া চলিয়াছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে অদূরশ্রুত ঝিল্লির সুউচ্চ রব তাঁহার তান-লয়হীন ভগ্নহৃদয়ের সুপ্তবেদনা জাগাইয়া দিতেছে। সেই পথ কত যুগ-যুগান্তরের অতীত স্মৃতি বক্ষে লইয়া পড়িয়া আছে, গ্রাম্য চৈত্য-বৃক্ষ তেমনই মাথা তুলিয়া মূকভাবে অতীত জীবনের অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—সকলই তেমনই আছে, কেবল তাঁহার হৃদয়ে সে

ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে আসিয়া পড়িলেন। গঙ্গার পবিত্র শীতল জলকনাবাহী মৃদু পবন তাঁহার শ্রান্ত হৃদয়ে ঈষৎ শান্তির হিল্লোল বহন করিয়া আনিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ সেইখানে স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলেন তাঁহার জ্ঞান ছিল না, অদূরে একটি মনুষ্য মূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন উষার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে। চন্দ্রের রশ্মি মলিন হইয়া আসিয়াছে, নৈশ অন্ধকার উষার রক্তিম অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যালোক ভয়ে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে, আর উপরে সুনীলাকাশে প্রভাতের শুকতারা পৃথিবীর পানে ম্লান চক্ষে চাহিয়া আছে। ক্রমে নরেন্দ্রনাথ মনুষ্য-মূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন। আজ নগেন্দ্রনাথেরও হৃদয়ে শান্তি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনিও প্রত্যুষ্যে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছেন। অগ্রজকে দেখিয়া নরেন্দ্রের আজ সেই দিনের কথা মনে পড়িল। আজ সেই বাসন্তী পূর্ণিমার চন্দ্র ধীরে ধীরে পশ্চিম প্রান্তে ডুবিয়া যাইতেছে, অন্ধকার আলোকের এমনই এক শুভ সম্মিলন বাসরে এমনই একদিন পবিত্র জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রের আজ সেই শপথের কথা মনে পড়িল। আজ তাঁহার উচ্ছসিত হৃদয় কিছুতেই সংযত হইল না, ছুটীয়া দাদার পদদ্বয় জড়াইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন "দাদা, ছয় বৎসর পূর্ব্বে এমন সময়ে, এই নদীতটে দাঁড়াইয়া যে নীতি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কি বিস্মৃত হইলেন দাদা, এখন দেখিতেছি কালের প্রভাব অক্ষুন্ন, ভ্রাতৃ-স্নেহের সুদৃঢ় বন্ধন ইহার নিকট মস্তক অবনত করে, দাদা আজ তোমার সেই নরেনকে, মাতৃ পিতৃহীন হতভাগ্য নরনকে আজ অবোধ ভাই বলিয়া তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

নগেন্দ্রনাথ বাষ্পজড়িত গদগদকণ্ঠে নরেনের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন "নরেন, ভাই———"

লোক চক্ষুর অন্তরালে বিধাতার কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য লুকাইত থাকে। মনুষ্য-বুদ্ধি সে গুঢ় রহস্যের দুর্ভেদ্য যবনিকা উত্তোলন করিতে পারে না।

পুত্রশোক সন্তপ্ত নগেন্দ্রের পূর্ব্বের কঠিন হৃদয় অনুতাপ ও শোকের উষ্ণ অশ্রুতে গলিয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "ভাই নরেন, এতদিন কি একটা ভ্রান্ত মোহজালে আমার অন্ধনয়ন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমি জানিতাম না মানুষের দূর্ব্বল শক্তির পশ্চাতে কল্যাণময় বিধাতার সামান্যমাত্র অঙ্গুলীহেলনে প্রতিকূল স্বার্থের নিষ্পেষণ মানুষের

কুটবুদ্ধি কোথায় ভাসিয়া যায়। ভগবান আজ আমার প্রাণের ক্ষুদ্র নলিনকে কাড়িয়া লইয়া আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন, আমার পাপের যথেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আয় ভাই, ছয় বৎসর পরে আবার সেই সময়, সেই স্থানে, সেই নদীতটে দাঁড়াইয়া তোর অনুতপ্ত দাদার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

"অপরাধ, অপরাধ কি দাদা আমি তোমার ছোট—"নরেন্দ্র আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কম্পিত দেহখানি বেষ্ঠন করিয়া নগেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের শিরচুম্বন করিলেন।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, বিরাট, অনন্ত, সীমাহীন আকাশতলে সে দৃশ্য মধুর, সে দৃশ্য স্বর্গীয়, সে দৃশ্য পবিত্র প্রেমের অনন্ত ভাণ্ডার।

বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এ ভ্রাতৃ-বিচ্ছের চিত্র সদা পরিস্ফুট, অনেকেই এই অসচ্ছ অপদার্থ 'মুকুরে' তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবেন।

শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়।

চিত্রে অপ্রতিমভাব।

সেই পরম-পুরুষ আদিকারণ স্বইচ্ছায় এই বিশ্বপ্রকৃতি সৃজন করিয়াছেন। তাঁহারই বিচিত্র ভাবে বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া এই প্রকৃতি শোভমানা হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই বিচিত্র প্রকৃতির যথাসাধ্য প্রতিকৃতি অনুকৃতিতে কৃতিত্বলাভ করিয়া আমরা সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

প্রকৃতির মধ্যে অনুপম বৈচিত্র না থাকিলে কাহারও তাহা অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হইত না। স্বভাবে কেমনি বিচিত্রতা! এই দেখ এখানে পাদপরাজী কুসুম ভূষণে ভূষিত ; হোথায় কুসুম মণ্ডিত লতামণ্ডপ ; উপবন, রমনীয় সরোবর কি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে! দূরে আকাশে পর্ব্বতে কনক কিরণাঞ্জিত নীরদমালা, তরুন তপনে সৌম্য স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে, আলোকে ছায়ায়, প্রকৃতির মাঝে কি অনুপম চিত্রসকল অনুক্ষণ

চিত্রিত হইতেছে! সকলি দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, আনন্দপূর্ব্বক দেখিতেছি। দেখিয়াই কি জানি কেন, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করে; তাহার অর্থ, বহির্দৃশ্য দেখিয়াই কি জানি কেন, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করে। এই ভিতরের দেখাই আসৎ—প্রকৃত জিনিষ। প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সে দেখিলেই দেখাই প্রকৃত দেখা। বহিঃস্বভাবকে বাহিরে দেখিয়াই অন্তরের স্বভাবের কাছে আনিয়া যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে, সেই দেখে, সেই প্রকৃত দেখে। প্রকৃতিকে এইরূপে প্রকৃত দেখা শুধু বাহ্য চক্ষু থাকিলেই সম্ভবেনা। বহিদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি এই উভয় প্রকার দৃষ্টির সহায়তায় প্রকৃত দেখাযায়; তাহা যদি না হইত তাহা হইলে সকলেই দেহীমাত্রেই যাহার বাহিরের দুটো চক্ষু আছে, দেখিতে পাইত। প্রকৃতিকে প্রকৃতরূপে দেখিতে চিত্র কবিরাই সক্ষম। তাঁহারা তাঁহাদের দর্শন বিদ্যারূপী গুণময়ী মায়ার দ্বারাই যেন প্রকৃতিকে দেখেন ও তাহার অনুকরণ করেন। চিত্র কবিদিগের গুণময়ী মায়া পবিত্র ও গোপমায়া, তাহারই বলে তাঁহারা যখন যেখানে প্রকৃতির ছবি প্রকৃত দেখিতে পান, সেখানে অপরেরা সেরূপ পায় না। তাঁহারা যে ছবি রচনা করেন তাহা অপরে পারে না।

যে সকল চিত্রকবিদের গুণময়ী মায়া যত অধিক ততই তাহাদিগকে বাহিরে দেখিতে গুণহীন—যেন নিগুর্ণ। এই গুণময়ী মায়াই জ্ঞান দৃষ্টি ছাড়া আর কি হইতে পারে? ইহাই জ্ঞানরশ্মি। এই জ্ঞানরশ্মির ন্যায় সূক্ষ্মরশ্মি আর নাই!—আজকাল বিজ্ঞান জগতে 'এক্সরেস্' 'এন্‌রেস' প্রভৃতি কত সূক্ষ্মরশ্মি সমূহ বাহির হইতেছে, তাহারা চক্ষুর দৃষ্টির বহির্ভূত পদার্থ সমূহকে তাহাদের আবরণ ভেদ করিয়া দৃষ্টি পথে আনিত করিতেছে, তখন সুসূক্ষ্ম জ্ঞান-রশ্মির তো কথাই নাই। চিত্রকবিদের মধ্যে এই সুসূক্ষ্ম জ্ঞান-রশ্মিকে যিনি যতটা আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি ততটা প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিকে দেখিতে সমর্থ হয় না। চিত্রকবিরা যখন প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাদিগের জ্ঞান-রশ্মি সাহায্যে গুণময়ী মায়া বিস্তার করিয়া প্রকৃতির ছবি সকল অনুকরণ করিতে থাকেন, তখন সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে যেন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন মায়াবী রূপে আশ্চর্য্য ভাবে দেখে!

এই যে গুণময়ী মায়ার ভাব ইহা ভগবানেরই মায়ার ছায়া। প্রকৃতি দেখিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখিলেই

কি মনে হয় কে যেন মহান গুণী তাঁহার গুণময়ী মায়ার প্রভাবে এই সকল রচনা করিয়াছেন! কিন্তু এতবড় গুণী হইয়াও তিনি যেন নিগুর্ণ রূপে জগতে প্রতিভাত হয়েন।

ভগবান স্বয়ং নিগুর্ণ হইয়াও কার্য্যকারনাত্মিকা নিজগুণময়ী মায়ায় প্রথমতঃ এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। পশ্চাৎ সেই সমস্ত গুণ,—যখন, আকাশাদিরূপে প্রকাশিত হইল,—তখন সমুদায়কে যেন আপনার গুণ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া সকলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার অভিমান নাই। কারণ, তিনি বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। * প্রকৃত চিত্রকবি হইলে এই জগতের বিচিত্র ছবি বুঝিতে পারেন, নিগুর্ণ ও ভগবানের গুণময়ী মায়াও উপলব্ধি করিতে পারেন, বুঝিতে পারেন যে ভগবানের অসংখ্য রূপ কার্য্য চলিতেছে তাঁহার শোভার সীমা নাই। তাঁহার অসংখ্য হস্ত, পদ মস্তক, অনন্ত কর্ণ, অনন্ত নাসিকা। প্রকৃত চিত্র কবিরা একরূপ যোগীদের মত। যোগীদের ন্যায় তাঁহারা জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দেখেন।—"যোগীগণ প্রভৃত জ্ঞান চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন;—পুরুষরূপ ভগবানের অসখ্য অদ্ভুত হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ ও নাসিকা। †

এই অপ্রতিম ভগবানের চিত্রকবি যোগীগণ একটা আশ্চর্য্য সুন্দর আদর্শ প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া সাধারণ জনগণের ভক্তিপ্রেম আকর্ষণ করিতে সকল দেশেই চেষ্টা করিয়াছেন। আজ কালকার অনেক ইউরূপীয় পণ্ডিতের মত যে যীশুখ্রীষ্টের ছবি চিত্রকবি কল্পিত। চিত্রকবি খ্রীষ্টের যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহা এখনো জগতে আদর্শরূপে খৃষ্টের জীবন্ত মূর্ত্তি রূপে বিরাজ করিতেছে, প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও ঐরূপ চেষ্টা হইয়া গিয়াছে,—অমূর্ত্ত ঈশ্বরেকে বোধগম্য করাইবার জন্য অনেক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া গিয়াছে।

বৈদিক ঋষিরা বলেন, "নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ। তিনি যে এই বিশ্বছবি করিয়াছেন, এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মহৎ যশ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। তাঁহার মহৎ যশেই তাঁহার মহিমাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদে আছে,—

---

* শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ—২য় অধ্যায়।

† শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ—৩য় অধ্যায়।

"সভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি"। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন "সেই ভগবান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ?" আচার্য্য উত্তর করিলেন— "স্বীয় মহিমাতেই তিনি প্রতিষ্ঠিত।"

পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই তাঁহার মহিমাতেই তাঁহাকে জানা যায়। শুধু প্রতিমাতে কতদূর বুঝিতে পারি ? সকল আত্মাই আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কারণ আত্মা সে পরমাত্মারই ছায়া। প্রতিমা কতদিন থাকে, মহিমাই আসনে থাকে।

যে চিত্রকবি চিত্র-প্রতিমার মধ্যে আত্মার অন্তরের মহিমাটুকু ফুটাইতে সমর্থ; বুঝিতে হইবে তিনি ততটা উন্নত ও মহান্। যিশুখ্রীষ্টের ছবিতে সাধারণ মনুষ্যের ছবিতে পার্থক্য তো কিছু নাই। তাঁহার যেমন নাক চোক আছে, অন্য মানুষেরও সেইরূপ নাক চোক আছে। তবে তফাৎ কোথায় ? শুধু মহিমায়। খৃষ্টের চিত্রে চিত্রকবি যে মহিমাটুকু জাগাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেই খৃষ্টের মূর্ত্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টমূর্ত্তি প্রতিমার অন্তরস্থ মহিমার দ্বারাই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। বিশ্বে যত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সকলি নিজ নিজ মহিমা দ্বারা। জীবাত্মা যে প্রতিষ্ঠিত সেও নিজ মহিমাকে অবলম্বন করিয়া। কোন প্রতিমা যখন সমাদৃত হয় তাহারও কারণ প্রতিমার অন্তরস্থ মহিমাটুকু। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর প্রতিমার কি সাধ্য অন্তরের অপ্রতিমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে ?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, এম-এ, বি-এল।

মানময়ী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

পরদিবস তিনি সেই গাড়োয়ান বিহীন গাড়ীতে আবার অবিনাশ দিগের গ্রামের দিকে চলিলেন। কানাই গাড়ী হাকাইয়া চলিল, কিন্তু তাহার বৃহৎ

রমেশবাবুও এবার প্রস্তুত হইয়া চলিলেন। তাহার সাতনলা পিস্তলটা পকেটে লইলেন। তিনি এটা বুঝিয়াছিলেন যে যেই কেন অবিনাশের শত্রুতা করিতেছে,—তাহাকে কেবল সাপায় নাই,—আক্রমণ করিতেও ক্রুটী করে নাই,—তাহারা সহজ লোক নহে। তাহাকে হত্যা করিয়া অনায়াসে এই জলার জলে ডুবাইয়া দিতে পারে,—সুতরাং সর্ব্বদা সাবধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

তিনি গ্রামে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন,—কিন্তু কেহই কিছু তাহাকে বলিতে পারিল না। জমিদারের সহিত অবিনাশের ঝগড়া ও শত্রুতা ছিল তাহাও কেহ জানে না,—সকলেই বলিল, "আমাদের জমিদার বড় মহাত্মা লোক,—তিনি প্রজার মা বাপ,—তাহার সঙ্গে কাহারও ঝগড়া হইবার সম্ভবনা নাই।

অনুসন্ধানে রমেশবাবু জানিলেন যে যথার্থই জমিদার দান ধ্যান প্রজা-বাৎসল্যের জন্য বিখ্যাত,—সকলেই তাহকে ধন্য ধন্য করিত,—তিনি বিচক্ষণ,—বয়স্ক,—তায় সাট বৎসর বয়স পুর্ণ হইয়াছে,—এ পর্য্যন্ত তাহার নামে কেহ কখনও নিন্দা শুনে নাই।

এই সকল শুনিয়া রমেশ কানাইকে আবার পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কানাই বলিল, "আমি বাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম,—আর কিছু জানিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমেশবাবু গোপালার মার সঙ্গেও দেখা করিলেন,—কিন্তু তাহার কাছে কি শুনিবেন,—সে মানময়ীর জন্য কাঁদিয়াই আকুল! তাহার ভাব দেখিয়া রমেশবাবু বুঝিলেন যে, সে যথার্থই তাহার ভগিনীকে বড় ভাল বাসে।

তিনি পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলেন, এখনও তাহাই শুনিলেন, সকলেরই বিশ্বাস,—অবিনাশ স্ত্রীর পীড়ায় পাগলের মত হইয়াছি, স্ত্রীর চিকিৎসায় যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছি, তাহার পর গ্রামের অনেকের নিকট টাকা ধার করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। তখন নিরুপায় হইয়া মেহের-জান্‌কে ভুলাইয়া জলায় লইয়া গিয়া খুন করিয়া তাহার গহনা লইয়া তাহার দেহ জলায় ফেলিয়া দিয়াছিল। মেহেরজান্‌কে খুন করিয়াছে বা করিতে পারে, এমন সন্দেহ আর কাহার উপরই পতিত হয় না। রমেশ বাবুও অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, আর কাহারও উপর সন্দেহ হয় না।

তিনি পূর্ব্বে জমিদারের উপর যেটুকু সন্দেহ করিয়া ছিলেন। এখানে আসিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল শুনিয়া তাহার সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন,—এ রহস্য ভেদ করা দুরূহ।—অবিনাশকে রক্ষা করাও অসম্ভব!

এক মাত্র ভরসা অবিনাশ, সে এখনও সকল কথা খুলিয়া বলিলে রক্ষা পাইতে পারে। তিনি তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য আবার বারাসত চলিলেন। কিন্তু তথায় গিয়া শুনিলেন, সে আলিপুরের জেলে গিয়াছে,—বারাসতে নাই। তখন হতাশচিত্তে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। এ রহস্য ভেদের আর উপায় নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

আলিপুরের দায়রায় অবিনাশের বিচার আরম্ভ হইল। রমেশবাবু প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভাল কৌঁসিল দিলেন। মানময়ীর যে দুই এক খানি গহনা ছিল, তাহাও সব আনিয়া দাদার হস্তে দিল, রমেশ অনেক নিষেধ করিলেন। কিন্তু মানময়ী তাহার কোন কথা শুনিল না।

কিন্তু সকলেই বুঝিল যে, অবিনাশের বিরুদ্ধে পুলিশ যেরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে তাহার রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রথম সাক্ষী দারোগা বাবু। তিনি আনন্দপুরের মাঠে পড়ো বাড়ীতে যাহা যাহা দেখিয়া ছিলেন, তাহা সমস্তই বলিলেন। তাহার কাপড়ে মেহেরজানের চুড়ী বাঁধা ছিল। ঘর রক্তে রক্তময়, সেই ঘরে তিনি মেহেরজানের কাপড় পাইয়া ছিলেন। দরজার নিকট ছোরা পান,—ছোরায় অবিনাশের নাম অঙ্কিত আছে। তিনি অন্য কোন লোককে সেখানে সে সময়ে দেখিতে পান নাই, অবিনাশের হাতেও কোন ঔষধের শিশি ছিল না।

কনেষ্টবল দুই জন দারোগা বাবুর কথার সমর্থন করিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন, যে সে রাত্রে অবিনাশ ঔষধের জন্য আদৌ তাহার নিকট

এই ঘোরতর মিথ্যা কথায় অবিনাশ আত্মসংযম করিতে পারিলেন না বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা!" তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার কৌঁসিলি রোষকষাইত লোচনে তাহার দিকে চাওয়ায় তিনি নীরব হইলেন।

তাহার পর পিসিমা—পুলিশ তাঁহাকেও ছাড়ে নাই। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হাঁ—বাছার বড় ব্যারাম হয়েছিল, আমার অবিনাশ তার যা কিছু ছিল সব খরচ করে তার চিকিৎসা করেছিল, ঘরে আর এক পয়সাও ছিল না। সে বৌমাকে বড় ভাল বাস্‌তো।"

মেহেরজানের পিতা আসগার সর্দ্দার তাহার কন্যার কাপড় ও চুড়ি সোনাক্ত করিল। অবিনাশ যে তাহার নিকট টাকা ধারের জন্য আসিয়াছিল, তাহাও বলিল। গ্রামের আরও দুই জন মাতব্বর এই টাকাধার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল।

গোপ্‌লার মা বলিল, "অবিনাশবাবু মেহেরজানকে সে দিন সন্ধ্যার সময় ডাকিয়া দিতে বলেন। মানময়ীর কাছে একটু বসিবে ইহাই মনে করিয়া সে তাহাকে ডাকিয়া দিয়াছিল। তাহার পর তাহাদের দুই জনকে আমিরপুরের মাঠের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল।

এক জন গ্রামবাসী বলিল, "সে সেই রাত্রে বারাসত হইতে গ্রামে ফিরিতেছিল। পথে পড়োঘরের নিকট একটী পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিল।

অবিনাশের কৌঁশিলি জেরা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পাইলেন যে এ সমস্তই ষড়যন্ত্রের ফল। পশ্চাতে কেহ থাকিয়া পয়সা দিয়া এই সকল সাক্ষী দিগকে হাত করিয়া ইহাদের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কিন্তু কে সে তাহা না বলিতে পারায় ও তাহা প্রমাণ করিতে না পারায়, তাহার কথা উড়িয়া গেল; কোন ফল হইল না। লাস পাওয়া সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু জজ বলিলেন "লাস পাওয়া যায় নাই। অথচ খুন হইয়াছে, এমন অনেক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জুরিগণ অবিনাশকে দোষী বলিলেন। জজ তাহার ফাঁশির হুকুম দিলেন। সকল আশা ফুরাইয়া গেল। অবিনাশ অবিচলিত ভাবে কাটগড়া হইতে জেলে প্রস্থান করিলেন। ক্রমশঃ।

বৈদিক ভারত।

ভারত আর্য্য-পদরেণু বক্ষে ধরিয়া ধন্য ও পবিত্রিত। অতীতের কোন্ অব্যক্ত দিবসে আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে তাহাদের বাসভবন প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। যে অপৌরিষেয় বেদ আর্য্য জাতির আদি-ধর্ম্ম গ্রন্থ; তদুল্লিখিত ক্রিয়াকাণ্ডাদি পাঠে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, বেদোৎপত্তির পূর্ব্বেও আর্য্যজাতি অবশ্য সভ্যতা লাভ করিয়া থাকিবেন। নতুবা বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে তাহাদের কুশল হওয়া অসম্ভব হইত।

"যাবন্মেরু-স্থিতাঃ দেবাঃ
যাবদ্গঙ্গা মহীতলে
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ
তাবৎ বিপ্রকুলেবয়ং।"

এই সদা প্রচলিত বাক্য ও আর্য্যজাতির প্রাচীনত্বের বিষয়ে উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতিই ভারতবর্ষে হিন্দুনামে অভিহিত। আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে হিমময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহারা উজ্জ্বলবর্ণ বিশিষ্ট এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ক্রমে বংশপরম্পরায় তাঁহারা যতই বহুপরিবার বিশিষ্ট হইতে লাগিলেন, ততই বসতি বিস্তারের চেষ্টায় পার্ব্বত্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া ধন-ধান্য-শস্য-শ্যামলা-সমতল-ভূমি-ভাগে স্বীয় স্বীয় বাসভবন প্রণয়ন করিতে প্রয়াসী হন। এই রূপে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চনদের সলিল-সিক্ত উর্ব্বর ভূমি খণ্ডে স্বকীয় বসতি সংস্থাপিত করেন। সিন্ধুনদের তীরবাসী বলিয়াই বোধ হয় আর্য্যগণ হিন্দুনামে অভিহিত। হিন্দুশব্দে সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। যে জ্ঞান মন্দ বিচার ক্ষম, অর্থাৎ যে হীনকে দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহারও হিন্দু নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আমাদের মন্ত্রময় ঋগ্বেদে তাৎকালিক আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ডের সম্যক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎপাঠে জানা যায় যে, বৈদিক আর্য্যগণ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবং

তাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, কার্য্যকুশল এবং সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

বৈদিক যুগে আর্য্যসমাজে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। এবং তাঁহারা প্রত্যক্ষাতিরিক্তা দেব দেবীর উপাসনাও করিতেন না।

বায়ু প্রভাবে মানবজাতি জীবন ধারণ করে বলিয়া, বায়ু তাঁহাদের উপাস্য। ঊনপঞ্চাশৎ-পবন-তেজ-গর্ভ প্রভঞ্জনের বিশাল-বিক্রমে বৃক্ষরাজি উৎপাটিত, গৃহসমূহ বিধ্বস্ত এবং তটিনীকুলের ফেনায়মান লহরীমালা-তেজে তটভূমি ও মানবীয় বাসগৃহসমূহ সলিলশায়ী হইতেছে বলিয়া বায়ুদেব আর্য্য-পূজিত হইয়া দেবতাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আর্য্য-গ্রন্থের অনেক স্থলে পবন-স্তোত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মানবীয় জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন অগ্নি। ভয়-ভীতি-সঙ্কুলিত-করাল-তমিস্রা-রজনীর তমঃ রাশিকে দূরীভূত করিতে, গভীর অন্ধকারে আলোকের মৃদুলচ্ছটা দান করিতে, অগ্নি আমাদের এক মাত্র সহায়। মানবীয় জীবনধারণের অবলম্বন স্বরূপ অন্নাদি আহার্য্য-সামগ্রী তাহার তেজে আহারোপযোগী হয়। অনলের লক্ লক্ শত জিহ্বার লোল আস্বাদনে শত শত গৃহ ভস্মীভূত হয়। হুতাশনের হুহু-ভীষণ প্রতাপে মানবদেহ ভস্মীভূত ও জর্জ্জরিত করে বলিয়া লোক-জীবনস্বরূপ অগ্নিকে প্রাচ্য-আর্য্যগণ দেবতা জ্ঞানে স্তব করিতেন। এবং তাহার সন্তোষ বিধা-নার্থ পবিত্র হবি-সমিধ-চন্দনাদি বিবিধোপকরণে মন্ত্র-পূত যজ্ঞাদির অনু-ষ্ঠান করিতেন। বেদের স্থল বিশেষে "অগ্নি আমাদিগকে দিন দিন বর্দ্ধ-মান ধন দান করুন" এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রারম্ভেই অগ্নির নামোল্লেখ আছে—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং (১) যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
হোতারং রত্ন ধাতমম্।" ঋগ্বেদ ১।১।১।

অর্থাৎ যজ্ঞের পুরোহিত অগ্নিদেবতা, ঋত্বিক্, হোতা এবং রত্ন প্রদাতাকে আমরা ধ্যান করি। অগ্নি কখনও সৌম্য মূর্ত্তি; কখনও যজ্ঞভূক্ দেবতা; আবার কখনও প্রলয়কারী পৃথ্বীগ্রাসী, ভীমরূপ করাল কাল। তাই বৈদিক দেবতাসমাজে সূর্য্যের পরই অগ্নির স্বর্ণাসন। আবার কখনও অগ্নির সাধারণ ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

---

(১) অগ্নিকর্ত্তৃক যজ্ঞ সম্পাদিত হইত বলিয়া অগ্নিই পুরোহিত নামে আখ্যাত হইতেন।

"যে যজ্ঞের চারিদিকে অগ্নে! তববাস;
সে যজ্ঞ নিশ্চয় হউক দেবতা-সকাশ।"
বেদ-সংহিতা।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ "পিতৃ-পিণ্ড-যজ্ঞ" খণ্ডেও অগ্নির নাম পাওয়া যায়—

"উর্জ্জং বহন্তিরমৃতং ঘৃতঃ পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং
স্বধাস্থ তর্পয়তঃ মে পিতৃন্। শুক্ল যজুর্ব্বেদ।

অর্থাৎ হে অগ্নে! মমদত্ত এই ঘৃত, জল এবং অন্নাদি বহন করিয়া পিতৃলোকে লইয়া যাও—এতদ্দ্বারা যেন আমার পিতৃলোক সন্তুষ্ট হন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, আর্য্যগণ অগ্নিকেও দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাসবিহারী রায়।

দোল পূর্ণিমা। *

চাঁদিমা-চুম্বিত, কুঞ্জ-কুটীরে
মিলিল ব্রজবালা ধীরে ধীরে।
করম ভরম, ভুলি সকলে
দলে দলে, জ্যোৎস্না মাখিয়া চলে।
কুঙ্কুম-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ
বনমালা-ভূষিত দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ।
মিলিল সকলে মাধব-সঙ্গ
উছলি উঠিল, প্রেম-তরঙ্গ!
বাঁশরি বাজিল, "রাধা রাধা বলি"
সখীগণ সঘনে, দিল করতালি।
যমুনা প্রেমভরে, উঠিল উথলি,
তরঙ্গ নাচিল, "রাধাশ্যাম" বলি।
ডাকিল কোকিল, তমাল-ডালে
কেকারবে ময়ূরী, নাচিল তালে।
সখীগণ হাসিমুখে, পিচকারি লয়ে
শ্যাম-অঙ্গ দিল, লাল করিয়ে!
কিশোরীর নীলবাস, লাল আবিরে
শিখিচূড়া পীতবাস, রঞ্জিল ধীরে!
লাল তমাল-তল, কুঞ্জ-কুটীর
লাল মালতী মালা, যমুনারি তীর।
আকাশে হাসি শশী, পড়িল ঢলিয়া
সখীগণ কুঙ্কুম্ মারিল ছুড়িয়া।
বহিল মলয়া, লয়ে সুবাস,
উঠিল বাড়িয়া, প্রেম পিয়াস।
বাঁশরী আকুল, তান-তরঙ্গ
উঠিল "রাধা" বলি, দোল-লীলা-রঙ্গ॥

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

* এই কবিতাটীর প্রত্যেক শব্দ দীর্ঘস্বরান্ত করিয়া পড়িতে হইবে।

ধ্রুবতারা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মনুষ্যোচিত সমস্ত গুণই উপেন্দ্রনাথে ছিল। উপেন্দ্রনাথ হিন্দুসন্তান;—হিন্দুর দার্ঢ্য, হিন্দুর পিতৃ-মাতৃভক্তি, হিন্দুরপরোপকার বৃত্তি, হিন্দুর গুণগ্রাহিতা, হিন্দুর রমণীরক্ষা—উপেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে, আত্মকর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে—আত্মবিপদ জানিয়াও সে সকলের পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

যখন উপেন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথকে আপনার প্রাপ্ত বৃত্তির টাকা দিয়া মেসে রাখিয়া আপনি গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া অন্য-গৃহে পালিত হইতে-ছিলেন, তখনও তাঁহার কর্ত্তব্যতা যায় নাই—আপনার দশা কি হইবে না ভাবিয়া, তিনি তাঁহার প্রভুকে তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই। এবং সেই অপরাধে উপেন্দ্রনাথ আশ্রয়চ্যুত হয়েন। কিন্তু উপেন্দ্র-নাথ তাহাতে মুহূর্ত্তও বিচলিত বা চিন্তিত নহেন। স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াই সন্তুষ্ট,—তিনি সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নের জন্য অন্য প্রকার অনুসন্ধান করিলেন।

এবার এক ব্রাহ্ম পরিবারে তাঁহার কাজ যুটিল। হিন্দু উপেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম মনিবের অন্ন ভোজন করিলেন না,—মাসিক বেতন লইয়া আবার "বাঙ্গাল মেসে" আহারাদি করিতে লাগিলেন,—কেবল সময় মতে আসিয়া ছাত্র দিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া যাইতেন।

এই স্থানেই উপেন্দ্রনাথের অধঃপতন। ব্রাহ্ম পরেশনাথ মিত্রের দুইটি পুত্রকে উপেন্দ্রনাথ পড়াইতেন। পরেশনাথের এক ভগিনী ছিল,—তাহার নাম চারুলতা। চারুলতা কলেজে পড়িত,—মাসিক কাগজে কবিতা লিখিত,—হারমোনিয়ম বাজাইত,—"বঁধু হে সখাহে" বলিয়া অপ্সরীকণ্ঠে ব্রাহ্মসঙ্গীত গাহিত। চারুলতা সেমিজের উপরে ফরাসডাঙ্গার সূক্ষ্ম ধুতি পরিত, মোজা পরিয়া লেডিস্-সু পায়ে দিত, মুখে পাউডার মাখিত, এবং চূর্ণ কুন্তলে ম্যাকেসারঅয়েল মাখিয়া মর্ত্ত্যে পারিজাতের গন্ধ বিলাইত। উপেনের কাছে গণিত, সাহিত্য, বিজ্ঞানের পাঠ লইত,—এবং মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিত। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-মুগ্ধ উপেন্দ্রনাথ

চারুলতার গুণে—(অন্ততঃ পাশ্চাত্য শিক্ষামুগ্ধ জন যাহাকে গুণ বলে) তাহাতে মুগ্ধ হইল। এই মোহ ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হইল।

এই স্থানে আমাদের মনে পড়ে, নগেন্দ্রনাথ * আর গোবিন্দলালের † কথা। নগেন্দ্রনাথের ভ্রান্তি পাপীষ্ঠের ভ্রান্তি;—অভাবে পড়িয়া নহে। অভাবের কশাঘাতে—প্রবৃত্তির তাড়নায় যাহারা ভ্রমে পড়ে, তাহারাও পাপী; কিন্তু অভাব নাই—অথচ প্রবৃত্তির দাস, তাহারা মহাপাপী। নগেন্দ্রনাথের পত্নী সূর্য্যমুখী রূপে গুণে ইংরেজ মহিলার দ্বিতীয় সংস্করণ বা হিন্দুর চারা গু ইংরেজের শাখার কলম করা। কিন্তু তথাপি নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীতে মজিয়া ছিল। আর গোবিন্দলালের পত্নী ভোমর, কালো—কুৎসিত; ভোমরে গোবিন্দলালের রূপ-তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই,—তাই গোবিন্দলাল রোহিণীতে মজিয়াছিল। উপেন্দ্রনাথও এইরূপ অভাবে মজিয়াছে—কিন্তু সে অভাব, তাহার শিক্ষাদোষে, নিজের দোষে নহে। যে শিক্ষায় আমরা আত্মহারা হইয়া নিজের ধর্ম্মের কিছু মাত্র আলোচনা না করিয়াই পৌত্ত-লিক পূর্ণ বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতেছি,—যে শিক্ষার মোহে "অপের অদেয়" মদ্যপান করিয়া সাহেব সাজিতেছি,—যে শিক্ষার কুহকজালে গৃহ লক্ষ্মীকে টানিয়া সখের বৈঠকে সঙ্গীত গাওয়াইতেছি, যে শিক্ষার ফলে ভাগীরথী নীরে অবজ্ঞা করিয়া কলের জল মাথায় করিতেছি, যে শিক্ষার বলে জননী জন্মভূমিকে হতাদর করিতেছি,—সেই শিক্ষার মোহে উপেন্দ্র-নাথ পল্লীবাসিনী পত্নীতে কোন গুণ নাই স্থির করিয়া, সহরবাসিনী স্বাধীনা চারুলতাকে মনেরমত করিয়া লইল। তাহাতেইত অধঃপতন! এখন তিন জনের কে বড়, কে ছোট, সে বিচার ভার পাঠক পাঠিকার উপর!

ক্রমে মোহ ঘনায়িত হইল,—ক্রমে উপেন্দ্র চারুলতায় অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল,—চারুলতাও আসক্তা। কিন্তু তুষের আগুন যেমন ধীরে ধীরে পুড়িয়া উঠে,—গ্রন্থকার তেমনই ধীরে ধীরে এ আগুন জ্বালিয়াছেন—বস্তুত পক্ষে জ্বলেও তাহাই। আর নগেন্দ্রনাথের ও গোবিন্দলালের মোহ বড় শীঘ্র জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

তখন কেবল পূর্ব্বরাগ;—সেই পূর্ব্বরাগের আকুলতাটুকু লইয়া দুর্গোৎ-সবের ছুটিতে উপেন্দ্রনাথ দেশে গেল। তখন বনলতা আর স্ফুটনোন্মুখী কলিকা নহে—প্রফুল্ল অম্লান পঙ্কজ।

উপেন্দ্র কিন্তু চারুলতার লিপির আশায় উন্মত্ত,—সদাই মোহ-ঘোরে অন্য মনস্ক। বনলতা তাহা বুঝে নাই,—কিন্তু ঘটনাক্রমে, চিঠিপত্র দেখিয়া শুনিয়া বুঝিল আর একজন, সে শরৎশশী। বনলতায় আর ভ্রমরে কত প্রভেদ—তাহা এই স্থান হইতেই আরম্ভ। এখানে গ্রন্থকারের কথাই একটু উদ্ধৃত করি—

"ওলো নূতন বৌ—ওলো বনলতা—কত ঘুমুচ্চিস্? ঐ দেখ, তোর ঘরে চোর ঢুকেছে।"

উপেনের বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় শরৎশশী বনলতার ঘরে আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। হেমন্তের রৌদ্র মৃদু তেজঃ হইয়া আসিতেছে কতকগুলি সাদা সাদা মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর সর্ব্বত্র এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কেবল মধ্যে মধ্যে উঠানে পায়রার বক্‌বকম্ শব্দ ও ঘরের চালে একটা কাকের বিকট কা কা ধ্বনি শুনা যাইতেছে।

বনলতা চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল, ও শরৎশশীর পানে চাহিয়া বলিল—

"কি বলিলে দিদি? কোথায় চুরি হয়েছে?

শরৎ তাঁহার ঘুমন্ত শিশুটির গায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন—

"চুরি হইয়াছে তোর ঘরে।"

"সে কি দিদি! আমার ঘর কোথায়?"

"তুই নিতান্ত বোকা মেয়ে। তুই একথাটা বুঝ্‌লি না?"

কোন্ খানটায় বোকামি করিয়াছে, বনলতা তাহা বুঝিতে পারিল না। শরৎ বলিল—

"আরে বুঝলিনা. মন চুরি।"

"কার মনকে চুরি করিল দিদি?"

"তোর ঘরে আবার কয়টা মন আছে লো? ঠাকুরপোর মন।"

"তাহা আবার কে চুরি করিবে?"

"কেন—আর কেউ? তুই বুঝি সে মনটা তোর পেটরার মধ্যে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া রেখেছিস্ যে আর কেউ তা দেখ্‌তে ছুঁতে পার্ব্বে না।"

বনলতা এতক্ষণে একটু বুঝিল। বুঝিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"ইস্, তোমার যে কথা! পুরুষের মন বুঝি আবার বাক্স-সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা যায়!"

"বন্ধ করিয়া রাখা না গেলে, তাহার চৌকী-পাহারা দিতে হয়।"

"ইস্,—আমার বড় গরজ পড়েছে কি না! যার মন সেই পাহারা দিক্ না গিয়া।"

"তা' কি সকলে পারে? অন্ততঃ আমি দেখিতেছি, তুমি যাঁর কথা বলিতেছ, তিনি কিন্তু একটু পারেন না—তিনি বড়ই অসামাল।"

"হোক্,—তাতে আমার কি?"

কিন্তু এ আমার কি অধিকক্ষণ থাকিল না। যখন শরৎ সত্য করিয়া বলিল, এবং ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল,—উপেন্দ্রনাথ চারুলতার প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, তখন বনলতা বিষণ্ন ও অপ্রীত হইল; এবং যথাসময়ে স্বামীকে পাইয়া সব কথা বলিল। উপেন্দ্রনাথ পত্নীর নিকট মিথ্যা কথা বলিলেন,—এ মিথ্যা কথা তখন উপেন্দ্রনাথকেই বলিতেই হইবে। ভ্রমর স্বামীকে এই স্থানেই বিদায় করিয়া দিয়াছিল,—এই স্থানে স্বামীকে বড় অবহেলা করিয়াছিল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে লিখিয়াছিল :—

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিব বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিলাম কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রাভরণ দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে। তুমি মনে জান বোধহয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি, পিত্রালয়ে যাইব।"

ভ্রমর কি হিন্দু রমণী? ভ্রমর কি সুভদ্রা রুক্মিণীর এক রক্তের মেয়ে? মনে হয়, "দিলে নিলে বদল পেলে"র দেশের মেয়ে। আর ঠিক এইরূপ সময়ে বনলতা উপেন্দ্রনাথকে বলিয়াছে :—

"তোমার পায়ে পড়ি—বল, আমাকে কেন ছাড়িয়া যাইতেছ? আমি জানি, আমার কোন গুণ নাই, যাহা দিয়া তোমাকে সুখী করিতে পারি।

সিরাজদ্দৌলার স্বপ্ন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পদ্মা ও ভাগিরথীর সম্মিলনী-তটে পরাণ পুর পুরাতন পল্লী। গ্রামে জনসংখ্যা তত অধিক নহে,—পঞ্চাশ ষাইট ঘর গৃহস্থ লইয়া এই ক্ষুদ্র পল্লী।

পল্লীটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নিকেতন। তাল, তিন্তিড়ি, আম্র, পনস এবং বেণব-বাগানে বেষ্টিত। নারিকেল ও গুবাক-বৃক্ষের ঘন শ্রেণীতে সমস্ত পল্লী সমাচ্ছাদিত,—আর তিন দিকে বেষ্টন করিয়া পদ্মা ও ভাগিরথীর জল কল কল নাদে অনন্ত উচ্ছাসে, অদম্য প্রবাহে দিবারাত্রি প্রবাহিত। এই গ্রামের মধ্যে বংশীধর বৈষ্ণবের বাড়ী।

বাড়ীটি ইষ্টক নির্ম্মিত। চারিদিকে সমশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সুন্দর সুন্দর কক্ষগুলি ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে দণ্ডায়মান। সম্মুখে বৃহৎ দেবমন্দির। মন্দিরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ। শ্যামসুন্দর ঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির নাম শ্যামসুন্দরের দীঘি। দীঘিতে কাচতুল্য স্বচ্ছ জল— কুমুদ কহ্লারে ভরা, এবং বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যরাজির আবাস-নিকেতন। দীঘির চারিদিকে নারিকেল, গুবাক, পলাশ, কাঞ্চন বৃক্ষের সারি।

সমস্তই শ্যামসুন্দর ঠাকুরের সম্পত্তি। বংশীধর বৈষ্ণব পুরুষানুক্রমে সেই বিরাট-বিপুল-সম্পত্তি উপভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন। শ্যাম-সুন্দর বিগ্রহের অনেক জমিদারী ছিল,—হিসাব পত্র দেখিয়া যাহারা আয়ের তালিকা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন,—শ্যামসুন্দরের জমিদারীর বার্ষিক আয় পঁচিশহাজার সাত শত চুয়াম টাকা। কিন্তু বাহিরের লোক অনেক অধিক অনুমান করিত।

বেলা দ্বিপ্রহর। নিস্তব্ধ-পল্লী অধিকতর নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছে। এইমাত্র শ্যামসুন্দরের ভোগ আরতির খোল করতাল বাদ্য থামিয়া গিয়াছে। নৈদাঘ-মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব আপন আসনে আকাশ পটে বসিয়া প্রখর কর বর্ষণে ধরাতল বিদগ্ধ করিতেছিলেন। পাখীরা পত্রকুঞ্জা-ভ্যন্তরে বসিয়া করুণ-স্বরে গান গাহিতেছিল।

শ্যামসুন্দরের বাড়ীর মধ্যমহলে একটি কক্ষে একখানি তক্তপোষের

পাশাপাশি দুইটি সুন্দরী রমণী উপবিষ্ট। সুন্দরী দুইটি আমাদের পরিচিতা। যে দুইটি রমণীকে গোপালচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র নৌকা হইতে মূর্চ্ছিতাবস্থায় আনিয়াছিলেন,—ইহারা তাহারাই।

গোপালচন্দ্রের সহিত তাহাদের কথোপকথন হইতেছিল। গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"আপনারা কোথায় যাইতেছিলেন?"

একটী রমণী বলিল,—"আমরা মুর্শিদাবাদে যাইতেছিলাম।"

গো। মুর্শিদাবাদে কেন?

র। আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার জন্য জমিদারেরা চেষ্টা করিতেছেন,—আমার স্বামী মুর্শিদাবাদে গিয়া নবাব সরকারে তাহার বিরুদ্ধে দরবার করিবেন বলিয়া মুর্শিদাবাদে যাইতেছিলেন।

গো। তোমরা?

র। আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলাম।

গো। তোমাদের ইচ্ছায়,—না, তিনিই তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন?

র। তিনি যেখানে যাইতেন, আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

গো। তোমাদের স্বামীকে যখন নিহত করে, তখন তোমাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও কি জ্ঞান ছিল না?

র। না,—আমরা উভয়েই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

গো। তোমাদের দুই জনেরই বয়স অল্প—তোমাদের স্বামীর বয়স কত ছিল?

র। ত্রিশ একত্রিশের উপরে নয়।

গো। বংশীবাবুর সহিত জমিদার ভিন্ন আর কাহারও সত্রুতা ছিল বলিয়া তোমরা জান কি?

র। না, আমরা তাহা জানি না।

গো। জমিদারের লোকজনে এ দস্যুতাও করিতে পারে।

র। কেন?

গো। মুর্শিদাবাদে জমিদারের নামে অভিযোগ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া—বিশেষতঃ তাঁহাদের স্বার্থে ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া—এই কাণ্ড করিতে পারেন। জানি না, কালের মাহাত্ম্যে কি বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট বৈগুণ্যে এখন মানুষ সব দানব সাজিয়াছে,—অর্থের জন্য, স্বার্থের জন্য নরহত্যা,

সতীত্বনাশ প্রভৃতি গুরুতর পাতক করিতে মানবগণ কুণ্ঠিত হইতেছে না। হইতে পারে, দস্যুগণ অর্থের লোভে আপনাদের স্বামীকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে পারে!

এই কথা বলিয়া গোপালচন্দ্র একবার কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,—"হাঁ, ঠিক হইয়াছে। আপনাদের স্বামী বংশী বাবুকে অর্থ-লোভে দস্যুগণই নিহত করিয়াছে। জমিদারের লোকে তাঁহাকে নিহত করিলে তাঁহার সঙ্গে যে সকল কাগজ পত্র ছিল, তাহা ফেলিয়া যাইত না।"

র। শ্যামসুন্দর দেবের কৃপায় সেই সময় আপনারা সেখানে আসিয়া ছিলেন, বলিয়াই আমরা জীবন পাইয়াছিলাম।

অপরা বলিল,—"জীবন না পাইলেই ভাল হইত। তিনি গিয়াছেন,— তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন গেলেই ভাল হইত।"

রমণীদ্বয়ই যুবতী,—ভাদ্রের ভরা নদী। দুকূলভরা উচ্ছ্বাস। প্রথমার নাম নন্দা, দ্বিতীয়ার নাম ভদ্রা।

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"আপনাদের কাছে আমার কয়েকটি কথা জানিবার আছে,—সেই জন্যই আপনাদিগকে ডাকাইয়াছি।

ন। কি কথা?

গো। আপনাদের স্বামী বর্ত্তমানেই যখন জমিদারেরা শ্যামসুন্দরের সম্পত্তি স্বহস্তে লইবার জন্য পীড়াপিড়ি করিয়াছেন, তখন তাঁহার অবিদ্যমানে এখন নিশ্চয়ই উহা কাড়িয়া লইবেন।

ন। খুব সম্ভব।

গো। এখন আপনারা কি করিবেন?

ন। আমরা কি করিব—তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

গো। আমি বিবেচনা করি, আপনাদের ভাণ্ডারে যে সকল ধন-রত্ন আছে, তাহা এ বাড়ী হইতে সরাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

ন। আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন।

ভ। পরামর্শ ভাল বটে, কিন্তু ধন রত্ন আমাদের নহে, দেবতার। আমরা তাঁহার সেবায়েত মাত্র।

ন। দেব সেবার জন্যে বিপুল বিষয় আছে,—জমিদারেরা যদি সম্পত্তি কাড়িয়া লয়,—বাড়ী-ঘর-দুয়ার বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়, তখন আমরা কোথায়

দাঁড়াইব? এখন সময় থাকিতে আমরা ধন-রত্ন গুলি স্থানান্তরিত করিতে পারিলে, তখন কূল পাইব।

ভ। ভগবান্ শ্যামসুন্দরদেব রাগ করিবেন না ত?

নন্দা গোপালচন্দ্রের মুখের দিকে মৃদু কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিল।

গোলচন্দ্র বলিলেন,—"না মা, সে জন্যে তিনি রাগ করিবেন কেন? তিনি বিশ্বেশ্বর—বিশ্বই তাঁহার ঘর বাড়ী, এ ঘর হইতে সে ঘরে লইলে, তাহারই ঘরে থাকিবে।"

ভ। কিন্তু ধন-রত্ন যাহা আছে, তাহা অগাধ—গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। তত ধন-রত্ন কোথায় লইয়া যাইব? কাহাকেই বা বিশ্বাস করা যায়?

গো। যে বাড়ীতে তোমরা মূর্চ্ছিতাবস্থায় গিয়াছিলে, সেই সাধু বিশ্বাসের বাড়ী ধন-রত্ন লইয়া গেলে হইতে পারে। তাহার বাড়ীতে অনেক ঘর আছে, একখানি ঘর চাহিয়া লইয়া তাহাতে রাখিলেই হইবে। তবে তাহাকে জানিতে দেওয়া হইবে যে তোমরা অত ধন-রত্ন লইয়া গিয়াছে। বস্ত্রাদির মধ্যে সিন্ধুক বাক্সের মধ্যে কৌশলে উহা রাখিতে হইবে। সাধু নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী নহে,—তবে সময় অতিশয় মন্দ। ধনের জন্য অবশেষে সাধুরও বিপদ ঘটিতে পারে।

ভ। যদি তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আ'জ রাত্রেই গাড়ী প্রভৃতির যোগে ধন রত্ন পাঠাইয়া দিন। আমি সনাতন দাসের মুখে শুনিয়াছি,—আগামী কল্য জমিদারের নায়েব গ্রামে আসিবে। তাহারা আসিয়া কোন একটি গোলযোগ করিতে পারে,—বাড়ীতে পাহারা বসাইতেও পারে। ভাল, তিনি কি নিশ্চয়ই জীবিত নাই?

গো। বোধ হয় না। সে ঘটনা আ'জ প্রায় দুই মাস হইল,—জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এতদিন বাড়ী আসিতেন।

ভদ্রা দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাগুক্ত ঘটনার পরে আরও পঞ্চদশ দিবস অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্যামসুন্দর ঠাকুরের বা বংশীধর বৈষ্ণবের বা বংশীধর বৈষ্ণবের বাড়ীতে এই পনর দিনের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটীয়া গিয়াছে। জমিদার সর-

কারের লোক শ্যামসুন্দরের বাড়ী দখল করিয়া বসিয়াছে,—স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহারা দখল লইয়া পূজাকার্য্য তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে লইয়াছেন। নন্দা ও ভদ্রাকেও তাঁহারা দখলে লইতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপালচন্দ্র মাঝখানে থাকায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই,—আর ধন-রত্ন প্রভৃতি যাহা ছিল, গোপালচন্দ্র তাহা পূর্ব্বেই সাধুচরণের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন;—তৎপরে জমিদারের লোকে বাড়ী দখল করিলে গোপালচন্দ্র নন্দা ও ভদ্রাকে লইয়া সাধুচরণের বাড়ী গমন করিয়াছিলেন।

সে পনর দিনের কথা। পনর দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার পরে গোপালচন্দ্র নন্দা ও ভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শোন মা, আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না। যে কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সে কর্ম্ম-ব্রত-উদ্‌যাপনের সময় হইয়াগিয়াছে,—আমি চলিয়া যাইব। তোমাদিগকে আ'জ আবার একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

নন্দা ও ভদ্রা উভয়ই বিস্ফারিত নয়নে গোপালচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"এখন তোমরা কি করিতে চাহ?"

নন্দা বলিল,—"কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

গো। তোমরা দেবতার যে ধন-রত্ন লইয়া আসিয়াছ, তাহার সংখ্যা অনেক। আমি দরিদ্র—সকল দ্রব্যের মূল্য না জানিলেও অনুমান করিতে পারি, অন্ততঃ লক্ষ টাকা তোমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ টাকা লইয়া এখন কি করিবে?

নন্দা কথা কহিল না। ভদ্রা বলিল,—"আপনি কি করিতে বলেন?"

গো। দুই পথ আছে। একপথ—দেবতার ধন দেবতার কাজে লাগান,—আর এক পথ দেবতার ধন আপনকাজে লাগান।

ভ। দেবতার ধন যাহাতে দেবতার কাজে লাগে, তাহাই করা উচিত। বিধবার উদরের জন্য কতটা চাউল লাগে?

ন। তবে এত কষ্ট করিয়া—এত লুকোচুরি করিয়া সেখানকার ধন এখানে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল?

গো। তাহাতে কি দোষ হইয়াছে মা?

ন। আবার সেখানকার ধন সেখানে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

গোপালচন্দ্র উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“দেবতা কি কেবল সেই স্থানেই আছেন, আর কোথাও নাই? তিনি যে ভূতনাথ,—ভূতে ভূতে ভগবান্। ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিত,—নিষ্কামভাবে ভূত সকলের সেবা করিলে ভগবানের পরম প্রীতি লাভ হয়। আর এক কথা।

ন। কি?

গো। আমি শুনিয়াছি, এবং অনেক স্থলে দেখিয়াছি ও—বৈষ্ণবের মধ্যে বিধবার পুনরায় পতি-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। তোমাদের বয়সও অল্প,—পুনরায় বিবাহ করিয়া কেন সংসার পাতাও না।

নন্দা বলিল,—“হ্যাঁ, আমাদের জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। আপনি যদি বলেন, আমরা বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইতে পারি।”

গোপালচন্দ্র ভদ্রার মুখের দিকে চাহিলেন। ভদ্রা মৃত্তিকা-সংলগ্ন নয়নে বলিল—“আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি?—আমি আর বিবাহ ব্যাপারে যাইব না। এক হৃদয় ক'জনের চরণে উৎসর্গ করা যায়? এ হৃদয়টুকু সমস্তই তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়াছি—মরণে-জীবনে তিনিই স্বামী। তিনি ইহলোকে না থাকুন, পরলোকে আছেন,—আমি তাঁহার চরণ চিন্তা করিয়াই দিন কাটাইব।”

নন্দা অপ্রতিভ হইল। ঢোক গিলিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিল,—“তা' বটে। কিন্তু আমাদিগের জীবন বৃথা যাইবে। কে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? কাহার আশ্রয়ে আমরা থাকিব?”

গো। তুমি মা বিবাহ কর। আর ভদ্রা, মা তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। কিন্তু বিবাহিত জীবনাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যে আনন্দ অধিক। পারিলে, নন্দারও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত ছিল।

নন্দা বা ভদ্রা কেহই সে কথার উত্তর প্রদান করিল না। গোপালচন্দ্র বুঝিলেন, নন্দা বিবাহ করিয়া সংসার করিবে, আর ভদ্রা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বামী প্রেম পূজা করিবে।

গোপালচন্দ্র নন্দার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরপি বলিলেন,—“তুমি কি বিবাহের পাত্র মনোনীত করিয়াছ?”

নন্দা বলিল,—“না, তা' কেন? তবে”

ভদ্রা মৃদু হাসিল। বলিল,—"সনাতন দাসের স্ত্রী নাই। তার সঙ্গে বিবাহ দিলে হয়।"

গোপাল চন্দ্র বলিলেন,—"যদি আমি এখানে উপস্থিত থাকিতে থাকিতে কার্য্য গুছাইয়া লইতে হয়, তবে শীঘ্রই এ কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।"

ভ। তাহাই,—আপনি চলিয়া গেলে, একার্য্য কে করিবে?

গো। তোমাদের মত হইলে, আমি নিজেই সনাতন দাসের নিকটে গিয়া স্থির করিয়া আসিব। সনাতন দাসও তোমাদের বাড়ীতেই থাকে?

ভ। হাঁ, থাকে।

ন। তা' হইলে নন্দা কোথায় যাবে?

ভ। নন্দা যদি ইচ্ছা করে, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

ন। আবার ঐ কথা! আমি কখনই বিবাহ করিব না। বিবাহ একবার হয়,—পুনঃপুনঃ বিবাহ হয় না।

ভ। তবে না হয়, আমিও করিব না।

গো। বুঝিয়া দেখ,—প্রবৃত্তির তাড়না হইতে যদি আপনাকে রক্ষা করিতে পার, তবে বিবাহ না করিলে ভাল হয়।

ভদ্রা মৃদু হাসিয়া নন্দার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বুঝিয়া দেখ।"

নন্দা কথা কহিল না। ভদ্রা বলিল,—"সনাতন দাসের এতক্ষণ দক্ষিণ বাহু স্পন্দন করিতেছে। তাহার ভাগ্যে সুন্দরী স্ত্রী ও বিপুল ধন যুটিতেছে।"

গোপালচন্দ্র বলিলেন,—"হাঁ, তোমাদের ধন-রত্ন সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে।"

ন। কি বলিবেন, বলুন?

গো। তোমরা জান, ঐ ধন-রত্ন দেবতার,—তোমাদের নহে। ঐ সম্বন্ধে তোমরা কি করিতে চাহ?

ন। আপনি বলিয়াছেন, উহা এখন আমাদের,—আমরা ভাগ করিয়া লইব!

গো। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, ভূতে ভূতে ভগবান্। ভগবানের ধন—সর্ব্বভূতের সেবার্থে উহার ব্যয় হওয়া কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ঐ ধনের এক তৃতীয়াংশ দেশের উপকারার্থে প্রদান কর,—অপর দুই অংশ তোমরা দুইজনে গ্রহণ কর, এবং আপন ইচ্ছা মতে ব্যয় কর!

ন। তাহাই করুন।

ভ। আপনি যদি সেইরূপ ভাল বিবেচনা করেন, তবে ধন বিভাগ করিয়া দিন। কিন্তু আমি টাকা লইয়া কি করিব? বিধবার টাকার প্রয়োজন কি? যাহাতে আজীবন কাল একবেলা এক মুঠা ভাত পাই,—তাহারই ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত টাকা আপনি লইয়া গিয়া দেশের কাজে ব্যয় করুন।

গো। এখন আমি তোমার অংশের টাকা লইব না। তুমি তোমার টাকা লইয়া একটি ব্যবসার কার্য্য আরম্ভ কর।

ভদ্রা হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"আমার ব্যবসায়ে প্রয়োজন কি? যাহার আদৌ টাকায় প্রয়োজন নাই—তাহার হাতে অগাধ টাকা—আবার ব্যবসা করিয়া ধনোপার্জ্জন! এ কেমন আদেশ?"

গো। এ কথার উদ্দেশ্য আছে।

ভ। সে উদ্দেশ্য কি?

গো। ধান্য, চাউল, যব, গম প্রভৃতি দ্রব্য কিনিয়া মরাই করিয়া রাখিতে হইবে, এবং সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে যে লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই একটি অনাথ আশ্রম করিয়া অনাথগণের সেবাব্রত গ্রহণ কর।

ভ। আমাকে যে অর্থ দিতে চাহিতেছেন, তদ্দ্বারাও ত অনাথগণের সেবা হইতে পারে।

গো। তাহাতে কত দিন চলিতে পারিবে? সে দেবতার ধন,—মজুত থাক। লাভ করিয়া অনাথসেবা দাও।

ন। আমায় যে অর্থ দিবেন, তাহাদ্বারা কি করিব?

গো। বিবাহ হইলে স্বামীর পরামর্শ মতে কাজ করিও।

নন্দা নিরুত্তর হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধুচরণের বাটী হইতে গোপালচন্দ্র বংশীধরের বাটীতে নন্দা ও ভদ্রাকে লইয়া যখন গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় গিরীশচন্দ্র ও কৃষ্ণ নগরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি সাধুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোপালচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র ও সাধুচরণ তিনজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গোপালচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গিরীশ, তুমি কোন্ কোন্ গ্রামে গমন করিয়াছিলে?"

গি। যেখানে যেখানে যাইবার কথা ছিল, সে সকল স্থানেত গিয়াছিলামই,—তদ্ভিন্ন বঙ্গের আরও বহু পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছি,—মুর্শিদাবাদেও গিয়াছিলাম।

গো। বঙ্গবাসিগণ কি বলিতেছে?

গি। বঙ্গ জাগান বড় কঠিন—অত্যাচারের অনল-দহনে বঙ্গবাসী নিরন্তর বিদগ্ধ হইতেছে—তথাপি অসাড়। কেহ জাগিবে না—উঠিবে না—অত্যাচারের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবে না। আমি আমার প্রাণের করুণাগ্নি বঙ্গের দ্বারে দ্বারে বিলাইয়াছি—কিন্তু জ্বালিতে পারি নাই। সে অগ্নির উত্তাপে চমকিয়াছে অনেকে। গলিয়াছে অনেকে,—কিন্তু কেহ জাগে নাই।

গো। বঙ্গের জমিদারবর্গের নিকট গিয়াছিলে কি?

গি। হাঁ, গিয়াছিলাম—জড়তা সেই স্থানেই অধিক। তাঁহারা ভয়ে জড়সড়,—তাঁহারা বিদ্রোহী, একথা যদি নবাব জানিতে পারেন,—জানিয়া যদি তাঁহাদের জমিদারী কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! এই ভয়ে তাঁহারা প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারেন না। তাঁহাদের মনের ভাব—নবাব যদি যায়, ভাল হয়,—কিন্তু না গেলে আর কি করিব?

গোপালচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বঙ্গের স্বাধীনতা সুদূর পরাহত। যাহারা শক্তিশালী—তাহারা এত ভয় পাইলে কাজ হইতে পারে না। তুমি মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলে, সেখানে গিয়া কি শুনিলে? তোমার সহিত অবশ্যই গুপ্ত-মন্ত্রণাকারিগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

গি। নিশ্চয়ই হইয়াছিল,—তাঁহাদিগের সহিত যদি দেখা হইল না,—তাঁহাদিগের সহিত যদি কথাবার্ত্তা না হইল, তবে কি করিতে গিয়াছিলাম?

গো। তাঁহাদের নিকট কি শুনিলে?

গি। তাঁহারা বলিলেন—বঙ্গে এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তি নাই, যিনি নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন?

গো। তুমি কেন বলিলে না,—আমরা অনেক লোক, অনেক অর্থ—তাঁহার সাহায্যে প্রদান করিব?

গি। তাঁহারা বলিলেন,—বঙ্গের যেরূপ অবস্থা, মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের যেরূপ অবস্থা, নবাবের সৈন্যগণের যেরূপ অবস্থা—নবাবের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সবিশেষ আয়োজনের কোন প্রয়োজন নাই। নবাব-সিংহাসনের ভিত্তি নাই—একটি ধাক্কা মারিতে পারিলেই সিংহাসন চূর্ণ হইবে, কিন্তু সে সাহস বঙ্গের কাহারও নাই।

গো। তাঁহারা তবে কি স্থির করিতেছেন? মহারাষ্ট্রীয়গণকে কি তবে বঙ্গরাজত্ব লইতে আহ্বান করিতেছেন?

গি। সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজ্যজয়ে ইচ্ছুক নহেন।

গো। মিছে কথা,—রাজ্য সংস্থাপনের জন্য তাঁহাদিগের প্রবল উদ্যোগ।

গি। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা বর্ত্তমানে না কি কোন সাহায্য মিলিবে না। তাঁহাদের এখন সময় নাই—তখন সময় নাই—এইরূপ ওজর।

গো। এখন কি হইবে?

গি। ইংরেজকেই তাঁহারা বাঙ্গলার অত্যাচার নিবারণ করিতে আহ্বান করিতেছেন।

গো। ইংরেজকে? ইংরেজ ব্যবসায়ী—তাঁহারা কি রাজ্যসম্বন্ধীয় ঝঞ্চাটে লিপ্ত হইবেন?

গি। তাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করিতে নাকি স্বীকৃত হইয়াছেন।

গো। নবাবের কলিকাতা বিজয়ই বোধ হয়, ইংরেজের ক্রোধের কারণ?

গি। বোধ হয়, তাহাই হইবে। তাহারা বোম্বে হইতে এদেশে আগমন করিবে।

গো। আমি শুনিয়াছি, ইংরেজের মুষ্টিমেয় সৈন্য আছে—তাহা লইয়া আসিয়া অগণিত নবাব সৈন্যের নিকটে কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারিবে? বিশেষতঃ তাহারা যে প্রকার বীর, তাহা কলিকাতা অভিযানেই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ দেশের লোক যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, তাহা হইলে মুর্শিদাবাদের সন্নিকটেও উপস্থিত হইতে পারিবে না।—গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতি এতৎ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিতেছেন?

গি। সকল কথা আমি শুনিতে পাই নাই,—ইংরেজদের সঙ্গে এখনও কথা চালাচালি হইতেছে। পাকাপাকি কিছু হয় নাই।

গো। মীরজাফর খাঁ কি করিতেছেন ?

গি। তিনি নবাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে।

গো। তাঁহার কথা ভাবিবার বিষয়।

গি। কেন ?

গো। বর্ত্তমান নবাব তাঁহার আত্মীয়—স্বজাতি। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন কি না, সন্দেহ।

গি। নবাব তাঁহাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছেন।

গো। নবাব সিরাজদ্দৌলা কাহাকে না অপমান করিতেছেন ? কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক না তাঁহার দাম্ভিকতায় আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতেছে ? এখন যে জগৎ শেঠ—তাঁহাকে নবাব সহস্তে প্রহার করিয়াছেন।

গি। মীরজাফর খাঁকেও সবিশেষ অপমান করিয়াছেন। নবাব নাকি জাফর খাঁকে আদেশ করেন, সভায় আসিয়া মহারাজা মোহন লালকে সেলাম ও যথাবিধি সম্মান করিতে হইবে।

গো। তার পর ?

গি। তারপরে জাফর খাঁ সেই কথা শুনিয়া বলেন, আমি সভায় আসা বন্ধ করিব। তথাপি মোহনলালকে সেলাম বা সম্মান করিতে পারিব না।

গো। নবাব কি বলিলেন ?

গি। নবাব ক্রোধরক্ত-নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন ? তদুত্তরে জাফর খাঁ বলেন—যে পদগৌরবে একজন তুচ্ছ লোক ছিল, তাহাকে সহসা ঐরূপ সম্মান করা জাফর খাঁর কর্ম্ম নহে। নবাব উত্তর করেন—তথাপি মহারাজা মোহনলাল এক্ষণে নবাব সরকারের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। তাহাতে মীর জাফর খাঁ উত্তর করেন—কিন্তু সেই উচ্চপদ অতি অসদুপায়ে অর্জ্জিত হইয়াছে বলিয়া লোকে তাহাকে সম্মানের চক্ষে দেখেন না। নবাব আরও রাগিয়া গেলেন,—এবং মীর জাফর খাঁকে সভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

গো। নবাবের অধঃপতন অতি সন্নিকট।

গি। তোমাকে একবার মুর্শিদাবাদে যাইতে হইবে।

গো। সত্বরেই যাইব। আগে একবার কৃষ্ণনগর রাজসাহী প্রভৃতি বঙ্গের কয়েক স্থানে যাইতে হইবে। এক্ষণে আর দুইটি কাজ আছে।

গি। কি ?

গো। সনাতন দাসকে ডাকিয়া তাহার সহিত নন্দার বিবাহ দিতে হইবে ?

গি। আর ?

গো। একটি অনাথ আশ্রম প্রস্তুত করিয়া তথায় ভদ্রাকে স্থাপিত করিতে হইবে। ভদ্রা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে।

গি। বর্ত্তমানে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, তাঁহার ব্যবস্থা কি ?

ভদ্রা হাসিয়া আহারোদ্‌যোগ করিতে গেল। ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা দেশজ শব্দ ও অর্থ।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত মূলক বাঙ্গালা শব্দ ভিন্ন আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, সংস্কৃতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারা যায় না, এই সকল শব্দকে 'দেশজ' শব্দ বলে। এই সকল শব্দের মূল কি, তাহা আমরা জানি না। হয়ত সংস্কৃত শব্দই এত বিকৃত হইয়াছে যে, এখন আর তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা দুষ্কর।

বাঙ্গালা ভাষায় দেশজ শব্দের সংখ্যা যে কত, তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দেশজ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু যে সৃষ্টি হইয়া কেবল লোকমুখে চলিত তাহা নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যেও উহারা প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যে উহাদের স্থান দেওয়া উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু স্থান যে পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহা সত্য, এবং প্রবেশ নিষেধেরও যে কোন উপায় আছে, তাহা বোধ হয় না।

বঙ্গের প্রাচীন কবিরা তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ যাবনিক ও দেশজ শব্দে পরিপূর্ণ। কবিকঙ্কণ বর্ত্তমান সময় হইতে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গল এতদিনের পুরাতন না হইলেও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পূর্ব্বে রচিত। উভয় গ্রন্থে এরূপ শব্দ অনেক আছে, যাহাদের অর্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ঐ সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তৎকালের প্রচলিত দেশজ বলিয়া বোধ হয়। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা রাঢ় দেশীয়। কবিকঙ্কণের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম। দামুন্যা তাঁহার জন্মভূমি হইলেও মুসলমান

ডিহিদারের অত্যাচারে অবশেষে তাঁহাকে জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলায় আড়রা গ্রামে বাস করিতে হয়। ঘনরামের জন্মস্থানও বর্দ্ধমান জেলায়। তাঁহার রচিত ধর্ম্মমঙ্গলের ঘটনাস্থান মেদিনীপুর জেলায়। ভারতচন্দ্রেরও জন্মস্থান বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে যেসকল দেশজ শব্দ আছে, তাহা বর্দ্ধমান বিভাগের প্রাদেশিক শব্দ বলিয়াই বোধ হয়। তবে সেই সকল প্রাচীন শব্দই ঠিক আছে, কি লিপিকর-করস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন।" পূর্ব্বকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকাতে গ্রন্থ নকল করিয়া লইতে হইত। এরূপ নকলে নকলে অবশেষে "সাত নকলে আসল খাস্ত" যে না হইয়াছে, তাহাই বা কে বলিল! ফল কথা, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের অভাবে যে, আমাদিগকে প্রাচীন বা আধুনিক দেশজ শব্দের অর্থজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ বিজড়িত হইয়া থাকিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যতদিন না এরূপ একখানি সম্পূর্ণ অভিধান সংকলিত হইবে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষার অভিধান অসম্পূর্ণ থাকিবে। তবে এস্থলে ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা একজনের সাধ্যায়ত্ত নহে। (১)

বর্ত্তমান বাঙ্গালা অভিধান গুলি সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ। সুতরাং উহাকে বাঙ্গালা ভাষার অভিধান না বলিয়া সংস্কৃত ভাষার অভিধান বলিয়া অভিহিত করা উচিত। যে সহস্র দেশীয় শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে; কি যাহারা সংস্কৃত শব্দ হইতে এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, কোন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, নির্ণয় করা দুষ্কর, সে সকল শব্দ বাঙ্গালা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, স্বর্গীয় আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয়, বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রকৃত অভিধান সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বাঙ্গালা অভিধানের উপকরণ সংকলন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যান নাই। শুনিয়াছি, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত সে শব্দসংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহ করিয়াছেন। যদি সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেশের মহোপকার সাধন করিবেন।

---

(১) প্রবন্ধ লেখক বিগত দশ বৎসরের অধিককাল পরিশ্রম করিয়া দেশজ শব্দের একখানি অভিধান সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

এখানে কয়েকটী বাঙ্গালা দেশজ শব্দের প্রয়োগ দেখান যাইতেছে। শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় করা এক্ষণে সহজ সাধ্য নহে। অর্থের আলোচনা জন্যও পাঠক বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

বিটল না বড় কেন কন মন্ত্রিবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকর॥ ১॥
কপালে কনক চান্দা বিচিত্র করালি।
সজোর উজোর ডোর মুখে মুখ নালি॥ ২॥
হেথানি জানায় ঘোড়া সেন মুখ তাকি।
সেন বলে জীয় জীয় বাবারে এরা কি॥ ৩॥
পাত্র বলে বেটারা সকল ঠক ঠেঁটা।
মুখে মুখে সম্মুখে চুকলি খায় বেটা॥ ৪॥
দাদালি দুহাতে, সেনা সব সাথে,
যুঝে যেন মহাকাল॥ ৫॥

তবে চূড়া চলিল চঞ্চল চালি ঢাল।
কালুর নন্দনে দেখে দিলেক দাদাল॥ ৬॥
অপর টাঙ্গল টাটু ঢালি ফরিকার।
সমুদয় নব লক্ষ যম অবতার॥ ৭॥
বসন ভূষণ গুয়া মন আপ মালা।
সবায় যোগান রঙ্গা বরণের ডালা॥ ৮॥
উপরে মালক ছাড়ে করে বীর দাপ।
তথাপি না উঠে হেন ছার জন্তু পাপ॥ ৯॥
সত্বরে পঁহুছিল সবে মহাবীরের বাড়ী।
ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি॥ ১০॥
কেহ কলন্তর লয়, বৃষে কেহ ধান্য বয়,
কানে কিনে রাখে কোনজন॥ ১১॥

তুলিয়া আখড়া ঘরে, মল্লযুদ্ধ কেহ করে,
জাল বিদ্যা গুলী চাপগারি॥ ১২॥

প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাক দিল পারা।
সাধু বলে যেই চোর নাহি পাতিয়ারা॥ ১৩॥

পাইকে পাইকে দেখা কাস্তে কাস্তে দেখা।
আগে মৈল করিকাল ঢালে দিয়া মাথা ॥ ১৪ ॥
ফণি ফণামণি দিলে ফের দিলে মোরে।
ফেফাতুড়া খাইয়া ফুল্লরা পাছে মরে ॥ ১৫ ॥
বরুণের শীজাকুড়া কনক আকুড়া।
হীরামুখী নামে যার চন্দনের কুড়া।
উপরে ছায়নী দিল পাটের পাছোড়া।
চারিদিকে নাম্বে গজ মুকুতার ঝারা।
ময়ূরের পাখে যার লেগেছে ছিটুনী।
বেলন পাটের খোপ সর্ব্বাঙ্গ দাপনী ॥ ১৬ ॥
হইলে প্রভাত কাল, বরঙ্গ ফুকরে ভাল,
আনন্দ বাধাই রাজপুরে ॥ ১৭ ॥
পরি দুর্পণের কাচা, ভানিত আমার ভাচা,
সেই বেটা হবে দেশমুখ ॥ ১৮ ॥
দুই পালের কন্ধে দিয়া দুই পাও।
আমার কন্ধেতে বসি রহনি খেলাও ॥ ১৯ ॥
চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি।
সাঙলি গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী ॥ ২০ ॥
নগর্য্যা ছাওয়াল সঙ্গে, নিত্য খেলে কত রঙ্গে,
খেলে কড়ি চিকা, কোড় ভেটা।
পাশকে হইয়া বশ, ডাকে বিদু দশ দশ,
বি পঞ্জিকা খেলেন সট্‌কা।
পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে পাতিবালি,
সামরুল শুনাইতে কথা।
গালাগালি ন্যায় বন্ধ, খেলায় সদাই দ্বন্দ্ব,
না জানি দিবসে রহে কোথা ॥ ২১ ॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ হইতে উপরি লিখিত পদগুলি উদ্ধৃত হইল। এমন সহস্রপদ আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সকল দেশজ শব্দের অর্থ নিষ্কাশন হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ইহা ব্যতীত এই সকল শব্দ

রক্ষা করিবার আর একটী আবশ্যকতা আছে। ভাষার ইতিহাসে ইহারা এক একটী স্তম্ভ-স্বরূপ।

কবি ভারতচন্দ্র যত যাবনিক ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় আর কোনও কবি বোধ হয়, সেরূপ করেন নাই। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতের ন্যায় পারশী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এবং সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে পারশীর খুব চলন। তখনও বাঙ্গালা দেশে মুসলমান রাজত্বের ক্ষীণ আলোক প্রতিভাত হইতেছে। একারণ যাবনিক শব্দের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে দেশজ শব্দের প্রাধান্য দেখিয়া অনুমান করা যায়, যে, সে সময়ে দেশজ শব্দের প্রাদুর্ভাব এখন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সভ্য সমাজে এখন বাঙ্গালার নানা ভাগের লোক একত্র হয়। এজন্য আমাদের কথায় ও লিখায় দেশজ শব্দের সংখ্যা কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে এতটা দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক ছিল না।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণও ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাঁদিবার সময় কেহ সাধু ভাষায় কাঁদে না, ভাষার বাঁধ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরা অনেকে রাঢ়দেশীয়। এজন্য রাঢ়দেশে প্রচলিত অনেক দেশীয় শব্দ বৈষ্ণব কাব্যে পাওয়া যায়। এস্থলে অদ্যাপি রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলি শব্দ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

অবেভার,	কাহা,	দাপুনি,	পাঁচান,
আটিয়া,	কাহাল,	দিঠ,	ফুট্কি,
আউদর,	খুটা	দিঠিজ,	বেরি,
আউয়াদ	গোডায়	দোসর	বেলি,
আউটিয়া	গোড়াইয়া,	ধামাল,	বালাই
আপত্তি,	ঘোচন	নাটুয়া	বিমার
আলাইলা,	ছটক	নেউটিয়া,	বহুরি
আলোল	ছাউনি	নেত,	বিকালি
উবারে	ছাওয়াল	নেতধটি	ভোক,
উরমিতে	ছার	নিবড়িল,	মাইল,
এড়ি	ছোঁয়ড়	পরতেক	মালসাট,
কতি	ঝটি	পরণয়	মোহরি
	চাঙ্গাল	পাছড়া	মোকাম্মি,

কানড়	তোকানি	পাশ	সরসন
কাশলি	তেঁউড়	পাখালিন,	হাব্যসে

প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানে ইহার কয়টী শব্দ পাওয়া যায়, এবং প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার কয়টী ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গলা দেশে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন অনার্য্য জাতি এদেশে বাস করিত, তখন অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা আর্য্য ভাষা আনয়ন করেন। তাহার অপভ্রংশ হইয়া ও অনার্য্য ভাষা মিশ্রিত হইয়া মাগধী ভাষার উৎপত্তি হয়। পরে বংশের রাজত্বকালে মৈথিলি ভাষার চলন হয়! লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিলে আবার বাঙ্গালার প্রাদুর্ভাব হয়। গত কয়েক শতাব্দীতে পারশী, আরবী, মগ, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য।

হোলি-উৎসব।

কাওয়া খেলত হরি ব্রজবধূসঙ্গেরে!
আবির কুঙ্কুমময় অরুণিম অঙ্গেরে!

* * *

মারয়ি মাধব-মাধবী অঙ্গেরে।
কাশ্মীর কুঙ্কুম কৌতুক রঙ্গেরে!
রঞ্জিত ইঙ্গিত কারু চারু ভুরু ভঙ্গেরে!

* * *

বাঁশী বাজিল আবার! সরস বসন্তে রস "বৃন্দাবনে" বাঁশী বাজিল;—ফুকারিল ব্রজেশ্বরের মোহন বাঁশী!

বাঁশী কাব্য জগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কল্পনার মধুর মলয় কল্পিত ভাবের লহরীমালা লইয়া কাব্য। ভাবসাগরের উত্তুঙ্গ তুফান পরিপূর্ণ মহা-বেগবতী সর্ব্বশান্তি বিনাশী খর স্রোতের যাবতীয় রুদ্রতা এবং উগ্রতার চরম সমাবেশ—বিরহীর সদা অস্থির চির-অতৃপ্তিময় চিরলাঞ্ছিত উদভ্রান্ত হৃদয়ে। নিশা দ্বি-প্রহরে, জগৎ যখন বিগত চেতন, মৃতকল্প, অব্যয়িত, সার্ব্বধারী,

ইন্দ্রিয়কুল গভীর অন্ধকারে এবং নীরবতার ভীত, দিক্‌শূন্য, সহায়হীন, ক্লৈব্য এবং শিথিলতার কোটর প্রবিষ্ট; কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় অপর সকলের কার্য্যভার স্কন্ধে লইয়া প্রহরীরূপে জাগ্রত এবং কার্য্যশীল;—তখন—সেই ভীষণ সময়ে—উৎগ্রীব উৎকর্ণ বুঝি শোনা যায় ভাবপূর্ণ, নিরন্তর সূচিকাঘাতবৎ যাতনাক্লিষ্ট, বিরহীর জ্বলন্ত হৃদয়ের সমস্ত হুতাশন রাশি—এই এক শ্রবণ দিয়াই বহির্গমন প্রয়াসী। এই মহাভাবময় আহা উহ পরিপূরিত হৃদয়োদ্গারে যদি মর্ম্মস্পর্শী বংশীধ্বনিলা শ্রুত হয়, তবে কোথায় যাইতে পারে, তাহা বুঝি না।

বাঁশী আবার বাজিল!—মলয়-সহচরী কুসুম-সুরভি-পরিপ্লুত পিককুল মুখরিত সাধের সরস বসন্তে "তুলিয়া লহর শত নীল যমুনায়" আবার ব্রজেশ্বরের বাঁশী বাজিল! স্বর্গের সুতীব্র মদিরা-সঞ্চারী বাঁশরী ঝঙ্কারমাত্রে স্থাবর-জঙ্গম জাগিল; জড় জীবিত হইয়া উঠিল! সেই মিষ্ট

"—মুরলি সুতান
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান।"

স্বভাব-সুন্দরী সুন্দর সাজে সাজিলেন। পুষ্পরাজ্য পুলকে পূর্ণ বিকশিত হইল। মলয়ানিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বর ছুটাইয়া মধুরিমা মিশাইয়া ব্রজেশ্বর বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। স্বর্গের সুধাস্রোত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শিরায় শিরায় ছুটিল। জড় জগৎ জীব জগৎ মাতোয়ারা, আত্মহারা; মুরলি-নিঃসৃত মদিরা পানে! বাঁশীর স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল। বাঁশী "ফুকারিল"—"তোরা আয় কে যাবিরে বৈকুণ্ঠে প্রেমিক প্রেমিকা রোগী ভোগী সুখী অসুখী দেব দানব সৎ অসৎ আয় সবাই আয় আমি সাযুজ্য দিব"। মানুষ মানুষী দানব দানবী প্রেমিক প্রেমিকা পশু পাখী সকলে ছুটিল! কাহার সাধ্য সে স্বরে স্থির থাকে? জগৎ ভাবোন্মত্ত, রসোদ্বেলিত, ফুল্ল কদম্ব পুষ্পবৎ কাঁপিতে লাগিল! মুরলির সেই প্রাণ মন বিমোহন-স্বর—সে স্বরের অনাহত স্বর্গীয় শব্দ সংসার ব্যাপিল; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাইল! ত্রৈলোক্য বিমোহিত করিল! গৃহী গৃহ-কর্ম্ম ত্যাগ করিল—সে স্বরে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল! সর্ব্বত্যাগী হইয়া সবাই সেই স্বরে প্রাণ ঢালিয়া দিল। ভাব বিহ্বল চিত্তে ঊর্দ্ধে বাহু হইয়া নাচিতে লাগিল! কেহ নাচিল বাৎসল্যে, কেহ দাস্যে, কেহ সখ্যে, কেহ নাচিল মধুর শান্ত রসে।

বাঁশী পুনর্ব্বার বাজিল। এবার—

"—বাঁশরী

সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন

স্তম্ভন ভীষণাবলী লহরী"

ছুটাইল! ছুটাইল সে কেমন! বৈদ্যুতিক বেগাকর্ষণ। সেই সম্মোহন সঙ্গীতের আকর্ষণ একান্ত উপমা রহিত; তাহা মিষ্ট, সুমিষ্ট—মিষ্টতর হইতেও মিষ্টতম! তাহা মুরলীর "মধুর রস" ব্রজেশ্বর বাঁশরীতে এবার মধুররস ছুটাইলেন! সে রসে বৃন্দারণ্য পূর্ণ উচ্ছসিত, প্লাবিত হইল। মুরলী 'মধুর রস' গাইল—মুরারির বিশেষ অনুগৃহীতাদের জন্য লক্ষ্মীঅংশে ঐ পরিগৃহীতা ষোল সহস্র গোপনারীকে উন্মত্তা ও উদ্ধার করিবার জন্য মুরালীতে মধুর রস বাজিল এই ষোলসহস্র গোপাঙ্গনা শান্ত; দাস্য সখ্য, বাৎসল্যাদি কোন রসের স্বতন্ত্র ভাবে অধিকারিণী নহেন, সান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য রসের একান্ত ঘনীভূত যে অত্যুচ্চ "মাধুর্য্য রস" তাহারই অংশ ভাগিণী এই দেবীগণ!

বাঁশীতে 'মধুর রস" বহিল। প্রেমিক প্রেমিকার মন প্রাণ গীতে—দ্রবীভূত হইল! মাধুর্য্য-রস-উন্মত্তা, মুক্তি-পথে মাতোয়ারা "আহিরিণীগণ" বংশীস্বর অনুসরণ করিয়া ছুটলেন। মুরলী আরও জোরে বাজিল, ষোল সহস্র গোপাঙ্গনার প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিল।

"শ্যামতনু অপরূপী, ষোল সহস্রেক গোপী

বাজে বংশী সবাকার নামে!"

বড়ই বিষম ব্যাপার! অন্তঃ পুরবাসিনী অঙ্গনা অভিসার ধাবিতা! সতী পতি পদ ছাড়িয়া চলিলেন। গৃহিণীর গৃহ-কার্য্য সমাধা হইল না, সঘনে ছুটিলেন; প্রসূতি দুগ্ধ পোষ্যকে স্তনদানে আর পারগ হইলেন না, প্রাণের বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া পথে ছুটিলেন। সুন্দরী সাজ সজ্জা করিতে ছিলেন; "শৃঙ্গার" আর সমাপন হইল না পরিচ্ছদ ফেলিয়া, অঙ্কের অর্দ্ধ গ্রথিত পুষ্পমালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, মুক্তকেশে উর্দ্ধশ্বাসে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় অভিসার গামিনী হইলেন! পিতা মাতা পতি পুত্র পরিজনাদি ত্যজিয়া, ধন সম্পদ বস্ত্র অলঙ্কারাদি ছাড়িয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই মমতার বন্ধন কাটিয়া লাজ কুল ভয়ে, সতীত্বে ওসম্ভ্রমে জলাঞ্জলী দিয়া নব যুবতীগণ নিকুঞ্জবিহারীর উদ্দেশে কুঞ্জকুটীরাভিমুখে ছুটিলেন।

"কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কান্ত! কোথায় আছ প্রাণবল্লভ, "দশদিক ব্যাপিয়া এই মাত্র শব্দ;—গোপবালা প্রেমবিহ্বলা, নারায়ণ রতিকাতরা, বিবসনা সাংসারিক সন্তাপমাত্র বিরহিতা। "হা কৃষ্ণ! প্রাণবল্লভ!" এই এক মাত্র রবে রোরুদ্যমানা!

কি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র জানে "তুরী বাঁশী"

বনোয়ারী! হায় আজ

"নববধূ নিলাজ ভাইলা"

কুঞ্জ-কুটীরে সমবেতা ষোল সহস্র সুন্দরী। কুঞ্জাধিপ, কামিনী মণ্ডলীকে তখন সম্বোন করিয়া কহিলেন,—"কামিনীগণ আমি তোমাদিগের প্রেমানুরাগে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এখন তেমরা সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন কর। পতি সেবাই সতীর একমাত্র ধর্ম্ম। আমার রূপ লাবণ্য দেখিবার জন্য তোমরা আসিয়াছিলে, এখন ত তাহা নয়ন ভরিয়া দেখা হইয়াছে অতএব আর বিলম্ব করিও না, গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমাদের ভক্তি ও প্রীতিতে পরিতুষ্ট হইয়াছি।

বনোয়ারীর একথা কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগের মনে ধরিল না। মর্ম্মে বিঁধিল তাহার।

"পদনখে লিখিক্ষিতি,　　　　দশনে অধর খাঁতি
অধো দৃষ্টে রাঙ্গাপদে চায়।
মোহিত পীরিতি কাঁদে,　　কেহ ফুকারিয়া কাঁদে
কেহ কহে বন্ধু! রাখ প্রাণ!"

আবার কি বলিতেছে ঐ শুন :—

"আর না যাইব ঘর,　　　　গুরুজন বরাবর
না করিব গৃহ প্রবেশন!"

সর্ব্বত্যাগী না হইলে, তোমায় পাওয়া যায় না; আমরা তোমায় পাইবার আশায় আজ সর্ব্বত্যাগিণী হইয়া আসিয়াছি। হায়!

"কত না যাতনা দেখ,　　　　পরশিয়া প্রাণ রাখ"

গোপিনীরা সেই মার্ত্তণ্ড-প্রভা-ম্লানকারী, পীতাম্বর-পরিহিত-পুণ্ডরীকাক্ষ্য —নবীণ-জলধর কান্তি বিভাসিত নবনটবর বঙ্কিম চন্দ্রকে একেবারে "ঘেরিয়া" ফেলিলেন।

ছল করিয়ে যাবে হে ভুলায়ে
সে আশা ত্যজহে বঁধু!
ছল করিয়ে ভকতে ভুলাও
হরিহে তু' বড় সাধু।

বঁধুরে—আমরি!
তু' বড় কল্পতরু!—
ফুটের লাগিয়ে আঁচর পাতলু
নিরাশ করিলি নাহে!
লাজ তেজিয়ে যাচলু একটী
নাদিলি নাগর মোহে!"

পুনশ্চ আর একদিক্ দিয়া আর এক সম্প্রদায় সুন্দরী অপূর্ব্ব সুন্দর নবনটবর শ্যামসুন্দরকে আক্রমণ করিলেন;—

ছি ছি রে কালিয়া কাঠের পুতলী
পাষাণে রচিত হিয়া!
সাধের হৃদয় না ভেলি কালিয়া
মাধব আর কি করিব?
সরমে মরিহে নীরব বঁধুয়া
সরম করতু কাহে?
ধরায় নিরখি কাহেরে নাগর
সুধাই কহত মোহে?
তুলহে বদন দাওহে চুম্বন
না রবি এমন ধারা!
তমাল বকুল লবঙ্গ মঞ্জরী
বুঝে কি এখনো তারা?

একদিকে তিনি একা; আর অপরদিকে রতি-প্রার্থিনী ষোল সহস্র আভিরী সুন্দরী! এ দৃশ্য সুন্দর কি ভয়ঙ্কর? এ দৃশ্য যে কি, তাহা ভক্তের অনুভবনীয়। ইহা অভক্তের একান্ত অবোধগম্য।

এখন আবির-কুঙ্কুম-চুয়া-চন্দনার্চ্চিত-অনুপম এবং অসংখ্য—

"————রাস মণ্ডল মাঝে।
যত গোপী তত কৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে সাজে॥"

বনমালী মোহন-খেলায়, বাসন্তী-লীলায় মাতিলেন।—

"ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর

*　　*　　*

সুন্দরী বৃন্দ করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ ঘন পরিরম্ভন
চুম্বল নবঘন নটবর রাজ।
কানু পরশ রসে অবশা রমণীগণ
অঙ্গে অঙ্গ মিলি কাঁপি রঁহু।—
পুরল সঁবহু মনোরথ, মনোভবমোহন,
গোবিন্দদেব ধবহুঁ।

*　　*　　*

দ্বাপরে যে বিশ্ব মোহনকরবংশী বাজিয়াছিল, তাহার মধুরধ্বনি এখনও ভক্ত হৃদয়ে বাজে। বৃন্দাবন মুরলী-নিঃসৃত সেই পঞ্চরসে নিত্য মাতে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হিন্দুস্থানের কোথায় না আবির—উৎসব হয়? শ্রীহরির দ্বাদশ যাত্রা হিন্দু-জীবনে জীবন্ত আছে;—চিরকালই জাগ্রত থাকিবে।

বসন্তাদি বিবিধ বর্ণের বসনে, আঙ্গিয়ায়, ওড়নায় এবং পেশোয়াজে সুসজ্জিতা সুন্দরী:—সুন্দর পরিচ্ছদ, আবির-প্রবাহে শতস্থলে অঙ্কিত। নয়নে কজ্জল—অঞ্চলে আবির,—ওষ্ঠাধরে তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত মিষ্ট হাসির অতুচ্চ হিল্লোল! আর সুকোমল করে প্রিয় পিচকারী; হেলিয়া-দুলিয়া" কামিনী গণ "হোলী" খেলিতেছেন। কোন রসবতী নবীনা—আবীর-ক্রীড়া পরায়ণা প্রবীনাকে পিচকারী সহ হয়ত সম্বোধন করিলেন:—

"বুড়িয়া ভইলি,　　দিন কাটালি
তবু না মিটল আশ!
যৌবন-নিদাঘ　　কেমনে কাটালি
হায় রে সরবনাশ!
জোয়ার সরল,　　দিন গয়িল
এখনও বাসনা মনে,
ধন লুঠায়ে　　দওলো ভইলি
সব রাখিয়া প্রাণে।"

প্রবীণা নবীনার নধর অঙ্গে ডবল পিচকারী প্রবাহিত করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর গাহিলেন :—

"বয়স হইলে বাসনা ফুরায়
কাঁহা পায়লি পাঠ ?
প্রবীণে বাসনা প্রবীণ ভয়লো
বুঝিবি দু'দিন যাক্!"

তা' আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র—সে সখীত্ব, কবিত্ব—ব্রজ-অভিসার—সে হোলী তাহার কি আর বর্ণনা করিব! কবির ভাষায় হোলী ক্রীড়া রতা কামিনীগণের অবস্থায়—

"কালীয়-কেশী-কংস-করি-কর্ষণ—
কেশর-কুঞ্চিত-কেশ।
কুলবনিতা-কুচ-কুঙ্কুমাঙ্কিত
কুসুমিত কুন্তল-বন্ধ।
কালিন্দী-কমল কলিত-কর-কিশলয়
কৌতুক-মদন-কন্দ॥"

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নন্দী।

মাসিক সংবাদ।

সীমান্তে গোলযোগ। জাকাখেল জাতি শান্ত হইতে না হইতে আবার ওয়াজির স্থানের মাসুদ জাতিরা অশান্ত ভাব অবলম্বন করিতেছে।

ঝড়। আমেরিকার অর্লিয়েন্স প্রদেশের লুইসিয়ানা মিসিসিপি এবং এলবানা নামক স্থানে প্রবল ঝড়ে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। অনেক বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে, জীবনহানিও অল্প হয় নাই।

রাজকোষে চুরি। দিল্লির খাজনাখানা হইতে ৩০ হাজার টাকা অপহৃত হয়। পুলিশ বহু কষ্টে ২৪ হাজার টাকা উদ্ধার করিয়াছে। বাকী ৬ হাজার ট্রেজারার এবং কালেক্টরকে দিতে হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।
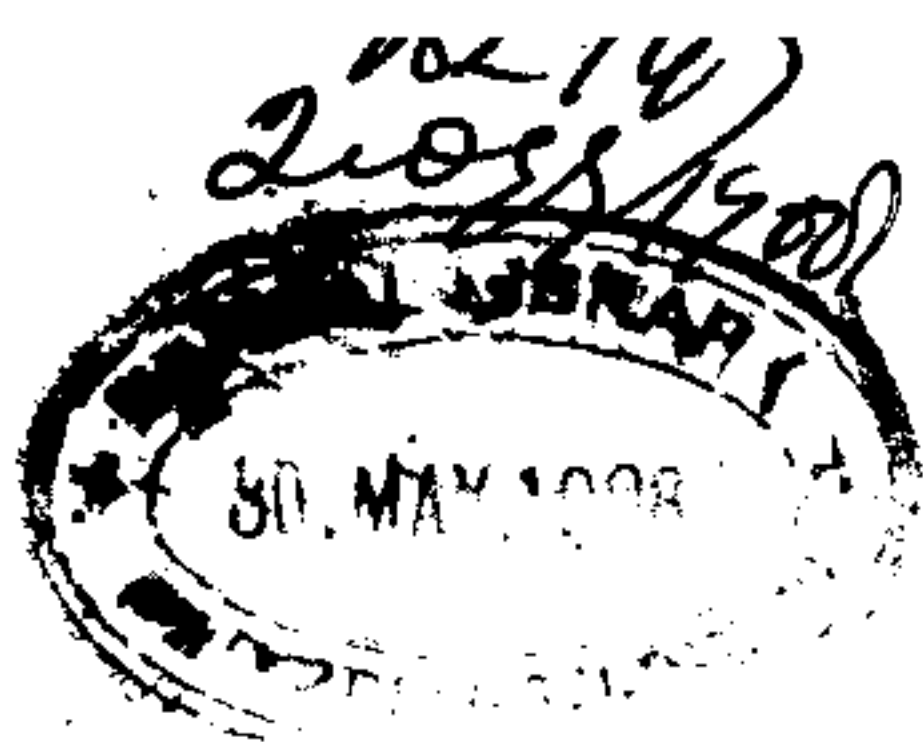
লোহার উনানে রং—বিলাত হইতে এদেশে লোহার উনান আমদানী হয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকার উনান বিক্রয় হয়। স্বদেশী আন্দোলনে এদেশে এখন ঐরূপ উনান প্রস্তুত হইতেছে, এবং স্বদেশহিতসাধকগণ প্রয়োজন হইলে দেশীয় প্রস্তুত উনানই ক্রয় করিতেছেন। কিন্তু স্বদেশজাত উনানে বিলাতী উনানের ন্যায় রং হইতেছে না, এবং কি উপায়ে তাহা হয়, জানিবার জন্য অনেকে ইচ্ছুক, নিম্নে লোহার উনানে রং করিবার উপায় লিখিত হইল।

বিলাতে লোহার উনানে রং করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বিত হয়,—সামান্য পরিমাণে সুর্মা (Black Lead) লইয়া তাহাতে তিনটা ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শুক্লাংশ মিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমাকার করিবে; তৎপরে তাহাতে বিয়ার মদ্য মিশ্রিত করিয়া তরল করিবে। জুতা বুরুশের তরলকালী যে প্রকার, ঐরূপ তরল করিবে—অধিক তরল হইলে ভাল হয় না। তৎপরে কুড়ি মিনিট কাল মৃদু অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া ক্রিয়া সমাপ্ত করিবে।

লোহার রেলের রং—সচরাচর যে সকল বারেণ্ডার রেল, ফটক ইত্যাদির ফটা-কাট রং (Brunswick Black) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিম্ন লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। যথা,—২ দুই পাউণ্ড পিচ (আলকাতারা) ২ দুই বোতল মসিনার তৈলে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতাপে দ্রব করত ১ এক গ্যালন টার্পিন তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্রিয়া সমাপ্ত করিবে। যদি গাঢ় হয়, তবে পুনরায় সামান্য পরিমাণে টার্পিন মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজনানুরূপ তরল করিয়া লইবে।

ব্যবসায় করিবার জন্য এই রং চীনামাটীর বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করিতে হয়। চীনামাটীর বোতল বঙ্গদেশে এখন প্রস্তুত হইতেছে। আজি কালি এই রং এদেশে বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু ইহা বিলাত হইতে আমদানী হয়,—এদেশে বরণকোম্পানী এই বার্ণিস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন।

হোলি-পর্ব।

কুজিছে কোকিল,
তরুর শিরে,
বহি'ছে মলয়,
সমীর ধীরে।
গুঞ্জিছে ভ্রমর,
কমল দলে,
শোভি'ছে কানন,
বনজ ফুলে।
নাচি'ছে ময়ূর
বিটপী শাখে,
ফুটে'ছে মাধবী
অযুত লাখে।
সাজি' নব সাজে,
পাদপ-চয়,
বিতরে সুরভি
কাননময়।
দোল পূর্ণিমার
এ শুভ দিনে,
কি আনন্দ আজি
নিকুঞ্জবনে।
খেলি'ছে মাধব
রাখালদলে,
বাজা'য়ে মুরলী
"শ্রীরাধা" বলে।
ল'য়ে "পিচকারী"
"আবির" জল,
চল্ সখিগণ
চল গো চল।
ব্রজেন্দ্র নন্দিনী
অধীরা হেথা,
উপনীত, শ্যাম
খেলি'ছে যেথা।
সখিগণ সব
তাহার সনে,
এসে'ছে সাজিয়া
নিকুঞ্জ বনে।
ল'য়ে "পিচকারী"
উভয় দলে
ভিজা'লে সিঁচিয়া
"আবির" জলে।
সব লালে লাল
মরি কি শোভা,
খেলিল যেন রে!
অরুণ আভা।
খেলা শেষ করি
রমণীচয়
হেরে অঙ্গবাস
আবির ময়।
কহিল কাতরে
শুনহে কালা,—
(আর) নহে তব সনে
আবির খেলা।
রমণী আমরা
নাহি কি লাজ?
কেমনে ভবনে,
যা'ব হে আজ?
গঞ্জিবে সকলে
তোমার কাজে,
ছি ছি বংশীধারী
মরিহে লাজে।

শ্রীবসন্তকুমার সেন গুপ্ত।

মানময়ী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মানময়ী নিরুদ্দেশ।

রমেশ প্রাণে প্রাণে জানিতেন যে অবিনাশ খুন করে নাই,—সম্ভব মত মেহের জান আদৌ খুন হয় নাই,—কিন্তু প্রমাণ নাই—প্রমাণ নাই—শত চেষ্টায়ও তিনি ইহার ভিতর যে কি গুঢ় রহস্য আছে,—তাহা ভেদ করিতে পারেন নাই।

কি রূপে এ ভয়াবহ সম্বাদ তিনি ভগিনীকে দিবেন, সে এ কথা শুনিলে আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিবে না,—তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সাহস করিয়া গৃহে ফিরিতে পারিলেন না। পথে পথে ঘুরিলেন।

কিন্তু এ রূপে পথে পথে ঘুরিলে দিন কাটিবে না। তাহাকে বাড়ীতেই ফিরিতেই হইবে—প্রায় রাত্রি দশটার সময় তিনি বাড়ীর দরজার নিকট আসিলেন, তাহার হৃদয় এত সবলে স্পন্দিত হইতেছিল যে তাহার বোধ হইল যেন তাহার হৃদয় অনতি বিলম্বে শত-ধা হইয়া যাইবে।

তিনি চোরের ন্যায় পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন,—তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন,—সম্মুখে তাহাই। মানময়ী তাহার অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়া আছে।

রমেশবাবুর সে সময়ের মনের অবস্থা আমরা বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইব না।

মানময়ী পাষান প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াছিল, দাদাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার মুখের দিকে চাহিল—তৎপর অতি ধীরে ধীরে বলিল। "আমি সব শুনিয়াছি,—এ খবর আসিতে দেরি হয় না,—দাদা,—আমার জন্য ভাবিও না?"

রমেশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মানময়ী বলিল, "দাদা,—আমি এখনও আশা ছাড়ি নাই—লোকে বলে না—বুকের রক্ত দিয়াও স্বামীকে রক্ষা করা স্ত্রীর কাজ; তুমি তাহাকে

বাঁচাইতে পারিলে না, তোমার দোষ কি—তুমি প্রাণপণ করিয়াছ—দেখি—দেখি——”

রমেশবাবু ভগিনীর কোন কথাই বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন এই গুরুতর আঘাত হৃদয়ে লাগায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে,—সে প্রলাপ বকিতেছে! তিনি এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—তথা হইতে পলাইলেন।

রমেশবাবু অবিনাশের সহিতও দেখা করিতে পারিলেন না। এ অবস্থায় তাহার সহিত দেখা করা তাহার ক্ষমতার অতীত,—তবে শুনিলেন অবিনাশ হাইকোর্টে আপিল করিতে বা লাট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে—রমেশবাবু কেন সকলেই ইহাতে বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, “ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে—নতুবা হাজার দোষী হইলেও আসামী হাইকোর্টে আপিল ও লাট সাহেব নিকট দরখাস্ত করিতে ছাড়ে না।

সুতরাং এক পক্ষ পরেই অবিনাশের ফাসি হইবে! নিরপরাধী হইয়াও অবিনাশ ফাশি কাষ্ঠে ঝুলিতে চলিল—এ রূপ ফাশি কেবল এই প্রথম অবিনাশের হইতেছে না,—অনেকের হইয়াছে।

যে দিন প্রাতে ছয়টার সময় আলিপুরের জেল মধ্যে অবিনাশের ফাসি হইবে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে সহসা মানময়ী নিরুদ্দেশ হইল। সে কখন কি রূপে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

রমেশ উন্মাদের ন্যায় তাহার সন্ধানে সমস্ত সহর ময় ছুটিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান হইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফাঁসি কাষ্ঠে।

অতি প্রাতে আলিপুরের জেলে অবিনাশের ফাঁসির আয়োজন হইয়াছে! এ ভয়াবহ দৃশ্যের আমরা বর্ণনা করিব না,—যিনি কখন এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে দেখিয়াছেন,—তিনি জীবনে তাহা আর কখনও ভুলিবেন না।

ঠিক ছয়টার সময় প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া অবিনাশ ফাঁসি কাষ্ঠের নিম্নে নীত হইলেন। তিনি অবিচলিত,—তাহার যে বাহ্য জ্ঞান আছে তাহা তাহাকে দেখিলে বোধ হয় না।

সাহেব ফাঁসির হুকুম তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন,—অবিনাশ শুনিল কি না সন্দেহ। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে।"

অবিনাশ কেবল মাত্র বলিল "না।" প্রহরিগণ তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে তুলিতে উদ্যত হইলে অবিনাশ বলিল, "ধরিবার প্রয়োজন নাই—নিজে যাইতেছি।" "সে ধীর পদক্ষেপে ফাঁসি কাষ্ঠে উঠিল। আর এক মুহূর্ত্ত—জহ্লাদ তাহার গলার ফাঁসির দড়ি লাগাইয়া দিল, তাহার মুখ কৃষ্ণ টুপিতে আবরিত হইল,—আর এক মুহূর্ত্ত—অবিনাশের এ জীবনের সাঙ্গ হইবার আর এক মুহূর্ত্ত—এই সময়ে সহসা এক বিকট চিৎকারে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইল। জহ্লাদ চমকিত হইয়া ফাঁশির দড়ি ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া জেলের দ্বারের দিকে চাহিলেন।

দেখিলেন এক আলুলায়িত-কেশা ধূলি ধূসরিতা স্ত্রীলোক উন্মাদিনীর ন্যায় সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, চিৎকার করিয়া বলিতেছে—"আসুন—আসুন—রক্ষা করুন ফাঁশি দিবেন না। আমি মেহেরজান—আমি খুন হই নাই।"

এই অদ্ভূত পুর্ব্ব কথায় সকলে স্তম্ভিত হইলেন। যেখানে সাহেবেরা দণ্ডায়মান ছিলেন, সে সেই খানে আসিয়া আবার ব্যাকুল ভাবে বলিল, "আমিই মেহেরজনান। আমি খুন হই নাই,—আমাকে খুন করার জন্যই ইহার ফাঁসি হইতেছে—আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমার বাবাকে ডাকুন।"

সাহেবেরা ইহাকে পাগল স্থির করিলেন, কিন্তু ফাঁসি বন্ধ রাখিতেও বাধ্য হইলেন। অবিনাশকে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় প্রহরিগণ ধরিয়া লইয়া আবার জেল মধ্যে রুদ্ধ করিল।

এ দিকে মেহেরজান সাহেব দিগের পা জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "এখনই আমার সঙ্গে চলুন—এখনই চলুন—ইহার স্ত্রী আমার জন্য প্রাণ দিতেছেন—চলুন—চলুন—এখনই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন।"

সাহেবেরা তাহাকে আফিসে লইয়া গেলেন। তাহাকে স্থির হইতে বলিয়া তাহারা নীরবে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সে একটু

স্থির হইলে সে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণনা করিল, তাহাতে সকলে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

দুই ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে কলিকাতা পুলিশের কমিসনার সাহেব, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব প্রায় একশত কনেষ্টবল, জমাদার ও ইনেস্পেক্টার লইয়া বেগবানঅশ্ব-যোজিত গাড়ীতে বারাসতের দিকে ছুটিলেন।

তাহারা রমেশবাবুকেও সম্বাদ দিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে চলিলেন, বলা বাহুল্য মেহেরজানও সঙ্গে চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত বিটেল।

অনেকে বোধ হয় দেখিয়াছেন যে আনরপুরে জমিদারের এক সুন্দর বাগানবাড়ী আছে। এক্ষণে আনরপুরের জমিদার বংশ লোপ পাওয়ায়—কলিকাতার অন্য জমিদার এই বাগান বাড়ী সহ তাঁহাদের জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—সে সময়ে আনরপুরের মহা প্রতাপান্বিত জমিদার প্রায় অধিকাংশ সময় এই বাগান বাড়ীতে বাস করিতেন।

আমরা এই প্রায় বৃদ্ধ জমিদারের প্রশংসার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কিন্তু তিনি বাহিরে একরূপ,—ভিতরে সম্পূর্ণ অন্য রূপ ছিলেন। পাপ বহুদিন ঢাকা থাকে না?

সাহেবেরা সদলে আসিয়া জমিদার বাড়ী ঘেরাও করিলেন। তখন ঠিক দুই প্রহর,—জমিদার বাড়ীর লোক জন প্রায় অধিকাংশই নিদ্রা যাইতেছিল। তাহারা নীরবে নিঃশব্দে একে একে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে উপরে চলিলেন। কোন গৃহে জমিদার আছেন,—তাহা একজন দেখাইয়া দিল।

গৃহ মধ্যে স্ত্রী কণ্ঠ উত্থিত রোষ কষাইত স্বর শুনিয়া তাহারা দ্বারের নিকট স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহ মধ্যে কে বলিতেছে,—"আর এক পা যদি আমার দিকে এস,—তাহা হইলে এই ছোরা নিজের বুকে বসাইব।—তুমি দুরাত্মা,—তোমাকে আত্মদান করিব বলিয়া তোমার হাত হইতে মেহেরজানকে ছাড়াইয়া দিয়াছি,—সে এতক্ষণ আমার স্বামীকে জেল হইতে খালাস করিয়াছে,—তিনি আসিয়া তোমার উপযুক্ত সাজা দিবেন। আর এক পা আমার দিকে আসিয়াছ কি ছোরা বুকে বসাইব।"

আর একজন কি বলিতেছিল,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভীম ব্রিটিস পদাঘাতে মহা শব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাহেবেরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন ছোরা হস্তে দেবী মূর্ত্তির ন্যায় মানময়ী প্রাচিরে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মানা। কামুক পাপকীট উক্ত বিটেল বৃদ্ধ জমিদার তাহার নিকট হইতে দূরে দাড়াইয়া কি বলিতেছে। সহসা গৃহ মধ্যে সাহেব ও পুলিশ দেখিয়া সভয়ে সে ফিরিল,—বংশ পত্রের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল,—সে পালাইতে চেষ্টা পাইল,—কিন্তু সাহেবেরা ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় তাহার উপর পতিত হইলেন,—মুহূর্ত্ত মধ্যে জমিদারের হাতে হাতকোড়ী পড়িল,—কনেষ্টবলগন পদাঘাত করিতে করিতে তাহাকে নিয়ে লইয়া চলিল।

মানময়ী পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় ঊর্দ্ধ নেত্রে দণ্ডায়মানা ছিল,—তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "ভগবান, অনাথের সহায়!"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "ধর—ধর—ইনি পড়িতেছেন।"

রমেশ লম্ফ দিয়া গিয়া ভগিনীকে ধরিলেন। মানময়ী মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য ভেদ।

মানময়ীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তাহাকে লইয়া রমেশ সাহেবদের সহিত ফিরিলেন। জমিদার ও তাহার সমস্ত লোক গেরেপতার হইয়া আলিপুরের জেলে চলিল।

মেহেরজান যাহা বলিয়াছিল তাহা এই :—

"জমিদার অনেক টাকা দিয়া সুন্দরী স্ত্রীলোক বাগানে লইয়া আসিত,—যাহারা টাকার লোভে আসিতে না চাহিত,—তাহাদের ভুলাইয়া বা জোর করিয়া আনিত। আমি মানময়ীকে দেখিতে গিয়াছিলাম,—সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেছিলাম,—হঠাৎ বাগানের ভিতর হইতে পাঁচ সাত জন লোক আসিয়া আমার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল,—আমি চেচাইতে পারিলাম না। তখন তাহারা আমাকে এক পাল্কিতে তুলিয়া জমিদারের বাগানে আনিল। আমি এই বদমাইসের কথা না শোনায় সে আমাকে এই কয়দিন একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।"

"কাল রাত্রে জমিদার আমার ঘরের দরজা খুলিল,—আমি দেখি তাহার সঙ্গে মানময়ী—আমি বলিয়া উঠিলাম "তুমি এখানে।"

"তখন মানময়ী বলিল, "মেহেরজান, "আমি জানি তুমি আমায় ভাল বাস। এই জমিদার অনেক দিন হইতে আমাকে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছে,—গোপলার মাকে দিয়া আমাকে রোজ অনেক টাকার লোভ দেখাইয়াছিল,—তাহাতে কিছু না হওয়ায় শেষ তোমাকে এখানে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তোমাকে আমার স্বামী খুন করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়াছে। তাহার ফাঁশির হুকুম হইয়াছে,—কাল সকালে তাহার ফাঁশি হইবে। তাহাকে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই দেখিয়া আমি ইহার নিকট আসিয়াছি। আমি জানিতাম,—তুমি খুন হও নাই,—তবে লোক লজ্জার ভয়ে এই রাক্ষসের কথা আমার দাদাকেও বলি নাই,—আমি জানি আমার স্বামী পাছে আমার নামে কলঙ্ক হয় বলিয়া এই নরাধমের কথা কাহাকেও বলেন নাই। আমায় কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ফাঁশি যাইতেছেন। এমন দেবতা স্বামীর রক্ষার কাছে আমার কলঙ্ক প্রাণ কি! তাহাই আসিয়াছি,—এ তোমায় ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিয়াছে—যাও শীঘ্র যাও,—কাল সকালে আলিপুরের জেলে তাহার ফাঁসি হইবে,—তুমি আমায় ভাল বাস জানি,—যাও,—আমার স্বামীকে রক্ষা কর।"

"আমার চোক জলে পুরিয়া গিয়াছিল,—আমি কথা কহিতে পারিলাম না। ছাড়া পাইয়া পাগলের মত কলিকাতার দিকে ছুটিলাম। আল্লার

বাবুকে রক্ষা করিতে পারিতাম না—চলুন—চলুন—এখনই চলুন,—এখনও গেলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। আমি আসিবার সময় তিনি আমার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিয়াছিলেন, "ভয় নাই মেহেরজান—আমার সঙ্গে ছোরা আছে—আমি মরিতে জানি।"

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল,—তাহা আমরা বলিয়াছি।

দুর্ব্বৃত্ত ভক্তবিটেল জমিদার সদলে আলিপুরের জেলে রুদ্ধ হইল,—সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য অবিনাশ খালাস পাইল।

দ্বারে রমেশ,—অবিনাশ তাহার গলা দুই হস্তে জড়াইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী—"

রমেশেরও কণ্ঠ রোধ হইল,—তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "সে ভাল আছে—এস—ঐ গাড়ীতে আছে।"

আমরা স্বামী স্ত্রীর মিলন দৃশ্য বর্ণনা করিব না,—সে বর্ণনার নহে।

উপসংহার।

বলা বাহুল্য আবার বিচার হইল। সেই বিচারে প্রমাণ হইল যে এই ভক্তবিটেল জমিদার বৃদ্ধ হইলেও তাহার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রের লোক ত্রিসংসারে আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ।

মানময়ীকে না পাইয়া সে শেষ ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করিয়া অবিনাশকে ফাঁশি কাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। অর্থে কি না হয়! গোপলার মা তাহার দূতি ছিল,—তাহার নিকটই শুনিয়াছিল যে অবিনাশ সেই রাত্রে ঔষধ আনিবার জন্য আনরপুরের মাঠ দিয়া যাইবে,—তাহারই লোকে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল,—তাহারই লোক গৃহ মধ্যে পাঁঠা কাটিয়া ঘর রক্তে রক্তময় করিয়াছিল,—তাহারই লোকে মেহেরজানের কাপড় সেই গৃহ মধ্যে রাখিয়াছিল,—তাহারই লোকে মেহেরজানের চুড়ী তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল। গোপলার মাই অবিনাশের ছোরা চুরি করিয়া আনিয়া দিয়াছিল। তাহার উপর পয়সা দিয়া দারোগাকে হাত করিয়া নানা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ফাঁশি কাষ্ঠে পাঠাইয়াছিল। মানময়ী আত্ম বলিদানে প্রস্তুত না হইলে,—অবিনাশের রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবে অনাথের চির সহায় ভগবান!

* * *

বিচার হইল,—বিচারে এই সকল সমস্তই প্রমাণ হইল,—তখন এই দুর্ব্বৃত্ত জমিদার জাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল।

অবিনাশের বিরুদ্ধে যেসকল লোক মিথ্যা সাক্ষ দিয়াছিল,—তাহাদের প্রত্যেকের তিন বৎসর জেল হইল। গোপলার মা দশ বৎসরের মত গেল।

দারোগা বাবুও রক্ষা পাইলেন না,—তিনি সহায়তা না করিলে অবিনাশের নামে মিথ্যা মকর্দ্দমা এত পাকা হইয়া তাহার ফাঁশির হুকুম হইত না,—তিনি সাত বৎসর কারাবাসে চলিলেন।

* * *

মানময়ীর নামে চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার জন্য চাঁদার খাতা খুলিলেন। দেখিতে দেখিতে দশ হাজার টাকা উঠিল। সাহেবেরা স্বয়ং আসিয়া এই টাকা মানময়ীকে দিয়া গেলেন।

মানময়ী হাজার টাকা দিয়া মেহেরজানকে এক হার গড়াইয়া দিল।

দুঃখের পর সুখ যে কি তাহা অবিনাশ ও মানময়ীই জানেন। তাহাদের অবস্থায় যে না পড়িয়াছে,—সে কিছুতেই বুঝিবে না।

সম্পূর্ণ।

কেন আর বাজিবে বাঁশরী।

১

কেন আর বাজিবে বাঁশরী!
কে আর বাজা'বে বাঁশী,
কোথা হায় কালশশী,
চলে গেছে গোপী মন হরি,
কেন আর বাজিবে বাঁশরী?

২

কেন আর বাজিবে বাঁশরী!
ভুলা'তে নারীর প্রাণ,
করিয়া বাঁশীতে গান,
গেছে এবে সবে পরিহরি
কেন আর বাজিবে বাঁশরী?

৩

কেন আর বাজিবে বাঁশরী!
গেছে শ্যাম মধুপুরে,
বিরহ সঁপিয়া মোরে,
কাঁদি এবে দিবা বিভাবরী,
কেন আর বাজিবে বাঁশরী

৪

কেন আর বাজিবে বাঁশরী?
বাজা'লে বাঁশরী কালা,
পুনঃ বৃষ ভানু-বালা,
দগ্ধ-হৃদে লভে শান্তি বারি,
কেন আর বাজিবে বাঁশরী!

৫

পারে পুনঃ বাজা'তে বাঁশরী
রাই যদি মরে প্রাণে,
শুনিবে যখন কাণে,
নিঠুর সে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
তবে,—পারে পুনঃ বাজাতে বাঁশরী!

সমগ্র ও অংশ। *

(১)

চাহ কি চাহ কি বঁধু, তোমার বাহুর ডোরে
বাহু মোর আলিঙ্গনে নিতে লতাইয়া ?
উপল খণ্ডের মত, প্রবল স্রোতের তলে,
এ যে খিন্ন অবসন্ন রয়েছে মরিয়া।
ছাড় বঁধু ছাড় এই ক্ষীণ ম্লান বাহুডোর,
নহে যোগ্য তব সনে রহিতে মিশিয়া

(২)

চাহ কি চাহ কি বঁধু, আমার কপোলখানি
তোমার কপোলময় রাখিতে গাথিয়া?
কপোল আমার ?—সেত অজস্র অশ্রুর ধারে
পাণ্ডুরিত, অবশীর্ণ, পড়েছে ভাঙ্গিয়া।
তবে এ দুয়ের মাঝে রাখ কিছু ব্যবধান ;
পাছে বঁধু, ও তোমার যায় মলিনিয়া ?

(৩)

নিবে কি নিবে কি বঁধু, এ মোর হৃদয়খানি
তোমার হৃদয়ময় রাখিবে মাখিয়া ?
কপোল উঠিছে রাঙি, শিহরি উঠিছে বাহু ;
"সমগ্র" জাগিলে "অংশ" না থাকিলে মরিয়া।
হাত আর মুখ, বঁধু, দূরে কি রহিতে পারে
হৃদয় যখন যায় হৃদয় মিশিয়া ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

---

* (মহিলা কবি ব্রাউনিঙের Inclusions কবিতাটীর অনুবাদ) ।

বঙ্গ-বীর আশানন্দ ঢেঁকি।

কালের বিচিত্র গতিতে কত ঘটনা ঘটিতেছে এবং জল বিম্ববৎ কাল স্রোতে মিলিয়া যাইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমরা যাহার কথা লিখিতেছি তিনি একজন সদাশয়, দয়ালু নির্ভীক, অতি বলশালী, পরোপকারী এবং দস্যুদমনকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইহার নাম আশানন্দ ভট্টাচার্য্য। কিন্তু ইনি জন সমাজে আশানন্দ ঢেঁকি নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি স্বীয় লাঠি ক্রীড়া দ্বারা জনসমাজে নিজেকে অদ্বিতীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। আশানন্দের বাসস্থান নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুরের রামনগর ছিল। তাঁহার পিতা প্রতাপ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনি শান্তিপুরে পুরোহিতের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। প্রতাপ শর্ম্মা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। কোন প্রকার কায় ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারে আশানন্দ ও সদানন্দ নামে দুই পুত্র এবং তাহারা কর্ত্তা গৃহিণী সমেত মোট চারিটী প্রাণী বর্ত্তমান ছিলেন। আর কেহ ছিল না ছিল তাঁহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা স্বত্বেও পুত্র আশানন্দকে তৎকালীন গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিতে দিয়া ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই আশানন্দ পাঠে অমনোযোগী ছিলেন। তিনি লাঠিখেলা তরবারি ঘুড়ান মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি শারীরিক বলচর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি প্রত্যহই পাঠ রাখিয়া লাঠি লইয়া লাঠিয়ালদের নিকট লাঠি খেলা শিক্ষা করিতে যাইতেন, তজ্জন্য পিতা কর্ত্তৃক বড়ই তিরস্কৃত হইতেন। কিন্তু স্নেহময়ী জননী বড়ই স্নেহ প্রবণা ছিলেন। তিনি বলিতেন, আশানন্দ বিদ্যা শিক্ষা না করিতে পারে, বড়লোকদের লাঠিয়ালী করিয়া খাইবে।

এই সময়ের কিছু পরেই প্রতাপ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হয়। সংসারের সমস্ত ভার আশানন্দের মস্তকে পড়িল—ঈশ্বর যাহা করেন ভালর জন্যই করেন—পিতৃ বিয়োগ ঘটায় সাংসারিক কষ্ট হইল বটে, কিন্তু লাঠি শিক্ষার বড়ই সুবিধা হইল।

তিনি বাল্যকাল হইতেই মাতার অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া—ক্রমে ক্রমে যুবক আশানন্দের অদ্ভুত ক্রীড়া জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি একজন বড় খেলোয়ার,—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইল।

তৎকালে যে কেহ লাঠি খেলা শিক্ষা করিত—সকলেই ডাকাতের দলে প্রবেশ করিত এবং লুণ্ঠনই তাহাদের কার্য্য ছিল।

আশানন্দ-জননী পুত্রের অদ্ভুত লাঠি শিক্ষা দেখিয়া মনে বড়ই ভয় পাইলেন। তিনি আশানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—আশানন্দ! আমি তোর মা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞাকর, যে, আমি কখনও ডাকাতী করিব না, বরং ডাকাতী নিবারণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

স্নেহময়ী জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আশানন্দ সহাস্য বদনে বলিলেন, মা! আমি কোন কার্য্য আপনার অমতে করি?—আমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার কি ডাকাতী সম্ভবে?—তথাচ আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম। আমার শিক্ষা অসৎ লোকের কাছে তাই বলিয়া কি ডাকাতী করিতে হইবে? এমন কোন কথা নাই।

জননী বলিলেন, বাবা! লোকের গুণ লইতে কোন বাধা নাই, কিন্তু সংসর্গ দোষে তাহার অসৎ কার্য্য স্পর্শ না করে। আশানন্দ-জননী পুত্রকে সদা সর্ব্বদা পরোপকার করিতে উপদেশ দিতেন। আশানন্দ ও মাতার কথা মত কার্য্য করিতেন।

সকালে তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং বৈকালে তিনি শারীরিক বলচর্চ্চা করিতেন। যখন তাঁহার অদ্ভুত লাঠি খেলা বঙ্গদেশময় প্রচারিত হইল, তখন দলে দলে লোক তাঁহার নিকট লাঠি খেলা শিক্ষা করিতে আসিতে লাগিল। তিনি সকলকেই শিক্ষাদিতে লাগিলেন এবং সকলকে তাঁহার উপবীত স্পর্শ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, কেহ কখন ও ডাকাতী অথবা পরস্ব হরণ করিবে না। শিষ্যগণ তাহাই স্বীকার করিল।

তৎকালে চুরি ডাকাতীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি একদিন বাটীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ-রমণী ভিক্ষা করিতে আসিল। আশানন্দ-জননী স্বীয় দরিদ্রতা-কষ্ট স্বত্বেও ভিক্ষুককে ভিক্ষাদিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গরীয়সী জননীর এই একটা মহদ্‌গুণ ছিল।

তিনি শুইয়া আছেন, এমন সময় ভিখারিণী তাহার কাতর আকাঙ্ক্ষা জানাইল। রৌদ্রে তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে,—তাহার উপর যেন একটা বিষাদ কালিমা মাখা। মাতৃ আজ্ঞায় আশানন্দ ভিক্ষা দিতে আসিয়া দেখিলেন,—ভিখারিণী কাঁদিতেছে। তিনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে. ভিখারিণী

বলিল, বাবা! আমি তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলাম। নবদ্বীপ দর্শন করিয়া শান্তিপুর দর্শন করিব মনে করিয়া আসিতে ছিলাম, পথে ডাকাতে আমার সমস্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে এবং কোথা হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ও ডাকাতগনের রং কি প্রকার? রমণী সমস্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। এমতকালে আশানন্দ-জননী তথায় আসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়া, পুত্রকে উহার প্রতি বিধান করিতে আদেশ দিলেন। আশানন্দ বলিলেন, মা। এখনই ইহার প্রতি বিধান করিতে যাইতেছি, আপনি ইহাকে শান্তনা করুন ও যাইতেদেন। আমি যদি আজই সন্ধান করিতে পারি, তবে রাত্রির মধ্যে ফিরিয়া আসিব, নতুবা কাল সকালে আসিব। এই বলিয়া আশানন্দ কোমর বাঁধিয়া দীর্ঘ লাঠি হস্তে বাহির হইলেন, এমন না হইলে বুঝি কর্ম্মবীর হওয়া যায় না? তিনি বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

প্রাতঃকালে দুইজন লোকের মস্তকে দুইটি কাপড়ের গাঁটরি দিয়া বাটী আসিয়া ব্রাহ্মণীকে তাঁহার জিনিষ পত্র কিনা সনাক্ত করিতে বলিলেন।

রমণী ব্যপার দেখিয়া অবাক। তিনি বলীলেন বাবা! এই আমার জিনিষ। আশানন্দ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং ডাকাত দ্বয়কে কি শাস্তি দিবেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রমণী বলিলেন, বাবা! যখন আমার জিনিষ পাইয়াছি তখন আর ওদের শাস্তি দেওয়ার দরকার কি? ওদের ছেড়ে দাও।

তিনি তাহাদের সদুপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। দুর্দ্দশাগ্রস্তা ব্রাহ্মণী আশানন্দকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, যে, আমার নাম করিয়া আপনি চলিয়া যাইবেন—যমে ও স্পর্শ করিবে না। এই প্রকার ঘটনা তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছিল।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাঁকীপুর শোমড়া সুখড়ে নাটাগড় দীগড়ে কামার ডিঙ্গি প্রভৃতি স্থানের ধনী এবং বিখ্যাত দস্যুগণকে শাসন করেন। উক্তস্থানের দস্যুগণ ডাকাতী ব্যবসাদ্বারায় অর্থ শালী ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নদীয়া জেলার অনেক স্থলে ডাকাত সম্প্রদায়কে শাসন করেন। তিনি একদিন হাঁটা রাস্তায় বাঁকীপুর হইতে শান্তিপুর আসিতে ছিলেন। সঙ্গে অনেক টাকা কড়িও ছিল। কিন্তু তিনি তৃষ্ণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। 'সন্মুখে 'কামারডিঙ্গির' বিখ্যাত খাল। তথায়

তৃষ্ণা নিবারণার্থে নামিলেন। তৎকালে এই ভীষণ খালে দিনে ডাকাতী হইত। কত লোকে কত সময়ে ধন-প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, এখানে জলাঞ্জলি দিয়াছে তাহার আর ঠিক নাই। এই ভীষণ খালের নাম শুনিলে লোকে শিহরিয়া উঠিত। এহেন খালে তিনি নামিয়া মুখ ধুইতেছেন কিন্তু তীরে টাকা বোঁচকাটি রাখিয়াছেন তৎ পার্শ্বে লাঠিগাছটি শোভা পাইতেছে।

সহসা সঙ্কেতধ্বনি হইল। অমনি ২৫। ২৬ জন লাঠি হস্তে দণ্ডয়মান হইল। নির্ভীক আশানন্দ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি জল পান করিতে লাগিলেন। একজন ডাকাত আশানন্দের লাঠিগাছটি লইয়া—অন্য একজনকে আদেশ করিল,—মাল উঠাও। সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ টাকার গাঁটরি লইল।

আশানন্দ বলিলেন, কেরে তোরা। আমার টাকা নিচ্ছিস্ কেন? এক-জন দস্যু উত্তর করিল,—আমরা তোর বাবা, তাই টাকা নিচ্ছি। আশানন্দ বলিলেন, আমার টাকা রাখ—নতুবা ভাল হবে না।

দস্যু বলিল চুপকর শালা! নইলে, এই লাঠি দিয়া মাথা ভেঙ্গে দেবো। তিনি তীরে উঠিয়াই 'মারডাক' দিয়া একজনের লাঠি কাড়িয়া লইলেন এবং লাঠি ঘুড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলকেই ধরাশায়ী করিলেন। তাঁহার দারুণ লাঠির আঘাতে সকলেরই উত্থান শক্তি রহিত। সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইল। তিনি বলিলেন, তোদের সর্দ্দার কে? এবং কোথায় আছে? তাহারা বলিল, ঠাকুর ঐ বনে সর্দ্দার আছেন। তিনি বলিলেন, আমি তোদের ক্ষমা করিতেছি, কিন্তু আমার পৈতা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও ডাকাতী করিব না। তাহারা তাহাই স্বীকার হইল। তাঁহার একটি গুণ ছিল যে, শত্রু অনুনয় বিনয় করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করিতেন—ইহা বীর হৃদয়ের মহদ্‌গুণ।

সে যাহা হউক তিনি বনের নিকটস্থ হইয়া—সর্দ্দার সাহেব—সর্দ্দার সাহেব বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সর্দ্দার মধুঘোষ আসিয়া দেখা দিল তিনি বলিলেন কিরে মোদো! তুই বুঝি এখানে ডাকাতী করিস। এই মধু তাঁহার শিষ্য ছিল। মধু, গুরু আশানন্দকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইল। অবশেষে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। এবং বলিতে লাগিল, গুরুঠাকুর! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আশানন্দ বলিলেন, তুই গুরুবাক্য পালন করিস নাই, সেই জন্য আজ তোকে কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অবশেষে তাহার কান্না কাটিতে তাহাকে সে যাত্রা ক্ষমা করিলেন এবং সদুপদেশ দিয়া বাটী ফিরিলেন।

কোন সময়ে আশানন্দ-জননী, তাঁহার অদ্ভুত লাঠি দেখিতে চাহিলে তিনি ক্রমাগত দুই ঘন্টাকাল বন্‌বন্‌ শব্দে লাঠি ঘুড়াইতে লাগিলেন, জননী বলিলেন, আশানন্দ! আর ঘুড়াইয়া কাজ নাই—তুমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছ।

তিনি বলিলেন, মা। এখনও ইহার দ্বিগুণ সময় আমি লাঠি ঘুড়াইতে পারি। মাতা বলিলেন, না, আর পার না। তিনি বলিলেন, মা! তবে দেখুন। জননী বাধা দিয়া বলিলেন, অহো! তুমি যদি এক লাঠিতে আমার এই নারিকেল গাছটির অর্দ্ধাংশ পরিমাণ ক্ষত করিতে পার, তাহা হইলে বুঝি।—এখন তোমার গায় দ্বিগুণ শক্তি আছে।

'যে আজ্ঞা—বলিয়া আশানন্দ গাছে তাহার বজ্র সদৃশ যষ্ঠি প্রহার করিলেন। গাছটি আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মাতা বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, আশানন্দ! আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও লাঠি হস্তে করিব না।

তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা বলিলেন, তোমার লাঠিতে যখন গাছ ভাঙ্গিল, তখন কোন সময় ক্রোধে মানুষ মারিয়া ফেলিবে।

সে যাহা হউক, মাতৃভক্ত পুত্র তাঁহার সাধের লাঠি চিরতরে বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি ইহজন্মে কখনও আর লাঠি স্পর্শ করেন নাই।

আর একটি ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি—ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন—তিনি কি প্রকার বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। শান্তিপুরের পশ্চিম উত্তরে বাঘ আঁচড়া গ্রাম। তথায় তিনি কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি একটি অশ্বত্থ গাছের নিকট শৌচে যান। নিকটস্থ অশ্বত্থ গাছটি এক রমণী প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে রাখিয়াছিলেন। তিনি আশানন্দকে জল খরচ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে গালাগালি দেন; তিনি, রমণীর রোষের কারণ জানিতে চান।

রমণী বলিলেন, তুই, আমার গাছ তলা অপবিত্র করিলি কেন, আজ যে আমার গাছ প্রতিষ্ঠা। আশানন্দ মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার গাছতলা অপবিত্র হয় নাই—ইত্যাদি।

রমণী তত্রাচ গালি দিতে লাগিলেন। বিশেষ তাঁহার মাতার নাম করিয়া গালি দেওয়ায় আরও রাগান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন, বিনা অপরাধে গালি দিও না, তাহাতে আমি ব্রাহ্মণ। তবু রমণী গালি দিতে লাগিল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, এই তোর গাছ প্রতিষ্ঠা করাই। এই কথা

বলিয়াই বাঁশের মত মোটা অশ্বত্থ গাছটি উপড়াইতে চেষ্টা করিলেন। টানা-টানিতে গাছটি উপড়াইয়া গেল। তিনি গাছ লইয়া বাটী আসিলেন। এই গাছটি (এখনও শান্তিপুরে ডাবরিয়া পাড়ায় কামাখ্যা মুদীর বাটীতে বিদ্য-মান আছে) তাঁহার অতীত কালের সাক্ষী দিতেছে।

আশানন্দ ৫ হাত দৈর্ঘ্য ছিলেন। আজানুলম্বিত বাহু। তাঁহার হাতের কব্জা বাঁশের মত মোটা ছিল। বক্ষঃ পৌনে দুই হাত অথবা আরও কিছু বেশী ছিল। তাঁহার লাঠির ভয়ে চোর ডাকাতের হৃদ্‌কম্প হইত।

এখন আমাদের দেশের লোকে স্যাণ্ডোকে মহাবলশালী বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশেই শত শত স্যাণ্ডো বিরাজিত ছিল। একবার তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন ?

তাঁহার অলৌকিক গুণের কথা শুনিয়া নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে আহ্বান করেন। আশানন্দ নামাবলী গায় দিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মহারাজ শুনিয়াছিলেন যে, আশানন্দ অতিশয় আহারী, তজ্জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। অপরিমিত আহার তিনি করিতে পারিবেন কি না, তাহাই মহারাজ স্বচক্ষে দেখিবেন। বেলা হওয়ায় তাঁহার জন্য পাকের যোগাড় হইল। ভাত তরকারি প্রভৃতিতে, একমন পাক হইল। তিনি আহারে বসিলেন, ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত উদরসাৎ করিয়া তিনি বলিলেন, মহারাজ! আরও পাঁচসের সন্দেশ খাইতে পারি। রাজ-আজ্ঞায় পাঁচসের সন্দেশ আসিল। তাহাও পেটে পুরিলেন। মহারাজ প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। পাঠক! হয়ত অলীক কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। অম্ল রোগগ্রস্ত পাঠক! বর্ত্তমান কালের মুনকে রঘুকে স্মরণ করুণ। তাঁহাকে সকলেই দেখিয়াছেন। কি প্রকারে একমন জিনিষ খাইতে হয়। তাঁহারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন।

সে যাহা হউক, তারপর তাঁহার সংসার চলাচলের কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, মহারাজ কোন প্রকারে অর্দ্ধ ভোজনে দিন কাটাই। রাজা তাঁহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিলেন।

রাজাকে লাঠিখেলা, লাঠি ঘুরান দেখাইলেন। ক্রমাগত তিনঘন্টাকাল 'বন্ বন্" শব্দে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। ৩০০।৩৫০ লোকে ইট পাটকেল লাঠি ছুড়িয়া তাঁহাকে মারিতে লাগিল, আশ্চর্য্যের বিষয় সমস্ত জিনিষই তাঁহার লাঠিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে পড়িল। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে

পারিল না। রাজা বড়ই প্রীত হইলেন। তৎপর উক্ত ৩০০।৩৫০ জন লাঠিয়ালের সঙ্গে রাজা আশানন্দকে লাঠি খেলিতে আদেশ করিলেন। কতকগুলি পশ্চিমে এবং গোয়ালা লাঠিয়াল তাঁহার সঙ্গে লাঠি খেলিতে আরম্ভ করিল। তিনি 'হুহুঙ্কার' দিয়া লাঠি ঘুরাইয়া দলের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িলেন এবং মুহূর্তকালের মধ্যে সকলকে বিমুখ করিয়া দিলেন। রাজবাড়ীতে 'ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল।

তরবারি ক্রীড়া, বৃহৎগাছ হইতে লম্ফ প্রদান প্রভৃতি সমস্ত খেলাই দেখাইলেন। রাজা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে থাকিতে আদেশ দিলেন এবং মাহিনা দিবেন তাহাও বলিলেন। আশানন্দ চাকুরি করিতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে রাজা তাঁহাকে কয়েক বিঘা নিষ্কর ভূমি ও ৺ রাধাবল্লভ জীউর সেবাইত নিযুক্ত করিয়া বিদায় দিলেন। এই বিগ্রহ এখনও শান্তিপুর ডাবরিয়া পাড়ায় বিরাজ করিতেছেন; ইহার কিছু দক্ষিণে তাঁহার বসতবাটী এই বাটীতে এখন শ্রীদুর্গাদাস প্রামাণিক বাস করিতেছেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই মাতৃ আজ্ঞায় লাঠি পরিত্যাগ করেন।

মধ্যে মধ্যে আশানন্দের ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটিত কিন্তু মাতার মীমাংসায় সমস্ত ঠিক হইয়া যাইত। একদিন ভ্রাতা সদানন্দের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তিনি বড়ই ক্রোধান্ধ হইলেন। সত্যপালনার্থে লাঠি ধরিতে না পারায়, সম্মুখস্থ ঢেঁকি লইয়া প্রহার করিতে গেলেন। সদানন্দ বেগতিক দেখিয়া মায়ের কাছে লুকাইলেন। আশানন্দের মারা হইল না। জননী বলিলেন, আমি তোমাদের বিচার করিব। বাবা! বাবা! এখন ঢেঁকি রাখ। তিনি ঢেঁকি ফেলিয়া দিলেন। এই ঝগড়ার সময় পাড়া প্রতিবাসীরা আসিয়া ছিলেন। কথায় কথায় 'আশানন্দ ঢেঁকি র' ঝগড়া দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কথা হইতেই 'ঢেঁকি' উপাধি গ্রামান্তরে প্রচারিত হইল। সকলেই 'আশানন্দ ঢেঁকি' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শুনা যায় ইহাতে তিনি বড়ই হাসিতেন, কিন্তু রাগিতেন না। ঢেকি দিয়া সদানন্দকে মারার কথা উঠিলে তিনি বড়ই লজ্জিত হইতেন। সে যাহা হউক, উক্ত কলহে মাতার বিচারে আশানন্দ জয়লাভ করেন বটে। কিন্তু মাতৃ আদেশে "আর কখনও কাহাকে প্রহার করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। তিনি আজীবন আর কাহাকেও প্রহার করেন নাই। তিনি বড়ই পরোপকারী ছিলেন, পরের বিপদকে আপন

তিনি লাঠির সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে পারিতেন। দৈনিক ২৫।৩০ ক্রোশ হাঁটিতে তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। অনেকে অনুমান করেন—কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন না, তাহারও পূর্ব্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থ গাছটি দেখিলে সে ভ্রম দূর হয়। ঐ বৃক্ষটি ১৫০ বৎসরের অধিক হয় নাই। আশানন্দের শৌর্য্য বীর্য্যের কথা হয়ত অনেকে প্রত্যয় করিবেন না। তাঁহাদিগকে বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺যোগেন্দ্র বাবু মহাশয়ের 'শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী' গ্রন্থে রঘুদয়ালের বিষয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহাতেই বুঝিবেন তৎকালে এদেশে কি প্রকার বীরপুরুষ জন্মাইত।

আর এখন সে বঙ্গদেশ নাই, সে আশানন্দ নাই—রঘুদয়াল নাই বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ নাই,—আছে অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণ ও নির্জ্জীব বাবুর দল। আশানন্দ চলিয়া গিয়াছেন, আছে জনশ্রুতি ও ক্ষীণ স্মৃতি। তাহাও সীমাবদ্ধ। এই হতভাগ্য দেশে না জন্মিলে তাঁহার গৌরবমণ্ডিত স্মৃতি থাকিত। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অকাতরে দান করিতেন, অন্যের বিপদে অংশভাগী হইতেন। কিন্তু এমন ব্যক্তিকে অনেকেই চেনেন না জানেন না। হায় বঙ্গদেশ!

শ্রীপ্রমথ নাথ সরকার।

নারী-শিক্ষা।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম; নারী সে ধর্ম্ম সাধনের সহায়তা কারিণী। জ্ঞান না জন্মিলে ধর্ম্ম সাধন করা যায় না, শিক্ষা জ্ঞান লাভের সোপান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুসমাজের অধিকাংশ নারীই অশিক্ষিতা, বর্ণজ্ঞান বর্জ্জিতা।

শিক্ষার অভাবে নারীসমাজের যে কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন। একশত গণিতে পারে না এমন নারী ঘরে ঘরে রহিয়াছে। এ শিক্ষার অভাব কেবল নারীর দোষে ঘটে নাই। পুরুষই সম্পূর্ণ দায়ী। দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতেই হিন্দু-বালিকা বিবাহিতা হয়, চতুর্দ্দশে কি পঞ্চদশে সন্তানের জননী হয়, তাহার পরে গৃহিণী

সাজিয়া বসে। বিবাহের পূর্ব্বে স্বগ্রামে যদি বালিকা পাঠশালা থাকে, তবে হিন্দু-বালিকা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখে, তৎপরে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। বঙ্গবধূর জীবনে শিক্ষালাভের সুযোগ অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। জননী হইলে তো সন্তান ও গৃহকর্ম্ম লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়ে; শিক্ষালাভ করিবে কখন? বর পণরূপ মহা অনিষ্টকর ঘৃণিত প্রথার জন্যও কোন কোন বঙ্গ বালিকা ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্তও কুমারী থাকে; কেননা সকল কন্যার জনয়িতা তো ধনশালী নহেন, যে হাজার দু'হাজার মুদ্রা পণ সহ কন্যা দানে গৌরী দানের ফল লাভ করিবেন। টাকা সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া বড় মেয়ে ঘরে রাখিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাকে লেখা পড়া শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান না; অত বড় মেয়ে 'ঘরের বাহির' করিলে পাড়ার লোকে 'কাণাকাণি' করিবে যে! বালিকাদের শিক্ষোপযোগি পাঠশালা নাই, এমন গ্রাম বাঙ্গলায় অনেক আছে। যে বালিকাগণবিবাহের পূর্ব্বে যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করে, তাহারাও সুশিক্ষিতা হয় না, কারণ শিক্ষার দোষে তাহারা উন্নত না হইয়া অবনত হইয়া পড়ে। গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া অবকাশ পাইলেই নাটক, নভেল, পাঠ করে এবং তাহার কতকগুলি বাঁধা বুলি কণ্ঠস্থ করিয়া বসে। নাটক নভেল পাঠের উপকারীতা আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু অল্প শিক্ষিতা বঙ্গনারী পুস্তকের সৎআদর্শ গ্রহণে সমর্থা নহে, সৎ আদর্শ গ্রহণ করিতে জ্ঞান বুদ্ধির আবশ্যক। আমাদের কোন প্রতিবাসিনী "কুরুক্ষেত্র" পাঠ করিয়া আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভাই, সুভদ্রা কে?" আমি বলিলাম কেন, তুই জানিস্ না? সে বলিল "না" তাহার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, আমি জানি সে বহু নাটক নভেল পাঠ করিয়াছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় কাশীরাম দাসের মহাভারত খানাও পাঠ করে নাই! নোয়াখালীর অন্তর্গত কোন একটী গ্রামে একটীমাত্র বালিকা লেখাপড়া জানে সে বিবাহিতা, তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে অনেক গল্পের পুস্তক পাঠ করিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত পড়ে নাই। যে অতুল্য অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং যাহার উপদেশ গ্রহণ করিরা নারী দেবী হইতে পারে, সেই রামায়ণ মহাভারত বঙ্গরমণীগণ পাঠ করে না। কিন্তু "নভেল নাটক পড়ার চটক" ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে; ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল বঙ্গনারীর নিকট কতদূর সমাজোন্নতির আশা করা যায়?

জননী যদি সুশিক্ষিতা হয়েন, তবে সন্তানগণ অবশ্যই সুশিক্ষিত হয়। কিন্তু কয়জন বঙ্গমাতা সুশিক্ষিতা? আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেক নারী অন্যায় কার্য্য করিয়া অভিভাবক ও গুরুজনের নিকট গোপন করে, এবং সন্তানদের সেই কার্য্যের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেয়। সুকুমার-মতি বালক বালিকাগণ যাহা দেখে তাহাই শিক্ষা করে, মাতার ব্যবহার দর্শন করিয়া তাহারাও অসত্যপ্রিয় হইয়া উঠে, এই অসত্যপ্রিয়তার হস্ত হইতে তাহারা কখনও নিষ্কৃতি পায় না। এমন জননীও আছে, যে না বলিয়া পরদ্রব্য আনিতে সন্তানকে বলিয়া দেয়। সুশিক্ষায় অভাবই যে নারীদের এইরূপ অবনতির কারণ ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, স্ত্রীর শিক্ষার অভাবে ও অমনোযোগিতায় বহু স্বামী কুপথ গামী হয় এবং বহু স্বামীর গৃহ অশান্তিময় হইয়া উঠে। দশজন নারী একত্র হইলেই তাহাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয় পরনিন্দা, কিন্তু যদি নারীগণ সুশিক্ষিতা হইত, তবে দশ জনে একত্র হইয়া লেখাপড়ার বা ধর্ম্মের আলোচনা করিলে তাহা কত সুখের হইত।

আশা ও সুখের কথা—আজকাল দেশে সুবাতাস বহিয়াছে, দেশের গতি কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকেই দেশের কাজে কায়মনঃ অর্পণ করিয়াছেন। নারীকে লইয়া সংসার, নারীর সুশিক্ষা না হইলে দেশোন্নতির আশা সুদূর পরাহত। নারীর সহায়তা, সহানুভূতি না লইয়া পুরুষ কোন কার্য্য করিতে পারে না; ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সত্যই ভারতললনা না জাগিলে ভারত জাগিবে না, জাগিতে পারে না। অতএব বর্ত্তমান নারী-শিক্ষার প্রসার করা দেশহিতকামী এবং সমাজ শুভৈষীগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রন্ধন, শিল্প, সন্তান পালন, স্বাস্থ্য, গৃহস্থালী প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়েই বালিকাদের শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। সরল ভাষায় অনুবাদিত রামায়ণ, মহাভারত, রাজস্থান ও বাঙ্গলার ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইলে বালিকাগণ সুশিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ করিতে পারিবে এবং গৌরবকর দেশের অতীত ইতিহাস জানিতে পারিবে।

পিতা দুহিতাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে এবং পতি পত্নীকে ঘরে বসিয়াই সুশিক্ষা দান করিতে পারেন। কন্যা, ভগিনী ও পত্নীকে শিক্ষা দান করা, পিতা ভ্রাতা ও পতির ধর্ম্ম। ভগবান্ নারীর শিক্ষার ভার পুরুষেরই হস্তে

স্ত্রীকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তবে গৃহধাম সুখ, শান্তি, পুণ্য, পবিত্রতায় স্বর্গ সদৃশ প্রতীয়মান হয়। সুশিক্ষিতা সাধ্বী নারী রোগীর আরামদাত্রী, শোকীর শান্তনারূপিণী, দুঃখ জ্বালা নিপীড়িতের আনন্দ ও শান্তিদায়িনী, ধার্ম্মিকের সহায়, কর্ম্মীর উৎসাহ, নৈরাশ্যপীড়িতের আশা, দুর্ব্বলের শক্তি ও ভরসা।

দেশ হিতৈষী মহাত্মাগণ! তোমরা নারীকে সুশিক্ষা দান কর, দেখিবে তোমাদের গৃহ নারী-শিক্ষার জ্ঞান ও পুণ্যালোকে বিভাসিত হইয়াছে। দেখিবে, আবার ভারতের গৃহে গৃহে সীতা, সাবিত্রী, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, পদ্মিনী, তারাবাই ও কর্ম্মদেবী প্রভৃতি বিরাজ করিবেন। সুমাতা গঠন কর, দেখিবে, প্রত্যেক ভারতে নারীর ক্রোড়ে বীর-বালক বাদল শোভা পাইতেছে।

প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়।

পালী-ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক একখানি গাথা পুস্তক আছে, তাহার "থারিগাথা।" ইহাতে ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রচয়িত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর হইলেও রাজবংশীয় ও সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেক মহিলারও নাম দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্যা ছিলেন। ইঁহারাই ভারতে প্রথম সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়। পুরাণে বেদবতী, জটিলা, শবরী প্রভৃতি তপস্বিনীদিগের আখ্যায়িকা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎকালে যে দলবদ্ধ সন্ন্যাসিনী বা সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় বলিয়া একটী স্বতন্ত্র সাধ্বী ও ধার্ম্মিকা সমাজ ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ভগবান্ বুদ্ধদেবই প্রথম এরূপ ধার্ম্মিকা সমাজের প্রবর্ত্তক।

যখন রাজা, রাজপুত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঐহিক সুখ—সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের পত্নী ও কন্যাগণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে কেন না বিচরণ করিবেন? শাক্য-বংশীয় রাজকন্যা প্রজাবতী উদযুক্তাস্বয়ং হইয়া প্রথম আপনার মস্তক মুণ্ডন

করেন, এবং পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় সৃজনের প্রার্থনা করেন। তিনিই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের অগ্রণী। তাঁহার দৃষ্টান্তে শীঘ্রই অনেক ধার্ম্মিকা রমণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হন, তদ্দ্বারা সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয়। বলা বাহুল্য যে প্রস্তাবিত গাথা পুস্তকখানি এই সকল ধার্ম্মিকা রমণীগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের কয়েকটীর নাম গাথায় বর্ণিত আছে, যথা—পূর্ণা;, তিশ্যা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, ধর্ম্মদীনা, বিশাখা, সুমনা, জয়ন্তী, অর্দ্ধকাশী, চিত্রা, অভয়মাতা, পদ্মাবতী, শ্যামা, সমা, কপিতানী, নন্দা, মিত্রকালী, শকুলা, স্বর্ণ, চন্দ্রা, সুজাতা, ঈশীদাসী, সুন্দরী ও রোহিণী।—ধর্ম্মদীনা, সমা, ঈশীদাসী বা ঐশিদাসী নামগুলি দীক্ষা নাম বলিয়া বোধ হয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ।

বৈদিক ভারত।

বৈদিক-গ্রন্থে ইন্দ্র নামক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ ইন্দ্র বর্ত্তমানের পারিজাতাঘ্রায়ক-নন্দনানিল-সেবী, স্বর্ণ বৈজয়ন্তের ঐরাবতারোহী অপ্সরা কুল-সেবিত শচীপতী সুররাজ ইন্দ্র নহেন। বৈদিক 'ইন্দ্র' বর্ষাকালীন বৃষ্টি দাতা মেঘ (১) অর্থে সংযোজিত। বৈদিক ভারতীয় আর্য্যগণ কৃষি বিষয়ে বহুল উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা কৃষির উপযোগী জল প্রাপ্তির আশায় বর্ষাপ্রদ মেঘাবলীকে 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করিয়া স্তুতি পাট করিতেন (২) বর্ত্তমান নাটকাদিতে অভিনীত "বৃত্র সংহারের" বৈদিক অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ের সত্যতা স্পষ্ট নির্দ্ধারিত হয়, ঋগ্বেদে উহার বর্ণনা এইরূপ—

বৃত্র অর্থাৎ ঔৎপাতিক শীলা বর্ষণকারী মেঘ। আকাশ মণ্ডলে উক্ত বৃত্রের উদয় হইলে শীলা বর্ষণে শস্য মথিত হইবে এই আশঙ্কায় তাহার

---

(১) ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে স্বার্থে র।

(২) ঋগ্বেদ ১, ২।১

নিবারণ জন্য ইন্দ্র (সুবৃষ্টি দাতা মেঘ) কে তাহার বজ্র (মেঘ গর্জ্জন) দ্বারা বৃত্র সংহার জন্য আর্য্যগণ স্তুতিপাঠ করিতেন। মেঘ গর্জ্জনে ঝটিকাদির উপশম হয় এযুক্তি বিজ্ঞান সিদ্ধ। নাটকাদিতেও বজ্রদ্বারা বৃত্র সংহার সম্পাদিত হয়। কিন্তু কালক্রমে উক্ত আখ্যায়িকা কবিতুলিকায় বীর করুণাদি নানা রসে প্লুত হইয়া জনসমাজে অসুররাজ বৃত্র কর্ত্তৃক ইন্দ্রের স্বর্গচ্যুতি, শচীহরণ ইত্যাদি বিবিধ ঘটনা-জাল-জড়িত সুললিত কাব্য প্রহেলিকা রূপে সমাদৃত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হইতেছে যে বৈদিক ভারতে কৃষি কার্য্য সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং বৈদিক আর্য্যগণ যজ্ঞাদির ন্যায় কৃষিকার্য্যকে ও নিত্যকর্ম্মরূপে পরিগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

বৈদিক ভারতে অনল সন্নিভ করোদ্দীপ্ত সহস্রাংশু * সূর্য্যদেব সমাজে সর্ব্বোচ্চ গরীয়ান্ আসনের অধিকারী। সমস্ত জগৎ সূর্য্য হইতে সমুদ্ভূত, এতথ্য আর্য্যগণ স্বকীয় গবেষণা বলে বহু পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত করিয়া ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সূর্য্যকে সবিতা অর্থাৎ জগত-প্রসবিতা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। সমস্ত যজ্ঞাদির প্রারম্ভেই সূর্য্যের স্তব পঠিত হইত। সূর্য্যস্তব মূলক গায়ত্রী মন্ত্র শ্রেষ্ঠ বেদমাতা নামে অভিহিত। রামায়ণের—

"গায়ত্রীক বিহনেতে যেরূপ ব্রাহ্মণ" এ বাক্য দ্বারাও গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইতেছে। ঋগ্বেদে উক্ত ঋক্‌টীর—স্বর্ণসিংহাসন। উহার অর্থ এইরূপ—

"সেই বরণীয় তেজ সবিতৃ দেবের
ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি দেন।"

বেদ সংহিতা।

একটু অনুধাবন করিলেই অনেক দেবতাকেসূর্য্যের নামান্তর বলিয়া অনুমিত হয়। আমাদের সূর্য্যার্ঘ্য দান মন্ত্র এইরূপ—

"নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে"

অর্থাৎ—

"ব্রহ্ম প্রভাসমন্বিত বিষ্ণু তেজশালী পবিত্র এবং কর্ম্মফল দায়ী সবিতৃ দেব বিবস্বৎ কে নমস্কার করি।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ব্রহ্মাও বিষ্ণু উভয়েই সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। আমরা ব্রহ্মাকে লোহিতাঙ্গ এবং সূর্য্যোদয় কালকে ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত বলি; ইহাতে

* সহস্র রশ্মি যুক্ত।

উদয়কালীন রক্তবর্ণ সবিতাকে পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলা হইত, বলিয়াই অনুমিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট লুপ্ত প্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধনায় যখন বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনিও এই মতের সমর্থন করিয়া ছিলেন। কথিত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বকীয় কন্যা উষাতে উপগত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ পিতামহ চরিত্রের এই অংশে সন্দিহান হইলে কুমারিল ভট্ট নিম্নোদ্ধৃত রূপ তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়বেলায়ামুষস্যুদ্যন্নভ্যেতি সা তদাহামনাদেবোপজায়ত ইতিতদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজ নিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগবদুপচারঃ।" অর্থাৎ—

"প্রজা পালন করে বলিয়া সূর্য্য প্রজাপতি নামে খ্যাত। সূর্য্যোদয়কালে তাঁহার আগমনে উষার জন্ম। এজন্য উষা তাঁহার দুহিতা। উষার সহিত সূর্য্যের তেজ-মিলন হয় বলিয়া উভয়ে স্ত্রী পুরুষ ভাবে কল্পিত হইয়াছে।"

চতুরানন ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ সম্বলিত। উহা বোধ হয় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে কিরণজাল বিতরণ হইতে সমুদ্ভূত। ঋগ্বেদেও সূর্য্য বিষ্ণু নামে অভিহিত।

"ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রিধা নিদাধ পদং"

অর্থাৎ "বিষ্ণু ইহা পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি তিন স্থানে পদ স্থাপন করিয়াছিলেন।" শাকপূণির মতে, পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও আকাশে। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও আকাশে সূর্য্যরূপে। ঔর্ণবাভের মতে উদয়কালে উদয় গিরিতে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু পাদে বা অন্তরীক্ষে এবং অপরপাদ গয়াশিরে অর্থাৎ অস্তগিরিতে সংস্থাপিত।

গয়াশির শব্দের প্রকৃতার্থ ভুলিয়া গিয়াই বোধ হয় লোকে, ঔর্ণবাভের উপরোক্ত মতানুযায়ী "গয়াসুরের হরি-পাদ-পদ্ম-লাভ" ও বিষ্ণুর তদীয় শিরে পদ স্থাপন আখ্যায়িকার উদ্ভব করিয়াছেন। এইরূপে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, কোন আখ্যার প্রকৃত অর্থবোধে অক্ষম হইয়া, কল্পনা-প্রসূত অভিনব ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই, অধিকাংশ দেবোপখ্যানের উদ্ভব। অনুসন্ধিৎসা বলে পদে পদেই এ সত্যটী পরিলক্ষিত হইবে।

তরল-শিশির-স্নাত পূর্ব্বাকাশের রজনী-সম্ভূত তমোময় ক্রোড়ে প্রত্যূষের স্বর্ণ বর্ণ কিরণ ছটা ছড়াইতে ছড়াইতে বাল-সূর্য্য প্রথম গগনের পার্ট উদ্ভিন্ন

হয়, এই জন্যই বোধ হয় প্রভাত-তপনকে (ব্রহ্মাকে) হিরণ্যগর্ভ (স্বর্ণ গর্ভ) নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কেবল ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নহেন। রুদ্রও সূর্য্য। দিবালোক যখন 'রৌদ্র' নামে কথিত, তখন 'রৌদ্র' যে 'রুদ্র' শব্দাত্মজ, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বিলম্ব হইবে না।

এতদ্দ্বারা সূর্য্য যে প্রাচীনকালে 'রুদ্র' নামে অভিহিত হইতেন, তাহা স্বতঃ প্রমাণিত হইতেছে। কাজেই দেখা যায় যে আমাদের দেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহারা সকলেই সূর্য্যের নামান্তর ভেদ মাত্র।

এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রও সূর্য্য। "শব্দস্তোম মহানিধিতে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় ঐশ্বর্য্যসূচক 'ইদি' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া উহার যে সকল অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বাদশার্কের অন্ত-র্ভূত একটী অর্কের নাম পাওয়া যায়।

কুমারিল্ল ভট্টের মতে ইন্দ্রও সূর্য্য। অহল্যার সতীত্বাপহরণাপবাদ সম্বন্ধে তিনি যে প্রকৃতার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

"তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য নিবন্ধন ইন্দ্র পদবাচ্য। অহনি অর্থাৎ দিবা-গমনে রাত্রির লয় হয় বলিয়া উহার নাম অহল্যা। সেই রজনীকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সূর্য্যকে অহল্যা-সঙ্গমী বলে, ব্যভিচার নিবন্ধন নহে।" উক্ত অহল্যা গোতমের সহধর্ম্মিনী। আমাদের বোধ হয়, গো অর্থাৎ কিরণ, তম অর্থাৎ ইচ্ছা করে বলিয়া চন্দ্রই গোতম নামে কথিত হইত। চন্দ্র যে রজনী-কান্ত, ইহা তাহার "নিশানাথ" নামেই প্রমাণিত হইতেছে।

চন্দ্র সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে আলোকিত হয়, ইহা অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ বহু পূর্ব্বে জানিতেন। 'রঘুবংশ'কার তদীয় গ্রন্থে উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

"পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্র সম্পদঃ
শুভৈ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-
রনু প্রবেশাদিব বাল চন্দ্রিমা॥" রঘুবংশ।

অর্থাৎ "সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশে বালচন্দ্রিমা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্ব-সম্পদোপেত পিতৃপ্রযত্নে তাহার কমনীয় দেহাবয়ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

হয় ত গোতম নামক ঋষির অহল্যা নাম্নী স্ত্রী ছিলেন। তদবলম্বনে কালে কবিকল্পনায় 'গোতম-স্ত্রীকে ইন্দ্র হরণ করেন' এই আখ্যায়িকার উদ্ভব হইয়াছে।

অহল্যা পতির অভিসম্পাতে পাষাণ ময়ী হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে রাম তাহাকে উদ্ধার করেন॥ আমাদের বোধ হয় কর্ষণার্থক হল্ ধাতু হইতে অহল্যা শব্দের উদ্ভব। সুতরাং অহল্যা অর্থে কর্ষণা যোগ্য অর্থাৎ প্রস্তরময় ভূমি। রাম অর্থে সুখস্বচ্ছন্দতা। সীতা অর্থে কৃষ্ট ভূমি। ইহাতে এই ভাবার্থ লক্ষিত হইতেছে যে, অকর্ষিত ভূমি মুক্ত হইল। লোকেও সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। এ অহল্যাকেও গোতম-স্ত্রী কল্পনা করা হইয়াছে।

ইন্দ্র গোতম-শাপে প্রথম সহস্রযোনি পরে সহস্রাক্ষ হন। সহস্রযোনি বোধ হয় ইন্দ্রের (সূর্য্যের) বিভিন্নরূপের নির্দ্দেশক। আকাশস্থ বলিয়া তারকারাজিকে বোধ হয় ইন্দ্রের চক্ষু স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে সহস্রাক্ষ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যায় যে বৈদিক যুগে সূর্য্যই একমাত্র উপাস্য ছিলেন। কার্য্যান্তর ভেদে কালে উহার বিভিন্ন রূপ কল্পিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাসবিহারী রায়।

সময়ের ফের।

(১)

এসংসারে বাণী কণ্ঠ বড়ই চুপচাপ। কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বা কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার ষড়যন্ত্র এসব কুচিন্তা কখনই তাহার মনে উদিত হয় নাই।

যেমনটি সাধ্য তেমনি কার্য্য করিয়া স্ত্রীর নিকট প্রত্যাহিক কড়ামিঠা ভর্ৎসনার সঙ্গে যৎসামান্য ডালভাত উদরস্থ করেন ও আহারান্তে একটী পান মুখে দিয়া তাম্রকূট ধূম সেবন পুরসরঃ নিদ্রার কোমল অঙ্কে হেলিয়া পড়েন। কোনরূপ হৃদয়ে অশান্তি নাই। সংসারটী যেন তাহার শান্ত পল্লী পার্শ্ব প্রবাহিনী কলনাদিনী স্বচ্ছতোয়া তটিনীর মত। সরল, সুখময় ও শান্তিময় কোথাও একটু আবিলতা বা গর্জ্জনের লেশমাত্র নাই। একদিন সে তাহার

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল, এমন সময় দেখিল দ্রুত তাহার ভগ্নীপতি যদুপতি বাবু তাহার দিকে আসিতেছে।

তাড়াতাড়ি হুঁকাটী নামাইয়া বাণী কণ্ঠ ভগ্নীপতির অভ্যর্থনা করিল।

যদুপতি কহিলেন "থাক আপ্যায়িত এখন পরে হবে, কিন্তু তোমার একটী কথা বলতে হচ্চে?

বাণীকণ্ঠ উদ্বেল হইয়া কহিল কি কথা"

যদুপতি। সবটী শোন আগে বলিয়া হুকা টানিতে টানিতে কহিতে লাগিলেন।"

তুমিত জানই তোমার বড়দাদার নামে আমার অনেক সম্পত্তি বেনামী রেখেছিলাম। কেন রেখেছিলাম, সেকথা আর তোমায় বলতে হবে না। বিষয়ের খাজনা আদিও আমি সব দিয়ে থাকি।

বানী। হাঁ তাত জানি তুমিই সব দিয়ে থাক।

যদু। কিন্তু তোমার বড়দাদা এখন বাকী খাজনা আছে বলিয়া জমি সম্পত্তি আমায় দিতে চাহিতেছে না, আমার কাছে প্রায় তিন হাজার টাকা প্রার্থনা করে, বলে টাকা নাদিলে কিছুতে আমার বিষয় ছেড়ে দেব না। তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।

সাক্ষ্য দেওয়ার নাম শুনিয়া বাণীকণ্ঠ একবারে আঁৎকাইয়া উঠিল। কহিলী, না না এও কি হয়? মেটিয়ে ফেলাবেন!—

যদু। নাহে তুমিত বোঝনা আমার একবার দেখতে হবে বলিয়া উঠিয়া পড়িল!—

বাণীকণ্ঠ এত বেলায় যাওয়া উচিত নয় বলিয়া অনেক আপত্তি তুলিল। যদুপতি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না বাণীকণ্ঠের কোন আহ্বানেই কর্ণপাত করিলেন না কহিলেন আবার সেদিন আসেত তোমাদের বাড়ী থাকাব।" বলিয়া সেখান হইতে দ্রুত চলিয়া গেল—

(২)

ক্রমে বাণীকণ্ঠ দেখিল সত্যই মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইয়াছে তাহার উপর সাক্ষীর পরোয়ানাও জারী হইয়াছে, তাহাকে নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দিতে হইবে। মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া দাদার বাড়ী গেল। দাদা রুদ্রকণ্ঠ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া খাতা খতিয়ান লইয়া হিসাব দেখিতেছিলেন। ভ্রাতাকে

আসিতে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কেবল একবার মাত্র মুখতুলিয়া চাহিলেন কহিলেন। "বোস্।"

বস্ আর কিছুই না সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তাটা আপ্যায়িতটা এইরূপই বটে। কিন্তু পুলীশের একটা সামান্য কনেষ্টবল কিম্বা উকীল বাবুদের একটা নির্জীব টক্তীর কাছে তাঁহার সে গাম্ভীর্য্য ধূলি সাৎ হইয়া পড়ে। তখন আর তাঁহাকে রাম ভারী বলিয়া মনে হয় না।

সে যাহা হউক, অনেক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বাণীকণ্ঠ আপনা হইতেই কথা পাড়িল। কহিল।

"হা দাদা আপনি না যদুপতির সঙ্গে মোকর্দ্দমা বাধিয়েছেন। কেন এসব মোকর্দ্দমা, মেটিয়ে ফেলানই ভাল। যদুপতির সঙ্গে মোকর্দ্দমা লোকে শুনে বলবে কি?

রুদ্রবাবু সেকথার কোন উত্তর দিলেন না আপন মনে খাতার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। পরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন তোকে সাক্ষী মেনেছে নাকি?

বাণী কহিল হাঁ।

রুদ্র। তবে সাক্ষী দিস্ ঠিক সত্যি কথাই বলবি বলিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিলেন।

বাণীকণ্ঠ অনেক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া আবার কহিল। দেখুন মোকর্দ্দমাটা মিটিয়ে ফেলালেই ভাল হয়না কেন অনর্থক কতকগুলো টাকা উকীল মোক্তারদের পায়ে খরচ করা।—

রুদ্রবাবু একখানা খাতা পাড়িয়া খাতার পাত খুলিয়া ভেয়ের সামনে ধরিলেন কহিলেন দ্যাখ কত টাকা পাওনা আমার যদু কখনই জমির এক পয়সাও খাজনা দেয় নাই। আমার কতটাকা লেগেগেছে দেখ।

দেখিয়া শুনিয়া বাণীকণ্ঠ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিল না ক্ষুন্নচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

গৃহিনী আসিয়া কহিল। দেখ মোকর্দ্দমা করতে যাবে, খবরদার মিছে কথা বলোনা যা জান তাই ঠিক ঠাক বলে যাবে' ভাইয়ের দিকও টানবে না, ভগ্নীপতির দিকও টানবে না।

বাণী তামাক ফুঁকিতে লাগিল। আর ভাবিল ভাল মুস্কিলই বটে। এ কাঁদাকে কি মানুষ পড়ে?

(৩)

সাক্ষ্য মঞ্চে দাঁড়াইয়া বাণীকণ্ঠ যাহা জানে ঠিক যথা যথই বলিয়া গেল। একটা মিথ্যাও কহিল না। বিপক্ষীয় উকীলেরা জেরা করিয়া তাহাকে সত্য হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বাণী মূলে ঠিক ছিল। সত্য বই একটি মিথ্যা বা সাজান কথা সে বলে নাই। মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশান্তে যদুপতি আসিয়া বাণীর হাত দুটী ধরিয়া কহিল—"উত্তম বলিয়াছ ভাই তুমি না থাকিলে আজ আমার কি হইত? তোমারই জোরে আমার মোকর্দ্দমার জয় লাভ হইয়াছে, তুমিই তোমার ভায়েগুলিকে ভিক্ষে হতে রক্ষে করেছ। ইত্যাদি—

রুদ্রবাবু বাণীরদিকে একটী জ্বালাময়কটাক্ষপাত করিলেন। বাণী দাদার ভাবটা অনেকখানি বুঝিল! সজল নয়নে দাদার অনুরাগ ভিক্ষা করিয়া কহিল কি করব দাদা আমি ঠিক বলিয়াছি, সত্য বই একচুল মিথ্যা বলি নাই। আপনিও তাই বলতে বলে ছিলেন। ইহাতে কোন দোষ নাই।

প্রকাশ্যে রুদ্র বাবু কিছু কহিলেন না কিন্তু মনে মনে কহিলেন। আচ্ছা দেখিব, যদুপতি তোর কি করে আর আমিই বা কি করি। আমার সঙ্গে শক্রতা কুমীরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করবার ইচ্ছা—

ইহার পর হইতেই বাণীকণ্ঠের বাগানে ফল থাকে না, গোয়ালের গরু নিত্য পণ্ডে চালান যায় তাহার সুখ পুকুরের জলে গোবর ছাই পচা দামাদি পড়ে—

বাণীকণ্ঠ চিত্তদাহ হইয়া এই সব বসিয়া বসিয়া দেখে আর নীরবে তামাক টানে। দাদার সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করে না। যেদিন হৃদয়জ্বালা একবারেই অসহ্য হইয়া পড়ে সেদিন কেবল কহে "দাদার একাজটা কি ভাল হচ্চে" প্রত্যুত্তরে বড়গিন্নী জানান ভগ্নীপতির মোকর্দ্দমায় মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারেন। এত টকা ঘুষ খেতে পারেন। আর এ সহ্য করিতে পারেন না।

রুদ্রবাবু গম্ভীর অবিচলিত মুখে তাঁহার কৃষাণ দিকে আবার আদেশ দেন যেখানে তাহার গরু পাইবি সেইখান হইতে ধরিয়া চালান দিবি। কৃষাণেরাও তেমনি যদি মনিবের জমীর কাছ দিয়াও একটী বাণীর গরু যায়, তাহা

তাহার ভাগের পুকুরে মাছ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মাছের ভাগ দূরে যাক, পুকুরের পাহাড় দিয়াও কেহ উঠিতে পায় না।

বানীকণ্ঠ গৃহিনী কি করিবে নিজের হতভাগ্য স্বামিকে নিতান্ত অক্ষম বিবেচনা করিয়া দায়াদের উচ্ছেদ জন্য দয়াময় পরমেশ্বরের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করে কিন্তু কি দুর্ভাগ্য তাহাতে কিছুই দেখা যায় না দায়াদের দিন দিন উন্নতি ভিন্ন যে অবনতি নাই।

দ্বিগুণ অর্থ পীড়ায় হতভাগিনীর ক্ষুদ্রপ্রাণ একবারে আকুল হইয়া পড়ে। তখন মনের মধ্যে একটী পাপ পুণ্যের ছায়া না উদিত হইলে স্থির হইতে পারে না, খুব জোরের সহিতই বলে "পাপের বাড় বা‍ড়ে দুদিন পরে সব যাবে।"

ইতিমধ্যে বানীকণ্ঠের কন্যার বিবাহের সময় হইয়া আসিয়া পড়িল। পাত্র দেখিতে যাইতে হইবে। জ্যেষ্ঠ দাদার মত না লইয়া কি যাওয়া হয়? দাদার বাড়ীতে গেল এসময় আর কোন বিবাদ নাই। বাস্তবিক বাঙ্গালী জীবনে এভাবটী বড় উচ্চ। বড় উদার জ্ঞান সম্পন্ন! ঠিকইত। ঘরকন্না সংসার করিতে হইলে পরস্পর পরস্পরে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ বাধিয়া যায়। তাই বলিয়া কি তাহা চিরদিন থাকিবে? বিপদের সময় কার্য্যের সময় বা কোন সামাজিক মিলনের সময় সে বিবাদ ভঙ্গ হইবে না? তাহা হইলে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ রহিল কি?

অতি সুন্দর প্রথা। বাঙ্গালী তোমরা সব হারাইয়াছ, এ সনাতন প্রথাটী হারাইওনা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এ ভাবটী যেন তোমাদের চির জাগরুক থাকে।

দাদা রুদ্রকণ্ঠ কহিলেন আমার এখন কাজের সময় তা পাত্রটী কোথায় দেখতে যাবি?

বাণী কহিল বাথানপাড়া।

"বাথান পাড়ায়? ওঃ এতদূর তা দেখে আয়না সেখানে ভাল পাত্র আছে, বলিয়া ভাইকে বিদায় দিলেন। কিন্তু মনে মনে একটী সন্তানকে খুঁজিতে লাগিলেন।

বাণী সরল ভাবেই আসিয়াছিল সরল ভাবেই চলিয়া গেল!—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

জিজ্ঞাসা।

তুমি কি গো সেই সে তপন, বরষের
শেষে যাও অস্তাচলে? তব অস্ত সনে
ভারতের আশাদীপ নিভেছিল কি গো
চিরদিন তরে হায়! পলাশী প্রাঙ্গনে?
অথবা সুদূর আরো অতীতের ক্রোড়ে,
মুছে দিল সপ্তদশ অশ্বারোহী আসি
গৌড়ের ললাট হ'তে হিন্দুনাম যবে,
ঢাকিলে না কেন দেব, লোহিত মূরতি
তব কৃষ্ণ আবরণে? যাও দেব এবে
শুধাইও ভারতের ভাগ্য বিধাতায়,
সেই দিন যেই রবি গেছে অস্তাচলে
পুনঃ কি উদিবে বঙ্গে অরুণ আভায়?
তেরশ' পনর পারিবে কি অপনীতে
বাঙ্গালীর সুবিশাল কলঙ্কের লেখা?

শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষাগমে।

অতীত হ'য়েছে বর্ষ;
কত বিষাদের ছায়া, অনন্তে মিশিয়া,
রেখে গেছে শুধু স্পর্শ।
ত্যজি অমল আলোকে অবনী উজলি',
ছুটায়ে হৃদয়ে অপার বিজলী,
সমাগত নববর্ষ;
তাই গভীর পুলকে, প্রকৃতির বুকে,
নাচি'ছে নবীন হর্ষ।

শ্রীমনোমোহন মজুমদার।

জগতে সুখ কি?

নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম,—সহসা একটী স্বপ্ন দেখিয়া, প্রাণে বড় অঘাত লাগিল—জগতে সুখ কি জানিবার জন্য প্রাণ বড় উদগ্রীব হইল; নিজে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারায়, মন ব্যাকুল লইল—অনন্ত ভাবনাস্রোতে প্রাণ কেমন আইঢাই করিয়া উঠিল—সুখান্বেষণে ঘরের বাহির হইয়া পরিলাম। রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং কিয়ৎদূরে যাইয়া একটী সুরম্য অট্টালিকা দর্শনে, তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, যে গৃহস্বামী অতুল ধনের অধিপতি, তাঁহার ন্যায় সুখী আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ আজ সকলেই, শোকসাগরে মগ্ন—ধনলোভে তস্করেরা আজ তাঁহাকে খুন করিয়াছে! বুঝিলাম, অতুল ধনের অধীশ্বর হওয়ায় সুখ নাই, শেষে, প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি!—ভাবিতে-ভাবিতে পর চলিতে লাগিলাম; পথে একজন বৃদ্ধ লোকের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! বলিতে পারেন, জগতে সুখ কি? তিনি বলিলেন "বাপু, সুখ সুখ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে কি জগতে সুখ পাওয়া যায়, আমরা যেমন গৃহস্থালী সংসার ধর্ম্ম করিলাম, তুমিও সেইভাবে ঘরসংসার কর, সুখের মুখ দেখিতে পাইবে।" সে কথায় মন মানিল না, আবার চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে আর এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল, প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন "সাহিত্য সেবাই জগতে সুখ"—বুঝিলাম তিনি একজন সাহিত্য সেবী। পথ দিয়া আর একদল যুবকবৃন্দ যাইতেছিল, তাহাদের নিকট গমন করিয়া, একজনকে বলিলাম, "ভাই, আমি একজন সুখের ভিখারী, বলিয়া দিতে পার, সুখ কি"—তিনি বলিলেন, "নবপরিণীতা স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ"—বুঝিলাম তিনি নববিবাহিতা।

তাঁহাদের মধ্যে আর একজন বলিলেন, "সুরাদেবীর ভজনা কর, বারাঙ্গনাগৃহে তাহাদের সহিত আমোদ আহ্লাদ কর—এর চেয়ে আবার সুখ

কি?” একজন বলিলেন “বাদ্যযন্ত্রাদিসহ সঙ্গীতাদি অপেক্ষা আর সুখ নাই”—আর-একজন বলিলেন,” চপ্‌ কাট্‌লেট্‌, কোর্ম্মা প্রভৃতি মুখরোচক সুখসেব্য আহার সামগ্রী পাইলে যেমন সুখ হয়, এমন আর কিছুতেই নাই।” আরও একজন বলিলেন, “সুনিল নভোস্থলে অসংখ্য তারকারাজি-খচিত, প্রকৃতির অতুল শোভা সন্দর্শনেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়।” পাঁচজনের পাঁচকথা শুনিয়া, কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া দূরের কথা, মনে আরও পূর্ণমাত্রায় সংশয় জাগিয়া উঠিল,—বুঝিলাম, লোকে স্ব স্ব জ্ঞান ও রুচি অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে, সুখের উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে!

পুনরায় রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম; যাইতে যাইতে দেখি, একটী সুন্দর বালক ধুলাখেলা করিতেছে; তাহার হাসি হাসি মুখখানি দেখিয়া ভাবিলাম—বাল্যকালটি বেশ সুখের, কিন্তু তাহা আবহমান কাল থাকে কৈ?—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কুটিলতা আসিয়া সে সুখ থাকিতে দেয় কই? বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম “তুমি গায়ে এত ধুলা মাখা-মাখি করিতেছ কেন, ধুলা লইয়া খেলা করিতে নাই—ইহাতে সুখ কি? বালক হাসিয়া বলিল, ধুলাখেলা বেশত, সকলেই ত ধুলাখেলা করে।” হয়ত বালক, তাহার সঙ্গীদের উদ্দেশেই একথা বলিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার কথাগুলি আমাকে স্তম্ভিত করিল;—ভাবিলাম, জগতে কে না ধুলাখেলা করিতেছে; চিরদিনই ধুলখেলা করিতে হইবে, তাই ছেলেবেলা হইতে ধুলা খেলা অভ্যাস করিয়া, যাহাতে আর ধুলার শরীরের জন্য ভাবিত না হয়, তাই বুঝি বালক “ধুলাখেলা বেশ” বলিল! কি যেন মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, আপন মনে ভাবিতে লাগিলাম,—ক্ষণেক পরে চাহিয়া দেখি আর বালক নাই—সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়া-ছিলাম, এই বালকের নিকট হইতেই ‘জগতের সুখ’সম্বন্ধে উপদেশ লইব—কিন্তু সাধ মিটিল না। যে বালকের ক্ষুদ্র দুটী কথায় আমার মন এত মুগ্ধ হইয়া পড়িল, তাহাকে আর সামান্য বালক বলিয়া বোধ হইল না? ভাবিলাম, হয়ত সে আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই পলাইয়াছে! তবে কি আশা মিটিবে না? সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, তীব্র তাড়নায়, দারুণ কশাঘাতে প্রাণ যখন অস্থির হয়—জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারচক্রে প্রাণ যখন নিষ্পেষিত

হয়; তখন জগতে সুখের সন্ধান লইতে ইচ্ছা হয়। আমি, পথহারা, শান্তিহারা, দিশেহারা,—অতি সঙ্কটে পড়িয়া সুখের বিমল স্নিগ্ধ স্রোত কোথায় প্রবাহিত, কিসে তাহার উৎপত্তি ও শেষে কোন মহান্ পদার্থে যাইয়া তাহার পতন হয়—জানিতে বড় উৎসুক। ভাই! যদি কেহ জান, বলিয়া দাও;—রাগ করিও না, ঘৃণায় হাসিও না, উপেক্ষা করিও না। যদি আমার মত অশান্তির অনলে অহর্নিশি হাড়ে হাড়ে পুড়িতে—যদি নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইতে—তাহা হইলে বুঝিতে, আমার এ বাতুলতা কেন?

গরীবের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না—আবার পূর্ব্বমত ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। কোথায় যাইতেছি, স্থিরতা নাই! কোথায় যাইলে প্রাণের পিপাসা মিটিবে, জানি না!

জগতে সুখ কি? অর্থে কি সুখ আছে? অর্থ না থাকার একদোষ, থাকার অনেক দোষ; না থাকিলে, জীবিকানির্ব্বাহ একটু কষ্টে হয়—থাকিলে, কিসে অর্থবৃদ্ধি হইবে, কি করিলে চোর ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবে তাহার চিন্তায় দিবানিশি পুড়িতে হয়। কখনও বা ধনমদে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আপাতরম্য পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, শেষ জীবন সাতিশয় মনস্তাপে ও অশান্তিতে কাটায়; আরও, পূর্ব্বে ত দেখা গেল, একজন ধনী, অর্থের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন,—তবে আর অর্থে সুখ কই? সংসারে কষ্ট আছে; দেহে জরা আছে; যৌবনে বার্দ্ধক্য আছে; কুসুমে কীট আছে; চন্দ্রে কলঙ্ক আছে; সূর্য্যরশ্মিতে রোগজনন প্রবণতা আছে; বিদ্যুতে বজ্র আছে, কার্য্যে নৈস্ফল্য আছে; জীবনে মরণ আছে; বিশ্বাসে সংশয় আছে; অসীমে সসীম আছে; স্নেহে আশঙ্কা আছে;—তবে কি জগতে সুখ নাই? দারুণ ভাবনায় হৃদয় মথিত হইতে লাগিল; ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া দেখি, পথ ফুরাইয়াছে! সম্মুখে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, কুল কুল ধ্বনিতে, একটীর পর আর একটী ঊর্ম্মি বক্ষে লইয়া, নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কহিলাম,—মা, তোমার ত কখনও পরিবর্ত্তন শুনি নাই! ধনী, দরিদ্র; জ্ঞানী, অজ্ঞানী; সাধু, অসাধু; পুণ্যাত্মা, পাপী; সকলেই ত সমভাবে, তোমার নিকট আদর পাইয়া আসিতেছে! তাই বুঝি, মা! তোর এই স্নিগ্ধ পবিত্র তটভূমিতে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে কে লইয়া

আসিল; যদি তাই হয়, তবে বলে দে মা, জগতে সুখ কি? এমন সময়ে, সহসা উত্তর দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, দেখিলাম একটী সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়া সাধনারত (?)—তাহার পার্শ্বে আবার একি!—এক সন্ন্যাসিণী। একটু নিকটে গিয়া দেখি, উভয়ে মদিরা পানে উন্মত্ত; একটু ভাল করিয়া দেখায়, বুঝিলাম সন্ন্যাসিণী—একটী বাজারের বেশ্যা! তাহাদের কার্য্যাবলী আর দাড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল না—জানিলাম, এরূপ ধর্ম্মের ভান আজ কাল যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরদিক ছাড়িয়া, তটভূমির উপর দিয়াই দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর, আবার এক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে, তাঁহার দেবত্বমাখা আননে স্বর্গীয় পবিত্রতার আভাস পাইয়া আপনা হইতেই মস্তক নত হইয়া পড়িল—আমি যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া চলিলাম! ধ্যানভঙ্গ হওয়ার পর সন্ন্যাসী বলিলেন "বৎস উঠ"; আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পদতলে বসিয়া, আমার প্রার্থিত বস্তু ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, ঘর হইতে বাহির হইয়া পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত জানাইলাম। আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলে তিনি বলিলেন,—"বৎস, জগতে প্রকৃত সুখ—প্রেমে; প্রেমের আদি নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই—ধ্বংস নাই; প্রেম সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের উপাসক যে, সেই সুখী; ইহাতে বিভিন্ন জাতীয় কঠোর সীমাবদ্ধ নিয়ম নাই। প্রত্যেক জাতীর স্ব স্ব ধর্ম্ম-পুস্তকে, ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ আছে, কিন্তু একটু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক জাতীয়-ধর্ম্ম-পুস্তকে, প্রেমই যে প্রকৃষ্ট যোগ—প্রেমই যে প্রকৃত সন্ন্যাস—প্রেমই একমাত্র সাধনা, তাহা গৌণভাবে বর্ণিত আছে। আমি এ সম্বন্ধে তোমায় অন্য সময় বলিব, তুমিও তোমার সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পার; একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি" বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রী প্রমথনাথ মিত্র।

ভোটান প্রবাসীর পত্র।

জন্মভূমি ছাড়িয়া, জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া বহু দূরে আসিয়াছি। কালের গতি অনুসারে জীবনের গতিও ভিন্নরূপ দাঁড়াইয়াছে; তাই আজ এই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অরণ্যে গোলামীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছি। দুই চারি ক্রোশ দূরে এক একটী চা বাগান; আর কেবল জঙ্গল। জঙ্গলে শাল, সেগুন, খয়ের, শিশু, পারুল ইত্যাদি বৃক্ষ, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতামণ্ডলে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে এতই নিবিড় বন যে কদাচিৎ সূর্য্যের উত্তাপ দেখা যায় না। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, বরাহ, হস্তি, বানর ইত্যাদিতে বড়ই আশঙ্কা, প্রতি পাদক্ষেপে হয়। কি করি পেটের দায়ে তবুও দেখি, যদ্যপি কোথাও গোলামী পাই। স্থানে স্থানে চা বাগানের বাবুদিগের বাসায় উপস্থিত হইলে অতি সমাদরের সহিত আহারাদি দিয়া থাকেন। বাবুদিগের বাসা ভিন্ন অন্য কোন থাকিবার স্থান নাই। এজন্য সেখানেই থাকিতে হয়।

যে সমস্ত স্থানে কাজকর্ম খালি থাকে তাহাও এক বাগানে গেলেই সংবাদ পাওয়া যায়। এইরূপে সংবাদ পাইলেই আবার নূতন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হই। প্রথম যে স্থানে সংবাদ পাই যে, অন্য স্থানে একটী কাজ খালি আছে, সে সময়ে হৃদয়ে কত আশা এবং কত বল বাঁধিয়া নূতন বাগানে উপস্থিত হই। কিন্তু হয় তো শুনিতে পাই সেখানে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে ইংরাজ রাজ্যের শেষ সীমায় আসিয়াছি। নিকটেই ভোটান স্বাধীন রাজ্য, ঐ যে পর্ব্বতাবলী দেখা যাইতেছে ঐটীই ভোটান রাজ্য। নিম্নে ইংরাজ রাজ্যের সীমানা, ম্যাকড়াপাড়া চা বাগান। এই চা বাগানটী বাঙ্গালী কোম্পানীস্থ। এখানে একজন বাঙ্গালী ম্যানেজারও আছেন, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সেন, কায়স্থ নিবাস ফরিদপুর জেলার ডুমুনী গ্রামে, ইনি অতি ভদ্রলোক। ইঁহার বাসায় রোজ প্রায় ২।৫ জন লোক না হয় এমন দিন খুব কমই। সকলকেই অতি যত্নের সহিত অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন না। আমি এখানে যে সমস্ত স্থানে ঘুরিয়াছি তাহার মধ্যে ইনি এবং আরও একটী বাঙ্গালী বাগানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিয়োগী কাটালগুড়ি বাগান এই দুইজন লোক উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ ইহাদের অর্থের সফলতা লোকের অন্ন দান এই প্রধান দৃষ্টান্ত দেখিলে বড়ই আনন্দিত হওয়া যায়

যাক বাজে কথায় অনেক দূরে আসিয়াছি। এখন সামান্য দুই চারিটী কথা ঐ ভোটান সম্বন্ধে লেখা যাউক। এই মাকড়াপাড়ার সীমানার পরই ভোটান রাজ্য। সম্প্রতি পাহাড়ের তলে, এবং উপরে যে স্থানে আবাদ হইতে পারে, এইরূপ সমস্ত জমি এই বাগানের আবাদের জন্য লইবেন। এজন্য ম্যানেজার বাবু সম্প্রতি বন্দোবস্ত করিতে ভোটানের বিচারকের নিকট যাইবেন; ঐ বিচারক মহাশয় কার্লি বং নামক স্থানে থাকেন, সেখানে ভোটান রাজ্যের দরবার সেই প্রধান বিচারক কাজী সাহেবের নিকট হয়। সেখানে ইংরাজের পলেটীক্যাল এজেণ্ট একজন আছেন, তাঁহার নাম মিঃ হোয়াইট। সেই সমস্ত স্থানে কোন কাজের জন্য গেলে প্রথমে ঐ পলিটিক্যাল এজেণ্ট সাহেবের দ্বারায় দরবার করিতে হয়, তদপর সফলতা হয়। সম্প্রতি ভোটানের রাজা, যিনি ধর্ম্মরাজ নামে পরিচিত, তিনি সেখানে নাই; তাঁহার শূন্য সিংহাসনে তাঁহার নিম্নে যিনি দেবরাজ ছিলেন তিনিই বসিয়াছেন। এজন্য বোধ হয়, আজকাল আর তেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব নাই। ওখানে দুইজন রাজা আছেন, যিনি প্রধান রাজা তিনি ধর্ম্মরাজ নামে খ্যাত। এবং যিনি দ্বিতীয় রাজা তিনি দেবরাজ নামে পরিচিত, এখন ধর্ম্মরাজ নাই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন এজন্য বা তাঁহাদের গৃহের অন্য কোন কারণে রাজ্যে অনেকটা পরাধীনতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এদিকে রাজা নাই, দ্বিতীয় কাজী সাহেব বিচারককে নানারূপ প্রলোভনে ইংরাজরাজ ভুলাইয়া তাঁহাকে যাহা বলিতেছেন তিনি তাহাই করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। ইত্যাদি নানা কারণে ভুটানের স্বাধীনতার মূলে ইংরাজ রাজ ধীরে ধীরে কুটরাঘাত করিতে ছাড়িতেছেন না। ভারতের সকল রাজ্যগুলির মূলেই এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া ইংরাজ রাজ ঢুকিয়াছিলেন, এখন যাহা সুখের বলিয়া ঐ ভোটান বাসীরা ভাবিতেছেন, পরিণামে তাহা কত দুঃখের ও কত অনুতাপের হইবে। ভারতবর্ষও যখন মুসলমান রাজ্য ছিল, তখন নানারূপ কৌশল অবলম্বনে হিন্দুরা এবং মুসলমানেরা এই ইংরাজকে আনিয়া ভারত সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, এখন তাহার ফলভোগ কত সুখময়, তাহা ভারতবাসী ভোগ করিতেছেন। সেইরূপ ভোটানের অবস্থাও যে না হইবে এরূপ নহে। আজকাল একরূপ কর্ত্তাই ভোটানের মন্ত্রীর হোয়াইট সাহেব। তিনি যাহা বলিবেন, কাজী সাহেব তাহাই করিবেন।

এখানকার প্রধান বিচারকের নাম কাজী সাহেব। যেমন আমাদের গবর্ণর সেইরূপ তাহাদের একজন গবর্ণর কাজী সাহেব। তিনি এখন ইংরাজের কলের পুতুল। ইংরাজ যে ভাবে তাঁহাকে চালায় সেই ভাবেই তিনি চলিতেছেন। সম্প্রতি কতকদিন হইল চামুর্চী নামক স্থানের উপরে একটী তাম্রখনি ভোটে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাও শুনিতেছি ইংরাজরাজ বন্দোবস্ত করিয়া লইবে। ভোটানবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম উপাসনা করিয়া থাকে, কতকগুলি স্থান লইয়া একজন ধর্ম্ম যাজক লামার অধীন, ইহারা মদ্যপ্রিয়, এবং মিষ্টভাষী, স্বভাবতই ইহারা শান্ত প্রকৃতির। স্ত্রীলোকগুলি দেখিতে সুন্দরী, নাকগুলি চাপা। গায়ে দুর্গন্ধ জন্য নিকটে যাওয়া কষ্ট। ইহারা প্রায় অর্দ্ধ সিদ্ধ মাংস খায়। গরু ও শুয়ার সমস্ত মাংসই খাইয়া থাকে। সকলেই মস্তকের সহিত একগাছি তোয়ালে দিয়া পিঠের উপর বোঝা টানিয়া থাকে।

পূরিল না আশা দেবী এ জীবনে আর।
নিভৃতে নিকুঞ্জ বনে, মিলি মিশি দুই জনে;
আনন্দে হ'ল না গাঁথা মালতীর হার।
মধুর সৌরভে মেতে, সুখ পৌর্ণমাসী রেতে;
হ'ল না সে আয়োজন প্রকৃতি পূজার॥
পূরিল না আশা দেবী এ জীবনে আর।
কোকিল পাপিয়া মুখে, আর না শুনিব সুখে;
লোলিত পুরবি সিন্ধু বসন্ত বাহার।
প্রাণের আকুল গান, হ'য়ে গেল অবসান;
হইল নীরব চির বীনার ঝঙ্কার॥

মধুর প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণে আনন্দ ধরে না; তাই হতাশ প্রাণে নিরাশা সমুদ্রে ভাসিয়া এইটী মনে আসিল। বসন্তের মধুর মহিমা শ্রবণে প্রাণ বড়ই আকুল। জীবনের অনন্ত আশাও মিটে না, তাই লিখিলাম ব্যভিচার ও যথেষ্ট আছে। দূরে ঐ যে সমস্ত পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে, উহা বিশ্ববিধাতার একখানা মানচিত্র। ওখানে যেন প্রকৃতি দেবী বসিয়া খেলা করিতেছেন। মানবের ছলনাময় মন তাই তাঁহার রচনার কৌশল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এদেশে যত শীত এবং তত গ্রীষ্ম। প্রত্যেক স্থানেই চা বাগান। তাহারই সৌন্দর্য্য কত সুন্দর ও রমনীয়। মানুষের তৈয়ারি

এবং প্রকৃতি তৈয়ারি এই দুই সৌন্দর্য্য এখানে সমভাবে বিরাজিত। আরও অনেক বিষয় দেখিবার এবং জানিবার আছে, তাহা বারান্তে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রী কেদারনাথ ভৌমিক।

সাধ।

আঁধার রজনী-কোলে তারকা মধুর হাসে।
বনলতা ধীরে দোলে শিশির নীরবে ভাসে॥
আমার পরাণ আজি তোমারে হেরিতে চায়।
গাথিয়া কুসুম রাজি পরাতে তব গলায়॥
তোমার প্রেমের হাঁসি শোভা দিবে এ জীবনে।
স্বরগ কুসুম-রাশি অমিয় ঢালিবে প্রাণে॥
তোমার সুন্দর মুখ আঁকিয়া রেখেছি প্রাণে।
যখন পাইব দুঃখ দেখিব সে ছবি প্রাণে॥
বনের বিহগ ডাকে বালিকা বলিয়া মোরে।
ফুলসাজে সাজাইয়া দেয় ফুলবালা মোরে॥
নদী বলে বালিকারে তোরে বড় ভালবাসি।
সাধ হয় বুকে করে প্রেমনীরে সুখে ভাসি॥
আকাশ হাসিয়া বলে বালিকা আয়রে হেথা।
তোরে লয়ে দুলে দুলে বলিব মনের কথা॥
সমীরণ অতি ধীরে মম মনে বলে মোরে।
বালিকা একটী গানে মোর প্রাণ খুলে দেরে॥
আমার বালিকা নাম সকলেই ভাল বলে।
তুমি কেন প্রাণনাথ বালিকা নাম না রাখিলে॥

শ্রীমতী সরমাসুন্দরী দেবী।

বর্ণ-ধর্ম্ম ।

(ত্রিগুণ-বর্ণভেদ ।)

ভারতীয় ঋষিগণ জগতের তাবৎবস্তু লইয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন—বস্তুজাতের গুণাবলী পরীক্ষা করিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রেণী-বিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, স্থাবর, জঙ্গম সকল বস্তুতেই যে সকল গুণাবলী দেখা যায়, তৎসমুদয় তিনটী গুণ প্রধাণের রূপান্তর মাত্র। সেই ত্রিগুণ সত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ব প্রকাশাত্মক অর্থাৎ জগৎ বিকাশের স স্তুতরাং সত্বগুণ বিকাশ স্বভাব। গীতাও সেই কথা বলিয়াছেন ;—

> সত্বং রজস্তম ইতিগুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
> নিবধ্নাতি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্ ॥
> তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ন্।
> সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গিন চানঘ ॥'
>
> ১৪ অঃ ৫।৬ শ্লোক।

হে মহাবাহো! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে স্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে। হে অনঘ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্ব হেতু (জ্ঞানের) প্রকাশক এবং অনাময় (শান্ত) সত্বগুণ (দহীকে) সুখসঙ্গ দ্বারা (সুখ আসক্তি দ্বারা) এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা (জ্ঞানকে আসক্তি দ্বারা) বদ্ধ করে। (আরামিশনের অনুবাদ) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে; সত্বগুণের দুই ধর্ম্ম তাহা জ্ঞানরূপে প্রকাশক এবং নির্ম্মলত্ব হেতু শান্তিময়। সত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথা,—

> 'সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
> প্রমাদ মোহো তমসো ভবতোঽজ্ঞান মেবচ ॥
>
> ১৪ অ,—১৭ শ্লোক।

রজঃ চাঞ্চল্যপ্রদ। রজো গুণ প্রধান ব্যক্তিরা প্রবৃত্তি-পরায়ণ। প্রবৃত্তি-পরায়ণতা-হেতু কর্ম্ম প্রধান। সাত্বিক লোকেরা যে কর্ম্ম করেন না, তাহা নহে। তাঁহারাও কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু তাহা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত। সাত্বিক কর্ম্মের সব প্রধান নির্ম্মলতাই ফল। রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা

কর্ম্ম দ্বারাই জগতে বিখ্যাত হইয়া থাকেন। রজোগুণ অনুরাগের কারণ, তাহা অনুরাগ পূর্ণ। তাই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;—

'রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥"

১৪ অঃ—৭।

হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে রাগাত্মক অর্থাৎ অনুরাগাত্মক এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন জানিও। তাহা দেহিকে কর্ম্ম সকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। এই হেতু রজোগুণ অদৃষ্টার্থক ও দৃষ্টার্থক ক্রিয়া সকলে আসক্ত করিয়া জীবকে বদ্ধ করে।

তমোগুণ অজ্ঞান সম্ভূত এ জন্য সকল প্রাণীর মোহজনক। ইহা অনবধানতা, অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতা দ্বারা দেহীদিগকে আবদ্ধ করে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই তিন গুণ সকল বস্তুতেই আছে। তবে যখন একগুণ কোনও বস্তুতে অন্য গুণদ্বয়কে অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয়, তখনই সেই গুণের প্রাবল্য বশতঃ সেই বস্তুকে তদগুণাত্মক কহে। সত্ত্বগুণী বলিলে সত্ত্বগুণ প্রধান বস্তুমাত্র বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র সত্ত্বগুণান্বিত নহে। এ কথাও ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

১৪ অ, ১০।

হে ভারত! কদাচিৎ রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়; সত্ত্বএবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ উদ্ভূত হয়; আর সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হয়। সত্ত্ব প্রধান দ্রব্য সাত্ত্বিকগণের, রজোগুণ প্রধান দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির এবং তমোগুণ প্রধান দ্রব্য তামসগণের প্রিয়। সুতরাং সত্ত্ব প্রধান দ্রব্য আহারে যে সত্ত্বের পুষ্টি হইয়া মানব প্রকৃতি সত্ত্ব প্রধানা হইবে, ইহা স্থির নিশ্চিত। প্রকৃতি জাত দ্রব্য মাত্রেই এই ত্রিগুণ লীলা। অতএব মানবও ত্রিগুণযুক্ত। এই গুণভেদ সকল জাতির মধ্যেই আছে। তবে প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অন্য কোনও দেশে অদ্যাপি হয় নাই এবং সেই প্রকৃতির যাহাতে পুষ্টি হয়, তদনুযায়ী শিক্ষা, আচার ব্যবহার বিধি নিষেধাদিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহা কেবল মাত্র ভারতেই হইয়াছে। অই পাশ্চাত্য

জাতির নিকট ভারতীয় বর্ণভেদ ও বর্ণানুকূল আচার ব্যবহার বিধি নিষেধ অতি কুসংস্কার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা অভিজ্ঞানের ফল, তাহা অতি অজ্ঞানোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক, সত্ব প্রধান মানবগণকে ঋষিগণ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দিয়াছেন, রজঃ প্রধানকে ক্ষত্রিয়, রজস্তম প্রধানকে বৈশ্য এবং তমোগুণীকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বর্ণ সৃষ্টি সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন;—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদবাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ। ঋগ্বেদ সংহিতা।

ইঁহার (বিরাট পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ হইল। বাহু যুগল রাজন্যকে করিলেন। ইঁহার উরুযুগল বৈশ্য হইল। পাদ যুগল হইতে শূদ্র হইল।

(শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ীকৃত অনুবাদ)

শুদ্ধ ঋগ্বেদ নহে, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ব বেদেও এই মন্ত্রটী আছে। তবে অথর্ব্ববেদে একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ভাবার্থ একই। যাহা বিরাটের মুখ তাহাই ব্রাহ্মণ, যাহা বাহু তাহাই ক্ষত্রিয় এবং যাহা উরু মধ্যাভাগ তাহাই বৈশ্য। এস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিতে এক এক জন ব্যক্তি মাত্র নহে, সকলই সমষ্টি অর্থে বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব এবং বৈশ্যত্বযুক্ত লোক সমষ্টিই ব্রহ্মার কায়া। ব্রহ্মা শুদ্ধ জাতি বিশেষে আবদ্ধ নহেন, সর্ব্ব জাতিতে তিনি বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ যে প্রাকৃতিক, তাহা যে মানবকৃত নহে, তাহা শুদ্ধ বেদ বলিতেছেন না। ভগবান মনু এবং গীতাও এই কথা বলিতেছেন,—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

মনু ১ম অঃ ৩১ শ্লোক।

পৃথিব্যাদি লোক সমূহের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেলেন। (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্ক রত্নের অনুবাদ)

অতএব দেখা যায় যে, মনুর মতেও সৃষ্টির প্রারম্ভেই অর্থাৎ সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল;—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তার মব্যয়ম্॥ ১৩॥

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। তাহার কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমাকে অব্যয় এবং অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে পুরাণ করে মহর্ষি বেদব্যাস কি বলেন। অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ প্রাচীনত্বে ও পারিভাষিক সূত্রে সমধিক প্রামাণিক। বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে,—

'ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরু বক্ষঃ স্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতা॥ বিষ্ণু পুরাণ—১।৬।৬।

বিষ্ণু পুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ মহাপুরাণেই বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ বচনই লিখিত হইয়াছে। এখন এক একটী বর্ণ লইয়া সেই বর্ণের স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কি, আমরা তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীভগবান গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে বর্ণ-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগুর্ণৈঃ॥
১৮ অঃ ৪১ শ্লোক।

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জব মেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২॥

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল পূর্ব্বজন্ম সংস্কার জাত গুণ দ্বারা বিশেষ রূপে বিভক্ত। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজাত কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংহিতাকার মনু বলেন ;—

অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহ শ্চৈব ব্রাহ্মণা-নামকল্পয়ৎ। মনু ১।৮৮।

বেদাধ্যয়ন্ অধ্যাপন, যজন, যাজন দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—

'শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা) দান ও ঈশ্বর ভাব এই [illegible]ল ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

সংহিতাকার মনুও তাহাই বলেন,—

প্রজানাং রক্ষণংদানমিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।

মনু ১ অ, ৮৯ শ্লোক।

প্রজারক্ষা, দান যজ্ঞ, বেদাদি অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। বৈশ্যের ধর্ম্ম,—

কৃষি গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।

গীতা ১৮।৪৪।

কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্য দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

মনু বলেন,—

পশুনাংরক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ।

মনু ১।৯০।

পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কৃষি ও কুসীদ ব্যবহার বৈশ্যের কর্ম্ম।

শূদ্রের ধর্ম্ম,—

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। গীতা ১৮অ-৪৪।

পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রদিগের স্বভাব অর্থাৎ পরিচর্য্যাই একমাত্র শূদ্রধর্ম্ম।

মনু বলেন,—

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশেৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া। মনু ১।৯১।

দ্বেষ শূন্য হইয়া একমাত্র অপর বর্ণত্রয়ের সেবাই শূদ্রধর্ম্ম। ইহাই বর্ণধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও জাতীয় বৃত্তি সম্বন্ধে যথাসাধ্য শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করা গেল। উহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গুণ ও কর্ম্মই বর্ণভেদের মূল। প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না, তৎপরে গুণ ও কর্ম্মের বিভিন্নতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য।

বসন্তে বিরহিণী রাই।

(১)

আবার কি পুনঃসখি বসন্ত উদয় ?
আবার কি তরুতলে,
পল্লবে মুকুলে ফলে,
সাজাইছে কায়,—
আবার কি পুনঃসখি, বসন্ত উদয় ?

(২)

আবার কি কুহুতানে কুজিবে কোকিল ?
আবার কি ঝুর্ ঝুর্
বহিবে মৃদু-মধুর
মলয় অনিল ?
আবার কি কুহুতানে কুজিবে কোকিল ?

(৩)

আবার কি গুন্ গুন্ গুঞ্জিবে ভ্রমর ?
আবার, কি কুতুহলে,
বেড়াইবে ফুলে ফুলে
মত্ত মধুকর ;—
আবার কি গুন্ গুন্ গুঞ্জিবে ভ্রমর ?

(৪)

আবার কি শাখী-শিরে শিখিনী-সুখিনী,
পুলকে পেখম ধরে,
মাতিবে আমোদ ভরে,
নাচিবে তেমনি ;—
আবার কি শাখী-শিরে শিখিনী সুখিনী,

(৫)

আবার কি চক্রবাক চক্রবাকী সনে,
শুক শারী সুখ মনে,
কোকিল কোকিলা সনে,
মাতিবে মিলনে ;—
আবার কি চক্রবাক চক্রবাকী সনে ?

(৬)

আবার কি কুঞ্জ সখি সাজিবে তেমন ?
সোহাগে লতিকা কুলে,
দুলিবে তরুর কোলে,
আনন্দে মগন ;—
ফুলে ফুলে উজলিয়া
সৌরভে আমোদি হিয়া
ব'বে সমীরণ ;—
ভ্রমর ঝঙ্কার শুনি,
শিহরি উঠিবে প্রাণী
মাতিবে মদন ;—
আবার কি কুঞ্জ সখি সাজিবে তেমন ?

(৭)

আবার কি মাধবী লো তমালে বেড়িয়া,
ভূষিয়া ফুলাভরণে,
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে,
আবেগে প্রাণের কথা কহিবে খুলিয়া,—
আবার কি মাধবী লো তমালে বেড়িয়া ?

(৮)

আবার কি সুখ-নীরে ভাসিবে গোকুল ?
পিককুল সুখ মনে,
কুহরি পঞ্চম তানে,
করিবে আকুল ?
আবার কি সুখ-নীরে ভাসিবে গোকুল ?

(৯)

আবার কি পুনঃ সখি পাব শ্যাম রায় ?
ত্যাজিয়া সে মধুহরে
আর কি আসিবে ফিরে,
ব্রজে ব্রজরায় ;—
আবার কি পুনঃ সখি পাব শ্যামরায় ?

(১০)

আবার কি মৃত প্রাণে পুনঃ অভিনব,
চির পরাণের তৃষা,
সুদূর প্রেমের আশা,
জাগিবে সে সব ?
জাগিল, জাগুক পুনঃ আশা নব নব।
আসিল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার।

মাসিক সংবাদ।

ময়মনসিংহ সুহৃৎ সমিতির সভ্য জিতেন্দ্রনাথ রায়, হেমচন্দ্র এবং নরেন্দ্র ও অধর নামক যুবকচতুষ্টয় পুলিশকে প্রহার করা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহারা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

দ্বারবঙ্গ সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য বাবু ললিতেশ্বর সিংহ বর্ত্তমান মহারাজের নামে যে নালিশ করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের আদিম বিভাগে সেই মোকদ্দমায় তিনি পরাজিত হন। ললিতেশ্বর বাবু আপীল করিয়াছেন।

মার্টিন কোম্পানীর আফিসের হেনড্রী নামক জনৈক কর্ম্মচারী গুড্ ফ্রাইডে ছুটী উপলক্ষে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং দ্বিচক্র যানারোহণে যাত্রা করেন। ইহার পর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। গত শনিবারে সংবাদ আইসে, তিনি দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিয়াছেন।

সে দিবস ৩১ জন আন্দামান দ্বীপে কারাদণ্ড ভোগ করিয়া প্রত্যাগমন করে। ইহাদিগের মধ্যে তিনটী স্ত্রীলোক ছিল। এই স্ত্রীলোকত্রয় তথায় বিবাহ করিয়াছিল। ইহাদিগের সাতটী সন্তানও হইয়াছে। কারামুক্ত ব্যক্তিদিগকে পুলিশ তাহাদিগের স্ব স্ব জন্মস্থানে প্রেরণ করিয়াছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্তে দুর্দ্ধর্ষ জাকাখেল জাতিকে দমন করিতে না করিতে মোমান্দজাতি "রণং দেহি" "যুদ্ধং দেহি" রবে রণতাণ্ডবে নিমগ্ন হইয়াছে। মোমান্দের যোদ্ধৃসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে প্রায় বিংশতি সহস্র হইবে। কাজেই ইংরাজকে সমরার্থ প্রস্তুত হইতে হয়। ইংরাজ তখন বুঝিতে পারেন নাই মোমান্দের পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে কাবুলের আমীরের সেনা দণ্ডায়মান হইবে।

মোমান্দদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত ইংরাজ বিপুল আয়োজন করেন। মোমান্দদিগের সহিত ইংরাজের অস্ত্রপরীক্ষা হইল। মোমান্দেরা ইংরাজের সীমান্ত রাজ্য আক্রমণার্থ অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজ সেনানী উইলকক্টর হস্তে মোমান্দেরা পর্য্যুদস্ত হয়। অবশেষে ইংরাজ সীমা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পলায়ন পর হন।

কেহ কেহ তখন অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সীমান্ত সমরের অবসান এইখানেই বুঝি হইল। কিন্তু তাহা হইল না। এই যুদ্ধে প্রথমাবধি মোল্লারা ইংরাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধই ঘোষণা করিতে থাকেন। সুকি মোল্লা এবং হজরৎ মোল্লা নামক দুই জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ মোল্লা পার্ব্বত্য জাতিকে উত্তেজিত করিতে সচেষ্ট হন। সুকি মোল্লার আফগান ভূমিতে খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সুতরাং তাঁহার প্ররোচনায় আফগান সৈন্যেরা মোমান্দদিগের সাহায্য করিতে লাগিল।

সুকি মোল্লা নাকি কাবুলের আমীরকেও ইংরাজর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বলেন। কিন্তু আমীর তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাই আমীরের উপর আফগানেরা নাকি বিরক্ত হইয়াছে। আমীরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নসিরুল্লা খাঁ এই সুযোগে, ইংরাজের শত্রুতাচরণ করিয়া আফগানদিগের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমীর মরিয়াছে বলিয়া মাঝে একটা জনরব উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে, তাহা অমূলক।

এদিকে দলে দলে আফগান যোদ্ধা ইংরাজের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়। অনুমান ৮।১০ হাজার আফগান যোদ্ধা মোমান্দদিগকে সাহায্য করে। শত্রুরা বারংবার ইংরাজকে আক্রমণ করে। লণ্ডি কোটাল নামক স্থানে আফগানেরা আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে পশ্চাৎপদ হয়। বলা বাহুল্য, উভয় দলে হতাহতের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় নাই।

বিলাতের রক্ষণশীল দলেরা আমীরের উপর দোষারোপ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, আমীর ইচ্ছা করিলে আফগান সেনাকে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে নিবারণ করিতে পারিতেন। আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে রক্ষণশীল দল পরামর্শ দিতেছেন।

আবার আফগান যুদ্ধ হইবে কি না বলিতে পারা যায় না। তবে যেরূপ কানাঘুষা শুনা যাইতেছে তাহাতে আমীরের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ সংঘটন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজ সীমান্তে বিষম সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। ভারতবর্ষস্থ দুর্গ, সেনানিবাস প্রভৃতি সৈন্যশূন্য হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আফগান যুদ্ধ বাধিলে নিরন্ন, দুঃস্থ ভারতবাসীর শোনিত সম অর্থের যে শ্রাদ্ধ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

ভয়ানক কাণ্ড, বিষম ব্যাপার। বিহারে মজঃফরপুরে দুইটী বাঙ্গালী বালক ক্ষুদিরাম বসু এবং দীনেশচন্দ্র রায় বোমা নিক্ষেপ করিয়া দুইটী শ্বেত মহিলার প্রাণনাশ করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া সমগ্র ভারতে হুলস্থূল পড়িয়াছে।

প্রকাশ পাইয়াছে, কলিকাতার একটা গুপ্ত সমিতি ছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ভারতের ইংরাজ রাজ্যের মূলোৎপাটন, অত্যাচারী রাজপুরুষ হত্যা। এই সমিতির আড্ডা কলিকাতার নানা স্থানে ছিল। মাণিকতলার মুরারি বাগানে প্রধান আড্ডা। এখানে বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া মাণিকতলা, হ্যারিসন রোড প্রভৃতি স্থানের কয়েকটা বাটী খানাতল্লাসী করে। তথা হইতে বোমা, টোটা, ডিনামাইট, কয়েক প্রকারের এসিড প্রভৃতি পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার সহোদর বরেন ঘোষ প্রভৃতি ৩০।৩৫ জন যুবক ও বালক ধরা পড়িয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কয়েক জন সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত বলিয়া ক্ষুদিরাম ঘোষ ওয়ালী ষ্টেশনে একটা মুদির দোকানে খাবার খাইবার সময় ধরা পড়ে। মোকামা ষ্টেশনে দীনেশ ধরা পড়িবার উপক্রম হওয়ায় পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে। ইহাদিগের বিচার চলিতেছে।

বৈদিক ভারত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৈদিক-ধর্ম্ম যদিও মানসিক পূজায় নির্ম্মিত, যদিও তাহাতে ভাস্করের শিল্প-চাতুর্য্য খচিত মনোহর মূর্ত্তি অথবা লোক মনোমুগ্ধকর সাজ সজ্জাদির বিশেষ আড়ম্বর নাই তথাপি বৈদিক-ধর্ম্ম স্বাত্বিক, নির্দ্দোষ এবং স্পৃহনীয়। যে প্রত্যক্ষ এবং উপকারক তাঁহার স্তুতি পাঠ করা কি অতীব মধুর এবং প্রাণস্পর্শী নহে ?

বৈদিক ভারতে অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ ক্রম নিম্ন বিধানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি সকলেই অপর জাতীয়া অনূঢ়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন।

বৈদিক ধর্ম্ম যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডে ভূষিত। যজ্ঞ সম্পাদন নিমিত্ত যজ্ঞ বেদিকার উদ্ভব। উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গঠিত হইত। উহাদের কোনটী চতুস্কোণ, কোনটী অষ্ট কোণ ইত্যাদি বিবিধাকারে নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যজ্ঞ বেদিকা প্রস্তুতি হইতেই জ্যামিতি শাস্ত্রের প্রথম উদ্ভাবন।

আর্য্যগণ চিত্রাঙ্কন বিষয়েও উদাসীন নহেন। যজ্ঞাঙ্গভূত বিচিত্র-বর্ণ শোভিত নানাবিধ মণ্ডল প্রস্তুত বিষয়ে আর্য্যগণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। উহাদের কোনটী অষ্টদল, কোনটী শতদল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে আখ্যাত।

"আলিখেৎ কল্প লতিকা দল পুষ্প সমন্বিতা।"

বাক্যই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

ভারতীয় বৈদিক আর্য্যগণ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন। বেদের অনেক স্থলে ঐরূপ অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১)

আর্য্যগণ কার্পাসের ব্যবহার জানিতেন। বস্ত্র বয়নে, কৃষি কার্য্যে, বাণিজ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং জ্ঞানোন্নতি সভ্যতা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাহারা অতি প্রাচীনকালে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

(১) মল্লিখিত 'ভারত-গৌরব' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'অবসর'......চতুর্থ সংখ্যা। ভাদ্র ও আশ্বিন।

এইরূপে বৈদিক ইতিহাসের যেস্থলেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিবে—সেই স্থলেই দেখিবে—উহা আর্য্য জ্ঞান-গরিমায় উদ্ভাসিত। উহার প্রতি ছত্র, প্রতি অক্ষর, প্রতি পৃষ্ঠা যেন আর্য্যোন্নতির উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদানে অগ্রসর। প্রতি পৃষ্ঠা যেন স্বকীয় জ্বলন্ত অক্ষর খুলিয়া জগতকে দেখাইতেছে—

ভারত জ্ঞানের ভূমি—ঐশ্বর্য্য আকর।

প্রতি অক্ষর যেন স্বীয় গৌরবে ফুলিয়া ফুলিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে পার্থিব মানবকে বলিতেছে—

সুসভ্য প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মগুণ ধর॥

ভূমিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেখিবে—কে যেন অবিনশ্বর বর্ণে তুলিকা দ্বারা আঁকিয়া রাখিয়াছে—

আর্য্য মহিমায় জগত উজ্জল।
আর্য্য জ্ঞান-গর্ব্ব পবিত্র অমল॥

আবার প্রতি পংক্তি যেন জগতকে কুটিল-কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ করতঃ আত্মোন্নতির হিরণ্ময়-মুকুটে শির শোভিত করিয়া থাকিয়া থাকিয়া জাতীয় গাঁথা গাহিতেছে—

"ভারত কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুজিত সকলে, পূজিত সকলে,
অনন্ত জগত, যুনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।"

পাঠক! বৈদিক ইতিহাসের দুটী পৃষ্ঠ দেখিয়াই গরিমায় দিশাহারা হইও না। প্রাচীন গৌরবে পুলকিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থাকে বিস্মৃতি সলিলে নিক্ষিপ্ত করিও না। ঐ শুন—বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ কোটী ক্ষীণ কণ্ঠ ভারত সন্তান দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে থাকিয়া থাকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছে—

হায়রে সেদিন আজিরে কোথা!

ভারত বাসী! বৈদিক চিন্তার স্বর্গীয় পূত প্রবাহে অপসারিত করিয়া একবার বর্ত্তমান জাতীয়-ইতিহাস পড় দেখি ভাই—

ওকি পড়িতেছ? এ যে অধঃপাতের চরম দিবসের বিষাদ-বিলীন কাতরোক্তি! ভারত সন্তানের মোহজাত ঈর্ষা, ঘৃণা, গর্ব্ব, স্বার্থপরতা ও অলসতার জলন্ত উদাহরণ। যে স্থলে সামগানের পবিত্র-নাদ, সেস্থলে বনবিহারী শৃগালাদির 'কেয়াহুয়া'। যেস্থলে ধার্ম্মিকের স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার জলন্ত ছবি প্রকটিত, সেস্থলে অধর্ম্ম-পিশাচের রক্ত লোলুপ তাণ্ডব নৃত্য। যেস্থান শান্তির বিমল জ্যোৎস্নায় আলোকিত, তথায় অশান্তি, অরাজকতা ও আত্ম প্রাধান্যের তমিস্রাময়ী ভৌতিক খেলা।

এসকল দেখিতে দেখিতে কি তুমি হতাশ-হৃদয়ে কর্ত্তব্য পথ স্খলিত হইবে? স্বদেশ হিতৈষীর স্বদেশ হিতৈষণার অক্ষয়-পদাঙ্কে মাতৃ-ভূমিকে বিচিহ্নিত না করিয়া কি আলস্য-পিশাচকে হৃদয় রাজ্যের অধিপতি করিতে প্রয়াসী হইবে? দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজের জন্য কি একটুও তোমার প্রাণ কাঁদিবে না? ছিঃ—

ভয় নাই—মাতৃ সেবী হও—মাতৃ-কলঙ্ক মোচনে সিদ্ধহস্ত হও—হতাশে, আলোকে, আঁধারে, বিষাদে, সুখে, দুঃখে মাতৃ মূর্ত্তিকে হৃদয়-পটে অঙ্কিত কর। আবার মৃত-ভারত বৈদিক জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া সমস্ত জগৎ প্রতিবিম্বিত করিবে।

আকাশের পটে চাহিয়া দেখ—দিগন্তব্যাপী আগুনের খেলা—পূর্ব্বে—দক্ষিণে—মধ্যে—চারিদিকেই আগুনের গড়—আগুনের মূর্ত্তি—আগুনের পাহাড়। কত জ্বলিতেছে—কত পুড়িয়াছে—কত তেজোগুপ্ত হৃদয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া তপনের কোলে আশ্রয় লইতেছে। সেখানেও আগুন—কেবল আগুনের ছুটাছুটি। মাঝখানে ঐ অচলা,—অটলা—ক্ষুব্ধা,—দলিতা—মথিতা—রত্নহারা ভারত জননী। নেত্রে আশীষ ধারা প্রকটিত। দক্ষিণ হস্তে শক্তি। বাম হস্তে অভয়। পদতলে কে যেন কোটীসূর্য্য সম জলন্ত আগ্নেয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে—

উত্তিষ্ঠ! জাগ্রত! যশোলভস্ব!

শ্রীরাসবিহারী রায়।

মার্কুইস ইটো।

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জাপানের রাজনীতি-গগনে সর্ব্বোজ্জ্বল গ্রহ। জাপানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সকল শ্রেণীর লোকই ইটোর নাম সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। জাপান সম্রাটের এতাদৃশ বিশ্বাসী ও উপযুক্ত কর্ম্মদক্ষ মন্ত্রী আর নাই। এক্ষণে জগতের দৃষ্টি জাপানের দিকে পড়িয়াছে। সুতরাং জাপান মন্ত্রীর উপযোগিতা এবং জাপানের অভ্যুদয়, সমস্ত জগতের আলোচ্য হইয়াছে। শত শত বর্ষে এক এক জাতির অভ্যুদয় হয়। চল্লিশ বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সামান্য জাতির প্রধান শ্রেণীভুক্ত হওয়া এক জাপান ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মার্কুইস ইটো ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবিতকালে জাপানের যত পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে,—তিনি স্বয়ং স্বদেশের ও স্বকীয় সম্প্রদায়ের যেরূপ উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। আলেকজণ্ডার ও বোনাপার্টি, সিজার ও সার্লেমন, হানিবল ও গ্যারিবল্ডি, কাহারও জীবনে এক দেশের এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং মার্কুইস ইটো সকলের লক্ষ্যস্থল হইয়াছেন। ইহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধিই যে জাপানের অভ্যুদয়ের মূল, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

দেশের সেবাতেই ইনি জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। পররাষ্ট্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই, ইনি যোগ্যতার [illegible] প্রদান করিতেছেন। যৌবনোদয়েই ইটো কাউন্ট ইনোয়ের [illegible] শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সেই শিক্ষার্থী, এক্ষণে জাপানের মহাপুরুষ স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরই ইটোর কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পায়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইটো, হায়গোর গবর্ণর নিযুক্ত হন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি আর ব্যয় বিভাগের সহকারী মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি আয় ব্যয় বিভাগের সহকারী মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থপদ্ধতি শিক্ষা করিবার জন্য ইনি আমেরিকায় গমন করেন; সেখানে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি মন্ত্রী সভার সভ্য হইলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম তিন বৎসর সহকারী মন্ত্রী সভা উজ্জ্বল করেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ইনি সম্মানাস্পদ ও দায়িত্বপূর্ণ বহুপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন

এবং দেশের হিতকামনায় অকাতর পরিশ্রমের জন্য ক্রমে কাউন্ট উপাধি লাভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয় মন্ত্রী সভা গঠিত করেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে চীন যুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময়ে দেশের বিপদে প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য ইহাঁকে মার্কুইস পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মার্কুইস তৃতীয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অল্পকালস্থায়ী চতুর্থ মন্ত্রী সভা গঠিত করেন।

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই হউক, অথবা অবসরকালেই হউক, মার্কুইস ইটো, জাপানের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক পুরুষ বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বিপদকালে সকল দলের রাজনৈতিকগণই এই বৃদ্ধ অভিজ্ঞ রাজনীতি-বেত্তার পরামর্শের প্রতীক্ষায় [illegible]হার গৃহে দলে দলে আগমন করিয়া থাকেন।

[illegible] জাপানের [illegible] সত্ত্বেও বহুবার ইটোকে পররাষ্ট্র বিভাগের [illegible] কে [illegible] হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইটো, যুবরাজ ইবাকুরার সহিত প্রথমে ইউরোপে এবং আমেরিকায় জাপানের কর্ম্মচারীরূপে গমন করেন।১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নিয়মতন্ত্র রাজ-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্ত তত্ত্বনির্ণয় ও বন্দোবস্ত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও, ইনি রুষ সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনারোহণোৎসবে জাপানের প্রতিনিধিরূপে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি চীনের সহিত কোরিয়ার বিবাদ মীমাংসার জন্য গমন করেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ অরি-সমাওয়র সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসবে যোগদান করেন। ইটোর রাজকার্য্যের এবং সাধারণ নিয়োগের এ প্রকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেশের জন্য তাঁহার অকাতর পরিশ্রমের অতি সামান্য আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইটো দেশের লোককে বুঝাইলেন এবং তাহারাও সহজে বুঝিল যে, উন্নতিশীল সময়ে তাহাদের অনেক প্রাচ্যরীতি নিরর্থক এবং অপকারী। ইটোর কথায় তাহারা আপনাদিগের অস্ত্র শস্ত্রের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য অস্ত্র-বিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিল। প্রাচ্য নৈতিক শক্তি এবং পাশ্চাত্য কার্য্যতৎ-পরতা উভয়ের সম্মিলনে জাপান এত উন্নত হইয়া উঠিল। এই পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইটো স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশাসনের পরিবর্ত্তে নিয়মতন্ত্র রাজ শাসন পবর্ত্তিত করিলেন।

সেনা বিভাগ ও নৌ বিভাগে মার্কুইস ইটোর বিশেষ যত্ন এবং উহাদের উন্নতি কল্পে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি যে পরিশ্রম করিয়া-

ছিলেন, তাহার ফলে জাপান, চীনকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মার্কুইস ইটোর বীর মূর্ত্তিও শক্তির অনুরূপ। তাঁহার কেশ এবং শ্মশ্রুরাজি এক্ষণে শ্বেতাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নেত্রে অথবা কণ্ঠস্বরে বার্দ্ধক্যের চিহ্নমাত্র নাই। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায়, ইহার একটী ইউরোপীয় ও একটা জাপানীয় রীতিক্রমে নির্ম্মিত গৃহ আছে।
ইঁহার ভবনে দেখিবার অনেক বস্তু আছে। তন্মধ্যে রাজ বংশের শিশুগণের প্রতিকৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপদ। উভয় বাটীর প্রকোষ্ঠগুলি সজ্জিত এবং গৃহতল প্রাপ্ত উপঢৌকন ও উপহার রাশিতে পরিপূর্ণ।

১৯০০খৃষ্টাব্দে ইটো নিয়মতন্ত্র রাজনৈতিক সভা নামক একটী দল সংঘঠিত করেন। সম্রাটের অনুরোধে মার্কুইস ইটো, নিম্ন বিভাগের দলপতির পদ ত্যাগ করেন। তিনি এখন মার্কুইস ইয়ামগোটা ও কাউন্ট মট্সুকটার সহিত রাজশক্তি ও মন্ত্রীসভার মধ্যস্থতার কার্য্যে নিয়োজিত। এই মন্ত্রীসভা তাঁহার মত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের সহায়তায়, আরও অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে।

চীনের বিষয়ে মর্কুইস ইটো বলেন যে, চীনে একজন ক্ষমতাশালী সম্রাটের প্রয়োজন; নতুবা বিদ্রোহে ঐ দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। চীন সৈন্য, চীন নায়কের অধীনে থাকিলে, কখনই সুশিক্ষিত হইবে না। কারণ তাহাতে অসাধুতার প্রাচুর্য্য ব্যতীত আর কিছুরই আশা করা যায় না। তিনি বিবেচনা করেন যে, চীনের শ্রমজীবি ও ব্যবসায়ীদিগের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে, চীনে এত পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে যে, সমস্ত পৃথিবীর বাজারে তাহা প্রভুত পরিমাণে সরবরাহ করা যায়। চল্লিশ কোটী লোকপূর্ণ চীনের অর্থবল যদি কখনও জাপানীর দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে চীনের সহিত জাপানের বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং চীনবাসী সম্পূর্ণ সভ্য হইবার পূর্ব্বে জাপান বহুপরিমাণে পণ্যদ্রব্য চীনে সরবরাহ করিতে পারিবে; চীনকে দলিত না করিয়া, উহাকে উন্নত ও স্বাবলম্বী করা কর্ত্তব্য, ইহাই ইটোর অভিমত।

মার্কুইস ইটো, জাপানকে কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা এখনও সকলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে নাই। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কার্য্যের কথা কিছুই জানা যায় না। নিজের জয় ঘোষণা করা তাঁহার স্বভাব

সিদ্ধ নহে। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে তিনিই বড় উদাসীন। প্রতীচ্য সভ্যতায় ভূষিত হইয়াও, তিনি প্রাচ্য নম্রতা ভুলিতে পারেন নাই। ইটোর কার্য্যাবলী আপনা হইতেই জনসমাজে সুপরিচিত। ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঁয়ষট্টি বৎসর।

জগতে সুখ কি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে পূর্ব্বাবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া আইস এবং কিছু ফলমূলাদি ভক্ষণ কর।" আমি হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল আহার করিলাম এবং তিনিও আংশিক ভক্ষণ করিলেন। ক্ষণেক বিশ্রাম করার পর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় দর্শন! এখন তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য, বলিতে পার।" আমি বলিলাম, "প্রভু, আপনার নিকট "প্রেমই সুখ" শুনিয়া 'প্রেম' কি—অগ্রে তাহাই জানিতে উৎসুক হইয়াছি, সুতরাং তাহাই বর্ণন করুন।

সন্ন্যাসী। প্রেম যে কি বস্তু, তাহা আমি সামান্য মানব হইয়া কি বলিব! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুখে প্রকাশ করিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আমি ত কোন্ ছার!

আমি। প্রভু, তিনি প্রেম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, আমাকে খুলিয়া বলুন।

সন্ন্যাসী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্য সময় বলিব, এখন যাহা বলি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। যাহা দুইটী বিভিন্ন সত্ত্বা পরস্পর মিলিত করিয়া এক নূতন সত্ত্বায় পরিণত করে, তাহাই প্রেম;— যে আকর্ষণী শক্তি বলে একটী হৃদয় আর একটীর দিকে ছুটিয়া যায়, তাহাই প্রেম;—নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া পরেতে মিশিয়া যাওয়াই প্রেম।

আমি। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ন্যাসী। একটী প্রাণ আর একটীকে যত্ন করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে চক্ষের উপর রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কোন উপকার করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, সামান্য একটু কাজ করিতে পাইলেই নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করে—ইহার কারণই প্রেম। সে অপরকে ভালবাসে, তাই প্রিয় বস্তুর কোন কার্য্য না করিতে পাইলে দুঃখিত হয়,

আপনাকে অপদার্থ হেয় জ্ঞান করে; যাহাকে ভালবাসে তাহার সন্তোষের জন্য মরণও সুখের মনে করে—ইহার মূলেই প্রেম।

আমি। এখন একটু বুঝিতে পারিয়াছি—আমাদের পাড়ার দেবেন বাবু ধনীলোক,—বিবাহিত, কিন্তু তিনি কুসুমকুমারী নামে একটী বারবণিতার বাটী যাইতেন; কুসুম খুব সুন্দরী। দেবেন বাবু কুসুমের রূপে মুগ্ধ ছিলেন, কুসুম বলিতে অজ্ঞান, তাহার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন, অধিকাংশ সময় তাহার মনস্তুষ্টি সাধনে তাহার বাটীতে অতিবাহিত করিতেন--ইহাই বুঝি প্রেম?

সন্ন্যাসী আমার কথায় এরূপভাবে হাস্য করিলেন যে আমি বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। তৎপরে বলিলেন "প্রেম বলিলেই তোমরা একটা রমণীর সহিত সম্বন্ধ জড়াইয়া ফেল, ইহাতেই যত গোলযোগ; বাস্তবিক প্রেমের সহিত রমণীর কোন সম্বন্ধ নাই; প্রেম সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম, ইহাতে কোন বিশেষত্ব নাই; জগতের প্রত্যেক জীবকে, পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীকে এবং ঈশ্বরকে ভালবাসাই প্রেম। যাহা হউক তোমাদের দেবেন বাবু কি, এখনও স্ত্রী ছাড়িয়া কুসুমকে লইয়া বিভোর আছেন?

আমি। না, তিনি এখন আর কুসুমের বাটী যান না; স্ত্রী লইয়াই ঘরকন্না করিতেছেন।

সন্ন্যাসী। ইহা বাস্তবিক প্রেম নহে; ইহা রূপজ মোহ বলে, দেবেন বাবু কুসুমের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে ভালবাসিতে পারেন নাই! প্রেম অকৃত্রিম হীরকখণ্ড—রূপজ মোহ নকল কাচ; প্রেম অনন্ত—মোহ ক্ষণস্থায়ী। রূপজ মোহই অনেকের চক্ষে প্রেম বলিয়া অনুমিত হয়, যেমন কাচকেও হীরক বলিয়া ভ্রম হয়।

আমি। রূপজ মোহ আবার কি?

সন্ন্যাসী। সে একটা নেশা; একজন হয় ত বেশ দেখিতে সুন্দরী—তাহার রূপ দেখিয়া পাগল হওয়া; কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশায়, তাহার প্রতি যে যত্ন বা টান—রূপ লালসা মিটাইবার জন্য, তাহার উপর যে অনুরক্তি, তাহাই রূপজ মোহ। রূপজ মোহে ইন্দ্রিয় লালসা প্রবল—লালসা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে যত্ন, সে টান (সাধারণের চক্ষে যাহা প্রেম) তাহা অন্তর্হিত হয়। কিন্তু প্রেম নিষ্কাম, যেখানে লালসা, সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না।

আমি। প্রেম জন্মে কিসে?

সন্ন্যাসী। যেখানে সৌন্দর্য্য বোধ সেইখানেই প্রেম। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সৌন্দর্য্য না দেখিলে ভাল বাসিতে পারি না। প্রেম ও সৌন্দর্য্যে এত নিকট সম্বন্ধ।

আমি। ভাল বুঝিতে পারিতেছি না ; আপনি বলিলেন, যেখানে সৌন্দর্য্য সেইখানেই প্রেম। তবে, কুসুমের রূপে মুগ্ধ দেবেন বাবুর ভালবাসা, প্রেম নহে কেন ?

সন্ন্যাসী। রূপ ও সৌন্দর্য্য বিভিন্ন পদার্থ। রূপ বাহিরে—সৌন্দর্য্য অন্তরে। যাহার আভ্যন্তরিক গুণ নাই, তাহার সৌন্দর্য্য নাই। সৌন্দর্য্যই প্রেমের প্রাণ। দেবেন বাবু কুসুমের রূপে ভুলিয়াছিলেন, সৌন্দর্য্যে নয়! যাহা সুন্দর তাহা ভোলা যায় না। তুমি যাহার রূপে মুগ্ধ হও, অপরে হয় ত তাহাকেই কদর্য্য দেখে কিন্তু যাহা বাস্তবিক সুন্দর তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর! যদিও সকলেই স্ব স্ব জ্ঞানে ও রুচিভেদে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য বা গুণ সকলেরই আদরণীয়। এই সৌন্দর্য্যের গতি অপ্রতিহত এবং চুম্বকের ন্যায় সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। প্রিয় বস্তুর সৌন্দর্য্য না থাকিলেও প্রেমিকের চক্ষে তাহার অতুল সৌন্দর্য্য, এ জ্ঞান না হইলে কি সে তাহাকে ভাল বাসিতে পারে ?

আমি। প্রেম কি স্ত্রী পুরুষে হয় না ?

সন্ন্যাসী। আবার এ কথা কেন ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রেমে কোন বিশেষত্ব নহে ; স্ত্রীলোকে পুরুষে, পুরুষে পুরুষে, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে প্রেম জন্মিতে পারে, কেবল পাত্র ভেদে বিভিন্ন নাম। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি যে প্রেম, তাহাকে 'ভক্তি'—ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি প্রেম, 'স্নেহ"—পুত্র কন্যাদির প্রতি প্রেম 'বাৎসল্য'—সমবয়স্কদিগের মধ্যে প্রেম 'সখ্য'—এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম, তাহাকে 'দাম্পত্য-প্রণয়' বলে।

আমি। যেখানে ইন্দ্রিয় লালসা আছে, সেখানে প্রেম নাই তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ইন্দ্রিয় লালসা থাকা সত্ত্বেও ইহা কিরূপে 'প্রেম' নামে অভিহিত হইতে পারে ?

সন্ন্যাসী। এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন বটে। যেখানে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপরই অনুরাগের ভিত্তি, তাহা অবশ্যই প্রেম নয়। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের সহিত এ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি জড়িত কেন জান ; প্রকৃতি পুরুষের মিলনে

এবং স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ শাস্ত্র সম্মত নিয়ম; কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে অপবিত্রতা নাই।

আমি। এখন বুঝিলাম, স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে মন কলুষিত হয় না সুতরাং ইহাও 'প্রেম' না বলিবার কোন কারণ নাই।

সন্ন্যাসী। তুমি এত শীঘ্র এ বিষয় অনুধাবন করিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। যাহা হউক, অন্য সময় আবার তোমাকে এ বিষয় বুঝাইয়া দিব; এখন কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিলাম।

সন্ন্যাসী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, আমিও সে দিনের মত উঠিয়া আসিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।

কাল-মাহাত্ম্য।

"কালস্য কুটিলাগতি।"—কালের যে কি কুটিল অনন্ত গতি, আমাদের মত নিরক্ষর অল্প বুদ্ধি লোকের তাহা বিবেচনা করা অতি দুঃসাধ্য। কি ছিল; দেখিতে দেখিতে কি হইল, কে জানে,—কেন এমন হইল! সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। হে চিরস্থায়ী অনাদি অনন্ত নিত্যকাল! তুমিই কি অনিত্য পার্থিব মানব দেহে, বাল্য যৌবন ও বৃদ্ধকাল রূপে বাস করিতেছ? তুমিই কি ধরাতলে জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে, ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান রূপে বিরাজ করিতেছ? তুমিই কি জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণের জ্যোতিষ শাস্ত্রাঙ্কে অকাল ও পুণ্যকাল বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছ? তুমিই কি বিশ্বপাতা বিধাতার সৃষ্ট জীবের জীবনে ইহকাল পরকাল রূপে শোভা পাইতেছ? তুমিই কি মানবানুমানে বর্ষ-মাস-পক্ষ-অহন-দণ্ড-পল-বিপল ও মুহূর্ত্ত বলিয়া অনুমানিত হইয়াছ? তুমিই কি শীত, গ্রীষ্মাদি ষড়ঋতু রূপে ধরায় প্রবাহিত হইয়া অব্যক্ত অচিন্ত অনাথ পালকের অনন্ত অকৃত্রিম অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছ? জানি না—তোমার গতি কেন এমন হইল! কেনই বা নিত্য এক

হইয়া বিভিন্ন মানব সন্নিধানে বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছ? বুঝিয়াছি,—"এ সকল তোমার কেবল মানবের সুখ দুঃখ নিমিত্ত।"

"কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্"—নিত্য হইয়াও তুমি যখন মানব সমাজে অনিত্য রূপে ব্যবহৃত হইতেছ, তখন ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে! তোমার অবস্থা যখন এইরূপ হইল, তখন তোমার চক্রাক্রান্ত অনিত্য জীবের অবস্থা যে, তোমা হইতে আরও নানারূপ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর না,—বুঝিতে পারিয়াছি—সকলই কালের কুটিল চক্রে পরিচালিত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে আমার মনের ভাব কেন এমন হইল! কেন আমার সুখ শশি, এতদিন পরে দুঃখের অমানিশার তীব্রান্ধকারে লুকাইল! কেন আমার সেই দিবানিশি হাস্য প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল-কুসুম, দুঃখের অতল জলে ডুবিয়া গেল? জানি না, কেন এমন হইল। আমার সেই একদিন, আর এই একদিন! একদিন বাল্যকালে অল্প বয়স্ক বালকদিগের সহিত স্তূপাকৃত ধুলার গাদায় বসিয়া, ধুলা খেলার আমোদ প্রমোদে দিন অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু তখন একবার, ভুলেও ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয়, অকৃত্রিম পদার্থের সৌন্দর্য্য দর্শনে মন যায় নাই, কেবল খেলাতেই মন দিয়াছিলাম। এখন কিন্তু মনের ভাব আর তাহা নাই, আর আমার বাল্যকাল নাই, এখন আমি "যুবক।"

কালক্রমে আমার মনের গতি যে, এতদূর বিপরীত ভাবাপন্ন হইবে, তাহা কে জানিত! কে জানিত;—সেই বাল্য চাপল্য এরূপ ভাবে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে! কে জানিত;—বাল্যকালের বাল্যলীলা, বাল্যকালের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের জন্য অন্তর হইতে অন্তর্হৃত হইবে! বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বভাব আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে যে খেলায় আমোদ হইত; এখন আর তাহা ভাল লাগে না। পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে বেড়াইতে সাধ হইত, এখন আর সেরূপভাবে বেড়াইতে ইচ্ছা করে না। অধিকন্তু তাহা মনে হইলেও লজ্জা করে, মনে হয় সত্যই কি বাল্যকালে সেইরূপ করিয়াছি! কখনই নয়! মোট কথা—অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে সকলই বিপরীত বলিয়া বোধ হয়।

"পাঠকবর্গ"! বলুন, কালান্তরে সকলেরই কি ভাবান্তর উপস্থিত হয়? হউক, আর নাই হউক, অন্যের কথা বলিতে চাই না, নিজের বিষয় একবার

আলোচ্য। যৌবনে পদার্পণ করিয়া বাল্যের আমোদ সব ভুলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে দেশের উন্নতির জন্য মন ধাবিত হইয়াছে। এক্ষণে জগজ্জীবন-জ্যোতির্ম্ময়-জগন্নাথ-জগদীশ্বরের সৃষ্ট জগতের, প্রকৃতি দেবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মন প্রধাবিত হইয়াছে। কিন্তু কি করি, এক স্থানে বসিয়াত নিখিল জগতের শোভা সন্দর্শন করা যায় না! বাটীর বাহির হইয়া পথে যাইবারও আর অন্য উপায় নাই। তাহার কারণ জলাধিপতি বরুণদেবের অকৃপা। পথে বাহির হইলে, পদবিক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধুলা মাথায় উঠিতে থাকে। এখন দেখিতেছি,—ধুলিরাশি সমাবৃত, গলিত-স্খলিত-কঙ্কার সমাকীর্ণ সুপক রাজপথ দিয়া যাতায়াত করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। আর বালুকাময় কসি ধরা কাঁচা রাস্তায় এ সময় গমনাগমন করার যে কি সুখ, সে বিষয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

যুবকের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি কি আর কাহারও নাই? যুবকের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে কি অন্য কাহারও মন যায় না? যুবকের ন্যায় অন্য কাহারও মনে কি স্বদেশ উন্নতির কথা জাগে নাই? যুবকের ন্যায় কি মনের ভাব আর কাহারও নাই? প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে রাজপথ সমুত্থিত গগণমার্গে উড্ডিয়মান বালুকারাশি ও কঙ্কর সমূহের দ্বারা দেশের শোভা যে একেবারে নষ্ট হইতেছে, তাহা কি কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না? বুঝিতে পারিতেছি, যুবক ব্যতীত সকলের চক্ষু আনারসের প্রায়। তাই বলি হে রাজন্যবর্গ! হে রাজপ্রতিনিধিগণ! আপনারা কৃপা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একবার কৃপা করিয়া পল্লীগ্রামের রাজপথে জল দানের বন্দোবস্ত করুন, নতুবা রাজপথ দিয়া যাতায়াত করা, বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাণীয় জলের বন্দোবস্ত না করিলে, জলাভাবে পল্লীস্থ অনেক প্রজা অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জানি না, পরিণামে, আরও কি অনন্ত দুঃখের ভীষণ স্রোত প্রবাহিত হইবে।

ভবিষ্যতে আবার কি হইবে? বর্ত্তমান কালে সকলেই, দারুণ অভাবানলে দগ্ধিভূত হইতেছে। অভাবের এই নিদারুণ যন্ত্রনা সহ করিয়া, মানব আত্মরক্ষা করিতে পারিলেত ভবিষ্যত? সে আশা আর নাই, বোধ হয় এই কলির পূর্ণকাল উপস্থিত। নতুবা কাল, আকালে পরিণত হইবে কেন? শুধু কি দেশে জলাভাব! ঐ শুন, দেশের দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ অন্নাভাবে

কেবল হাহাকার করিতেছে! ঐ শুন, বালক কালিকাদিগের সকরুণ চীৎকার! ঐ শুন, বৃদ্ধের আর্ত্তনাদ! কি ভীষণ হৃদয় বিদারক লোমহর্ষণ ব্যাপার! এ ব্যাপার হেরিলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, মানবের কি হয় না? ধরাধামে এমন নরাধম কে আছে যে, এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে, তাহার চক্ষের জল বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া ধরাতল অভিষিক্ত না করে।

কুহক জাল বিজড়িত, মায়ামুগ্ধ, ভ্রান্ত ভারতবাসী! এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না, দেশের অবস্থা কি হইল? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি কাহারও চক্ষু ফুটিতেছে না? এখনও কি সকলে ভ্রমান্ধে পতিত রহিয়াছ? এরূপভাবে ঠেকিয়া ও কি শিখিতেছ না, দেশের কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে? এরূপ ভাবে দুঃখের ভার বহন করিয়া, আর কতদিন থাকিবে? অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া দাও, কুহকজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, সকলে আলোকে বাহির হইবার চেষ্টা কর। রত্নাকর সোনার ভারতের স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্য, আবাদ পরিত্যাগ করিয়া, পরাধীনতায় দশ পনর টাকার চাকুরী করিয়া কেন দেশের দুর্ভিক্ষ বাড়াইতেছ? কেন নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়া আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছ? ধীক কাল মাহাত্ম! আবার ঐ সামান্য দশ পনর টাকার চাকুরী করিয়াও সাধারণের মধ্যে গোঁফ যোড়া দিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছ? ভুলিয়াও একবার ভাবিতেছ না যে, এই দারুণ দুর্দ্দিনে, ঐ গোঁফ যোড়া চিরস্থায়ী হইবে কি না। তাই বলি, এখনও সাবধান হও, এখনও পরাধীনতার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের স্বাধীন ব্যবসায় ব্রতী হও, এখনও বর্ত্তমানের শূন্য ভারতকে প্রাণপণে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় রত্নময় কর। নতুবা অন্নাভাবে সাধারণের অপঘাত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসীগণ! যদি দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে এখনও চেষ্টা কর, এখনও একতা বন্ধনে বদ্ধ হও, এখনও পরাধীনতার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হও, দেখিবে আবার সব হবে, আবার সুখের মুখ ফিরে দেখতে পাবে। কারণ, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুখানিচ"। এই জগতে কালের মাহাত্ম্যে যখন চক্রের ন্যায় সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তনশীল, তখন সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ ইহা চির নিশ্চিত। হে ভারতবাসীগণ! একবার ভারতেতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন কথাটা সত্য কি না। এককালে দিলীপ, দশরথ, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হিন্দু রাজাগণের এবং আকবর প্রভৃতি মুসলমান

রাজাদিগের রাজত্বকালে এই ভারতে কি সুখময়ী শান্তিদেবী বিরাজ করিতেন না? কিন্তু বর্ত্তমানে সে সুখের অবসান হইয়া, সোনার ভারতে দুঃখের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতেছে। কালক্রমে এই অসহনীয় দুঃখের অবসান হইয়া আবার সুখের স্রোত প্রবাহিত হইবে। সকলে জানিবেন ইহাই কালের মাহাত্ম্য।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রবাস।

প্রবাস! চরণে তব শত নমস্কার,
তোমারি প্রসাদে আমি চিনেছি স্বদেশ;
বুঝিয়াছি কত স্নেহ মায়ের আমার,
নিষ্ঠুর পীড়ন তব সহিয়া অশেষ।
ঘৃণাদত্ত অঙ্কে তব করিয়া শয়ন,
মনে জাগিয়াছে মার স্নেহময় ক্রোড়।
কৃপায় খুলিয়া দেছ অন্ধ দুনয়ন,
তাই চিনিয়াছি আজ জননীরে মোর।
তোমার ভ্রূকুটী-ভরা সুতীব্র চাহনি,
দণ্ডে দণ্ডে শতবার ক্রূর উপহাস,
চিনায়ে দিয়াছে মোরে বাৎসল্যের খনি,
জননী জনম ভূমি—সুধার আবাস!
ঘৃণা তব মোর কাছে আশীষের ধারা;
প্রবাস! প্রবাসী তোমা নমে আত্মহারা।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সৌন্দর্য্য-সেবা।

১। মনুষ্যজাতি সৌন্দর্য্য-পিপাসু। এই সৌন্দর্য্য শারীরিক ও মানসিক। আমরা কিন্তু বাহ্য বা শারীরিক সৌন্দর্য্য লইয়াই আকুল। মানসিক সৌন্দর্য্যের পূজা করিতে আমরা কয়জন জানি? অন্তঃসারশূন্য বাহ্য চাক্‌চিক্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরি। যিনি সাধু তিনি শারীরিক সৌন্দর্য্য অনাদর করিয়া মানসিক সৌন্দর্য্য লাভেচ্ছায় যত্নবান হন।

২। মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রাধাণ্য দর্শাইবার জন্য আমরা এস্থলে একটি ক্ষুদ্র গল্প উদ্ধৃত করিব।

৩। বৈশাখ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। মার্ত্তণ্ডময়ূখতাপে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা দগ্ধ হইতেছেন। চতুর্দ্দিক নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে তাম্রাক্ষের মধুর তানে দূরস্থ লতাকুঞ্জ মুখরিত হইতেছে। এমন সময়ে এক জটাজুট সমন্বিত, কঠোর-তাপস, তেজস্বী সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে শুষ্কমুখে প্রসন্নপুণ্য সলিলা ভাগীরথী সৈকতে আসিয়া একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসিলেন। সঙ্গে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রত্নে ভূষিত এক নবীন শিষ্য। পথশ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত তাঁহারা উভয়ে বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন। যখন দিনদেব শেষরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া পশ্চিমাকাশকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিতেছেন তখন উভয়ে উঠিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের কিছু আহার হয় নাই। শিষ্য কমণ্ডলু হস্তে দুগ্ধান্বেষণে গ্রাম-প্রান্ত অতিক্রম করিয়া সম্মুখেই একটী গোয়ালা বাড়ী দেখিতে পাইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন একটি পরমাসুন্দরী গোপযুবতী সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া অনন্য মনে আপনার কেশ বিন্যাস করিতেছেন। তাঁহার তাম্বুল-রাগ-রক্ত অধর, সুন্দর সীমান্তে সিন্দূর বিন্দু। কেশবিন্যাস কার্য্য শেষ হইলে তিনি উঠিলেন। দ্বারদেশে শিষ্যকে দেখিয়াও তিনি মাথার কাপড় টানিলেন না। সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীর আবেশময়ী, খঞ্জন-গঞ্জিত গতি ও "নিন্দি—ইন্দীবর" নয়নের হাস্য-বিলাস কটাক্ষে তাঁহার প্রকৃত চরিত্র জানিতে শিষ্যের বড় বেশী বিলম্ব হইল না। যুবতী এই গৃহের একমাত্র কর্ত্রী। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে বিসূচিকা রোগে তাঁহার

তাঁহার মর্য্যাদা ছিল। সে কারণ তিনি কখনও নিজে দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন না। একটী দাসী ছিল সেই গ্রামে গ্রামে দুধ দিয়া আসিত। দাসী এখনও আছে। এই সময়ে দাসী গ্রামে দুধ দিতে গিয়াছিল। গোপ-যুবতীর নাম তরঙ্গিনী। যুবতী বিধবা। দুগ্ধ-ব্যবসা ছাড়া তাঁহার আর একটি ব্যবসা ছিল। বয়স কাঁচা—সে ব্যবসা চলিতও ভাল। সেই নবীন শিষ্যের ধর্ম্মোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া যুবতীর পাপানল জ্বলিয়া উঠিল। যুবতী জ্ঞানশূন্য হইয়া এক দৃষ্টে শিষ্যের দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন সময়ে দাসী আসিল। শিষ্য দুগ্ধ লইতে আসিয়াছেন শুনিয়া দাসী তাঁহাকে দুগ্ধ দিল। শিষ্য দুগ্ধ লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যুবতীর হৃদয়ের পাপবহ্নি নিভিল না। পাপীয়সী প্রেমাবেশে অন্ধ হইয়া শিষ্যের প্রেমকামনায় তাঁহার নিকট দাসীকে পাঠাইয়া দিল।

৪। সেই আত্মজয়ী জিতেন্দ্রিয় শিষ্য ধীরভাবে তরঙ্গিনীর প্রার্থনা শুনিলেন। দাসীকে বলিলেন "এখন নয়। তরঙ্গিনীর নিকট যাইতে পারি এখনও সে সময় হয় নাই।"

৫। এই নিষ্ঠুর উত্তরে যুবতীর প্রেমাবেগ থামিল না। বাধা পাইয়া তাহার হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইল, প্রেম কামনার ঐকান্তিক গতি আরও প্রবল বেগ ধরিল। শিষ্য সময় অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। পাপীয়সী বার বার দূতী পাঠাইয়া শিষ্যের প্রণয় ভিক্ষা করিত, কিন্তু উপযুক্ত সময় না আসিলে শিষ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না বলিলেন।

৬। এই রূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদা তরঙ্গিনী কি কারণে তাহার এক প্রণয়ীর প্রাণ সংহার করিল। পাপকার্য্য লুক্কায়িত রহিল না। যুবতী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল সেই সুষমা-মণ্ডিত, সৌন্দর্য্য-শালিনী, রূপজীবনী রমণীর রূপোদ্দীপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, তদীয় কবন্ধ ভূতলে প্রোথিত করিবার আদেশ হইল। সেই হতভাগিনীর হস্তপদ ছিন্ন হইয়াছে, এমন সময়ে অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ কলেবর, ধর্ম্মপ্রাণ, বিশুদ্ধাচারী সেই শিষ্য বধ্যভূমিতে দেখা দিলেন।

৭। তখনও হতভাগিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় নাই। তখনও তাহার হৃদয়-পদ্মে শিষ্যের আসন পাতা ছিল। যখন মৃত্যুর করাল ছায়া তাহার মুখেন্দু ম্লান করিয়াছে তখনও সে প্রেমের কঠিন পাশ ছিন্ন করিতে পারিল না। সেই শান্তিমূর্ত্তি যখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল তখন তাহার

মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা কি এক মন্ত্রবলে দূরে গেল। ধীরে ধীরে প্রেমস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

৮। যুবতী অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্কীর্ণ হৃদয়, প্রেমে আবেশে পূরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিল "যখন আমার এই নবনীবৎ শরীর সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় সুরভি ছিল, যখন আমার শরীর মণি মাণিক্য খচিত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছিল তখন তোমায় আমি হৃদয়ের প্রেম উপহার দিয়াছিলাম। এখন আমি বিগত প্রাণ—আমার দেহে হস্ত নাই পদ নাই ; এখন আমার দেহ রুধিরে রঞ্জিত ও ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে। এখন তুমি এলে !"

৯। তখন সেই সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রশান্তবদন শিষ্য বলিলেন, "ভগ্নি ! অলীক সুখের আশায় তোমার নিকট আসি নাই। বাহ্য সৌন্দর্য্যের পিপাসায় আমি কখনও শুষ্ক তালু হই নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্য অতি অসার অতি তুচ্ছ। তোমার এই অধঃপতন অহেতুকী নহে। বাহ্য সৌন্দর্য্য লিপ্সাই তোমার যন্ত্রণার একমাত্র মূলীভূত কারণ। যদি তুমি পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, স্ত্রীজাতির প্রধান ভূষণ লজ্জা পাপ কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিয়া কায়মনোবাক্যে সৌন্দর্য্য সেবা না করিতে, তাহা হইলে তোমার এত দুর্দ্দশা হইত না। তুমি যদি হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি নিচয়ের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইতে তাহা হইলে পরমশান্তিতে সংসার সুখ উপভোগ করিতে পারিতে।"

১০। শিষ্যের এই উপদেশ বাণী মুহূর্ত্তের জন্য—ভগবৎ প্রেরিত আশীর্ব্বাদের ন্যায়, তামসী নিশায় শশাঙ্ক কৌমুদীর ন্যায়—হতভাগিনীর হৃদয়াকাশের অজ্ঞান মেঘমালা দূর করিল—তার হৃদয়ে এক নবীন ভাবের মন্দাকিনী বহিল। তার প্রাণের বীণাটী এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল—মৃত্যুকালে তার হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাবের উদ্রেক হইল। সে ইঙ্গিতে তাহার মাথায় শিষ্যের পা রাখিতে বলিল। চরণস্পর্শে তার দাবদগ্ধ হৃদয় শীতল সঞ্জীবন ধারায় সিক্ত হইল। অন্তিমকালে সংসারের সুখমরীচিকার অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে দিব্যধামে চলিয়া গেল।

১১। আমরা যতটুকু পারি মানসিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা পাইব। তবেই হৃদয় নিকেতনকে আনন্দ নিকেতন করিবার উপযুক্ত করিব। হৃদয়ে করুণা ও শেফালিকা ফুটাইতে পারিব ; তাহারা পরম

পিতার শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া আমাদের জীবন মধুময় করিবে। হৃদয় অনন্ত শারদোৎসবের লীলাভূমি হইবে।

শ্রীফণিভূষণ মুস্তৌফী।

বাসন্তী-আবাহন।

এস প্রিয়! এস মোর কাছে এস এস
স্বরগের সুধাভাণ্ড লয়ে,
চির পিপাসিত, বিরহিনী আমি সখে!
যৌবন যে যায় মোর বয়ে।
ছিলে তুমি কমলার কল্পতরু মূলে
এত দিন সুদীর্ঘ প্রবাসে,
তৃষিতা চাতকীমত আমি ছিনু তব
প্রেম-ঘন-বারি-বিন্দু আশে।
চিরপরাধীনা, অবলার ক্ষুদ্র প্রাণে
বিরহের ঝটিকা প্রবল,
কত আর সহিব হে নাথ! অবসন্ন—
দেহ, মন, হৃদয় বিকল।
আজি তব শুভ-আগমনে ধরা অঙ্গে
সুমধুর নবভাব জাগে,
ধরণীর নবীন যৌবন বিকসিত,
উচ্ছ্বাসিত নব অনুরাগে।
মধুময় মধুঋতু আসিয়াছে সখে!
আসিয়াছে সহচর তার,
মধুকণ্ঠ কোকিল কূজনে মধু ঝরে
মুখরিত কানন-কান্তার।
মুঞ্জরিত বিশীর্ণ বল্লরী, প্রফুল্লিত
সুরভিত তরু সহকার,
আনিয়াছে বসন্ত নবীন বিতরিতে
মধুময় সোহাগ-সম্ভার।

আজি তুমি আসিবে বলিয়া রাখিয়াছি
কত যত্নে ফুল শেজপাতি,
কণ্ঠে তব পরাইব ব'লে রাখিয়াছি
প্রেম কুঞ্জে বর-মাল্য গাঁথি।
এস এস বঁধু, এস সখা, অধিনীর
মরুময় হৃদয় কুটীরে,
ঢাল ঢাল প্রেমের মদিরা, দগ্ধ প্রাণ
তৃপ্ত হোক্ প্রেম-সুধা-নীরে।

শ্রীরামচন্দ্র দেববর্ম্মা।

সময়ের ফের।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

এইখানে আর একটী কথা বলিতে হইবে। বাণী কণ্ঠের কন্যার বিবাহের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে যদুপতিরও কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইল। যদুপতি আসিয়া বাণীকণ্ঠকে ধরিয়া কহিল—ভাই বাণী আমিত টাকা কড়ি কিছু যোগাড় করিতে পারি নাই। তোমায় যোগাড় করে দিতে হবে। নইলে মেয়ের বিয়ে হয় না—একবার বিপদ হতে উদ্ধার করেছ আর একবার কর।

বাণীকণ্ঠ কহিল আমি টাকা কোথায় পাব ভাই; আমারই টাকার যোগাড় নাই। বাস্তবিক তাহারই টাকার যোগাড় ছিল না সেই ধারের জন্য চেষ্টা দেখিতেছিল।

যদু। তা তুমি একজায়গায় জামিন হয়ে দিতে পারলে হয়। আমায় এখানে কেউ জানে না, তুমি বলিলেই হবে।

বাণীকণ্ঠ অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিল কোথায় যেতে হবে।

যদুপতি কাছেরই এক কুশীদ ব্যবসায়ীর নাম করিল।

একটু ইতঃস্তত করিয়া বাণী কহিল তা আচ্ছা অতি শীঘ্রই টাকা মিটিয়ে দেবেন ত? হারাধন বাবু লোকটী বড় ভাল নয়।

যদুপতি কহিল,—তাহার কাছে ভাই এখন কিছুই নাই তাই—তা নইলে দেখ্‌তেই পাবে।

কিন্তু বাণীকণ্ঠ গৃহিণী জ্ঞানদা সুন্দরী গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল,—তা হইতে পারিবে না, যাইও না, তুমি জামিন থাকিয়া টাকা ধার করিয়া দিওনা, আমি পই পই বলছি আমার কথাটা শোন। একাজ কি?—

বাণীকণ্ঠ একটী ধমক দিয়া কহিল—"যাও, তুমি ত সব জান যতই হোক আমার ভগ্নীপতি বটে ত? আমি না একটু চেষ্টা করলে আমার ভাগ্‌নীর বিয়ে হবে না।"

জ্ঞানদা চুপ করিল। কহিল,—"তা বেশ যাও। তোমার ভগ্নীপতি, তোমার ঘরকন্না যা মন তাই করিতে পার। আপনার পাঁটা লেজে কাট্‌লে তাতে কে কি বলবে। তবে বলতে হয় তাই বল্‌লাম বলিয়া চলিয়া গেল।

বাণীকণ্ঠ জামিন হইয়া টাকা লেন দেন আদি সব ঠিক হইয়া গেল।

যদুপতি দুই মাসের মধ্যে সব ঋণ পরিশোধ করিব বলিয়া শপথ করিল।

মহাজন হারাধন শিকদার কহিলেন,—তা কি আমি ত দুমাস পরে বাণীবাবুর কাছ হতেই টাকা পাব, আমার কি! তারপর না পাই সুদ চাইব।

বাণী কহিল হাঁ—

এদিকে বাণীকণ্ঠের বাড়ীতে বিবাহের সব যোগাড় চলিতেছে—হেনকালে সহসা সংবাদ আসিল বিবাহ সেখানে হবে না, পাত্র পক্ষীয়েরা পাত্রীর অনেক দোষ দেখিতে পাইয়াছে, বিশেষ পাত্রীর পিতার যখন অনেক দেনা তখন তাঁহারা জামাইয়ের সাধ আহ্লাদ কিছুই করিতে পারিবে না, এ সংবাদ অবশ্য তাঁহারা পাত্রীর কোন নিকট সম্পর্কীয় লোকের কাছ হইতে পাইয়াছেন।

বাণীকণ্ঠের আর জানিতে বাকি রহিল না, যে এ কীর্ত্তি তাহার দাদারই।

দাদাকে আর কি বলিবে? কিন্তু মনে বড় দুঃখ পাইল। দাদার সঙ্গে আর কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকুক, সে যে তাহার দাদার কন্যার বিবাহের সময় কত করিয়াছে, সেই যে স্বয়ং তাহারই শ্বশুর সম্পর্কের এক নিতান্ত আত্মীয় পুত্রের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রীর কত অনুরোধ করিয়া বিবাহ দেওয়াইয়েছে, সেই কর্ম্মের কি এই পুরস্কার হইল? তাহার পর সেই ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের সময় কলিকাতা হইতে জিনিষ পত্র আনিবার কালে কি কষ্টই ভোগ করিতে হইয়াছিল। পথ ভ্রান্ত হইয়া অন্ধকারপূর্ণ দুর্য্যোগ রাত্রিতে নদীতীরে ঝিলের

উপরে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিল। মনে পড়িল, কথাটা বড় বুকে বাজিল তাই কহিল—

হায় মানুষ এই রকম করিয়াই কি উপকারীর প্রত্যুপকার দিয়া থাকে? হৃদয়ের রক্ত দিয়া উপকার করিলে—শেষে সুতীব্র ছুরিকাঘাতে তাহার প্রতিদান দেয়?

আবার অন্য যায়গায় কন্যার বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। এবার কিন্তু বড় গোপনে কেবল মাত্র গোলাম বলিয়া পেয়ারের চাকরটীকে সঙ্গে লইয়া চাদরের খুটে গুটিকয়েক টাকা বাঁধিয়া পাত্রের খোঁজে বাহির হইল।

অনেক রৌদ্র ঝড় জল বৃষ্টি বাতাস সহার পর অনেক খোঁজা খুঁজিতে এক জায়গায় পাত্র স্থিরীকৃত হইল।

পাত্রর বয়স ১৯।২০ দেখিতে সুন্দর, অবস্থাও ভাল বাণীকণ্ঠের বেশ মনের মত হইল।

গোলামকে কহিল খবরদার একথা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ না হয়। গোলাম ছোটলোক ও পর হইলে কি হয়? তাহার হৃদয় অমুলোত্তম অনেক শিক্ষিত আত্মীয় অপেক্ষা বেশী উন্নত। সে প্রভুর কথা যে কেমন মানিতে হয় তাহা বেশ জানে।

আবার বাড়ীতে বিবাহের সব আয়োজন চলিতে লাগিল—জ্ঞানদা-সুন্দরীকেও একথা গোপন রাখিল। কিন্তু স্ত্রীর কাছে কি একথা গোপন রাখা চলে? বিবাহের খুব নেকটা দিকটা সর্ব্বশেষে দ্বিপ্রহর রাত্রে, জল খাবারের সময় কথায় কথায় সব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বলিয়াই সাবধান করিল—"দেখো খবরদার একথা যেন কারও কাছে প্রকাশ না পায়।

জ্ঞানদা কহিল। তুমি খেপেছ, আমায় তেমন মেয়েই পাওনি।

বাণীকণ্ঠের বাড়ীর সব কাঠ কাটা মুড়িভাজা ইত্যাদির আয়োজন দেখিয়া ওবাড়ীর মেঝোবউ। (ডাকনাম মেজো গিন্নীর) মনে ভারি সন্দেহ জন্মিল, তাঁহার মনে স্থির ধারণা জন্মিল নিশ্চয় মনোর কোথাও বিয়ের ঠিক হয়েছে।

পুকুরের ঘাটে চুপি চুপি জ্ঞানদাকে কহিল,—হাঁ ছোট বউ, ছোট কর্ত্তা মনোর কোথাও বিয়ের ঠিক ঠাক করলে নাকি?

জ্ঞানদা একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"না বোন বিয়ে কোথা" জানইত চারিদিকে শত্রু, বিয়ে কি আর হতে দিচ্ছে? আবার কে কোথা হতে ভাঙ্গিয়ে দিক।

মেজো। তবে যে বলচো বিয়ে কোথা! তা আমাকে বল না? আমি কি কাউকে একথা বলে দিচ্চি? ও ভাঙানি দিকে না শুনালে কি করে জানতে পাচ্চে?

জ্ঞানদা ভাবিল তাও ত বটে। অপ্রকাশ রাখা ত কেবল ওদেরই জন্যে! তা ওদিকে না শুনালেই হচ্চে? একবার এদিক ওদিক চারিদিক চাহিয়া আস্তে আস্তে প্রথমে অতি সঙ্কোচে তারপরে ক্রমে ক্রমে সাধা গলায় সব প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

জামাইয়ের রাজ গুণটী শুদ্ধও বাদ পড়িল না। পেট খোলসা করিয়া ছোটগিন্নী তবে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাকালে দূতি মুখ হইতে রুদ্রবাবুর কাছে বাণীর কন্যার বিবাহ সংবাদ গেল।

রুদ্রবাবু তখন পঞ্চা ঘোষের ভিটস্থ খুঘুস্থ করিবার জন্য দৃঢ় মনোনিবেশের সহিত সুদের সুদ কষিতেছিলেন। সহসা যে একথা শুনিয়া তাহার প্রতিকার পথ আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কথাটা শুনিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন,—আঁঃ বল কি? সত্যি নাকি?

বড়গিন্নী ভগ্নকণ্ঠে কহিলন,—সে আর কি বলবো! যে জামাই হবে তাদের টাকা কড়ি বা কত? দুয়ারে দরোয়ান আবার পশ্চিমে না কোথায় খুব একটা বড় ব্যবসা আছে।

রুদ্রকণ্ঠবাবু কপালে হাত দিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন,—ওঃ বুঝেছি! জগদলের ঘোষেদের বাড়ী, তারা বড়লোক বটে। কিন্তু হাল বড়লোক, তা আমি মনে করছিলাম যদি,—

গৃহিণী চুপি চুপি কহিলেন তা হয় না, আমাদের বেলার সঙ্গে সে পাত্রের সঙ্গে হয় না? বেলাও ত এই যেটের সাত ছাড়িয়ে আটে পড়লো।

রুদ্রবাবু কহিলেন, আচ্ছা আর বিয়ের কদিন আছে বল দেখি?

গৃহিণী। আর দিন কোথা দুদিন মাত্র আছে।

রুদ্র। আচ্ছা তাই ত, যাও বলিয়া সুদকষার কার্য্য পরিত্যাগ পুরঃসরঃ অতি সুন্দর কাগজে একখানি চিঠি লিখিতে লাগিলেন।

(৫)

গায়েহলুদের রাত্রে হঠাৎ বাণীকণ্ঠের বাড়ীতে জগদ্দল হইতে চারিজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়ীর ছোট ছোট মেয়ে, ছেলেরা পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। লোক এখন কেন আসিল? সকলেই ভাবিল না জানি ভাবী জামাইদের কোন দৈব দুর্ঘটনাই ঘটিয়াছে।

বাণীকণ্ঠ গিয়া সমস্ত শুনিল,—তাহারা কহিল পাত্র পক্ষীয় আরও একশত টাকা অধিক, ও অদ্যই সমস্ত টাকা পাইতে চায়।

এত রাত্রে টাকা কোথায়? বাণীকণ্ঠ নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার কথা ছিল সে বিবাহরাত্রে অর্দ্ধেক টাকা ও বিবাহের পর সমস্ত মিটাইয়া দিবে।

একবার ইচ্ছা হইল খোলসা জবাবই দিই গা,—বলিগে আর ওখানে মেয়ের বিবাহে কাজ নাই। যাহারা কথার ওলট পালট করে তাদের তুল্য নীচ ব্যক্তি আর কে আছে?

কিন্তু নানা কারণে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না কথঞ্চিত শান্ত হইয়া টাকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এত রাত্রে টাকাই বা কে দেয়? এখন কোন্ মহাজনের কাছেই বা যাওয়া যায়? ভাবিল দাদার কাছেই একবার যাই। পায়ে হাতে পড়িয়া যে কোন গতিকে গহনা বন্ধক দিয়াও একবার চেষ্টা দেখি, বিপদের সময় কি তাঁহার মন গলিবে না? যতই হোক আমিত তাঁর সহোদর ভাই বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দাদা কিছুতেই টাকা দিতে সম্মত হইলেন না। তাহার বড় আশায় ছাই পড়িল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে পরন্তু এমন সময় শ্লেষ দিয়া বড় গিন্নী কহিলেন কেন যদুপতি বাবুর কাছে টাকা পেলে না তাঁর মোকর্দ্দমা জয় করিয়ে দিয়েছো।

সে কথায় গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া হতাশ হৃদয়ে বাণী, স্ত্রীর কাছে আসিল। এ সময় স্ত্রী ভিন্ন আর গতি কি আছে?

স্ত্রীকে কাঁদাইয়া তাহার যত গুলি গহনা ছিল সব লইয়া বেচিয়া কিনিয়া দিয়া কন্যার ভাবী শশুর বাড়ীর লোকগুলিকে বিদায় দিল শুভক্ষনে মনোরমার বিবাহ আদি সব সুসম্পন্ন হইয়া গেল লোকজন খাওয়ান দাওয়ান সম্বন্ধে কোন ক্রটি হইল না।

কিন্তু বিবাহের পরদিন গ্রাম খরচা সম্বন্ধে কন্যা পক্ষে ও বরপক্ষের বাদানুবাদে অনেক বেলা হইয়া গেল।

বারোয়ারী থিয়েটারের চাঁদা আর কিছুতে মেটেনা, কন্যা পক্ষ বলে এসব বর পক্ষেরই দিবার কথা, বরপক্ষ বলে এসব মেয়ের বাবাই ধারিয়ে এসেছে তাহাকেই দিতে হইবে।

কিছুতেই মীমাংসা আর হয় না বর কন্যাও বাহির হয় না।

তখন বরপক্ষের বৃদ্ধ পুরোহিত ব্রাহ্মণ একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি আজ না যাইলে তাঁহার চাষ বাস পাটকাচা ইত্যাদির অনেক ক্ষতি। ব্রাহ্মণ একবারে উত্তেজিত হইয়া কহিলেন শীঘ্র সব বার হবেত হও। নইলে আমায় পাল্কী ডেকে দাও আমি চলে যাচ্চি। তাও না হয় আমি পায়ে হেঁটে চলছি। ব্রাহ্মণের ভাব দেখিয়া বাণীকণ্ঠ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না তবু একবার কহিল এত বেলা হয়ে গেল রাস্তা অনেক দূর এত বেলায় যাওয়া কি হয় ?

ব্রাহ্মণ। ওগো কিছু করিতে হইবে না আমরা রাস্তায় খাওয়া দাওয়া করে যাব।

এদিকে মীমাংসাও কতকটা শেষ হইয়া আসিয়াছিল সমস্ত গ্রাম খরচা বাণী কণ্ঠকেই দিতে হইল। ব্যথিত চিত্তে মনোরমা ও জামাইকে বিদায় দিয়া বাণীকণ্ঠ ভূতলে শুইয়া পড়িল। সারা রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, শুইবা মাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

এইরূপে বাড়ীর সকলে যখন কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ মনোরমা সম্বন্ধে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে, হেনকালে মনোর বড়দাদা বিমল প্রসাদ সে মনোমার সঙ্গে অনেক দূর গিয়াছিল।

বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিয়া মায়ের কাছে গিয়া কহিল ! এখানকার বেহারারা যে পাল্কীতে করে মনোরমাকে লইয়া যাইতে ছিল, তাহারা আর যাইতে চাহে না দ্বিগুণ ভারা পাইয়াও স্বীকার হইতেছে না এদিকে বেলা হইয়া যাইতেছে সবাই আমাদিকে গাল দিতেছে।

বাণীকণ্ঠকে উঠাইতে অনেক ঠেলা ঠেলি করা হইল কিন্তু কিছুতেই উঠাইতে পারা গেল না বড় ঘুমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। হতাশ হইয়া জ্ঞানদা তাহার পুত্রকে কহিল "যা বাবা তুই যা, তুই আর একবার গিয়ে দেখে আয়না বেহারাদের পায়ে হাতে পড়েও চেষ্টা দেখিস্।

বিমল গঞ্জে গিয়া দেখিল আর কেহ সেখানে নাই, লোক মুখে শুনিল তাহা-দের জামাইএর কাকা যিনি বরকর্ত্তা হইয়া আসিয়া ছিলেন তিনি কাঁদিয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়া গিয়াছেন এবং আর যে কখন তিনি ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র এমুখ হইবেন না তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

নিদ্রা ভঙ্গে বাণী কণ্ঠসব ব্যাপার শুনিয়া বেহারাদের কাছে তদন্তে

বাহির হইল তদন্তে সব রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। জানিল যে এ খেলা তাহার জ্যেষ্ঠ দাদা মহাশয় কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইয়াছে।

অতি দুঃখে তাহার অন্তঃকরণ বড় মর মর করিয়া উঠিল। ভাইয়ে যে কখনও এতটা করিবে তাহা মনে হয় নাই; কিন্তু তবু করিতে হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীপরিমোহন ঘোষ।

ফুল।

ঊষার উদ্যানে ফুল আপনি ফুটিয়া উঠে, রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণীর উষ্ণ শ্বাসে সন্ধ্যায় আপনিই শুকাইয়া যায়। কোন কুসুম সন্ধ্যায় বিকশিত হইয়া প্রভাতে শিশির-সম্পাতে আপনি ঝরিয়া পড়ে। ঊষার অধরে নবোদিত অরুণের রক্তিম রাগ দেখিয়া সরোবরে প্রভাত বাতাহত কম্পিতা পদ্মিনী হাসিয়া উঠে, আবার অপরাহ্নে অস্তাচলচূড়াবলম্বী দিনকরের ম্লানোজ্জ্বল রক্তরশ্মি দেখিয়া পতি বিরহাশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়।

ফুল, তোমার মত মানবও সংসারে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে কৃত কর্ম্মের সংস্কার লইয়া শ্মশানের সেই শেষ শয্যায় শয়ন করে। নশ্বরত্ব ব্যাপ্ত জগতে জন্ম-মৃত্যু-জরা জড়িত নর-দেহের নাশ আছে—তোমারও স্থূল দেহের ধ্বংস হইবে, কিন্তু তোমার ওই হাস্য-স্ফুরিত অধরের সৌন্দর্য্য সুষমাটুকু চির অবিনশ্বর। কীর্ত্তিকুশল মানবের যশঃসৌন্দর্য্য তোমারই মত যুগান্তজীবী।

ফুল, তুমি অনেক বস্তুর তুলনাস্থল, কিন্তু তোমার তুলনা কোথায়? কবি কাব্যোক্ত নায়কের মানসী প্রতিমায় রঙ ফলাইতে বসিয়া কল্পনা-সমুদ্রের কূল হারাইয়াছেন, এমন কি পাঠকগণকে স্ব স্ব প্রিয়তমার সহাস্য আস্য দেখিতে ও পাঠিকাগণকে স্বীয় মুখাবলোকন করিতে বলিয়াও তৃপ্তি পান নাই, ফুল—তখন তুমি ধীরে ধীরে তাঁহার মানসোদ্যানে ফুটিয়া উঠিলে, কবি হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। ফুল এইখানেই কি তোমার তুলনার শেষ? না। যখন তুমি কামিনীর বেণীবদ্ধ কবরীতে মেঘে ঢাকা সৌদামিনীর মত ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে থাক, তখনই বাস্তবিক তাহার কমনীয় মুখকান্তি অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখায়। সুতরাং তোমার সম্মিলনে যাহার সৌন্দর্য্য বিকাশ, তাহার সহিত তোমার তুলনা অসম্ভব।

ফুল, সকলে তোমাকে পাইয়া তৃপ্ত হয়, তোমার পরিতর্পণ কিসে হয়? ক্রন্দন পরায়ণ শিশু ফুল দেখিলে সকল জ্বালা ভুলিয়া—রোদন ভুলিয়া—স্নেহ রস নিষিক্ত মাতৃ ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ধরিতে ছুটে। বিলাসোন্মাদদীপ্ত যুবকের স্ফীত বক্ষে স্থান পাইয়া তুমি বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাও। জ্যোৎস্না ধবলিত রজনীতে প্রিয়জন বিরহী প্রবাসী উদ্যানে তোমাকে দেখিয়া প্রিয়তমার মুখ ভ্রমে মনে কথঞ্চিৎ শান্তি পায়। তাহাতেই কি তোমার তৃপ্তি? সংসার ত্যাগী—বিষয় বৈভব বিরাগী যোগী যখন ভক্তি চন্দন সংমিশ্রণে "এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া যখন তোমাকে ইষ্ট চরণে অর্পণ করে, তখনই তোমার প্রকৃত পরিতর্পণ—কেবল সেই খানেই তোমার ফুল জন্মে স্বার্থক—সেই পরমেষ্ট পদই তোমার উপমাস্থল।

শ্রীমনোমোহিন মজুমদার।

ফুল দোল।

(বৈশাখী পূর্ণিমা)

১। কি সুন্দর রাকাশশী,
নীলাকাশে হাসি ভাসি,
ধরণী চুমিয়া তায় অমিয়া ছড়ায়;
চকোর চকোরী সনে,
পিয়ে সুধা হৃষ্টমনে,
ভাতিছে বিরলতারা-আকাশের গায়।

২। ফুটেছে সাঁঝের ফুল,
পুষ্প-প্রাণ ভৃঙ্গকুল,
পারে না চুমিতে তায় প্রদোষ কারণ;
পিকের পঞ্চম তান,
হতাশ পাপিয়া গান,
মিলন বাসরে গায় বিরহ বেদন।

৩। দেখ ওই রাকাশশী,
সুনীল বিতানে বসি,
কালশশী সঙ্গে করে অমৃত বর্ষণ;

বামে লয়ে প্রাণেশ্বরী,
কিবা শোভা ধরে হরি,
মধুর সুন্দর এই যুগল-মিলন।

৪। আসে কত কুলনারী,
নিতম্বেতে হ'য়ে ভারি,
হেরিবারে রাধা নাথে রাধিকা-রঞ্জন ;
তেয়াগিয়া লাজমান,
স'পিয়াছে মন প্রাণ,
অঞ্জনে অঙ্কিত কিবা খঞ্জন নয়ন।

৫। পুষ্প দোলে রাধাশ্যাম,
মরি কি ত্রিভঙ্গ ঠাম !
শ্রীঅঙ্গে শোভিছে কিবা ফুল-আভরণ ;
নবীন নীরদ পাশে,
স্থির সৌদামিনী হাসে,
তমাল জড়ায়ে স্বর্ণ লতিকা যেমন।

৬। কোথা আজ গোপবালা,
বিনা সূতে গাঁথি মালা,
পরাত শ্যামের অঙ্গে, নীরদ বরণ ;
হরি বলে ডেকে ডেকে,
চাঁদের জোছনা মেখে,
করে না কো রাখালেরা মধুর কীর্ত্তন।

৭। দেখ সই বনমালী,
হয়েছিল কৃষ্ণকালী,
বনমাঝে আয়ানেরে করিতে বঞ্চন ;
বসে রাধা-বিনোদিনী,
ফুল সাজে ফুল-রাণী,
রাঙ্গা-জবা রাঙ্গা-পায়ে করিতে অর্পণ।

৯। কটী তটে পীত ধটী,
চাঁচর চিকুরে জটি,
সুরভি চন্দন ত্যাজি ভস্ম বিলেপন ;

কালার কপাল দোষে,
দ্বারে দ্বারে যোগী বেশে,
ভাঙ্গিত রাধার মান করিয়া ভ্রমণ।
৯। কোথা সে আভীর বালা,
দোলাইয়া কাঞ্চীমালা,
নাচিত কৃষ্ণের সনে হইয়ে বিহ্বল;
কোথা সে বংশীবাদন,
শুনে প্রাণ উচাটন,
উজান বহিত কাল কালিন্দীর জল।
১০। কোথা সে শ্রীদাম-দাম
কোথা বা সে বসুদাম
ধবলী-শ্যামলী-ধেনু কোথায় এখন?
কোথা পাখী শুকশারী,
মঞ্জুল কাননচারী,
পড়ে না ত "রাধাকৃষ্ণ" পড়িত যেমন?
১১। কৃষ্ণের আশ্বাসবাণী
আনিয়ে মৃদুল ধ্বনি,
উল্লাসিত করে আজ ভারত জীবন;
রব সবে আশা করি,
সকলি আসিবে ফিরি,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব চরণ॥

শ্রীফণিভূষণ মিত্র।

আনার্কিষ্টের ইতিহাস।

কয় দিন পূর্ব্বে দুই জন উন্মত্ত মস্তিষ্ক বাঙ্গালী যুবক নিরপরাধী দুই জন সুভ্রান্ত ইংরেজ মহিলাকে এসিড ও ডাইনামাইট পূর্ণ বোমা নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মম ভাবে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঙ্গালী জাতির মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে। তাহাদের দলের আরও ত্রিশ জন ধৃত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ আছে; তাহারা লাট-সাহেবের গাড়ী উড়াইয়া দিয়া শত শত লোককে

হত্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল;—যাহারা এরূপ আততায়ী ঘাতুক তাহারই "আনার্কিষ্ট" নামে অভিহিত হইতেছে।

ভারতে এ দলের এই প্রথম আবির্ভাব। আশা করা যায় ভারতবর্ষ এরূপ কাপুরুষ গুপ্ত ঘাতুকগণের স্থান হইবে না। এ দলের অস্তিত্ব শীঘ্রই সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

তবে হয় তো অনেকেই অবগত নহেন যে "আনার্কিষ্টের" অর্থ কি, আর এই সকল লোক কে ও কাহারা? তাই আমরা ইহাদের বিষয় সংক্ষেপে দুই একটা বলিব, ইহাদের ভয়াবহ কুকীর্ত্তির কথা শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিবেন—

আনার্কিষ্ট অর্থে যাহারা রাজ্য মধ্যে একটা বিপ্লব সংঘটন করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই ব্যগ্র। ইহাদের মতে পৃথিবীর সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট দূর করিবার এক মাত্র উপায় সম্রাট, রাজা, রাজপুরুষ, ধনী, সমস্তকেই নিধন করিয়া—সমস্ত মনুষ্য জাতির মধ্যে সমতা স্থাপন,—তখন ধনী বলিয়া আর কেহ আসিবে না। দরিদ্র জগতে বিলুপ্ত হইবে, তখন রাজা প্রজায় আর কোন পার্থক্য রহিবে না।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই রূপ উন্মত্ত লোক অনেক আবির্ভূত হইয়াছে। ইয়োরোপ আমেরিকার প্রত্যেক দেশে দেশে ইহাদের অনেক গুপ্ত সমিতি আছে। এই সকল সমিতির ভয়ে সকলে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত কাহারও জীবন,—কাহার ধন সম্পত্তি, কোন প্রাসাদ গির্জ্জায়, বড়লোকের অট্টালিকা ইহাদের নিকট নিরাপদ নহে। মায়া দয়া মমতা হিতাহিত ন্যায় অন্যায় ইহাদের কোন জ্ঞানই নাই। অথচ ইহারা এত গুপ্ত ভাবে কার্য্য করে যে ইহাদের পাপ কাণ্ড ইয়োরোপের সুদক্ষ পুলিশও অবগত হইতে পারেন না। ইহাদের ধরাও অতি কঠিন। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কোথায়ও বা "নিহিলিষ্ঠ," কোথায়ও বা "সোসালিষ্ট", কোথায়ও বা "আনার্কিষ্ট", এরূপ ইহাদের শত নাম আছে।

গত কয় বৎসরে ইহারা কিরূপ ভয়াবহ কার্য্য সকল করিয়াছে, তাহার কয়েকটী মাত্রের উল্লেখ করিতেছি। রুষ সম্রাট আলেকজাণ্ডার ১ম ও দ্বিতীয়, দুই জনেই ইহাদের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রেল গাড়ী ইহারা উড়াইয়া দিয়াছিল, কেবল তাঁহার ক্ষত বিক্ষত চূর্ণীকৃত দেহ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি উপস্থিত রুষ সম্রাট নিকোলাসের খুল্লতাত

গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতেছিলেন। সেই গাড়ীতে এক জন এক বোমা নিক্ষিপ্ত করে, তাহাতে গাড়ী ঘোঁড়া সহিস কোচমান সহিত তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যান। এতদ্ব্যতীত এই কয়েক বৎসরের মধ্যে রুষ রাজ্যে যে কত উচ্চ রাজ পুরুষ এই ভয়াবহ দলের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এত দিন সম্রাট নিকোলাস যে জীবিত আছেন, ইহাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য। এক দিন তাঁহার ভোজনাগারে এক দুর্ব্বৃত্ত বোম ফেলিয়া দেয়, সৌভাগ্য ক্রমে সে সময় সম্রাট তথায় উপস্থিত হয়েন নাই,—নতবা তিনি সে দিন সপরিবারে হত হইতেন।

কয়েক বৎসর হইল অষ্ট্রীয়ার বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ইহাদের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, ইনি হোটেল হইতে গাড়ীতে উঠিতে ছিলেন, এই সময়ে এক জন গুলি করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। স্ত্রী লোকেরও এই পাপাত্মাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা নাই।

ইটালি দেশের রাজা হাম্বাট এক স্কুল পরিদর্শন করিয়া ফিরিতে ছিলেন, এই সময়ে এক জন এই দলের পাপাত্মা তাঁহাকে নির্ম্মম ভাবে গুলি করে। সেই গুলিতেই গাড়ীর উপরই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

সম্প্রতি তুরস্কের সম্রাট আবদুল হামিদ শুক্রবারে মস্‌জিদে উপাসনা করিতে যান। তাঁহার গাড়ী কয়েক পদ যাইতে না যাইতে পশ্চাতে কে বোমা নিক্ষেপ করিল, আর একটু দূরে পড়িলে, তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেন। তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু শতাধিক পারিসদ ও সৈনিক প্রাণ হারাইল।

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে আমাদের সম্রাটের কনিষ্ঠা ভগিনী প্রিন্সেস্ বিয়াট্রিসের কন্যার সহিত স্পেনদেশের যুবরাজের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহারা বিবাহের পর গির্জ্জা হইতে প্রাসাদে ফিরিতেছিলেন। এই সময়ে কে কোন বাড়ীর উপর হইতে তাঁহাদের গাড়ীর উপর একটা ভয়াবহ বোম নিক্ষেপ করে। ভাগ্যক্রমে বোমটা গাড়ীতে না পড়িয়া একটু পশ্চাত দিকে পড়িল। ইহাতে নব পরিনিতা রাজা রাণীর প্রাণ বাঁচিল বটে,—কিন্তু রাণীর বিবাহ সজ্জা এক পারিসদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল।

তিন মাস পূর্ব্বে পর্টুগাল দেশে যে লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়াছে। তাহা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। রাজা ও রাণী তাঁহাদের দুই পুত্র লইয়া গাড়ীতে আসিতেছিলেন। এই সময়ে একটা লোক তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া

গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল, রাজা ও যুবরাজ হত হইলেন, যুবরাজের কনিষ্ঠ আহত হইলেন, রাণী প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। মানুষ রাক্ষসে পরিণত না হইলে কখনই এরূপ ভয়াবহ কাজ করিতে পারে না।

কেবল যে ইহাদের রাজার উপর রাগ তাহা নহে। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র দেশ, প্রজাগণই ফ্রান্সের প্রধান রাজপুরুষ প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া থাকে। মার্কিন দেশেরও এই নিয়ম, এখানে রাজা বা সম্রাট, উপাধিধারী বড় লোক নাই। এই কয় বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট কর্ণ ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মাকেনাল এই রাক্ষসদিগের হস্তে নির্ম্মম ভাবে হত হইয়াছেন।

আমাদের সম্রাট এডোয়ার্ডের উপর যে ইহাদের দৃষ্টি নাই, তাহা নহে,—তবে জগতের হিতার্থে ভগবান তাঁহাকে এই দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচ ঘাতুকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন।

ইহারা কত বড় বড় অট্টালিকা উড়াইয়া দিয়াছে,—জগতে কত অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে গেলে এই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। পাঠকগণ দেখিলেন যে কি ভয়ানক দলের বীজ ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে,—বাঙ্গলার কলঙ্কের জন্য, বিদেশ হইতে এ দেশে নীত হইয়াছে। ভগবান করুন, এই বীষবৃক্ষের বীজ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া পুণ্যশীলা পবিত্রতার আধার ভারত মাতার সুনাম রক্ষা হউক।

বিদায়।

(১)

প্রবাসী পথিক আমি
চিত মোর জ্বলে নিরন্তর
তাই গো হেরিতে আজ
আসিয়াছি বহুদিন পর॥

(২)

আশার কুসুম মোর
ঝরে গেছে নিদাঘের বায়।
জীবন-প্রদীপ-শিখা
হইয়াছে নিভ নিভ প্রায়॥

(৩)

প্রেমের বন্ধনে আর
কেহ নাই ভবে রাখিবার
নয়নের নীর শুধু
হইয়াছে সার অভাগার ॥

(৪)

জীবনের পথে একা
মরণের সাথে অনিবার
যুঝিব, অদৃষ্টে হায়!
যাহা আছে, হবে লো আমার ॥

(৫)

লাজে যদি আসি হেথা
দেখা দিতে না পার সদাই;
তবে নাহি আড়ে থেকে
দেখে ল'য়ে ফিরে চেয়ো ভাই।

(৬)

বেশীক্ষণ নাহি রব
হেসে দুটী কথা কও ভাই।
হেরিয়ে বদনখানি
দেশান্তরে ফিরে চলে যাই ॥

(৭)

আসি তবে, হেসে হেসে
অভাগারে দাওলো বিদায়।
নয়নের নীর দিয়ে
আর তুমি বেঁধনা আমায় ॥

(৮)

এই মোর শেষ দেখা
আর নাহি হবে পুনঃ হায়।
থাক সুখে চির দিন,
এই মাগি জগদীশ ঠাঁই ॥

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ।

গোষ্ঠবিহার।

নব বর্ষ সমাগমে,
এস দেব ধরাধামে,
রাধা নামে সাধা বাঁশী বাজুক আবার।
ভক্তের হৃদয় মাঝে
এখনো যে সুর বাজে
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আজ শুনিব কি তার?
লীলাময় যেই লীলা
ল'য়ে গোপ, ব্রজবালা
খেলেছিলে বৃন্দাবনে সুদূর দ্বাপরে,
হিন্দুর স্তিমিত প্রাণ
পূর্ব্বপুণ্যে বলীয়ান্
জাগায়ে রেখেছে তায় কতবর্ষ পরে।
শ্যামলী ধবলী কোথা?
শ্যাম শষ্প নাহি হেথা,
মৃত্তিকা ভক্ষণ করে গাভীগণ হায়!
সুজলা সুফলা ভূমি
হ'য়েছে গো মরুভূমি
কোকিল পঞ্চমে শুধু বসন্ত জানায়।
রাখাল বালক কোথা?
কিশোর বয়স্ক হেথা
সাজিয়া পবিত্র সাজে তব আগে যায়।
তাদের যে হাসি মুখে
দেবত্ব নিহিত থাকে
এদের দেখিব কি গো দেখিব তোমায়?
দেখ দেব গ্রাম্য ছায়া
শুধু তার আছে কায়া
প্রাণহীন অসাড় সে আছে যে পড়িয়া।

তব স্মিতমুখ হেরি
হাসে সব জোর করি
প্রাণের সহজ হাসি গেছে গো চলিয়া।
আমার কি আছে আর
কি বা দিব উপহার
এসেছি লইয়া শুধু আকুল হৃদয়।
শুধুই কি যাব ফিরি
যুগল মূরতি হেরি
দুর্ব্বল হৃদয়—যে—গো প্রতিদান চায়।
দয়ার ঠাকুর তুমি
কি আর চাহিব আমি
সুখ দুঃখ সব এবে হ'য়েছে সমান।
এখনও স্মৃতি আছে,
এখণও অশ্রু আছে,
তাই ঢের আর কিছু চাহে না কো প্রাণ।
দেখো দেব এ'র পরে
যেন গো নয়ন ঝরে,
দীনের সম্বল অশ্রু তাও না শুকায়।
আকুল পরাণ ভরে
যেন পারি কাঁদিবারে,
দুটী ফোঁটা অশ্রু তাও অধিক কি হায়!
"তেয়াগিয়া বৃন্দাবন
যাব না এক চরণ"
স্মরি সে আশ্বাস বাণী প্রীতিপ্রেম ভরে।
দুর্ভিক্ষের অট্টহাসি
কালের নিষ্ঠুর ফাঁসি
বুক পাতি লই আজ অম্লান অন্তরে।
শুনি যে বাঁশরী তান
কালিন্দী বহে উজান,
সে মোহন বাঁশরী কি বাজিবে আবার?

ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে
পুনঃ কি আসিবে ফিরে,
গীতার সে মহাবাক্য ফলিবে কি আর ?

মধু-যামিনী।

মধুমাসে হের মধুর যামিনী
শোভিছে মধুর কিবা।
জ্যোছনা কিরণ মাখি নিজ অঙ্গে
ভাতিছে কনক বিভা॥
সুনীল আকাশে তারকা নিচয়
কবরী কুসুম সম।
যামিনী কুন্তলে ঝলমল করে
হেরি কিবা মনোরম॥
বন-ফুল-হারে সাজিয়া যতনে
খেলিছে প্রকৃতি সনে।
মলয় পবনে মৃদুল হিল্লোলে
নাচিছে প্রফুল্ল মনে॥
সরোবর অঙ্গে বিকাশে কুমুদ
হাসিছে যামিনী যেন।
সে হাসি হেরিতে হের অলিকুল
ভ্রমিছে চঞ্চল হেন॥
পাপীয়া ঝঙ্কারে মন মাতাইয়া
আবেশে বিভোর প্রাণে।
ভুলাতে প্রাণেশে যেনরে যামিনী
গাহিছে; কোকিলা তানে॥
সে সঙ্গীত ধ্বনি উঠিয়া বিমানে
ঢালিয়া অমিয় রাশি।
জানিনা ক্রমেতে কাহারে শুনাতে
যেতেছে অনন্তে ভাসি॥

হেলে দুলে কভু ভঙ্গিমা নয়নে
চাহিছে চাঁদের পানে।
মাঝে মাঝে হায় কি যেন বলিছে
চকোর চকোরী কানে॥
বুঝেছি যামিনি! যাহার কারণে
সেজেছ এহেন বেশে।
পবিত্র হৃদয়ে পতির সহিত
প্রণয় মিলন আশে॥

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রমণী রহস্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন না সত্য।

মধুপুর যে চেঞ্জারগণের বিহার স্থান তাহা কে না অবগত আছেন? কয়েক বৎসর হইল মধুপুরের থানার দারোগা বাবু থানার মধ্যস্থ এক উচ্চ সুন্দর বেলগাছতলার বাঁধান রোয়াকের উপর বসিয়া অতি প্রাতে মুখ ধুইতে ধুইতে ডাকিলেন, "মুন্সি?"

মুন্সিও কেবলমাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া বদনা হস্তে বাহির হইয়াছিলেন,—দারোগা বাবুর আহ্বানে সত্বর তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "দারোগা বাবু কি ডাকিলেন?"

"হাঁ—হে—হাঁ—" বলিয়া দারোগা বাবু হাসিয়া উঠিলেন। তাহার এই অকারণ হাস্যের কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হতভাগ্য মুন্সি তাহার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন। তাহার বিস্মিত ভাব দেখিয়া দারোগা বাবু আরও উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"কাল রাত্রে ভারি একটা মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

মুন্সি বলিলেন, "বলেন কি?"

দারোগা বাবুর হাসি আর থামে না,—তিনি হাসির বেগ অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ দমন করিয়া বলিলেন, "হাঁ—হে—হাঁ,—আরি মজা! হা—হা—হা!"

মুন্সির কৌতুহল শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি অতি ব্যাকুলভাবে দারোগা বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দারোগা বাবু হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে, বলিলেন; "তবে শোন।"

"বলুন।"

এই সময়ে দুই চারিজন কনষ্টেবলও তথায় সমবেত হইয়াছিল। দারোগা বাবু বলিলেন, "আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন ঘোড়ায় চড়িয়া মধুপুরের দিকে আসিতেছি।"

মুন্সি বলিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছেন?"

দারোগা বাবু বিরক্ত স্বরে বলিলেন; "কথার উপর কথা কহিও না,—চুপ করিয়া শোন।"

ধমক খাইয়া মুন্সি ভীত ভাবে বলিলেন, "বলুন।"

দারোগা বাবু রাগত হইয়া বলিলেন, "বলিতেছি না তো কি করিতেছি,—দেখিতে পাইতেছ না? তারপর, আমি ঠিক জানিনা কোথা হইতে মধুপুরে ফিরিতেছি,—ঘোড়ায় আসিতেছি,—জ্যোৎস্না রাত্রি—"

"কাল জ্যোৎস্না ছিল?"

"চুপ—পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম যে, দুইজন লোক একটী বালিকার গলায় দড়ি লাগাইতেছে—"

"কি সর্ব্বনাশ!"

"ফের—আরও দেখিলাম,—একজন লোক গাছের পাশ হইতে এই দুই জনকে গুলি করিল—"

"কি ভয়ানক!"

"তুমি তো বাপু বড় বিরক্তজনক লোক?"

"না তাই বলি—"

"চুপ,—তারপর দেখিলাম যে লোকটা গুলি করিতেছিল—তাহাকে দূর হইতে একজন শাওতালনী তীর মারিল।"

"আশ্চর্য্য!"

"আশ্চর্য্য নয়,—হাসির বিষয়;—হা, হা হা!"

একজন কনষ্টেবল বলিল, "হুজুর, হয়তো সত্য সত্যই দেখিয়াছেন।"

দারোগা বিস্মিত ও বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যি দেখিয়াছি! গাধা শুনিলি না যে আমি রাত্রে এই রকম স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

সে মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে বিনীতস্বরে বলিল, "হুজুর;—কাল জগদীশপুরে তদন্তে গিয়াছিলেন—"

দারোগা বাবু তাহাকে প্রতিবন্ধক দিয়া বলিলেন, "তাতে হয়েছ কি?"

"আপনি কাল সেখান থেকে ঘোড়ায় ফির্‌ছিলেন।"

"গাধা!"

"আমি হুজুরের সঙ্গে ছিলাম।"

"তা জানি,—সে আক্কেল আমার আছে?"

"তাই বলছিলাম হয়তো হুজুর সত্য সত্যই দেখিয়া থাকিবেন।"

"না—আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি,—আমি আটটার মধ্যে থানায় ফিরিয়াছিলাম—না—নিশ্চয়ই স্বপ্ন।"

মুন্সি বলিল, "বিশেষ আশ্চর্য্যের স্বপ্ন।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "তাইতো হাসিতেছিলাম,—কথাটা মনে আসিতেছে আর হাসি পাইতেছে—এ আবার কি?"

এই সময়ে তথায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন,—তাহার পশ্চাতে দুই তক্‌মাধারী দরোয়ান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খুন না গুমি।

যিনি আসিলেন তাহার নাম বিনোদ বাবু। মধুপুর সহরের মধ্যস্থলে সরূপ দাসের বাঙ্গালা। একমাস হইতে মহেশপুরের রাণী বিন্ধ্যেশ্বরীদেবী চৌধুরাণী এই বাঙ্গালায় বহু লোকজন দ্বারবান লইয়া বাস করিতেছিলেন। স্বামী বিয়োগের পর তাহার দেহ নিতান্ত ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন। তাহার এক কন্যা মাত্র সম্বল,—তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই,—বয়স ত্রয়োদশ,—পরমাসুন্দরী,—নাম লক্ষ্মীদেবী। বিনোদ বাবু রাণীর একমাত্র ভ্রাতা,—তিনিই রাণীর ম্যানেজার,—সর্ব্বে সর্ব্বা।

সুতরাং এই বিনোদ বাবুকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া থানায় আসিতে দেখিয়া দারোগা বাবু বিস্মিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, "আসুন, বিনোদ বাবু,—এত সকালে এত সৌভাগ্য—"

বিনোদ বাবু দারোগা বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে বলিলেন,—"মহাশয়েরা আছেন কেন ?"

দারোগা বাবু অতি বিস্মিতস্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি ! কি হইয়াছে ?"

তিনি ক্রোধে বলিলেন, "ব্যাপার কি ! কি হইয়াছে ? আপনারা থাকিতে এই কাণ্ড ?"

"আপনি কি বলিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কাণ্ড ভয়ানক ! সকাল হইতে রাজকুমারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না !"

"হয়তো বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।"

"শুনুন সব।—রাত্রে রাণীর সঙ্গে তিনি শুইয়া ছিলেন,—ভোর রাত্রে রাণী উঠিয়া দেখেন রাজকুমারী পাশে নাই,—আরও তাহার কাছ হইতে বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত রক্ত !"

"বলেন কি ?"

"বলি আমার মাথা আর মুণ্ডু, চারিদিকে তাহাকে খুজিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম,—তাহাকে কেহ কোথায়ও খুজিয়া পায় নাই।"

"তাইতো !"

"রাণী পাগলের মত হইয়াছেন "

"হইবারই কথা,—আমিও চারিদিকে সন্ধানে লোক পাঠাইতেছি।—রাণীর বাড়ীতে সমস্ত রাত্রীই তো দরোয়ান পাহারায় থাকে ?"

"নিশ্চয়ই—একজন করিয়া জাগিয়া থাকে।"

দারোগা বাবু বিশেষ ভাবিত হইয়া বলিলেন, "তাইতো !"

পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মনে সেই স্বপ্নের কথা উদিত হইল। তবে কি—না—অসম্ভব ! তিনি মন হইতে এই ভয়াবহ চিন্তা দূর করিয়া দিয়া বলিলেন, "হয়তো তিনি বাড়ীতেই আছেন।"

বিনোদ বাবু মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমরা কি এমনই গাধা যে বাড়ী না খুজিয়া আপনাকে সম্বাদ দিতে আসিয়াছি—তার পর রক্ত—সে বিষয়ে আপনি কি বলিতে চান ?"

দারোগা বাবু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, "বিনোদ বাবু,—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—প্রথম আমায় কর্ত্তব্য করিতে দিন—মুন্সি!"

"হুজুর" বলিয়া মুন্সি ছুটিয়া আসিল। দারোগা বাবু বলিলেন, "শীঘ্র ইহা ডায়ারি ভুক্ত করিয়া চারিদিকে চৌকিদার কনষ্টেবল পাঠাও, এমন হইতেই পারে না।"

বিনোদ বাবু বলিলেন, "কি হইতে পারে না?"

"মহাশয়, একটু ক্ষমা করুন,—কাজ করিতে দিন। আমি এদিককার সমস্ত হুকুম দিয়া নিজে আপনাদের ওখানে তদন্তে যাইতেছি। সকল বিষয় না জানিলে কি বলিব।"

এই বলিয়া তিনি এক জনকে একখানা চেয়ার আনিতে আজ্ঞা করিলেন। সে ছুটিয়া গিয়া চেয়ার আনিলে, দারোগা বাবু বলিলেন, "বসুন—এখনই কাজ সারিয়া আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

বিনোদ বাবু বসিলেন,—কিন্তু তাহার পক্ষে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল, তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় নাই।—তাঁহাদের যথাসাধ্য তাঁহারা করিয়াছেন,—কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই বলিয়া,—তিনি থানায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। দারোগা বাবুও কর্ত্তব্য কার্য্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিলেন না। ডায়ারি লেখা শেষ হইবামাত্র তিনি রাজকুমারীর অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তৎপরে স্বয়ং তদন্তে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি থানা হইতে দুইপা অগ্রসর হইতে না হইতে কে পশ্চাত হইতে চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, "দারোগা বাবু—দাঁড়ান—দাঁড়ান!"

তিনি ফিরিয়া দেখিলেন রেলের ডাক্তার বাবু দুই তিনজন লোক লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। দারোগা বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আবার কি!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খুন।

ডাক্তার বাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ফিরুন—থানায় আসুন—ডায়ারী করিতে হইবে।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "বিশেষ জরুরি তদন্তে যাইতেছি।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "জরুরও ত এটা—ফিরুন—আসুন—খুনি

দারোগা বাবু প্রায় লম্ফদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "খুন!"

"হাঁ—একজন গার্ড খুন হইয়াছে,—ফিরুন-না!"

"খুন!"

"অমন করিতেছেন কেন?"

"রাণীর কন্যা হারাইয়াছে,—তাহারই তদন্তে যাইতেছি—

"পরে গেলে চলিবে—এ জরুরি জানেনইত—খুনের মামলা—তাহাতে সাহেব।"

দারোগা বাবু ব্যাকুলভাবে বিনোদ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন,—তিনি বলিলেন, "যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই করুন। আপনি আমাদের বাড়ী দুই দশমিনিট পরে গেলে কিছু বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। সেখানে যাহা তদন্ত করিবার তাহা আমরা করিয়াছি।"

"তবে আসুন।"

এই বলিয়া দারোগা বাবু ফিরিলেন।

সকলে থানায় আসিয়া বসিলে ডাক্তার বাবু বলিলেন, "রাত্রি প্রায় চারিটার সময় গার্ড স্মিথ সাহেবের খানসামা আমায় জাগাইয়া তুলিয়া বলে যে, তাহার সাহেবকে গুলি করিয়াছে শীঘ্র আসুন। আমি তখনই ছুটিয়া তাহার বাড়ী যাই। কিন্তু গিয়া দেখিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আরও অনেক সাহেব সেখানে দাড়াইয়া আছেন। আমি দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তাহার গলায় একটা গুলি লাগিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আর একটী ঠিক মাথায় লাগিয়া মাথার ভিতর রহিয়া গিয়াছে। দেহ এখনও সেই অবস্থায় আছে। আপনি গিয়া যাহা ভাল বিবেচনা করেন—করুন।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "আপনার কাছে দুই একটা কথা শুনিয়া লই।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কি বলিতে চাহেন বলুন।"

"আপনার কি মনে হয় সাহেব বসিয়াছিলেন,—কেহ তাহার পশ্চাত হইতে তাহাকে গুলি করিয়াছে।"

"না—তাহা হইলে গুলিতে যে ক্ষত হইয়াছে, তাহা অন্যরূপ হইত।"

"তাহা হইলে আপনার কি মনে হয়?"

"সাহেব দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাত হইতে তাহার অতি নিকটে আসিয়া উপরি উপরি তাহাকে কেহ গুলি করিয়াছিল।"

"সাহেব তো ব্যারাকে থাকেন,—তাহা হইলে নিশ্চয়ই বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইত।"

"না—তাহা নহে,—সাহেবকে কেহ বাড়ীতে গুলি করে নাই—"

"তবে কোথায়?"

"তাহা কেহ বলিতে পারে না। খানসামা বলে রাত্রি ৮টার সময় আহার করিয়া সাহেব বাহির হইয়া যান। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন,—তাহার সে কিছুই জানে না।"

"তাহা হইলে সাহেব এই গুলি খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা কি সম্ভব।"

"সম্পূর্ণ সম্ভব। সাহেব গুলিতে যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে তাহার পরই যদি তিনি কোন চিকিৎসকের সাহায্য পাইতেন,—তাহা হইলে হয়তো তাহার মৃত্যু হইত না। আমার বিশ্বাস এই রূপ আহত অবস্থায় তিনি অনেক দুর চলিয়া আসিয়াছিলেন;—তাহাতেই রক্ত ক্ষয়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"সাহেব বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কি করিলেন, খানসামা এবিষয়ে কি বলে।"

"সে বলে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় সাহেব ফিরিয়া আসিলেন,—সে দরজায় ঘুমাইতেছিল। সাহেব তাহার উপর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে সাহেবের অবস্থা দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে সাহেব মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল,—কিন্তু তাহার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ত মাখা। সাহেব কষ্টে উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়েন,—অস্পষ্টস্বরে বলেন, "ডাক্তার—ডাক্তার"—তখনই খানসামা আমাকে ছুটিয়া ডাকিতে আসিল?"

"সাহেব কাহাকে কিছু বলিয়া গিয়াছেন।"

"না কিছু মাত্র না। খানসামা আমায় ডাকিতে ছুটিলে তাঁহার পার্শ্বের ঘরের সাহেব তাহার গোগডানি শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিতে আসেন,—তিনি বলেন যে তখন তাহার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার একটু পরেই তাহার মৃত্যু হয়।"

এই সময়ে সহসা দারোগা বাবু লম্ফদিয়া উঠিয়া বলিলেন। "এ আবার কি! আমি কি পাগল হইব! আবার খুন!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লাস।

সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন দুইজন লোক কাহার মৃত দেহ বাঁশে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে দুইজন চৌকিদার ও আরও অনেক লোক। এই দৃশ্য দেখিয়া থানাগৃহ হইতে সকলে সত্বর বাহিরে আসিলেন।

তাহারা মৃত দেহ থানা গৃহের সম্মুখে নাবাইলে চৌকিদার দুইজন অগ্রসর হইয়া দারোগা বাবুকে সেলাম করিল,—তিনি বলিলেন "এ কি?"

চৌকিদার বলিল। "বটগাছ তলায় এই লাস পাওয়া গিয়াছে। তাহাই লইয়া আসিয়াছি।"

মুন্সি দারোগা বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হইল যেন ইচ্ছা করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন না। যাহারা মধুপুরে গিয়াছেন তাহারাই জানেন যে মধুপুরের নিকট এক স্থানে একটী প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। ইহা একটী দেখিবার বিষয়। যে কেহই মধুপুরে আসুন না কেন,—এই বটগাছ না দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন না। এই মৃতদেহ এই সুবিখ্যাত বটগাছের নিম্নে পাওয়া গিয়াছে।

দারোগা বাবু মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন।" লোকটা কে?"

চৌকিদার বলিল, "জানি না,—দেখুন—বোধ হয় চেঞ্জার বাবু,—এখানকার লোক হইলে চিনিতে পারিতাম।"

সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চেঞ্জার বাবু!"

মুন্সি আবার দারোগাবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন,—কিন্তু দারোগা বাবু তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "লোকটী কে, চেঞ্জার বাবু—ডাক্তার বাবু দেখুন দেখি।"

ডাক্তার বাবু—মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক?"

দারোগা বাবু বলিলেন,—"আশ্চর্য্য কি!"

ডাক্তার বাবু যেন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিলেন,—"কি অশ্চর্য্যের বিষয়,—অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! গার্ড স্মিথের যেমন গলায় ও মাথায় গুলি লাগিয়া ছিল,—ইহারও ঠিক সেই রূপ লাগিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন এক লোকে একই পিস্তলে একই গুলিতে

একই রকমে এই দুই জনকে খুন করিয়াছে। অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। লোকটা কে,—কেহ চিনেন,—আমিতো ইহাকে পূর্ব্বে কখনও এখানে দেখি নাই।"

তিনি ফিরিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।—সকলেই সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"না কই ইহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।"

দারোগা বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মুন্সি এখনই ঢেড়া দেও,—সকলে দুই ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া—লাস দেখিয়া যান। তাহার পর লাস চালান দিব। দেখিতেছি ভদ্রলোক,—গায়ে কেবল একটা সার্ট,—তাহাতে—একি বোধ হয় সোনার বোতাম—হাতে একটা আংটীও আছে, মুন্সি।"

"হুজুর।"

"ডায়ারি কর। পুলিশের চাকুরী কেমন বুঝিতেছ।"

"হুজুর,—সকাল থেকে তো অনেক দেখিতেছি—এখন আরও কি হয়।"

"এখন বল দেখি কোন তদন্তে যাই,—কে বলিতে পারে যে আর দু'দশটা এই রকম না আসিবে—"

"হুজুর—দু'দশটা—"

"আশ্চর্য্য কি! ডাক্তার বাবু আপনিই বলুন। এই বিনোদ বাবু—রাণীর কন্ঠা চুরি গিয়াছে,—তাহার পর আপনি। এই গার্ড সাহেবের খুন—তারপর এই দেখুন আর এক নম্বর লোকটা কে,—তাহাই স্থির নাই।"

"হুজুরের স—"

"চুপ গাধা! তোমার আল্লা কি তোমার ধড়ে একটু আক্কেল দেন নাই—চৌকিদার—"

চৌকিদার অগ্রসর হইয়া আবার সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল। দারোগা বাবু বলিলেন,—"গাছের তলায় কি কি দেখিয়াছ বল।"

চৌকিদার বলিল,—"হুজুর গাছতলায় আর কিছু দেখিতে পাই নাই,—কেবল এই লাস উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল,—তাহাই ইহাকে—"

দারোগা বাবু ক্রোধে চক্ষু আরক্তিম করিয়া বলিলেন, "তোদের মত আহম্মক লইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়াই, পায় পায় উপর ওয়ালার কাছে লাথি ঝাঁটা খেতে হয়। লোকটাকে দেখ্‌ছিস কেউ গুলি করে মেরেছে, সে সেই গুলি খেয়ে পড়ে গেছে, আর সেইখানে তার রক্ত নেই—বটে বেটা?"

"হুজুর রক্ত দেখতে পাইনি।

"শালা বজ্জাত,—আমার গাধা ঠাওরিয়াছ?—কাল তোমার বরতরফ কর্ব্বো।—চৌকিদারী কচ্চেন! না?"

দারোগা বাবুর সহসা এই তর্জ্জন গর্জ্জন ক্রোধের কারণ বিশেষ কিছু না দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু কেহ কোন কথা কহিলেন না।

দারোগা বাবু বলিলেন, "মুন্সি এখনই ঘোড়া জুতিতে বল—আমি এখনি অকুস্থানে আপনি গিয়ে তদন্ত কর্ব্বো,—দেরি কল্লে অনেক প্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে—ডিটেক্‌টিভগিরি হাসি মসকারম নয়। এতে বুদ্ধি লাগে।"

মুন্সি অতি বিনিত ভাবে বলিল, "তাতো বটেই হুজুর।"

দারোগা বাবু বলিলেন। তুমি এখানে থেকে এই লাস শেনাক্ত করাও। এই লোক যখন এখানে আসিয়া মারা পড়িয়াছে তখন ইহাকে কেহ না কেহ চিনিতে পারে। ডাক্তার বাবু, আপনি যান,—আমি পরে গার্ডের বাড়ী যাইব,—বিনোদবাবু, আপনিও জান,—পুলিশের দ্বারা যাহা হইবার তাহা হইবে,—তাহাতে ক্রটী হইবে না। রাম সিং ভিড় নিকাল দেও।"

এই বলিয়া দারোগা বাবু আপিস গৃহে প্রবেশ করিলেন। যে যাহার গৃহে চলিয়া গেল। লাস এক বৃক্ষের ছায়ায় রক্ষিত হইল। মুন্সি মনে মনে বলিলেন, "দারোগা বাবুর এ ভাব বড় দেখা যায় না।—ব্যাপারটা কি! স্বপ্ন—না—সত্যি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বটতলা।

ক্ষুদ্র মধুপুরের ন্যায় সহরে এই রূপ একটা ব্যাপার ঘটিলে যে একটা হলস্থূল পড়িয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! বিখ্যাত বটতলার নিম্নে এইরূপ একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে শুনিয়া মধুপুর শুদ্ধ লোক সেই দিকে ছুটিল। দারোগা বাবু বিচক্ষণ লোক, তিনি পূর্ব্ব হইতেই কতকটা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাই তিনি প্রথমেই বটগাছ পর্য্যবেক্ষণে চলিলেন। কিন্তু মুন্সি ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিলেন, "হুঁ হুঁ—ইহার ভিতর কিছু আছে।"

দারোগা বাবুর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বহুলোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। তিনি সকলকে তাড়াইয়া দিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বটগাছের নিম্নে বা ইহার বহুদূর পর্য্যন্ত কোন স্থানে কিছু

মাত্র রক্ত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। এই লোককে কেহ যদি এই খানে গুলি করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এখানে রক্ত চিহ্ন থাকিত, কিন্তু দারোগাবাবু বিশেষ অনুসন্ধানেও কোন স্থানে কোন রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না।

কাল রাত্রে এই গাছ তলায় কোন যে ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন নাই,—তিনি ফিরিতেছিলেন, এই সময়ে এক জন চৌকি-দার গাছে কি একটা দ্রব্য আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, "হুজুর,—ঐ দেখুন।"

দারোগা বাবু চাহিয়া দেখিলেন একটী তীর, বৃক্ষের গুড়িতে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি চৌকিদারকে তীর তুলিয়া আনিতে বলায় সে গাছে উঠিয়া তীর অতি কষ্টে তুলিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল,—দারোগা বাবু তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ তীর কাহার,—তোমরা কেহ বলিতে পার?"

যে সকল লোক তাঁহার ভয়ে দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া তীর দেখিতে লাগিল,—তাহার পর সকলে এ উহার মুখ চাওয়াচাহি করিতে লাগিল। দারোগা বাবু ইহা দেখিয়া ক্রোধ কষায়িত লোচনে বলিলেন, "কার তীর? বেটারা জেনে শুনে না বলিলে মারা যাইবে।" তাহারা সকলে বিনীতভাবে বলিল, "হুজুর, আমরা জানি না,—জানিলে হুজুরকে অবশ্যই বলিতাম।"

দূর হইতে কে বলিল, "ডাইনীর তীর।" দারোগা বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ও কে? কে বলে ডাইনীর তীর!"

যেখান হইতে এই কথা উঠিয়াছিল, দুই চারি জন চৌকিদার সেই দিকে ছুটিয়া গিয়া কে এই কথা বলিল বলিয়া সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলিল যে তাহারা কিছুই জানে না। দারোগাবাবু আরও রাগত হইয়া উঠিলেন,—যে দিক হইতে এই ডাইনীর কথা উঠিয়া ছিল, সেই দিককার সমস্ত লোককে ধরিয়া সম্মুখে আনিলেন,—তাহাদের প্রত্যেককে নানা প্রশ্ন করিলেন। তাহাদের গলার শব্দ বিশেষ লক্ষ্য করিলেন,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ যে এই কথা বলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তবে কে কোথা হইতে এই কথা বলিল? কেবল যে দারোগা বাবু বিস্মিত হইলেন, তাহা নহে—সেখানে যে যে ছিল, সকলেই বিস্মিত হইল,—ভীত ভাবে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিল,—কেবল দারোগা বাবুর ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

খুনের কোন বিষয়ই কিছু জানিতে না পারিয়া দারোগাবাবু আবার ঘোড়ায় উঠিলেন। চৌকিদার যাহা বলিয়াছিল, তাহার অধিক তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত দেহ এই বটগাছের নিম্নে চৌকিদার দেখিতে পাইয়া তাহা থানায় লইয়া গিয়াছে—এই মাত্র; অথচ খুনের কোন চিহ্নই এই বটগাছের নিম্নে নাই।

দারোগা বাবু অগত্যা থানায় ফিরিলেন। থানায় আসিয়া দেখিলেন একটী ভদ্রলোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে,—তিনি উঠিয়া বলিলেন, "দারোগাবাবু,—বিশেষ দুঃখের সহিত আপনাকে একটী কথা বলিতে হইতেছে।"

দারোগা বাবু অতি বিস্মিত ও বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু? বিরক্ত করিবার কি আর সময় পাও নাই?"

তিনি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "আমার নাম গোঁসাই মহাশয়,—কলিকাতার ডিটেকটিভ ইনেস্পেকটার। মহাশয়ের নামে একখানা ওয়ারেণ্ট আছে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নূতন কথা।

লোকে বলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোকে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পড়ে। সহসা থানার মধ্যে থানার দারোগাকে এ কথা বলিলে লোকে যে ইহাপেক্ষাও অধিকতর বিস্মিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! মুন্সি প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেলেন। কনষ্টেবলগণ ভীতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল,—দারোগাবাবু স্তম্ভিত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ডিটেকটিভ ইনেস্পেক্টার গোঁসাই বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার পক্ষে এত আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না—"

এতক্ষণে দারোগা বাবুর মুখে কথা বাহির হইল,—তিনি অতি ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু? এ কি স্থান বোধ হয় জান না।"

গোঁসাই বাবু আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাহা বিশেষ অবগত আছি। এখন ওয়ারেণ্টখানি দেখিতে আজ্ঞা হউক।"

এই বলিয়া গোঁসাই বাবু পকেট হইতে এক খানা কাগজ বাহির করিয়া—দারোগা বাবুর হস্তে দিলেন। ওয়ারেণ্ট সর্ব্বনেশে জিনিষ,—দারোগা বাবু শত চেষ্টা করিয়াও আত্ম-গাম্ভির্য্যতা বজায় করিতে পারিলেন না, তাহার হস্ত সুস্পষ্ট কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কাগজখানি হাতে লইয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ওয়ারেণ্ট,—আমার নামে ওয়ারেণ্ট—কেন?"

গোঁসাই বাবু বলিলেন,—"কেন, তাহা আপনি বেশ অবগত আছেন—নয় কি?"

"না—আমি কিছুই জানি না, এখানে এ রকম জাল বদমাইসি চলিবে না।"

"আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবই বলিতে পারেন--তবে এখন——"

"এখন কি? আমি এখনই তোমায় গারদে পাঠাইব—মুন্সি ডাইরি কর,—রাম সিং—ভোলা সিংহ,—এই লোকটাকে এখন গারদ ঘরে রাখ।"

গোঁসাই বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন আমি একলা আপনার মত এক জন দারোগাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি—লোক সঙ্গে আছে।'

গোঁসাই বাবুর অভীতি ভাব ও গাম্ভির্য্যে দারোগা বাবু একটু কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন,—তিনি বসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কে জানি না,—ব্যাপার কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তবে বুঝাইয়া দি।"

এই বলিয়া গোঁসাই বাবু পকেট হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিয়া অতি ধীরে ধীরে সে গুলি খুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "মধুপুরে উপস্থিত একজন রাণী বাস করিতেছেন,—তাহার এক কন্যা আছে,—নাবালিকা, অবিবাহিতা,—এই রাণীর ক্ষেন্ত বলিয়া এক দাসী ছিল, এই ক্ষেন্ত এই রাজকুমারীকে ভুলাইয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাক টাকার গহনাও লইয়া গিয়াছে। মহাশয় এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন। গহনা পূর্ব্বেই কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিল,—যে গহনা লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল, সে এক জন রাণীর চাকর,—সে এত টাকার গহনা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করায় কলিকাতা পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে,—বলা বাহুল্য সে সকল কথাই বলিয়া ফেলিয়াছে,—তাহাই মহাশয়ের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে—যাহাতে মেয়েটীকে আপনারা কলিকাতায় লইয়া যাইতে না পারেন, সে জন্য

আমরা রাত্রের গাড়ীতেই মধুপুরে রওনা হইয়াছিলাম। ক্ষেত্র দাসীর নামেও ওয়ারেণ্ট আছে, আর কিছু শুনিতে চাহেন ?"

দারোগা বাবু বিবর্ণ মুখে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, এক্ষণে বলিলেন, "এ সমস্তই মিথ্যা কথা,—আমি ইহার কিছুই জানি না।"

গোঁসাই বাবু বলিলেন, "সম্ভব! বিচারে সমস্তই প্রকাশ পাইবে,—এখন কি আপনার বিশ্বাস হইল যে ওয়ারেণ্ট জাল নহে।"

দারোগা বাবু বলিলেন, "তা-তা—জামিন—এ সম্বন্ধে——"

সহসা বাহিরে একটা গোল উঠায় সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন দুই তিন জন লোক থানার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা হাপাইতে হাপাইতে থানার দ্বারে আসিয়া বলিল, "দারোগা বাবু, দারোগা বাবু,—শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন।"

তাহারা কে,—কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত ভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।—দারোগা বাবু নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত ছিলেন—তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না,—গোঁসাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ?"

তাহারা বলিল, "আমরা রাণী বাড়ীর চাকর—দারোগা বাবু শীঘ্র আসুন।"

"কি হইয়াছে ?"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে,—শীঘ্র আসুন।" এই সময়ে কলিকাতা পুলিশের কয়েক জন কনষ্টেবল সহ এক জন ইন্‌স্পেক্টার তথায় উপস্থিত হইলেন,—গোঁসাই বাবুকে দেখিবা মাত্র ইন্‌স্পেক্টার বলিয়া উঠিলেন, "এই যে মহাপ্রভু। এত কষ্ট দিতে হয় ?"

গোঁসাই বাবুর মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইতে না হইতে—কনষ্টেবলগণ তাহার হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া তাহাকে টানিয়া থানা গৃহের বাহিরে বৃক্ষতলস্থ মৃত দেহের দিকে লইয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সদরে

কলিকাতার পুলিশ কমিসনার সাহেব তাহার শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ রামঅক্ষয় বাবুকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিলেন। রাম

অক্ষয় বাবু তাহা পাঠ করিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বুঝিতেছেন ?"

রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন"সমস্যা গুরুতর—এখন কিছুই বলিতে পারি না।

"তোমাকে আজই মধুপুর রওনা হইতে হইবে।"

"আপনি হুকুম করিলেই যাইব।"

"দুইটী খুন হইয়াছে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এই রাণীর কন্যাকে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক জন দাসী ও চাকর নিরুদ্দেশ হইয়াছে। সাওতাল পরগণার পুলিশ সাহেব যাহা যাহা লিখিয়াছেন সবইতো পড়িলে,—ইহাতে একটা ধারণা হওয়া উচিত।

"আমার যাহা ধারণা হইয়াছে। অনুমতি হইলে বলি।"

"নিশ্চয়ই ;—তুমি এ অনুসন্ধানের ভার লইবার পূর্ব্বে আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

"যাহা ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এইঃ—এক জন রেলের গার্ড, আর একটী অল্প বয়স্ক ভদ্রলোক খুন হইয়াছে,—দুই জনেরই গুলির আঘাত একই রূপ, সুতরাং মনে হয় যে একই লোক দুই জনকে খুন করিয়াছে।"

"এতো দেখাই যাইতেছে,—এখন কথা হইতেছে কে খুন করিল ?"

"আমি সংক্ষেপতঃ সকলই আলোচনা করিবার চেষ্টা পাইতেছি—তাহার পর এই মুন্সির কথা। সেই দিন সকালে দারোগা যে অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলিয়াছিল, তাহা দারোগার সম্পূর্ণ বানান কথা কিনা, খুব সম্ভব দারোগা এই দৃশ্য সচক্ষে দেখিয়াছিল। খুব সম্ভব সেও এই ব্যাপারে জড়িত আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।"

"তাহার পর ইহাদের নিরুদ্দেশ।"

"হাঁ—দারোগা থানায় ফিরিয়া আসিবামাত্র গোঁসাই বাবু একজন লোক কলিকাতা পুলিশের একজন ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টার বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে ওয়ারেন্ট দেখাইয়া গ্রেপ্তার করে,—একটু পরেই পাঁচ ছয় জন কলিকাতা পুলিশ কনষ্টেবল ও ইন্‌স্পেক্টার গিয়া গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করে। তাহার পর তাহারা দারোগা ও গোসাইকে লইয়া পরের গাড়ীতেই রেলে উঠে, তাহার পর তাহাদের যে কি হইয়াছে,—তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

"ঠিক,—তাহারা সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হইয়াছে।"

আর যাহা কিছু ছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কে কখন এই সকল লইয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।"

"আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই।"

"তাহার পর বিনা কারণে একজন দাসী রাণীর বাড়ী গলায় দড়ি দিয়া সেই দিনই মরিয়াছে,—ইহার হঠাৎ আত্মহত্যা করিবার কারণ কি?"

"অতি জটিল সমস্যা। হঠাৎ এরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় না।"

"তাহার পর এই ডাইনীর তীর কি? কে একথা সে দিন গাছতলায় বলিয়াছিল, কেই বা এ তীর ছুড়িয়াছিল—

"এ সমস্তই দেখিয়াছি, এখন কথা হইতেছে ব্যাপারটা কি?"

"সেখানে গিয়া অনুসন্ধান না করিলে কিছুই বলা সম্ভব নহে।"

"সে কথা তো নিশ্চিত,—মনে কর কি এই সমস্তই এক দলের কাজ।"

"চারদলও হইতে পারে।"

"কি—কি—চার দল তো আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

"প্রথম এই দারোগার দল,—দ্বিতীয় এই মুন্সির——"

"তুমি মুন্সিকেও সন্দেহ করিতেছ?"

"যে রকম ব্যাপার তাহাতে সকলকে সন্দেহ করা উচিত।"

"তাহার পর আর কে?"

"এই গোঁসাই বাবুর দল, তাহার পর যে ইন্‌স্পেক্টার তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার দল। এই চারদলের কোন না কোন দলের সহিত রাণীর দাসী ও চাকর জড়িত আছে,—খুব সম্ভব রাণীর ম্যানেজার বিনোদ বাবু ও ইহার ভিতর আছেন। হয়তো চার দলের প্রত্যেক দল প্রত্যেক দলের উপর চাল চালিতেছে। অথবা এই সমস্ত লোক লইয়া একটা দল,—রাণীর যথেষ্ট লইয়াছে, থানাতেও রাহাজানি ও চুরি করা সহজ নহে, সুতরাং এক দলই হউক আর চার দলই হউক ইহারা লোক সহজ নহে।"

এই সময়ে একজন চাপড়াসী আসিয়া সাহেবের হাতে এক খামা টেলিগ্রাম দিল, সাহেব টেলিগ্রাম খানি খুলিয়া পাঠ করিয়া মৃদু হাসিলেন, তাহার পর রাম অক্ষয় বাবুর হাতে টেলিগ্রাম খানি দিয়া বলিলেন, "দেখুন! আরও অদ্ভুত।"

রামঅক্ষয় বাবু পাঠ করিলেন,—"রাণীর মেয়ে বাড়ীতেই ছিল—শীঘ্র খুব ভাল এক জন ডিটেকটিভ পাঠান। বিলম্বে আসামী ধরা কঠিন হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রহেলিকা

রাম অক্ষয় বাবুর পত্র পাঠ শেষ হইলে সাহেব বলিলেন, "এখন কি বুঝিলেন ?"

রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন, "সমস্তই গোলমাল বলিয়া বোধ হইতেছে। মেয়েটী যদি বাড়ীতেই ছিল, তাহা হইলে তাহাকে এত দিন খুজিয়া পাওয়া যায় নাই কেন ? আর দারোগা সপ্নেই হউক আর সত্যই হউক যে মেয়েকে বট গাছ তলায় দেখিয়াছিলেন, সে মেয়েত রাণীর মেয়ে নহে। সে মেয়েই বা কে ! যেরূপ গোলযোগ ব্যাপার, সেখানে না গেলে কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না।"

সাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে আজ রাত্রেই রওনা হও,—দেরি করিও না, আমি এখনই মধুপুরে পুলিশ সাহেবকে টেলিগ্রাম করিতেছি।"

রাম অক্ষয় বাবু সাহেবকে সেলাম দিয়া সত্বর বাড়ীর দিকে চলিলেন। সঙ্গে আরদালীকে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে মধুপুরে রওনা হইলেন। তিনি এক খানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাহার আরদালী মালপত্র লইয়া থার্ড ক্লাসে উঠিল।

দুই দিন পরে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেব মধুপুর হইতে এই পত্র পাইলেন।

"মহাশয়,—আপনার টেলিগ্রাম পাইয়া ডিটেক্‌টিভ সুপারিণ্টেণ্ড রাম অক্ষয় বাবুর প্রত্যাশায় আমি সকালে স্বয়ং ষ্টেশনে ছিলাম, কিন্তু গাড়ী হইতে তিনি নামিলেন না। তাহার আরদালী থার্ড ক্লাস হইতে ছুটিয়া তাহার সন্ধানে সেকেণ্ড ক্লাসের নিকট আসিল, কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে রাম অক্ষয় বাবু নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, আরদালি মালপত্র লইয়া থার্ড ক্লাসে উঠে। বর্দ্ধমানে গাড়ী আসিলে সে তাহার সন্ধানে আসিয়া দেখে যে তিনি নিদ্রা যাইতেছে, গাড়ীতে আর কেহ নাই। তাহার পর সে তাহার গাড়ীতে উঠিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রাত্রে আর কি হই-য়াছে, তাহা জানে না। মধুপুরে গাড়ী আসিলে সে ছুটিয়া আসিয়া দেখে রাম অক্ষয় বাবু গাড়ীতে নাই। তাহার সঙ্গে কেবল একটী ব্যাগ ছিল। গাড়ীর মধ্যে তাহা খোলা পড়িয়া আছে, ব্যাগে যাহা কিছু ছিল, তাহা কে

সমস্তই বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়াছে। তিনি যে কম্বল বেঞ্চের উপর বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বেঞ্চের উপর সেইরূপই পাতা রহিয়াছে।

গার্ড, ড্রাইভার, গাড়ীর অন্যান্য সকলকেই তাহার বিষয় অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কেহই কিছুমাত্র বলিতে পারে না,—এখান হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে, লাইনের দুই ধার অনুসন্ধান করা হইয়াছে,—কোথাও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। যদি দৈবাৎ কোন গতিকে তিনি গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাহার জীবিত বা মৃত দেহ লাইনের পার্শ্বে পাওয়া যাইত। লাইনের দুই ধার বিশেষ করিয়া দেখা হইয়াছে, কেহ যে গাড়ী হইতে কোন স্থানে পতিত হইয়াছে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রত্যেক ষ্টেশনে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। তিনি যে কোন ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়াও বোধ হয় না। সকলেই বলিয়াছেন, সেকেণ্ড ক্লাস হইতে কোন প্যাসেঞ্জার নামিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য করিতেন।

আপনার রাম অক্ষয় বাবুর ব্যাপার এই,—সমস্তই অতি জটিল ও রহস্যময় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখানকার দারোগা, তাহার পর গোসাই বাবু,—তাহার পর জাল ইনেস্পেক্টর প্রভৃতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাণীর গহনা বা থানার মালখানার টাকা প্রভৃতিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই,—এদিকে রাণী কাহারও কোন কথা না শুনিয়া তাহার লোক জন লইয়া আজি দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আটক করিয়া এখানে রাখিবার আমাদের আইনানুসারে কোন অধিকার নাই,—তাহাই তাহার গমনে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারি নাই। তবে এটা স্থির তিনি এখান হইতে হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় আমাদের অনুসন্ধানের যে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য করিতেছি। এক্ষণে সকল কথাই আপনাকে লিখিলাম; যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন ইতি।"

সাহেব পত্র পাঠ শেষ করিয়া মৃদু হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর তাঁহার সমস্ত বিচক্ষণ ইনেস্পেক্টর ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজ পত্র দিয়া বলিলেন, "এই রহস্য যিনি ভেদ করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট

চেষ্টা করিতে পারেন, বিশেষতঃ আপনাদের এক জন প্রধান সুপারিণ্টেণ্ড এই অনুসন্ধানে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। এক জন দারোগাকেও কাহারা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার একটা মিমাংসা করিতে না পারিলে বিশেষ লজ্জার কথা।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রারম্ভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৌকা।

আমরা মধুপুরের যে ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তাহার দুই বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি।

যশোহরের মধ্যস্থিত নবগঙ্গার তীরে সুন্দরপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম;—গ্রামের পার্শ্ব দিয়া স্নিগ্ধ সলিলা নবগঙ্গা তরতর শব্দে প্রবাহিতা, নদীর দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী, তাহাদের নীল পাতা সম্বলিত শাখা সকল নবগঙ্গার জলের উপর শত সৌন্দর্য্য বিস্তৃত করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে নদীর দুই তীরে ঘাট, ঘাটে অবগুণ্ঠনবতী রমণীগণ কলসী কক্ষে জল লইতে আসিতেছেন। দুই চারিটা উলঙ্গ বালক জলে পড়িয়া জল তোলপাড় করিয়া দিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই এক খানা ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকা তরতর শব্দে চলিয়াছে। চারিদিকেই প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য।

সুন্দরপুরের নিকট একটী নির্জ্জন ঘাটে একখানি পান্সি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। এ ঘাটে কোন লোক জন নাই। এখানে লোক জন আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ এই ঘাটের অতি সন্নিকটে সুন্দরপুরের শ্মশান। যাহারা সৎকার করিতে আসিত, তাহারাই কেবল এই ঘাটে স্নানাদি করিয়া গৃহে ফিরিত। ঘাটের অদূরে পুরাতন বংশ, ভগ্ন কলসি, কৃষ্ণ অঙ্গার পতিত রহিয়াছে, তবে বহুদিনের মধ্যে এখানে যে কোন সৎকার হয় নাই, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই ঘাট অতি নির্জ্জন—বিশেষতঃ তির

নবগঙ্গা বাঁকিয়া এই স্থানে কতকটা ভিতরে গিয়াছে, অনেকটা নবগঙ্গা এই স্থানে শ্মশান ঘাটে কতকটা পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। নদীর তিনদিকেই বৃক্ষশ্রেণী। সুতরাং আমরা যে ক্ষুদ্র নৌকার কথা বলিতেছিলাম, তাহা যেখানে বাঁধা ছিল, সেখানে এই নৌকা অপরে যে দেখিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। যাহাদের নৌকা তাহারা ইচ্ছা করিয়াই যে নৌকা এই ঘাটে লাগাইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

নৌকার মুখে এক জন দাঁড়ী বসিয়া তামাকু টানিতেছিল, উপরে তীরে বৃক্ষতলে একব্যক্তি রন্ধন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ভাতের হাড়ী হইতে ফেন উত্থিত হইয়া চারিদিকে পতিত হইয়া তাহার মৃত্তিকা নির্ম্মিত উনান প্লাবিত করিতেছে। হতভাগ্য সেই ফেন বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছে।

আর কোন দিকে কোন লোক নাই। নৌকার ভিতর কেবল এক জন আছেন। তিনি নৌকার মধ্যে বসিয়া সম্মুখে একখানি পুস্তক রাখিয়া পাঠ করিতেছিলেন, কিন্তু পুস্তক পাঠে বোধ হয় তাহার মন ছিল না, তিনি প্রায়ই নৌকার ক্ষুদ্র ঝাপরি জানালা দিয়া তীরের দিকে চাহিতেছিলেন,—দেখিলেই বোধ হয় তিনি কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কে যেন তীরের দিক হইতে আসিবেন তিনি তাহারই প্রত্যাশা করিতেছিলেন।

ইনি একটী স্ত্রীলোক,—যুবতী, বোধ হয় সপ্তদশ বৎসরের অধিক তাহার বয়স নহে। পরমা সুন্দরী! তাহার আজানুলম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশ তাহার পৃষ্ঠ আবরিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে তাহার রূপ শত গুণ যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইনি সধবা কি বিধবা তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, কারণ ইহার অঙ্গে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই! সাদা শূন্য সুন্দর গোল হাত দুইটী ইহাতে আরও সুন্দরতম দেখাইতেছে, অথচ বোধ হয় যেন সিতায় সিন্দূর আছে, কিন্তু তাহাও অস্পষ্ট। সুন্দরী প্রায়ই মধ্যে মধ্যে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া তীরের দিকে চাহিতেছিলেন,—কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে কেহই আসিল না।

তীরে দাঁড়ীর ভাত নামিল, ডাল চড়িল, নৌকাস্থ দাঁড়ী এক কলিকা তামাক শেষ করিয়া আর এক কলিকায় আগুণ চড়াইল। এই সময়ে আর দুই জন দাঁড়ী কতকগুলি আহারিয় দ্রব্য,—চাল, ডাল, কাষ্ঠ, তরকারী, মাছ লইয়া নৌকায় আনিয়া রাখিল,—রমণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?"

এক জন দাঁড়ী বলিল, "মা ঠাকরেন, তারা আসতিছেন। এই সব কিনে দিয়ে আমাগার আগে পাঠালন।"

রমণী এ কথায় বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন না,—অতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তবে ইহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা ভাবিয়া তিনি মন স্থির করিবার জন্য আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন।

পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে তীরে কাহার পদ শব্দ শ্রুত হইল,—কে যেন,—না একজন নহে। দুই জন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা স্পষ্ট পায়ের শব্দে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পর মুহূর্ত্তেই দুই জন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে তথায় ছুটিয়া আসিল। এক জন বৃদ্ধ হিন্দু, অপরে মুসলমান। দুই জনেই রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "পালা—পালা—পালা,—"

দাঁড়ী ভাত ফেলিয়া নৌকায় ছুটিল। যে দুই জন লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল,—তাহারা লম্ফ দিয়া নৌকায় উঠিল, তাহার পর মুহূর্ত্তেই তাহারা নৌকা খুলিয়া প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল। নৌকা তীর বেগে ছুটিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নৌকা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এই সময়ে কয়েক জন লোক আসিয়া তীরে সমবেত হইল। তখন নৌকা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঊষা।

নৌকা নবগঙ্গাবক্ষে তীর বেগে ছুটিয়াছে। ক্ষুদ্র নৌকা,—তাহাতে চারিজন দাঁড়ী, দেখিতে দেখিতে নৌকা বহুদূরে গিয়া পড়িল। বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে নৌকার পশ্চাৎ দিকে চাহিতেছিলেন, তখনও তিনি হাঁপাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি সর্ব্বদাই ভয় করিতেছিলেন যে অন্য নৌকা তাঁহাদের নৌকার অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্য্যন্ত নৌকা আসিলেও পশ্চাতে অন্য কোন নৌকা দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নৌকার ভিতর উপবিষ্টা বিষণ্ণ আননা রমনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান, অদৃষ্টে আরও কত কি লিখিয়াছেন।"

রমণী বলিলেন, "বাবা, ভগবানের দোষ কি,—সকলই আমার কপালের দোষ।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না উষা,—দোষ আমার,—আমি যদি তোমার এরূপ বিবাহ না দিতাম,—তাহা হইলে তোমার এ দশা হইত না।

উষা বলিল, "বাবা,—সে সব কথায় আর কাজ নাই, কি হইয়াছে, তাই বল।"

বৃদ্ধ বলিল, "আর বলিব কি আমার মাথা আর মুণ্ডু;—আমি গরিব মানুষ আর বেহাই আমার বড় লোক,—আমায় দেখেই আমায় ধরে লোক জনকে জুতা মার্ত্তে হুকুম দিল,—ছুটে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছি,—দেখ্‌লেই তো।"

উষার সুন্দর আয়ত লোচনদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—তাহার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গেল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমি আসিয়াছি,—তাহা কি বাবা তিনি শুনিয়াছেন।"

"না, কেমন করিয়া শুনিবেন,—আমাকে কি কোন কথা কহিতে দিল,—আমায় দেখেই একেবারে জুতা মারবার হুকুম! ভগবান এত অপমানও আমার অদৃষ্টে লিখেছিলেন।"

"বাবা,—বাবা,—আমার জন্য তোমায় এত কষ্ট পাইতে হইতেছে?"

"না—মা—তোমার দোষ কি? এমন পাজির ঘরে তোমার বিবাহ দিয়াছিলাম! আগে কি জানিতাম এমন?"

বৃদ্ধ আর কথা না কহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, উষাও মুখ ফিরাইয়া লুকাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

ইহাদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রামরূপ শর্ম্মা গরিব লোক,—যাজকতা করিয়া যৎসামান্য কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই তাঁহার একরূপ চলিত। তাঁহার ব্রাহ্মণী ও দুইটী কন্যা ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। কন্যা নিশা জ্যেষ্ঠা,—উষা কনিষ্ঠা। তবে নিশা ও উষার ন্যায় সুন্দরী সে প্রদেশে আর কেহ ছিলনা।

সুন্দরপুরের জমিদার রায় বনমালী চৌধুরী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ;—তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত,—এই ইংরাজ শাসনের মধ্যেও তাঁহার অত্যাচারের পরিসীমা ছিলনা।

গরীব রামরূপ এই বনমালী রায়ের প্রজা। তাঁহার মেয়ে দুইটী পরমা সুন্দরী দেখিয়া বনমালী একরূপ জোর করিয়া গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে দুইটীকে

তাঁহার সম্বন্ধি গোবিন্দপুরের জমিদারের সহিত বিবাহ দেন। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া গরীবব্রাহ্মণের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ কন্যাদ্বয়কে হারাইয়া ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কোন গতিকে কলিকাতায় আসিয়া দুঃখ কষ্টে বাস করিতে থাকেন।

তাঁহাদের এই দুইটী কন্যাই সম্বল ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাই এ অপমান লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কন্যার জন্য বনমালী রায়কে পত্র লিখিতেন, কিন্তু সে পত্রের কোনই উত্তর পাইতেন না। দেশ ছাড়া হইবার পর কন্যার আর কোন সংবাদ পান নাই।

সহসা এক দিন তাঁহার কন্যা উষা এক বস্ত্রে তাঁহার কলিকাতার খোলার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কন্যাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন বটে; কিন্তু এ ভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলেন, উভয়েই ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি—এমন করে কোথা হইতে আসিলে?"

উষা কেবলমাত্র বলিল, "বাবা, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না,—তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।"

সে এ কথা এমনই ভাবে বলিল যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়েই বুঝিলেন যে গুরুতর কিছু ছটিয়াছে,—এখন তাহাকে এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে তাহার আত্মহত্যা করা বিচিত্র নহে। তাহাই তাঁহারা তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। উষা তাঁহাদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গিনী হইল।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইল,—কিন্তু উষা কোন কথা বলিল না। ব্রাহ্মণী অনেকবার তাহাকে তাহার শ্বশুর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীর কথা হইলেই উষা বলিত;—"মা; আমাকে ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমাকে যদি ওসব কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমি আর তোমাদের এখানে থাকিব না। ভগবান, যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে।"

কাজেই উষার শ্বশুর বাড়ীর কোন কথা তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেন না। এইরূপে দুই বৎসর কাটিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উষার ব্যয়।

দুই বৎসর পরে উষা একদিন মাকে বলিল, "মা,—আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব।"

ব্রাহ্মণী তাহার এই হঠাৎ প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কি কি!"

উষা কেবলমাত্র বলিল, "আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব।

"শ্বশুর বাড়ী! আর তারা এ দুবছরের মধ্যে এক দিনের জন্যও তোমার খবর নেইনি।"

"তা হোক, আমি যাব।"

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "মা উষা,—তুমি কেন একাকী এক বস্ত্রে শ্বশুর বাড়ী হইতে এখানে আসিয়াছিলে,—কিরূপে কার সঙ্গে আসিয়াছিলে, তাহার কিছুই আমাদের বল নাই। তোমার শ্বশুর বা আমাদের জামাই এই দু'বছর তোমার কোন খবর নেন নাই;— এ অবস্থায় তুমি কি রকমে সেখানে যাবে।"

উষা কেবলমাত্র বলিল, "আমি যাব।"

"যদি তারা তোমায় বাড়ী ঢুকিতে না দেয়,—আবার অপমান করে।"

"গিয়া দেখিব কি হয়।"

ব্রাহ্মণ কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু উষা কিছুতেই কোন কথা শুনিল না। অবশেষে বলিল, "বাবা তুমি সঙ্গে করিয়া না লইয়া যাও; আমি যেমন আসিয়াছিলাম; তেমনি যাইব।"

যুবতী সুন্দরী কন্যাকে ব্রাহ্মণ কিরূপে একলা ছাড়িয়া দিবেন,—কিন্তু তাহাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইতে হইলে খরচা আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,—সে সময়ে কলিকাতা হইতে সুন্দরপুরে উপস্থিত হইতে হইলে নৌকায় যাইতে হইত। কম পক্ষে এক খানা ছোট নৌকা লইলেও দশটা টাকার কম পড়িবে না। কিন্তু এই সামান্য দশ টাকাই একত্র সংগ্রহ করা রামরূপ শর্ম্মার পক্ষে সহজ নহে। তিনি চিন্তিত হইলেন।

মধ্য হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বাবার হাতে দিয়া বলিল, "বাবা, টাকার ভাবনা নাই—নৌকা ঠিক কর।"

রামরূপ এত নোট দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে কেবলমাত্র বাহির হইল "নোট !"

ঊষা বলিল,—"হাঁ, এক শ টাকা আছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এত নোট তুই কোথায় পেলি। তুই যখন এসেছিলি, তখন তোর কাছে কিছু ছিল না।"

ঊষা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তখন ছিল না,—এখন আছে।"

"কে দিল তোকে নোট।"

"ভয় নাই বাবা,—আমি তোমার মেয়ে, এই পর্য্যন্ত জান যে নোট আমার।"

"তুই কোথায় নোট পেলি, না জান্‌লে আমি কিছুই কর্ব্বো না।"

"আমি তা বল্‌ব না,—বল্‌তে পারি না, পরে সবই জান্‌তে পার্ব্বে বাবা।"

ব্রাহ্মণ কন্যার এ সমস্ত রহস্যের কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন,—মেয়েও অতি অবাধ্য। কিছুতেই কোন কথা বলে না,—ভাল মানুষ রামরূপ বড়ই বিপদে পড়িলেন। কিন্তু উপায় কি! তিনি কন্যাকে প্রথমে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন,—তৎপরে রাগত হইয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করিলেন,—তৎপরে আবার স্নেহপূর্ণ স্বরে তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু ঊষা শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে কিছুতেই কোন কথা বলিল না। সে এখন হঠাৎ এত নোটই বা কোথায় পাইল, তাহাও সে কিছুতেই বলিল না। নোট হাওয়ায় উড়িয়া তাহার কাছে আসে নাই; নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে দিয়া গিয়াছে। এই লোক কে?

তাঁহার বাড়ীতে পল্লিস্থ দুই একটী পরিচিত লোক ব্যতীত আর কেহ আসিত না,—তাহাদের কাহারই সম্মুখে ঊষা বাহির হইত না। তবে কি কোন স্ত্রীলোক তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতে পাড়ার দুই একটী স্ত্রীলোক আসিত সত্য,—কিন্তু তাহারা সকলেই পরিচিত, তাহাদের কাহারই টাকা দিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কে তাহাকে টাকা দিয়া গেল! তবে কি ঊষা গোপনে কাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে? ইহা জানিয়াও কি ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট গোপন করিয়াছে। তাহাই সম্ভব? রামরূপ কন্যার উপর, ব্রাহ্মণীর উপর ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন। কন্যার অসাক্ষাতে ব্রাহ্ম-

নীকে যথেষ্ট তাড়না করিলেন। কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণীর কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে ব্রাহ্মণী যথার্থই কিছু জানেন না। যদি ঊষা গোপনে কাহারও সহিত দেখা করিত তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই তাহা জানিতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণ ক্রোধে বলিলেন, "এমন অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে কখনও দেখিনি! না জানি কত পাপে আমার এমন মেয়ে জন্মিয়াছিল! নোট কি ভূতে দিয়ে গেল।"

এই সকল গোলযোগে, কখন মেয়েকে ভৎর্সনা, তাড়না, কখন তোষামদ, অনুনয়, বিনয়, কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়,—ঊষা কিছুতেই কিছু বলিল না। অবশেষে এক দিন সে পিতাকে বলিল, "বাবা, এখন আর আমি ছেলে-মানুষ নই, বল্‌চি সময়ে সবই জান্‌তে পার্ব্বে। এখন কিছুতেই বলবার উপায় নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাক,—তোমার মেয়ে তেমন নয় যে তোমার মুখে কালি দেবে। বাবা, আমাকে কি অন্যান্য মেয়ের মত দেখচ—না আমি তা নই। তুমি যদি সঙ্গে যেতে না চাও, স্পষ্ট বল,—আমি তা হলে আজ একলাই রওনা হব, কেউ আমাকে রাখতে পার্ব্বে না।"

বলিষ্ঠের কাছে দুর্ব্বলের সর্ব্বদাই পরাভব ঘটে। দুর্ব্বল রামরূপ কন্যার নিকট পরাভূত হইলেন। নৌকা ঠিক করিয়া শুভ দিন-ক্ষণ দেখিয়া কন্যা লইয়া সুন্দরপুর চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেশে।

এইরূপ রহস্যে জড়িত হইয়া রামরূপ শর্ম্মা কন্যা লইয়া সুন্দরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি জমিদার বাড়ী,—তাঁহার বৈবাহিকের বাড়ী যাইতে বাধ্য হইলেন। সেখানে যে তাঁহার সমাদর হইবে না, তাহা তিনি বেশ অবগত ছিলেন। কিন্তু উপায় নাই;—কন্যার জন্য এ সকলই করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নিশার সংবাদও তিনি বহুকাল পান নাই;—ভাবিলেন যদি বৈবাহিক বা জামতার সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহার সংবাদও পাইলে পাইতে পারেন। কিন্তু সকলই হিতে বিপরীত হইল।

অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। বৈবাহিক মহাশয় বার দিয়া কাছারি করিতেছেন;—তাঁহার প্রায় শতাধিক প্রজা কাছারি ঘরে বসিয়া আছে। অনেকে তথায় স্থান না পাইয়া সম্মুখস্থ ময়দানে বসিয়া পরস্পর গল্প গুজব করিতেছে। রামরূপ শর্ম্মা দেশত্যাগী হইলেও, তাঁহাকে কেহ ভুলে ন্যাই,—তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত স্বরে বলিল, "ঠাকুর মশায় যে!" অতি ভাল মানুষ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ মান্য ভক্তি করিত। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। রামরূপ শর্ম্মা ক্রমে জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বনমালি রায় কি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কে রে?" তাহার পর ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র গর্জ্জিয়া চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা? নায়েব, বেটাকে জুতা মার্ত্তে মার্ত্তে এখান থেকে বার করে দেও,—ভিক্ষের যায়গা পাওনা।"

বলা বাহুল্য এই সময়ে রামরূপ শর্ম্মা স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার কণ্ঠ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না! বলা বাহুল্য উপস্থিত সকলেও এই কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রায় বনমালী বাবু বৈবাহিকের ন্যায় সদয় নহেন, তাহাকে ভিটা ছাড়া করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানিত। ইহাতে যে তাহার কেহ প্রশংসা করিত, তাহাও নহে। তবে ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু আজ বহুদিন পরে বৈবাহিক উপস্থিত হইলে তাহাকে যে বনমালী রায় এ কথা বলিবেন, তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই। নায়েবও ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত প্রায় হইয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

ইহাতে জমিদার মহাশয় আরও রাগত হইয়া প্রায় অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, আমার হুকুম শুনিতেছ না;—রামসিং—বলদেব সিং—এই বেটাকে জুতো মার্ত্তে মার্ত্তে এখান থেকে তাড়িয়ে দে, এক মিনিট দেরী হলে চাকুরী যাবে।

রাম সিং প্রভৃতি তাহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের সহসা চমক ভাঙ্গিল, এখানে আর এক মিনিট থাকিলে প্রকৃত পক্ষেই জুতা খাইতে হইবে বুঝিয়া, দরিদ্র রামরূপ শর্ম্মা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নৌকায় আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দাঁড়ী মাঝীরা তাহার ভীতি পূর্ণভাব দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া—রাঁধা ভাত ফেলিয়াই নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

কিয়দ্দূর নৌকা আসিলে উষা বলিল, "বাবা,—এখানে নৌকা লাগাও।"

ব্রাহ্মণ রাগত স্বরে বলিলেন, "কেন,—আবার জুতা খাই।"

উষাও ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি বড় ভীত লোক——"

কন্যাকে প্রতিবন্ধক দিয়া—রামরূপ বলিলেন, "কাজেই,—তোমার জন্য অনেক লাঞ্ছনা হইয়াছে—আর নয়।"

উষা মাঝীর দিকে চাহিয়া বলিল, "নৌকা ঐ ঘাটে লাগাও।"

মাঝী ব্রাহ্মণের দিকে চাহিল,—তিনি রাগে অভিমানে এত অভিভূত ছিলেন যে কোন কথা কহিলেন না,—উষা স্বর আরও উচ্চে তুলিয়া বলিল, "শুনিতে পাইতেছ না,—নৌকা ঐ ঘাটে লাগাও।"

মাঝী বলিল, "কর্ত্তা—তবে।"

রামরূপ রাগত স্বরে বলিলেন, "যা ইচ্ছে কর গে বাপু,—আমি জানি না।"

মাঝী নৌকা ভিড়াইয়া দিল,—যেখানে নৌকা লাগিল সেটা ঠিক ঘাট নহে। নিকটে কোন গ্রাম ছিল না,—তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে বিস্তৃত প্রান্তর। কেবল সেই ঘাটের উপর একটা বড় তেতুল গাছ ছিল। নৌকা লাগিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাপু, ভাত ডাল রাঁধা ফেলিয়া আসিয়াছ,—এই আমাদের থেকে চাল ডাল নিয়ে আবার রাঁধ আর করিবে কি?"

উষা বলিল,—"আমাদেরও চাল ডাল আনাইতে বল,—আমি এখনই রাঁধিতেছি। আজ রাত্রে এই খানেই থাকিব,—"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি কোন কথা বলিতে চাহি না।"

উষা পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক করা বৃথা দেখিয়া সেই নদীতীরে তেঁতুল তলায় রন্ধনাদি করিল। সে দিন সেখান হইতে সে নৌকা কিছুতেই ছাড়িতে দিল না। রাত্রে মাঝী দাঁড়ী নৌকা ভালরূপ বাঁধিয়া সেই নির্জ্জন লোক-শূন্য ঘাটে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। অবাধ্য কন্যার জন্য ব্রাহ্মণ অতি বিরক্ত হইয়া শয়ন করিলেন, কখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না,—অনেক রাত্রে মাঝী চীৎকার করিয়া বলিল, "কর্ত্তা,—মা ঠাকুরুণ নেই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

মাজীর চীৎকার শুনিয়া রামরূপ শর্ম্মা লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি হইয়াছে প্রমাণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি নিদ্রিত ছিলেন, সহসা নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া মনে করিলেন যে হয় তো নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে, তিনি তাড়াতাড়ি নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন।

তখন অন্যান্য দাড়ীগণও জাগরিত হইয়াছিল,—তাহারাও সভয়ে চারিদিকে চাহিতেছিল, রামরূপ শর্ম্মা কোন দিকে কোন লোক না দেখিয়া বলিলেন, "কই কে ? কি হইয়াছে !"

মাজী বলিল, "দেখ্‌চেন না,—মা ঠাক্‌রুণ নেই।"

রামরূপ সবিস্ময়ে বলিলেন "বলিস কি রে, মা ঠাক্‌রুণ নেই, সে কি ?

"দেখচেন না ?"

"কি দেখ্‌ব।"

"নৌকার ভেতর দেখুন।"

তখন ব্রাহ্মণের কন্যার কথা মনে হইল। ক্ষুদ্র নৌকা,—কন্যা নৌকার পশ্চাৎদিকে শয়ন করিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ মুখের দিকে ছিলেন। তিনি দেখিলেন নৌকায় কেহ নাই—তখন আরও আশঙ্কায় তাহার প্রাণ প্রাণের ভিতর বসিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি কোনই কথা কহিতে পারিলেন না, স্তম্ভিত প্রায় বসিয়া রহিলেন।

মাজী বলিল, "কে যেন নৌকা হইতে নামিয়া যাইতেছে, এই রকম মনে হওয়ায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, দেখিলাম মা-ঠাক্‌রুণ নৌকা হইতে নেমে যাচ্চেন। দরকার আছে বলে আমি কোন কথা বলিলাম না,—ভাবিলাম, এই এখনই আবার নৌকায় আসিবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ হলো তিনি নৌকা হতে নেমে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

"আমায় ডাকিলি নে কেন ?"

"তিনি ফিরে আসবেন মনে করে ডাকি নি।"

ব্রাহ্মণ মাজীর উপর বিশেষ রাগত হইলেন। নৌকার ভিতর লণ্ঠন জালিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "আয় সব,—দেখি এই খানেই কোন খানে

মাজী বলিল, "কৰ্ত্তা,—তা বোধ হয় না।" ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন!"

মাজী বলিল, "চলুন, হয়তো আমার ভুল হয়েছে,—মা-ঠাকরুণ তীরেই আছেন।"

রামরূপ শর্ম্মা দাঁড়ী মাজীগণ লইয়া লণ্ঠন হস্তে তীরে নামিলেন,—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই স্থানে নদীর উপর বিস্তৃত প্রান্তর,—কেবল ঘাটে একটী বড় তেতুল গাচ আছে। সুতরাং এখানে থাকিলে তাহাকে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইত। ব্রাহ্মণ চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ঊষা তীরে নামিলে সে যতদুরই যাক না কেন, তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত—না—যত দূর দৃষ্টি চলে কেহ কোথায়ও নাই, জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিক বিধৌত হইতেছে।

সে তীরে নামিলে তাহাকে কেহ যদি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া উঠিত,—তাহার চীৎকারে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত,—না নিশ্চয়ই সে ইচ্ছা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অতি সন্তর্পণে নৌকা হইতে নামিয়াছে. বিশেষ সাবধানে না গেলে নিশ্চয়ই তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তাহার এরূপ করিয়া যাইবার অর্থ কি,—তাহার কন্যার জীবন সম্পূর্ণই রহস্যময়, ইহার জন্য তিনি রাগত ও বিরক্ত ছিলেন, এক্ষণে আরও রাগত ও বিরক্ত হইলেন,—বলিলেন, "যাক চুলোয় যাক—কে আর তাকে খুজবে। আপনি ফিরে আসে ভাল, না হয় কাল আমি চলে যাব। এমন মেয়ে না থাকাই ভাল।"

মাজী বলিল, "কৰ্ত্তা,—বোধ হয় তিনি নৌকায় গেছেন।"

ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে বলিলেন, "নৌকায় গেছে! নৌকা কোথাথেকে এল। এ কথা আগে বলিস নি কেন?"

"কৰ্ত্তা আমি মনে করছিলাম আমার ভুল হয়েছে, ঘুম চোক ছিল।"

"কি হয়েছে তাই বল।"

"একটু আগে এক খানা সিপ নৌকা আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল,—আমার বোধ হল যেন মা-ঠাকরুণ সেই নৌকায় বসে আছেন। একে সিপ নৌকা,—তার পর বোধ হয় বিষ জন লোকে বোট চালাচ্ছিল। চক্ষের নিমিষে চলে গেল, ভাল দেখতে পেলাম না। বোধ হল যেন মা-ঠাকরুণ সেই নৌকায় বসে আছেন।"

ব্রাহ্মণ নৌকার ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িলেন, হতাশ স্বরে বলিলেন, "ভালই হয়েছে।"

মাঝী বলিল, "কর্ত্তা, মা-ঠাকরুণের বিচানায় কি যেন পড়ে রয়েছে, না?"

রামরূপ কন্যার বিছানার দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন এক তাড়া কাগজ পড়িয়া আছে, তিনি উঠিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন,—দেখিলেন এক তাড়া নোট!

নোটের সহিত এক খানা কাগজও আছে, তাহাতে লিখিত ;——

"বাবা আমার জন্য ভাবিবেন না,—৫ শত টাকার নোট আছে লইবেন।

উষা।

ক্রমশঃ।

মনে হ'ত।

আজিকার ম্লান মূর্ত্তি সান্ধ্য প্রকৃতি বালা
আসেনি কথনো প্রভূ ভরা'য়ে হৃদয় ডালা,
বিশ্বের বিষাদময় দীর্ঘ নিশ্বাস গুলি
তপ্ত অশ্রুজলে সিক্ত যতনে লইয়া তুলি'।
মনে হ'ত অবসরে মধুর মিলন ল'য়ে,
সুখদা প্রেয়সী মোর সুষমা রঞ্জিত হ'য়ে,
আমার বিষাদময় হৃদয় মণ্ডপ পরে
আসিবে উজলি'ধরা আকুল পুলক ভরে।
তা'র সাথে মনে হ'ত মানব-আবাস ছাড়া
আমারি ও ধরাতলে বিষাদ দেয়না সাড়া।
মনে হ'ত পৃথিবীর যাহা আছে পরপারে
আমার কুঞ্জের চারু প্রভাত আঁখির ধারে
স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যময়,—এই সংসারের মত
তোমার কি, প্রভু, অই পরলোক অসম্বৃত?

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

বিধবা।

ঢাকি দেহলতা সুশুভ্র বসনে
কে তুমি দাঁড়ায়ে হিন্দুর প্রাঙ্গণে,
বাহিরের ওই শুক্ল আবরণে
স্বচ্ছ হৃদয় প্রভা—কি—হাসে ?
সীমন্তে সিন্দুর কে বলো মুছালে,
সধবার শাঁখা কোথায় ফেলিলে,
অধরে হাসি কেমনে চাপিলে ?
বিষাদের ছায়া সেথা যে ভাসে।
আগে যে হাসিতে মোহিত নয়ন
এখন যে তাহে জুড়ায় জীবন,
যে চাহনি আগে আনিত বিভ্রম
এবে যে হেরিলে নয়ন ঝরে।
কামনার বহ্নি কেমনে নিভালে;
প্রবল ইন্দ্রিয়ে কেমনে চাপিলে,
আঁখির আগুন কোন্ দৈববলে
নিভায়ে রেখেছ পলকে ঢেকে।
সে রমণীগণ কোথা এবে হায় !
ঝাঁপ দিত যারা জ্বলন্ত চিতায়
মৃতপতি সাথে হাস্যমুখীপ্রায়,
(বুঝি) আপদ্ গিয়াছে জঘন্য প্রথা।
বীর প্রসবিনী চিতোর রমণী
কোথায় তাহারা, কোথায় পদ্মিনী,
দুদিনের সুখ উপেক্ষি তখনি
পতি সনে যারা সাজাত চিতা।
সেই রক্ত বহে এখনো হৃদয়ে,
তবে কেন শুনি বিধবার 'বিয়ে',
ইন্দ্রিয় সেবা কি পতিপ্রেম চেয়ে

অনলের শিখা সহি ত যাদের
সেই এক দেহ ছিল ত তাদের,
এক উপবাস সহে না এদের
কুসুম পেলব কোমল প্রাণে!
বিলাসের স্রোতে দে'ছ গা ঢালিয়ে
ধর্ম্মের বন্ধন গিয়াছে ভাসিয়ে
তুমি মা এখনো ব্রহ্মচর্য্য ল'য়ে
দেবী বেশে আছ হিন্দুর গৃহে।
ধর্ম্মের পথ কি সহজ এতই
সুখের নেশায় বিচরিবে তাই?
প্রফুল্ল পঙ্কজ তুলিতে গেলেই
কুশ সূচিবেধ ফুটিবে দেহে।
হিন্দুর সংসারে অন্নপূর্ণা হ'য়ে
যতনে পালিছ পরিজন ল'য়ে,
কর্ম্মের বন্ধন কর্ম্মে ঘুচাইয়ে
প্রশস্ত কর মা স্বর্গের দ্বার।
সকলি ত আছে অথচ কি নাই;
দিব্য জ্যোতিঃ শোভে আননে সদাই
স্বামী জ্ঞানে প্রেম পূজিছ কি তাই
সযত্ন রক্ষিত পাদুকা তাঁর।
হৃদয়েতে শান্ত স্বামীরূপ ধ্যান,
উপরে অনন্ত স্বামী ভগবান,
কর্ম্মক্ষেত্রে এ যে কর মা প্রয়াণ,
ঘুচাও পূর্ব্বের করম ফল।
মরণের পারে আছে দিব্য ধাম
অনন্ত মিলনে লভিবে বিশ্রাম;
ভূত ভবিষ্যত ঐশ্বর্য্য মহান্
স্মরিলে হৃদয়ে পাইবে বল।

শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীধরস্বামী।

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি
ব্যাসো বেত্তি নবেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি
শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভারতের গৌরবরবি শ্রীশ্রীধরস্বামী একজন প্রাতঃ স্মরণীয় মহাপুরুষ।

অনেকের মতে গুর্জ্জরদেশে শ্রীধর স্বামীর জন্ম হইয়াছিল কিন্তু সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম খণ্ডের লিখিতানুসারে তিনি ভারতের পূর্ব্বদেশ বাসী ছিলেন।

স্বামীজী পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অবলোকন করিয়া গীতা ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন; ইহা তাঁহার গীতার সুবোধিনী নাম্নী টীকার মঙ্গলাচরণের পরবর্ত্তী শ্লোকটী প্রমান। অনেকে ইহাঁকে, বৈষ্ণবীয় রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু স্বামীর অল্পকাল পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন। এরূপ অনুমানের অনেক কারণ আছে। শ্রীস্বামীজী বাল্যকালে অতি যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। পরে উপযুক্ত বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হন। তারপর একদা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধীয়—

"সংসার-সিন্ধুমতি দুস্তর মুত্তিতীর্ষো
নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।,,

ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাঁর হৃদয় ভগবৎ-প্রেম পিপাসু হইয়া উঠে; এবং ভগবৎ-প্রেম—পিপাসার সম্মোহিনী শক্তি দ্বারা ক্রমশই সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে। এই সময়ে উক্ত স্বামীজীর সহধর্ম্মিণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নীবিয়োগকে পূর্ণ আনুকূল্যে পাইয়া স্বামীর ভগবদ্দর্শন লালসা বলবতী হইয়া উঠে। পত্নীবিয়োগের পর; শ্রীস্বামীজী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যে "এই সদ্যোজাত শিশুকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব। শ্রীস্বামীজী ...

হইয়া সদ্যোজাত শিশুর একপার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গৃহের উপরি ভাগ হইতে একটী টীক্‌টীকির ডিম্ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ; এবং তাহার মধ্য হইতে একটী ছানা বাহির হইয়াই সমীপবর্ত্তী একটী মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিল। স্বামীজী এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দর্শন করিলেন। এবং ভাবিলেন যিনি জীবের সৃষ্টি কর্ত্তা তিনিই জীবের পালনকর্ত্তা ; যে দয়াময় এই সদ্যোপ্রসূত ছানাটীর আহার যোগাইয়া দিলেন, সেই দয়াময় এই শিশুটীরও আহার যোগাইবেন অতএব সেই করুণাময় শ্রীভগবানের আশ্রয়ে এই নিরাশ্রয় শিশুটী রাখিয়া একান্ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই প্রতিবেশীগণ সেই শিশুটীকে লইয়া গিয়া বল্লভীপতি রাজা নরেন্দ্রকে প্রতিপালন করিবার জন্য দিলেন। কালক্রমে এই মাতৃ-পিতৃ হারা বালকটী মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

"ভক্তমাল" রচয়িতা, ভট্টিকাব্যের ২২ সর্গের ৩৫ শ্লোক "কাব্যমিদং বিহিতং ময়াবলভ্যাং শ্রীধরসূনু নরেন্দ্র পালিতায়াং" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া ইহাঁকেই "ভট্টিকাব্যের" কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক এদিকে শ্রীশ্রীধরস্বামী ভারতীয় বিবিধ তীর্থপর্য্যটন করিয়া যথা সময়ে শ্রীকাশী-ধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই তিনি শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগ-বতের মধুময়ী টীকা রচনা করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে গীতা ও ভাগবতের এই স্বামী কৃত টীকাই বিশেষ আদরণীয় ও সুখপাঠ্য।

কাশীধামের পণ্ডিত সমাজে স্বামীকৃত গীতার টীকা লইয়া অনেক বাদানু-বাদ হয়। পরে পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রীবিশ্বেশ্বর সমীপে ইহার মীমাংসা প্রার্থনা করিলে শ্রীবিশ্বেশ্বর স্বপ্নে আদেশ করিয়াছিলেন ;—

"অহং বেত্তি শুকোবেত্তি ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥"

স্বামীজী গীতা ও ভাগবতের টীকা ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুরাণের টীকা, এবং অমানুষী প্রতিভা বলে "মহিম্নস্তব" নামক শিবস্তোত্রের বিষ্ণুস্তোত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁর রচিত "ব্রজবিহার" নামে একখানি

মধুরতায় মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺হরিমোহন প্রামাণিক স্বামীজীকে ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ভগবানের শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তিই ইহাঁর উপাস্য দেবতা ছিল। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর নিকটে ইনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। "মহিম্নস্তবের" বিষ্ণু স্তোত্ররূপ ব্যাখ্যাই ইহাঁর শেষ রচনা, এবং এই রচনার অল্পকাল পরেই ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি কতকাল মর্ত্তে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহার এখনও কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

"ভক্তমাল" রচয়িতা শ্রীশ্রীধরস্বামী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন; প্রয়োজনীয় বোধে তাহারও কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবন পাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জন॥
তাঁহার বৈরাগ্য কথা আদ্য বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণ রসয়ন॥
শ্রীমান পরমানন্দ পুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্ক শশী হৃদয়ে উদয়॥
মহাভাগোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণ গর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥
হেনকালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কাল প্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যোঠী ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়িগেলা বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকষিয়া।
খাইলসম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥

এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহপণ্ডিত হৈলা
ভট্টিনামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা॥

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

মাতৃ-পূজা।

ফুল নাই মালা নাই অগুরু চন্দন
কোথা পাব—কোথা পাব—মহার্ঘ্য ভূষণ!
তবু লাজ নাহি আজ সেবিতে তোমার—
ও'চরণ!—মা'যে তুমি—জননী আমার।
তোমারিত হাতে গড়া দীনের সকল
বসন ভূষণ যাহা সহায় সম্বল,
আমি শুধু আনিয়াছি তাই বহি শিরে,
তুচ্ছ বলে ঠেলিবে কি! যেতে হ'বে ফিরে!
ভিখারী কি সাজিব মা!—পরের দুয়ারে
তোর লাগি! তার চেয়ে আয় প্রাণ ভরে
পরাইয়া পট্টবাস,—শুভ্র-রেখাপাতে—
রচি দেই পূত-শঙ্খ স্নেহে দুটী হাতে;
তা'হলেত মাতৃ রূপ জাগিবে তোমার
পূর্ণ হবে মনস্কাম জননি আমার!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

দেশীয় শিল্পের বিনাশ।

দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ-সাধন-কল্পে কেহ কেহ বিশেষ ভাবে মনোযোগ করিয়াছেন। এরূপ সময়ে ভারতীয় শিল্প নাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অনেকের বিশ্বাস, বিলাতে বাষ্পীয়-বলে পরিচালিত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হওয়াতেই এ দেশের শিল্পীর গৌরব-হ্রাস হইয়াছে। বাষ্পীয়-যন্ত্র-জাত পণ্যের সহিত হস্তকৌশলে নির্ম্মিত শিল্প সামগ্রী প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই এ দেশীয় শিল্পীকুলের নিন্দায় প্রবৃত্ত হন। যাহারা এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী, আমরা তাঁহাদিগের মতের পোষকতা করিতে অসমর্থ। বিজ্ঞানানুমোদিত যন্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতায় যে এ দেশীয় শিল্পীদিগকে কিয়ৎপরিমাণে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু এদেশীয় শিল্পনাশের অন্তবিধ গুরুতর কারণ আছে; অদ্য আমরা সেই কারণের আলোচনা করিব।

একটা জাতির এত বড় শিল্পসম্ভার একদিনে লোপ হয় নাই। এই ইতিহাস তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম, কোম্পানীর রাজ্যারম্ভ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয়, ১৮৩৩ অব্দ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—যখন সুয়েজের খাল কাটা হয়। আর তৃতীয় আজ পর্য্যন্ত।

ইংরেজের প্রথম লীলাক্ষেত্র যে বঙ্গদেশে ছিল, একথা কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা বহুকষ্টে নবাবের নিকট হইতে এদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই অধিকারের ফলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পণ্যাদি আমদানী রপ্তানী মাশুল না দিয়াও দেশের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। বলা বাহুল্য, কোম্পানীর ব্যবসায় তখন বড় অধিক বিস্তৃত ছিল না।

১৭৫৭ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরাজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল;

বিশেষ সদয় হইলেন। ফলে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি নামে নবাব হইলেন, ইংরেজেরা প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মীরকাশিম নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না, ইংরেজের যথেচ্ছাচার তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। দরিদ্র প্রজাগণের কষ্ট মোচন করিবার জন্য তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন; কিন্তু স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকগণের চক্রে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইংরেজের কোপানলে পতিত হইয়া তিনি ভস্মীভূত হইলেন; মীরজাফর আবার নবাব হইলেন; তাঁহাকে বাঙ্গলার সিংহাসনে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ রাখিয়া ইংরেজ বাঙ্গলা শাসন করিতে লাগিলেন।

পলাশীতে যুদ্ধাভিনয়ের পর হইতে বাঙ্গলায় ইংরেজের প্রতিপত্তি যেমন বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাঁহারা বলপূর্ব্বক বাণিজ্যের স্বত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কোম্পানীর ভৃত্যেরা তাঁহাদিগের প্রভুর জন্য অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। প্রথমে এই কার্য্য গোপনে সম্পাদিত হইত। বাঙ্গলার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলা এই অবাধ বাণিজ্য ব্যাপারে বাধা প্রদান করিতে গিয়া ইংরেজের বিষনয়নে পতিত হন। সুচতুর ইংরেজ তৎকালীন কতিপয় কূটনীতি ব্যক্তির সাহায্যে সিরাজকে পদচ্যুত ও নিহত করাইয়া আপনাদিগের অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

মীরকাশিম ইংরেজের এই অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তিনি দেশীয় বাণিজ্যেরও শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, স্বরাজ্যে বিদেশীকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে দেওয়ায় শুল্কদানকারী স্বদেশীয় বণিক সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহার এই সৎকার্য্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও ইংরেজ বণিক সমান অধিকার লাভ করিলেন। ইহাতে বাণিজ্য বিভাগীয় রাজস্বের আশা নবাবকে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রজার মঙ্গলের জন্য এইরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াও মীরকাশিম অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিলেন না। কলিকাতার স্বার্থান্ধ ইংরেজ বণিকেরা অতীব নির্লজ্জের ন্যায় মীরকাশিমের এই ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা কেবল লবণাদি কয়েকটী পণ্যের একাধিকার লাভের জন্যই যদি বিবাদ করিতেন, তাহা হইলেও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত।

কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা বঙ্গদেশে শ্বেতাঙ্গ মাত্রেরই পক্ষে সর্ব্ববিধ পণ্যের অবাধ বাণিজ্য একাধিপত্য লাভ ও দেশীয় বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্কভার স্থাপনের জন্য মীরকাশিমকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মীরকাশিম ইংরেজ বণিকের সেই অবৈধ অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইংরেজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাহিতৈষী নবাব মীরকাশিম ঘেড়িয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্যায় সমরের আর একটা দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বাণিজ্য ব্যবসায়ে এদেশীয় শিল্পীগণের যে সাধারণ অধিকার ছিল, ইংরেজ বণিকগণ সেই স্বাভাবিক অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য বিবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহাদিগের দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের পর দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়।

ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ এদেশের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগের আমলের অরাজকতার বিষয় যথাধিক পরিমাণে অতি রঞ্জিত করিয়া অতি বিস্তারিত ভাবেই স্ব স্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে আসিয়া তাঁহারা যে অমানুষিক জুলুম করিয়া বঙ্গদেশে ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ কোনও প্রচলিত বাঙ্গলার ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি সে সময়ের সরকারী কাগজপত্রে এবিষয়ের সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং এখনও আমরা সে অরাজকতার ফলভোগ করিতেছি।

বাঙ্গলার তৃতীয় গবর্ণর মিঃ ভেরেলষ্ট View of Bengal নামক গ্রন্থে এই জুলুম সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

A trade was carried on without payment of duties, in the prosecution of which infinite oppressons were committed, English agents or Gomosthas, not contended with injuring the people, trampled on the authority of the government binding and punishing the Nobob's officers whenever they presumed to interfere. This was the immediate cause of the war with Meer Cassim—View of Bengal p. 48.

মীরজাফরের মৃত্যুর পর সমগ্র ইংরেজজাতি ও কোম্পানী দুই পক্ষে

লাগিল, এবং সেই পরিচালনে প্রতিযোগিতা করিয়াই তাহারা আমাদের শিল্প নষ্ট ও শিল্পীদিগকে নিরন্ন করিয়াছে।

কোম্পানীর লোকে বিলাতে এদেশের শিল্পভাণ্ডার খুলিয়া নবাব বলিয়া যাইতে লাগিল; তাহাতেই তাহাদের বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এদেশের তন্তুবায়কুলের সহিত প্রতিযোগিতায় না পারাতে পার্লামেণ্ট সভা শতকরা প্রায় ৭২ টাকা হার পর্য্যন্ত এদেশের কাপড়ের মাশুল করিয়া দিলেন। এইরূপে ইংলণ্ড হইতে এদেশের মালের বাজার লোপ করা হয়। এদিকে ভারতের কারখানায় ছাড়া, কোম্পানীর গাওদার ছাড়া অন্য কেহ রেশমী জিনিস তৈয়ারী করিতে পারিত না। কোম্পানী আইন করিয়া সে পথ বন্ধ করিয়া দেন। প্রথম যুগের ইতিহাস তো এই।

দ্বিতীয়যুগে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার দূর হইল বটে, কিন্তু উদার ইংরাজজাতির অবাধ বাণিজ্যের সেই সূত্রপাত হইল। তখন ভারতের শিল্পী এত দরিদ্র, ৭০ বৎসরের কোম্পানীর রাজত্বে এতটা শোষিত হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতা করা দূরে থাকুক, তখন বিলাত হইতে বস্ত্র আমদানী করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৩৩ অব্দেই তিন কোটী টাকার কাপড় বিলাত হইতে এদেশে আমদানী হয়। এই যুগের শেষ পর্য্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়াই এদেশ হইতে বিলাতে যাতায়াতের পথ ছিল। সুতরাং অধিক সংখ্যক লোক এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া তখন আসিত না। তখন ইংরেজদের এদেশে ভূমি ক্রয় করা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারী অনেকেই এদেশে জীবন অতিবাহিত করিত। তাহাদের সঞ্চিত অর্থ এদেশেই ব্যয় করিত। সুতরাং দরিদ্র হইতে থাকিলেও, তখনও এদেশের লোক কোনও রকমে সম্পোষ্য করিয়া লইত। ৭৬ অব্দের মন্বন্তরের পর এখনও তেমন দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই।

কিন্তু তৃতীয় যুগে সুয়েজ খাল খোলার পর হইতে আমাদের সর্ব্বনাশের পথ সর্ব্বাপেক্ষা সরল হইয়াছে। পৃথিবীর বাণিজ্যের ইতিহাসে এই খাল এক যুগান্তর আনিয়াছে, এবং ভারতবর্ষকে ধনপিপাসু পাশ্চাত্য জাতির ধন-পিপাসা চরিতার্থতার প্রস্রবণ করিয়া তুলিয়াছে। যখন এই খাল খোলা হয়, ভারতবাসী তখন দারিদ্র্যনিপীড়িত ও অসহায়, ধনবলে হীন; কিন্তু সে ভিতরের অবস্থা। ভারতেরকূলে বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইল, সর্ব্বত্র রেলপথ

হাটে বাজারে পৃথিবীর পণ্য বিক্রীত হইয়া ভারতের শিল্প ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(১)

ভারতের দুরদিনে
আয়লো ভগিনিগণ!
কর্ত্তব্য সাধন তরে
করি দৃঢ় প্রাণপণ!

(২)

প্রকৃতি মোরা-লো-সতি
সংসারের অলঙ্কার,
সংসার পালন তরে
নারী সৃষ্টি বিধাতার।

(৩)

হৃদে প্রেম, ভক্তি রাশি
স্নেহ, প্রীতি প্রাণদান;
দয়া মায়া মমতাদি—
সরলতা-মাখা প্রাণ।

(৪)

কোমল রমণী হৃদি,
স্বর্গের নন্দন বন;
সংসার মরুর মাঝে,
সুখ শান্তি নিকেতন।

(৫)

স্নেহেতে জননী নারী
রোগে ভগিনীর সমা,
সুসম্পদে সুখময়ী
প্রেমময়ী প্রিয়তমা।

(৬)

সন্তান পালনে ধাত্রী
সচিব মন্ত্রণা দানে;
সুখে দুখে সহচরী
গৃহিণী গৃহের কোণে।

(৭)

সংসার মরুর তাপে
দগ্ধ-হৃদি মানবের,—
শান্তির সরসী করি,
নারী-রত্ন সংসারের।

(৮)

প্রকৃতি মোরা-লো-সতি,
সংসারের অলঙ্কার;
সংসার পালন তরে
নারী সৃষ্টি বিধাতার।

(৯)
আয়, মোরা প্রাণপণে
সাধি সে কর্ত্তব্য সবে ;
পুরুষ সহায়ে পশি
ভীষণ জীবনাহবে।

(১০)
কর্ম্মবীর পুরুষের
মোরা লো সহায় হ'লে,
ভীষণ জীবন রণ
জিনিব লো অবহেলে।

(১১)
স্মর সতী সাবিত্রীর
মৃত পতি প্রাণদান ;
সতি, বৈষ্মী, বৈদেহীর,
স্মর সে কীরতি-গান।

(১২)
বীর-প্রসূ, বীর-ধাত্রী,
জানি এ ভারত-মাতা ;
ইতিহাস-অলঙ্কৃত
ভারত-কীরতি-গাথা।

(১৩)
অসীম জলধী-হৃদে,
ভীষণ নগ-কন্দরে ;
ভারত সন্তান কীর্ত্তি
প্রদীপ্ত জলদাক্ষরে।

(১৪)
সে আর্য্য-রমণী মোরা
বাস সেই আর্য্যভূমে ;—
সে আর্য্য শোনিতে জন্ম,
তবে কেন রব ভ্রমে ?

(১৫)
বাঁধ লো বাঁধ লো কটি,
খোল লো কবরী ভার ;
কর সর্ব্ব বিধিমতে
বিলাসিতা পরিহার !

(১৬)
ভূষণ-বিহীনা মাতা,
মোরা লো দুহিতা তাঁর
সাজে কি মোদের তরে,
বিলাসিতা, অলঙ্কার ?

(১৭)
জীবন সংগ্রাম মাঝে,
পতির সহায় হও ;
কর্ত্তব্য পালন তরে
দৃঢ় করে অসি লও।

(১৮)
বিলাসিতা, মদ, মোহ,
একে একে ফেল কেটে ;
তেয়াগি কুহেলী ঘোর
আলো পানে যাও ছুটে !

(১৯)
শিখাও লো দুহিতারে
রমণী কর্ত্তব্য যাহা,
পুরুষ করম-বীর
কুমারে শিখাও তাহা !

(২০)
শিখাও কর্ত্তব্য তার,
যুঝিতে জীবনাহবে,—
কর্ম্মভূমী এ সংসারে—
অক্ষত রহিবে তবে।

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার।

ভারতে কৃষির অবনতি।

ভারতবর্ষে দিন দিন যেরূপ কৃষির ব্যবসায়ের অবনতি হইতেছে তাহা প্রতি বৎসরের দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা দ্বারা প্রমানী কৃত হইতেছে। ইহার কারণ অনেক আছে প্রধানতঃ বিদেশীয় রাজা, দেশবাসীর অজ্ঞতা, অনিচ্ছা দ্ররিদ্রতা এবং কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব, বিদেশীয় রাজা হইলে প্রধানতঃ তিনি প্রজার মঙ্গল চিন্তা করেন না। দ্বিতীয়তঃ তাহার অর্থ শোষণে দেশে দারিদ্র্য বিরাজমান এবং কৃষি বিষয়ের উন্নতির জন্য রাজার সাহায্য আবশ্যক তাহা আমাদের রাজা করেন না। বিলাতে যেরূপ রাজকীয় সাহায্য কৃষিতত্ত্ববিদ্‌রা প্রাপ্ত হন তাহা আমরা পাই না। আমাদের রাজা ব্যবসায়ী, রাজা তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায়ের অনুকূল কৃষিসম্ভার যথা তুলা, পাট ইত্যাদির উৎপন্ন বিষয়ে যেরূপ যত্ন করেন অন্য বিষয়ে তত যত্ন করেন না, এবং কৃষি বিষয়ক অন্য অন্য লাভজনক ব্যবসায়ের পথ তাঁহারা দেখাইতে চাহেন না, কারণ তাহাতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের অনিষ্ট হইবে ইত্যাদি। বিদেশীয় রাজার সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলে আরও অনেক কথা বাহির হয় কিন্তু প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবার ভয়ে এবারকার মত ক্ষান্ত হইলাম। আমাদের দেশবাসীর সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে আমরা কৃষি বিষয়ে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইয়োরপীয় দেশবাসী অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ এবং তাহাদের সমকক্ষ হইবার ইচ্ছা ও চিন্তা শূন্য। কারণ আমারা দরিদ্র জাতীয় নানা অভাব এবং আমাদের ভিতর যাহারা একটু ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছেন তাহাদিগকে সদা সর্ব্বদা প্রায়ই ডাক্তারি ওকালতি, সরকারী এবং বে-সরকারী চাকুরী করিতে ব্যস্ত—এবং ভারতবাসী যাহারা এই কৃষি বিষয়ে বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত তাহারা দেশের মায়া ভুলিয়া একেবারে চাকুরী লইয়াই উন্মত্ত। অনিচ্ছা সম্বন্ধে এই যে, আমাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সরকারী বে-সরকারী সাহেবের চাকুরীর জন্য লালাইত, এমন কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না যে আমরা চাষ করিয়া স্বাধীন ভাবে সংসার চালাইব কৃষি কার্য্যকে চাষার কাজ মনে করিয়া এদেশবাসী কৃষিকে বড়ই ঘৃণা করেন। অজ্ঞতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে আমাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া আসিয়াছেন তাহাই করিতে হইবে। তাহার অধিক আর করিব না। আমার বোধ হয় অধিক করিলে ভারতবাসীর জাতি যাইবে এবং কোন্ দেশে কি হইতেছে তাহাও জানিবার আবশ্যক নাই।

আজ কাল আর সে সময় নাই যাহা হইবার নয় বলিয়া মনে মনে ধারণা ছিল তাহাই হইতেছে। বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি দ্বারা বিলাতের মত ঠাণ্ডাদেশে (Glass house) কাচঘরের মধ্যে আমাদের দেশীয় শাক শব্জী এমন কি নারিকেল বৃক্ষ পর্য্যন্ত জন্মান হইতেছে এবং হইয়াছে, এবং এই সব কৃষি ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসীরা কত যে অযত্র অর্থ ব্যয় করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সমস্ত দেশে এই সব কৃষি বিষয়ক চর্চ্চা বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তি দ্বারা হইয়া থাকে, কেহ ডাক্তার, কেহ রাসায়নিক, কেহ উদ্যানতত্ত্ববিদ্ কেহ ভূতত্ত্ববিদ কেহ কৃষিতত্ত্ববিদ ইত্যাদি বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রথমতঃ কৃষি বিষয়ক নূতন মত সকল আলোচিত হইয়া কোন্ কোন্ মত অবলম্বিত হইবে তাহা অবধারিত হয়, পরে সেই সমস্ত বিষয় তাহারা নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে থাকেন এবং যিনি যে পরিমাণে সাফল্য বা অসাফল্য লাভ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কৃষি বিষয়ক সংবাদ-পত্রে ছাপাইয়া দেন ইহাতে এই উন্নতি হয় যে তাহাদের দেশের নিরক্ষর কৃষকেরা তাহাদের মত অবলম্বন পূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহারা বিশেষ সাফল্য লাভ করে। বিলাত, আমেরিকা, জার্ম্মানি ফ্রান্সদেশে কৃষি সম্বন্ধে যে কত শত কৃষিপত্র ও পুস্তক আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এদেশীয় ভদ্র মহোদয়গণ চাকুরীর জন্য যেরূপ লালাইত তাহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাহারা চাকুরী করিয়া যাহা পান, চেষ্টা করিলে কৃষি কার্য্যে তাহারা চাকুরী অপেক্ষা অনেক অধিক আয় করিতে পারেন এবং ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে এই কৃষি বিষয় সংসারের কত উপকারী, কৃষির কার্য্য দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। যে মানব জাতীর যাবতীয় জীবন ধারণ উপযোগী দ্রব্যই কৃষি হইতে উৎপন্ন হইতেছে। একটু চিন্তা করিলে নিজেরাই এই সমস্ত বুঝিতে পারেন, আহার, বিহার, ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক হয়, সমস্তই কৃষি হইতে উৎপন্ন। এই কৃষি কার্য্যের দ্বারা আমেরিকা ধনকুবের। জার্ম্মনী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং নেটাল, ট্রান্সভাল প্রভৃতি ঔপনিবেশিকেরা ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছে।

আমাদের দেশে এই কৃষির উন্নতি করিতে হইলে অনেক কষ্ট, পরিশ্রম, অর্থব্যয় করিতে হইবে, এবং বিদ্বান ব্যক্তিরও আবশ্যক। তাহারা প্রত্যেক জেলায় কৃষি সমাজ প্রতিষ্টা করিয়া অজ্ঞ এবং বিজ্ঞ ব্যাক্তি সকলে মিলিত হওয়া আবশ্যক। কোন্ কোন্ কৃষি তাহাদের দেশের অনুকূল এবং তাহা হইতে বিশেষ লাভবান হওয়া যায় তাহা স্থির করিয়া ঐ সমস্ত কৃষি উৎপন্ন করিতে নিজেরা চেষ্টা করিবেন। নিরক্ষর কৃষকদিগকেও উৎপন্ন করিতে উপদেশ দিবেন। ঐ সমস্ত বিষয় নিজেরা উত্তম রূপে বুঝিতে ও অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, এবং কৃষি বিষয়ে মাসিক বা সাপ্তাহিক একখানি সংবাদ-পত্র প্রতি জেলা হইতে বাহির করা উচিৎ। ঐ কৃষি পত্রে কৃষি বিষয়ক দেশী ও বিদেশীয় প্রবন্ধ থাকিবে এবং যিনি যে কোন অবলম্বিত কৃষি বিষয়ে যতদূর সাফল্য বা অসাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা লিখিত হইবে। বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কি হইতেছে এবং কি হইয়াছে, তাহারা কোন্ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাফল্য লাভ করিয়াছেন আমরা তাহাদের অবলম্বিত বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিব কিনা এই সমস্ত বিষয় আলোচিত ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান উচিত। তাহা হইলে ঐ সমস্ত মত অন্যান্য লোকে গ্রহণ করিয়া বিশেষ লাভবান হইবার চেষ্টা করে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ এবং যে সমস্ত কৃষির অনুকূল তাহা ক্রমশঃ যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। কৃষি নানা বিষয়ক, Market gardening, vegetable gardening; fruit growing and preserving poultry keeping Cow keeping fishery, Horticulturae gardening seed growing etc. যথা বাজারের জন্য সব্জী জন্মান বা সব্জী ব্যবসার, ফল উৎপন্ন করা এবং টাটকাভাবে রাখিয়া দূরদেশে চালান করা। গরু, ভেড়া, ছাগল, মেষ, মহিষ, শূকর, মুরগী, মৎস্য, ইত্যাদি। জীব জন্তু রক্ষা ও তাহাদের পালন করা, বাগান প্রস্তুত করা বীজ উৎপন্ন করা ইত্যাদি বীজ উৎপন্ন করা ও সব্জী চাষ ও ব্যবসায় আমেরিকা কৃষির একটী প্রধান বিষয়, ঐ সমস্ত কার্য্য আমেরিকা বাসীরা এত সাবধানতার ও যত্নের সহিত করিয়া থাকে যে তাহাদের বীজ ও সব্জী সকল উৎকৃষ্ট এত যে দিনে দিনে পৃথীবি ছাইয়া ফেলিতেছে। আরও আমেরিকার কৃষির এইটী আশ্চর্য্য যে তাহারা এরূপ পরিষ্কার ভাবে সব্জী, মৎস্য, মাংস, রক্ষা করে যে তাহা তিন বা চারি মাসের পথে যাইলে ঐ সমস্ত দ্রব্য কোনরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অথচ আমাদের দেখা উচিত যে যাহা তাহাদের

ছিল না, তাহা তাহারা আমাদের দেশ হইতে লইয়া গিয়া সেই সমস্ত দ্রব্যের এত উন্নতি করিয়াছে যে সেই সমস্ত বীজ আমাগদিকে তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইতেছে। আমাদের ত উন্নতির চেষ্টা নাই অথচ আমাদের যাহা ছিল তাহাও অযত্নে দিন দিন লোপ পাইতেছে। আমার যথাসাধ্য এই সমস্ত বিষয় অনুশীলন পত্রিকায় বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দে।

মনে রেখো।

আজি বহু দিন পরে
এসেছি দুয়ারে সখা!
কি যেন কি চির তরে
লভিতে বিদায়
মনে রেখো—ভুলনা আমায়।

চিরদিন সাথে সাথে
ছিলে তুমি সঙ্গীরূপে
আজিকে চলিনু সখা!
ছাড়িয়া তোমায়
মনে রেখো—ভুলনা আময়!

তোমার ও মুখ ছবি
পাগল করেছে হায়!
কি জানি কখন আর
দেখিব তোমায়
মনে রেখো—ভুলনা আমায়!

অধম পাতকী আমি
ক্ষণেক সুখের তরে
কাঁদায়েছি কতদিন
শত বেদনায়!
মনে রেখো—ভুলনা আমায়!

বারণ করেছ কত
আমিত শুনিনি মানা
কত না দিয়াছি সখা!
বেদনা তোমায়,
মনে রেখো—ভুলনা আমায়!

ছাড়িয়া চলিনু আজ
স্মৃতিটুকু বুকে লয়ে
বাঁচিত আবার পুনঃ
দেখিব তোমায়!
মনে রেখো—ভুলনা আমায়

দেখ আর নাই দেখ,
ভালবাসা—মনে রেখো,
অদরশে ঠেলিওনা
যেন উপেক্ষায়!
মনে রেখো—ভুলনা আমায়!

একদিন—যেইদিন
আবার আসিব ফিরে
এমনি হৃদয় যেন
দেখিহে তোমায়
মনে রেখো—ভুলনা আমায়!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

প্রবাসের পত্র।

যখন "হাওড়া" হইতে "বম্বে স্প্যাশালে" চড়িলাম, যেন 'যমের বাড়ী যাইতেছি' বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অন্তরে হর্ষ, বিষাদ, কিছুই ছিল না, ফলতঃ আমার অন্তরের অবস্থা তখন আমিই সম্যক বুঝিতে সক্ষম হই নাই এবং ঐ প্রকার অবস্থা আর কখনও অনুভব করি নাই। গাড়ীতে উঠিয়াই প্রথম বিভ্রাট,—সে গাড়ীতে বাঙ্গালী নাই, আমিও হিন্দু ভাষায় পরম পণ্ডিত, কাজেই বাক্য সকল হৃদয়-দুর্গ হইতে বাহিরে আসিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে তীব্র গতিতে গাড়ী ছুটিতে লাগিল। যতক্ষণ জাগিয়া ছিলাম, গাড়ী "ব্যাণ্ডেল," "বর্দ্ধমান," "রাণীগঞ্জ" ইত্যাদি ষ্টেশন অতিক্রম করিল।

আমার দুইটী বাঙ্গালী সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। নিরুপায় হইয়া ভাগ্যবিধাতার সম্ভাষণ করিতে লাগিলাম তিনি শুনিলেন কি না তিনিই জানেন। অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাদেবী সংজ্ঞাকে বিতাড়িত করিয়া সে রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। রাত্রের ভিতর আর কিছু জানিতে পারি নাই।

জাগিয়া দেখি, "রজনী প্রভাত হইয়াছে,—জগৎ মনোমোহিনী উষাদেবীর অনন্ত সৌন্দর্য্য ছটায় নির্জ্জীব পৃথিবী সজীব হইয়া উঠিয়াছে—অন্ধকার ভীত হইয়া দূরবর্ত্তী বনভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করিতেছে।"

কিছুক্ষণ পরে গাড়ী "দানাপুরে" পৌঁছিল। তথায় নামিয়া প্রাতঃক্রিয়ার অর্দ্ধাংশ সম্পন্ন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। "দানাপুর" হইতেই গাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হিন্দি ভাষা না জানাতে আমার যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। প্রায় ১০টার সময় গাড়ী "মোগল সরাই" ষ্টেশনে গিয়া থামিল। এখানে গাড়ী বহুক্ষণ অপেক্ষা করে। "কাশী" ও অন্যান্য স্থানের যাত্রী সেখান হইতে নামিয়া গেল। আমরাও নামিয়া ষ্টেশন ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। সেখানে কএক জন বাঙ্গালীর সহিত দেখা হইল। "মোগল সরাই" ষ্টেশন অত্যন্ত বৃহৎ; এখান হইতে ভিন্ন লাইন দিয়া (গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া) "কাশী," অযোধ্যা ইত্যাদি স্থানে

যাইতে হয়। "কাশী" দর্শনের ইচ্ছা তখনকার মত নিবারণ করিয়া উদ্দেশে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার চরণে প্রণিপাত করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

"চুণার" "ষ্টেশনের নিকট হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত কেবল পাথরের কারখানা। পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মানোপযোগী টালী ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। চারিদিকের ছোট ছোট পাহাড়গুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। দেখিতে দেখিতে গাড়ী "এলাহাবাদে" পৌঁছিল। "এলাহাবাদের" যমুনার পুলটী অতি চমৎকার। পুলের উপর হইতে সহর দেখা যায়। ষ্টেশন হইতে সহর ভাল করিয়া দেখিতে পারা গেল না। "যদি "বম্বে" হইতে পৈতৃক প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারি তবে দেখিয়া যাইব" ইহাই চিন্তা করিতে করিতে 'লাইনি"তে আসিলাম। আরও কএক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া "সুতনায়" আসিলাম। এই দিকে বহু চুনের ভাঁটা—দেখিলাম বহু ভাঁটায় পাথর পুড়িতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পুর্ব্বেই গাড়ী "জব্বলপুরে" আসিল। "জব্বলপুর" ই, আই, রেলের শেষ সীমা ; এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া জি, আই, পি রেলের গাড়ীতে "বম্বে" যাইতে হয়। এখানে আসিয়া আমার একটু সুবিধা হইল। এ দিকে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী না থাকায় আমার সহযাত্রী দুইজন ও আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। গল্প করিয়াই অনেক রাত্রি কাটান হইল, অনেক গুলি ষ্টেশন দেখিলাম। "খাণ্ডোয়া" হইতে "ভঁসোয়াল" পর্য্যন্ত মহাভারত বর্ণিত "খাণ্ডব" বন, কিন্তু বিশেষ কিছু দেখিতে পারা গেল না। "ভঁসোয়াল" জংশনে গিয়া ভোর হইল। বালার্ককনক-কিরণ প্রোদ্ভাসিত বহু বিস্তৃত নগ্ন-প্রান্তর সমূহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। যোগী বেশধারী মসৃণ মস্তক-পর্ব্বত সকল সুবর্ণ সলিলে প্রাতঃ স্নান করিয়া উঠিল, চারিদিকে শুধুই পাহাড়,—দেশটা যেন পাহাড়ের রাজ্য সেই পর্ব্বত রাজ্য ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল প্রায় বেলা ১১টার সময় "নাশিক" ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। নাশিকে নামিয়া বোধ হইল যেন বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। তথায় দুইদিন ছিলাম। তথাকার বৃত্তান্ত পরে লিখিব।

দুই দিন পরে আবার গাড়ীতে উঠিলাম। কএকটী ষ্টেশন পরেই কতকগুলি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া গাড়ী যায় ; সে গুলির ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিলে এতই ভয়াবহ অন্ধকার হয়, যে অতি নিকটের কোন পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমাগত ঐ প্রকার ১০।১১টা সুড়ঙ্গ পার হইতে হয়।

ঐ গুলি অতিক্রম করিলেই রেল লাইনের এক দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী অপর দিকে গভীর খাত নিম্নদিকে দৃষ্টি করিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। চারি দিকের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে গাড়ী "ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে" গিয়া থামিল। এমন সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট সুবৃহৎ ষ্টেশন ভারতে আর নাই,—পৃথিবীতেও আর আছে কি না সন্দেহ; ইহা শুধু আমার মত নহে।

"বম্বের" তুলনায় "কলিকাতা" বহু পরিমাণে নিকৃষ্ট। ইহার তিন দিকে আরব সমুদ্র। এখন বুঝিলে বম্বে একটী উপদ্বীপ। পশ্চিম তীরে "উত্তর দক্ষিণ ঘাট" পর্ব্বত শ্রেণী বা "মলয়াচল।" মলয় পর্ব্বত যে অতীব রমণীয় স্থান তাহা হিন্দুগণ সবিশেষ জ্ঞাত আছেন অতএব "বম্বে" কি প্রকার সৌন্দর্য্যপূর্ণ সহর তাহা বুঝিতে পারিবে। যে দিকে সাহেবদিগের আবাস সে পর্ব্বতটীর নাম "মালবার হিল।" একটী সমুদ্র-শাখা এই সাহেব কোয়ার্টর স্কন্ধে করিয়া রহিয়াছে। এই স্থানের শোভা কল্পনার অতীত। প্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নারিকেল তাল ও অন্যান্য গগণ স্পর্শি বৃক্ষ সমূহ শোভিত শৈল-মালা কি শোভাই খুলিয়া রাখিয়াছে দেখিলে মনপ্রাণ মোহিত হয়। স্বভাব ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য মিশ্রিত হয়ে যে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছে দেখিয়া আত্মহারা হইলাম। "বম্বের" এক দিকে মুম্বো দেবীর মন্দির আছে। তাঁহারই নামানুসারে "বোম্বাই" নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানকার অট্টালিকাগুলি বহুতল সমন্বিত ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। প্রশস্ত রাস্তাগুলি ধূলি শূন্য। কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্ত্তারা যদি "বম্বের" অনুকরণ করেন তাহা হইলে কলিকাতাবাসী যুবকগণের অকালে চশমা ক্রয় অপব্যয়টী কমিতে পারে। এখানকার হাইকোর্ট কলিকাতার অপেক্ষা ছোট বলিয়া বোধ হইল। Museum কলিকাতার চেয়ে নিকৃষ্ট। পার্শীদের সমাধিভবনের নাম 'নীরব মন্দির।' ভিতরে যাইয়া দেখিতে পারি নাই। তথায় স্ত্রী, পুরুষ ও বালকদিগের শবদেহ রাখিবার জন্য বিভিন্ন মঞ্চ আছে। শবগুলি সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই শকুনের উদরস্থ হয়। ভিতরে একটী কূপ আছে, তথায় অস্থিগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। শব দেহের প্রতি এরূপ আচরণ ভাল কি মন্দ তাহা আমার সামান্য জ্ঞানের অগোচর। জলের চৌবাচ্চার উপর একটী সুন্দর বাগান আছে, তাহার নাম "হ্যাঙ্গিং গার্ডেন।"

এক খানি বোট ভাড়া করিয়া আমরা "এলিফ্যান্টা গুহা দেখিতে গিয়া-ছিলাম। ইহা পর্ব্বত গাত্রে খোদিত। বোটে চড়িয়া যখন চলিলাম,

সমুদ্রের শোভা দেখিয়া মনে হইল আমিও চৈতন্যের মত এই অসীম সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া মরি। সমুদ্র গর্ভ হইতে স্থানে স্থানে রথের চূড়ার মত খণ্ড পর্ব্বত সকল মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন বোম্বাই নগরী দর্শন করিতেছে। দূর হইতে সে গুলি বড়ই সুন্দর দেখায়; বোধ হয় যেন সমুদ্র সলিলে "বোম্বাই শ্বেত পদ্ম"ফুটিয়া রহিয়াছে। বোম্বাই পদ্ম কি বুঝিলে ত? আমাদের দেশে যেমন বড় মূলা ও বড় রস্তাকে "বোম্বাই" বিশেষণে বিভূষিত করা হয়, "বোম্বাই শ্বেত পদ্মও"ও সেই রূপ বুঝিবে। সেই সকল খণ্ড গিরি-শিখরে ইংরেজদের অস্ত্রা-গার স্থাপিত। স্থানে স্থানে বড় বড় জাহাজ ভাসিতেছে; তুমি সেরূপ জাহাজ দেখ নাই। এক একখানি জাহাজের আয়তন আমাদের গ্রামের অর্দ্ধেকের কম হইবে না। "এলিফ্যাণ্টা" গুহার সম্মুখে প্রকাণ্ড একটী প্রস্তর-হস্তী শুণ্ড ছিল; পর্ত্তুগীজগণ সেই জন্য "এলিফ্যাণ্টা"নাম রাখিয়াছিল। গুহার কারুকার্য্য তত সুন্দর না হইলেও স্থানটী অতি মনোরম। প্রাচীর গাত্রে বহু হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণীর সহিত সামন্য রকমের আলাপ হইল। তাঁহারা গুহাটী "বৌদ্ধ মন্দির" ছিল বলিয়া দুই চারিটী প্রমাণ দর্শাইলেন। ঐ সূত্রে তাঁহাদের সহিত প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা তর্ক বিতর্ক হইল। আমি একটী বিষয়ে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম দেখিলাম লবণ সমুদ্রের হাওয়ায় তাঁহাদের ভারতপ্রবাসী-শ্বেতাঙ্গ সুলভ-হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি লোপ পাইয়াছে। শুধু এই স্থানেই নয়, "বম্বে" আসিয়া ঐ প্রকার প্রমাণ আরও পাইয়াছি।

ফিরিবার সময় যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি চক্ষু আর ফিরিতে চায় না। অস্তাচলাবলম্বী ভাস্করের সুস্নিগ্ধ কিরণ, সমুদ্রের সুনীল সলিলে এবং পাদপ-কিরীটি-পর্ব্বত-শিখরে পতিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে তাহা কল্পনা ও বর্ণনা করিতে অক্ষম। সৌন্দর্য্য সাগর উদ্বেলিত হইয়া যেন চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিতেছে। আমার বোধ হইল যেন স্বপ্নে কোন সৌন্দর্য্যের দেশে আসিয়াছি। এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলাম।

"বম্বের" স্ত্রীলোক গুলি খুব সুন্দরী। পার্শী ও মহারাষ্ট্রী রমণীই সচরাচর রাস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্বাধীন গমনাগমন দেখিতে আরও সুন্দর। "বম্বের" একটী অংশের নাম কামদেবী। যখন মলয় পর্ব্বত আছে,— কামদেবী না থাকাও অনুচিত, কিন্তু তাঁহারা ফুলবান প্রস্তুত করিবার উপযোগী

কুল কোথায় পান, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস এখানে বেশী ফুলবাণের দরকার হয় না; হইলে তাঁহাকে মালীর স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এ দেশে বাঙ্গালীর সম্মান কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালা হইতে নূতন আসিয়াছি বলিয়া এখানকার ভদ্র লোকদের সহিত অধিকাংশ সময় ঐ আলোচনা করিয়া অতিবাহিত করিতে হয়। আজ এই পর্য্যন্ত লিখিয়া পূণা রওনা হইলাম। যাহা লিখিতে বাকি থাকিল, তথা হইতে লিখিব।

শ্রীশচন্দ্র।

কি চাহি?

(১)

কি চাহি কেমনে বলি,
পাতি হাত দাও তুলি'
যা দিয়ে পূজিব ওই চরণ যতনে;—
বড় আশা জাগে মনে,
দিবা নিশি অনুক্ষণে,
সাজাতে ও রাঙ্গা পদ ফুল-আভরণে।

(২)

আশীর্ব্বাদ কর তাই;
(যেন) স্বদেশ সেবিতে পাই,
অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর জাগে না অন্তরে;
ভায়ে ভায়ে মিলে সবে,
এক হয়ে এক ভাবে,
গাহিব মায়ের নাম দেশ দেশান্তরে।

(৩)

বিলাসিতা পরিহরি,
বিসর্জ্জিয়া অশ্রুবারি,
মুছে ফেল হৃদয়ের বিজাতীয় ভাব;
বিলাস রাক্ষসী হায়,
অতি বড় অন্তরায়,
দেখিতে দিবেনা সে যে আমাদের লাভ।

(৪)

বিলাস-বিভ্রম-মোহে,
অন্তঃ সারশূন্য হ'য়ে,
যাপিতে কি হবে এই মানের জীবন!
অতীতের দ্বার খুলি,
চাহ দেখি চক্ষু মেলি;
সে আনন্দ-ছবি হেরি জুড়াবে নয়ন।

(৫)

গেছে সুখ গেছে আশা,
গেছে স্নিগ্ধ ভালবাসা,
অনুতাপানলে দহে আমাদের প্রাণ;
এখনো ফিরিয়া চল,
পাইবে নূতন বল,
স্বার্থের মুখোস খুলি' লভ দিব্যজ্ঞান।

(৬)

মায়েরে ডেকেছ ভাই,
ভাকিয়ে ফিরাতে নাই,
মায়ের সুপুত্র হয়ে পূজ এক মনে;
ফিরিয়া আসিবে দিন,
রহিবেনা প্রাণহীন,
ভাতিবে উজ্জল রবি ধূসর গগণে।

(৭)

হৃদয়-কুসুম লহ,
ভকতি চন্দন সহ,
মায়ের ও রাঙ্গা পদে দিব উপহার;
মা কি গো থাকিতে পারে,
ডাকি যদি প্রাণভ'রে,
কুপুত্র হলেও মোরা, সন্তান তো মা'র?

শ্রীফণিভূষণ মিত্র মুস্তোফী।

কবিবর হাফেজ।

(১)

মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত পাঠে অমূল্য জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ঘটনা, উপদেশ পরিপূর্ণ। তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যকলাপ দর্শন অথবা আলোচনা করিলে বোধ হয়, লোক শিক্ষার জন্যই যেন তাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কেহ বিদ্যাবত্তা, কেহ ধর্ম্মজ্ঞতা, কেহ রসপাণ্ডিত্য কেহ স্বদেশানুরাগিতা, কেহ বা ত্যাগশীলতার জন্য পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এজন্য নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ মহাত্মাদিগের জীবন চরিত পাঠার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া থাকেন। সাহিত্য-কানন যে সকল কবিগণের যশঃ সৌরভে আমোদিত, সেই সকল কবিদিগের জীবন চরিত পাঠ করিলে চিত্ত আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কবিবর হাফেজ তন্মধ্যে একজন। আজ অবসরের পাঠক পাঠিকাদিগকে সংক্ষেপে কবিবর হাফেজের জীবন চরিত শুনাইব।

পারস্য ভাষার কাব্যোদ্যানে যাঁহার নির্ম্মল যশঃ সৌরভে আমোদিত, যাঁহার রসময়ী কবিতা প্রস্রবণ হইতে অমৃত-ধারা উদ্গীর্ণ হইয়া, পারস্য ভাষার সমধিক সৌরভ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করিতে কাহার না কৌতূহল জন্মে? সংস্কৃত ভাষায় কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাসের রসময়ী কবিতা যেরূপ আনন্দদায়িনী, পারস্য ভাষায় কবিবর হাফেজের কবিতাও সেইরূপ প্রসাদ গুণশালিনী। এই মনোহারিণী কবিতার জন্যই হাফেজ অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যতদিন পারস্য ভাষার প্রচলন থাকিবে ততদিন হাফেজের অবিনশ্বর নাম দেদীপ্যমান রহিবে।

পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরে মহামতি হাফেজ জন্মগ্রহণ করেন; ইনি বাল্যকাল হইতেই শাস্ত্রাধ্যয়ন ও কাব্য রচনায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কবির উপাধি হাফেজ তাঁহার প্রকৃত নাম শমসুদ্দিন আহম্মদ। হাফেজের কবিতা অতি সুন্দর, মধুর, কোমল এবং শব্দালঙ্কারে ও গাম্ভীর্য্যরসে সুশোভিত। তাহার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে—তিনি অতি সুললিত ও সুরস শব্দ সকল এত সহজে ও চমৎকাররূপে প্রয়োগ করিতেন যে, প্রভূত আয়াস সহ-

হাফেজ অতি সরল চিত্তের লোক ছিলেন। প্রকৃতি বিবিধ গুণে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি সম্পন্ন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের তোষামোদ ভাল বাসিতেন না বলিয়া প্রকৃত সুখাসক্ত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত সমাজেই কালহরণ করিতেন। তিনি ধন অপেক্ষা ধর্ম্মের অধিক গৌরব করিতেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ধন সম্পত্তি নানাবিধ দোষের আকর, ধনই নানা অনর্থের মূল। এজন্য বিলাসসঙ্কুল রাজসদন তাঁহার নিতান্ত অসন্তোষদায়ক ও বিরাগভাজন ছিল। তিনি রত্ন সিংহাসনারূঢ় সম্রাট অপেক্ষা সামান্য পর্ণ কুটীরবাসীর তৃণাসনোপবিষ্ট সরল চিত্ত ধার্ম্মিক কৃষককে সমধিক প্রীতি করিতেন। তিনি অসচ্চরিত্র দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগকে যারপরনাই ঘৃণা করিতেন।

মুসলমান বাদশাহদিগের রাজত্বকালে হাফেজ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন লাহোরের সন্নিকটে উপস্থিত হন, তখন পূর্ব্ব পরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই ব্যক্তিকে নিতান্ত পথশ্রান্ত ও একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন দর্শন করিয়া, পরদুঃখকাতর কবিবর তাঁহার তাদৃশী দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, দুর্বৃত্ত দস্যুগণ তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছে। এমন কপর্দ্দক নাই যে তদ্দ্বারা পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতে পারেন। এই দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার করুণ হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল তৎক্ষণাৎ ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে প্রদান করিলেন। এই রূপ দানের পাত্র দর্শন করিলেই, তিনি যথাসাধ্য তাহার দুঃখ বিমোচনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতেন।

হাফেজ স্বভাবতঃ ভীত, নম্র ও ধৈর্য্যশালী হইলেও কবিতায় তাঁহার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উপস্থিত বক্তা ও শ্লেষপূর্ণ বচনপটু ছিলেন। সমরাঙ্গনে বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় তিনি সকল সমাজেই জয়লাভ করিতেন। শেখ আবুইশাখ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত হাফেজের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। মহম্মদ মুজফরনামক কোন ভূপতি আবুইশাখের প্রাণ বধ করেন। এই পাষণ্ড নরপতির পুত্র সাহ-সুজা কাব্য-রচনা-কুশল ছিলেন।

ক্রমশঃ।

ডাঃ শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়।

অভিধ্যা।

আজিকে আমার প্রাণের তটিনী
গিয়াছে মরুভূ হ'য়ে;
আজিকে আমার আশার তরণী
গিয়াছে পালট্ খেয়ে।
আজিকে আমার তরুণতপন
করিছে মলিন আলো বিকীরণ;
আজিকার মোর মধুর স্বপন
গিয়াছে ভগন হয়ে;
আজিকার মোর জীবন যাপন
রহিয়াছে দূরে ভয়ে।
আমার প্রাণের আকুল-পুলক
মোর হৃদয়ের ভাষা;
আমার বুকের মৃদুল-লহরী
মোর পরাণের আশা;
আমার প্রাণের কানন মাঝারে
ফুটেছে যে ফুল আলোকে আঁধারে,
তাহারি ক্ষুদ্র হৃদয়ের প'রে
রচিত-কামনা বাসা;
দিওনাকো, নাথ কখনো ভাঙ্গিয়া
আমার সাধের আশা।

তোমার হাতের কুসুম কানন
তোমারি হাতের ফুল,
বাসিয়াছি ভাল বলিয়া হ'য়েছি
আমার আমার ভুল।
মোর জীবনের প্রথম কামনা,
মোর সাধনার প্রথম সূচনা,
মোর ধ্রুবতারা চন্দ্রনিভাননা
লুকায়ো না, নাথ; কুল,
মুছি হৃদয়ের দিওনা ভাসা'য়ে;
ভাঙ্গিও না মোর 'ভুল'।
হৃদয়ের মোর বিশাল-গগনে
সে যে মোর ধ্রুবতারা;
আমার তৃষিত তপ্ত-হৃদয়ে
সে যে অমিয়ার ধারা;
অন্তহীন তব ধরণীর বুকে
সে যে গো সহায় মোর সুখে দুঃখে;
সে যেন আমার মধুর-কুহকে
চারু-স্বপনের পারা;
লইওনা, নাথ ছিনা'য়ে আমার
হৃদি-গগনের তারা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ভগ্ন-হৃদয়।

১

বুঝিতে পারনি তুমি হৃদয় আমার।
আমি বড় আশা করে, ডাকিয়া এনেছি তোরে,
ব্যথিত হৃদয়খানি দিতে উপহার।
দলিলে তা চরণে তোমার!

২

আকুল অভাগা হৃদি, অশ্রু ফেলি নিরবধি,
ভেবেছিনু মুখ চেয়ে মুছাবে নয়ন।
ঘুচালে সে মোহের স্বপন।

৩

আমি তব মুখ চাহি, অন্তরে অন্তর সহি,
ছিনু চাপি এতদিন দারুণ যাতনা,
সে যে ওগো অতীত কল্পনা।

৪

তোমারে দিনু গো দেখা, জগৎ ভুলিয়ে একা,
বাসিলাম ভাল ভাবি পাইব তোমায়,
সে আশা ভাঙ্গিলে মোর হায়!

৫

নাহি জানি কোন্ দোষে, ঠেলিছ চরণে দাসে।
ভেবেছ লম্পট আমি অলির সমান।
পিয়ে মধু করিব প্রস্থান।

৬

ভেঙ্গে গেছে মোর হৃদি, দিবারাতি তাই কাঁদি,
ক্ষণে ভাবি নিবাই এ ক্ষুদ্র দীপিকায়
তা হ'লে এ যাতনা জুড়ায়!

৭

আর কোন আশা ল'য়ে কার মুখ পানে চেয়ে,
রহিব সংসার বক্ষে বহি দেহভার।
হৃদে ল'য়ে অশান্তি অপার।

৮

(আমি) নীরবে কাঁদি গো একা, পরাণ বিষাদ মাখা,
কে ফেলিবে অশ্রুবিন্দু অভাগারে হেরে
অভাগার কে আছে সংসারে।

৯

নীরবে নিভৃতে রব, নীরবে ডুবিয়া যাব
বিস্তৃতি সাগর গর্ভে অনন্তে মিশায়ে।
কেহ ওগো দেখিবে না চেয়ে।

১০

সেই চাঁদ সেই তারা, সেইত শ্যামল ধরা,
প্রদানে বিমল জ্যোতি প্রাণে সবাকার।
আমি সব হেরি গো আঁধার।

১১

সে হাসি শুকায়ে গেছে, প্রেম-ধারা মুছিয়াছে
অন্তর জ্বলিছে ধু ধু মরভু সমান
দেহে যেন নাহি তার প্রাণ,

১২

(আমি) নীরবে ভগন প্রাণে, ইচ্ছা হলাহল পানে
ত্যজি এই স্বার্থ ভরা কুটিল সংসার।
(তুমি) মুছে ফেল স্মৃতি অভাগার।

শ্রীপদ্মলোচন মহান্তি।

প্রার্থনা।

দাও, দেখিতে দাওহে ভুবন মোহন।
তোমারে পরাণ ভরিয়া।
লও, কৃপা করি লও, হে মনো হরণ।
আমার মানস হরিয়া॥
প্রভু, তোমার মোহন বাঁশরী শ্রবণে
শ্রুতি যুগ যাক্ গলিয়া।
যাক, অহরহ যাক তব গুণগানে,
রসনা অবশ হইয়া॥
দাও, পরশ মাণিক—চরণ পরশে,
মমতা বাঁধন খুলিয়া।
তব, ওরূপ মাধুরী দেখিহে হরষে
বিষয় বাসনা ভুলিয়া।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

মাসিক সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ২৭শে মে তারিখে ৬৮ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মোমান্দ যুদ্ধাবসান হইয়াছে। সীমান্তে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইতেছে। ইংরাজ বাহিনী মোমান্দদিগের বাসভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

বোমা ব্যাপারের জের মিটে নাই। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু এবং কিশোরী বাবু দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। ক্ষুদিরাম হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, এবং কিশোরী বাবু হত্যাকারীকে সাহায্য করণাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। আলিপুরের মামলা এখনও চলিতেছে। কলিকাতা পুলিশ আদালতে যাহাদিগের বিচার হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে দুইজন জামিনে খালাস পাইয়াছে।

যুগান্তরের মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মিত্র রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহীল সাহেবের বিচারে তাঁহাকে ১ বৎসর ১১ মাস সশ্রম কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। অর্থ দণ্ড প্রদান না করিলে আর ছয়মাস জেলে থাকিতে হইবে। যুগান্তরের পুনরায় নূতন মুদ্রাকর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যথারীতি ঘোষণা-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন।

মদে দেশ ভাসিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুরাপান যত বৃদ্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের আয়ও তত বাড়িতেছে। সুতরাং অর্থলুব্ধ-রাজা সুরাপান নিবারণে কিরূপে ব্রতী হইতে পারেন? বোম্বাই বিভাগে সুরাপান নিবারণী সভার উদ্‌যোগে পানাধিক্য নিবারণের চেষ্টা হইতেছিল। দেশের ভাগ্য বিধাতারা তাহাতে বাদ সাধিতেছেন। সুরাপান নিবারণী সভার সভ্যদিগকে পুলিশের হস্তে নিগৃহীত হইতে হইতেছে। কলিকাতায় সুরাস্রোত রোধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় সুরা বিক্রয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্প্রতি এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ পানাধিক্যের পক্ষাবলম্বী হইতে পারেন, কিন্তু যে সকল গণ্য মান্য ব্যক্তি উহার বিরোধী, তাঁহাদিগকে ত সহজে দমন করিতে পারিতেছেন না।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

কাকনাড়ার কলের তিনটী সাহেব সে দিবস পূর্ব্ববঙ্গ ষ্টেট্ রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ ট্রেণে কলিকাতা হইতে কাকিনাড়ায় যাইতেছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানে, একটা বোমা তাঁহাদিগের গাড়ীতে আসিয়া পড়ে। ইহাতে একটা সাহেব সাংঘাতিক রূপে আহত হয়, দুইটা আঘাত সামান্তরূপে হয়। বোমার জের এখনও মিটে নাই।

দেশীয় সংবাদ-পত্রে নাকি রাজভক্তিহীনতামূলক, উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, এবং তাহা পাঠ করিয়াই লোকে বোমা প্রভৃতির দ্বারা সাহেব-দিগের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছে। অন্ততঃ এইরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কর্তারা সম্প্রতি দুইটা আইন পাশ করিয়াছেন। একটী বিস্ফোরক পদার্থ বিষয়ক বিধান, অন্যটী সংবাদ-পত্র শাসন-বিধি।

বিস্ফোরক বিষয়ক আইনটী যেভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে পুলিশের দ্বারা অনেক স্থানে অত্যাচার উপদ্রব হইতে পারে। পুলিশ ইচ্ছা করিলে নিরীহ লোককে উক্ত আইনের বলে নিষ্পেষিত করিতে পারেন। আইনে লেখা আছে, যদি কোন বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করণের কোন-রূপ উপকরণ প্রস্তুত বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেও দণ্ডার্হ হইবে। মনে করুন, কেহ নারিকেল দ্বারা বোমা প্রস্তুত করণার্থ কোন দোকান হইতে নারিকেল ক্রয় করিল। নারিকেল-বিক্রেতা অবশ্য ক্রেতার উদ্দেশ্য জানিতে পারিল না। পরে যখন প্রকাশ পাইল, নারিকেল-বিক্রেতার নারিকেলেই বোমা প্রস্তুত হইয়াছে, তখন কি সেই নারিকেল বিক্রেতাকে পুলিশ নিগৃহীত করিতে পারিবে না? কর্তৃপক্ষ সত্বর বিধান করিতে গিয়া নানা স্থানে পদস্খলিত হইয়াছেন।

নূতন আইনের বলে, "যুগান্তর" সংবাদ-পত্রের তিরোধান হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মধ্যে আবার এক সংখ্যা ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত "যুগান্তর" নাকি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বোমা প্রস্তুত প্রণালী ও ইংরেজের গালাগালি লিখিত ছিল।

মজঃফরপুরের দায়রার বিচারে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। ক্ষুদি-রাম স্বহস্তে বঙ্গভাষায় আপীলের হেতুবাদ লিখিয়া হাইকোর্টে পাঠাইয়াছে।

হিন্দু বিধবা।

কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তনের সহিত আমাদের হিন্দু-সমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক শিক্ষাও ইহার অন্যতম কারণ। উচ্চ-শিক্ষা মানবমনকে উন্নত ও প্রশস্ত করে; এবং কুরীতি নীতিসকল অপনীত হইয়া মনোমধ্যে ধর্ম্মের পবিত্র আলোক বিকাশিত হয়, কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রাখর্য্যে যে সকল অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে বোধহয় এইপ্রকার শিক্ষা আমাদের দেশ হইতে দূরীভূত হওয়াই উত্তম। অবশ্য ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের অন্যান্য বিষয়ের অনেক উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু অন্তর্ম্মধ্যে পাপের ছায়া বিন্দু বিন্দু পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে; তজ্জন্য যে আমরা অতিশীঘ্র ধর্ম্মে পতিত হইব ইহা অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চশিক্ষিত মনিষীগণ দেশের মুখোজ্জ্বলকারী রত্ন বিশেষ। তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেশের বরেণ্য, তাঁহারা যে পথে চলিবেন সকলেই সেই পথানুগামী হইতে চেষ্টা করিবে। কারণ সকলেই জানেন তাঁহারা যে সমস্ত কার্য্যে ব্রতী হয়েন তাহা অতি মহৎ ও আদর্শস্বরূপ। কিন্তু আজকাল এই সকল উচ্চশিক্ষিত মহাজনদিগের কার্য্যকলাপে হতবুদ্ধি হইতে হইয়াছে। তাঁহারা বহুমূল্য হীরকের অনাদর করিয়া, কাচের আদর সমধিক করিতেছেন, গুণ-গৌরব তাঁহাদের হৃদয়ে আর স্থান পাইতেছে না, বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে মোহিত হইতেছেন। হিন্দু হইয়া হিন্দুর আচার, হিন্দুর পবিত্র নিয়ম সমূহ পদদলিত করিয়া যবনের রীতি-নীতির অনুসরণ করিতেছেন; ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে।

এই সকল মহাত্মা অধুনা হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রাতঃস্মরনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার এই প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের কঠিন তাড়নায় তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা স্রোতমুখে বালি-বাঁধের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল।

উপস্থিত যাঁহারা এই ব্যভিচারে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের সম্প্রদায়টি প্রায় দ্বিতীয় রৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সম্প্রদায়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,বৈদ্য ও সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন কায়স্থ প্রভৃতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষগণের নামে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিতে উৎসুক তাঁহারাই এই

সম্প্রদায়ভুক্ত। নাই কেবল দেশপূজ্য প্রকৃত হিন্দু সন্তান। 'হিন্দুত্ব' যাঁহাদের হৃদয়ে স্বরূপভাবে অনুভূত হইয়াছে।

নবীন-সমাজ সংস্কারকগণ কি বুঝেন না, যে স্বামীই স্ত্রীলোকের ভূষণ এবং সংসারের একমাত্র অবলম্বন। উভয়ের সম্বন্ধ কত সুন্দর এবং কিরূপ এক প্রাণতায় আবদ্ধ, সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে স্ত্রীলোক স্বামীর পূজা করিয়া থাকে। ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যিনি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার নিকট একটা কথা শুনিয়া তৃপ্তি, কথা কহিয়া সুখ, সেই দুর্লভ রত্ন যদি কালের কঠোর শাসনে জন্মের মত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীর তখন কি কর্ত্তব্য? অপর একজন ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করা, কিংবা মৃত-স্বামীর কোন চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা? প্রভেদ এই যে পুনরায় অন্য লোককে স্বামী সম্বোধন করিলে স্ত্রীলোক কুলটা বলিয়া পরিগণিতা হয়, সতী চিরকালের জন্য অসতী হইয়া থাকে, আর বৈধব্য অবস্থায় থাকিয়া স্বামীপদ ধ্যান করিলে, স্বামীর জন্য প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, সেই স্ত্রী দেবী বলিয়া পরিচিতা হয়। ইহা বাল্য ও বয়ঃপ্রাপ্ত বিধবাদিগের পক্ষে সমান প্রযুজ্য। হিন্দু বিধবা, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার একমাত্র সামগ্রী। হিন্দু বিধবা আছে বলিয়া হিন্দু আজ সর্ব্ব সমাজের শীর্ষস্থানীয়। যদি হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে জগত যবনের আবাসভূমি হইত। ধর্ম্ম ও সতীত্ব বলিয়া কোন জিনিষ ধরিত্রী-বক্ষে স্থান পাইত না।

যাঁহাদের জন্য বিধবা বিবাহ লইয়া সহরে এত হুলস্থুল পড়িয়াছে, তাঁহারা বলেন যে, হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নচেৎ 'হিন্দুগৃহে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, সতীর কন্যা কখনও অসতী হয় না। স্বীকার করিলাম যে বিধবাদিগের বিবাহ না দিলে তাহারা চরিত্রহীনা হইতে পারে। কিন্তু সে কাহার দোষে? পিতামাতার শিক্ষার দোষে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কন্যা বিধবা হইল, মাতা বলিলেন "আহা, খুদু আমার বড় আদরের মেয়ে। কচি বয়স, খুদুর গা থেকে আমি একখানিও অলঙ্কার খুলিতে দিব না। বাছার আমার ফিতে পেড়ে একখানি কাপড় পরিতে সাধ হ'য়েছিল, কর্ত্তাকে আনৃতে বলবো। ছেলে মানুষ বৈ ত নয়?" পিতা বলিলেন "সমাজের মুখে

থাকিলে খুড়ুর পুনরায় বিবাহ দিতাম" এবং খুড়ুর জন্য একবেলা মাছের ঝোলের সহিত অন্নাহার, মধ্যাহ্নে উত্তম জলযোগ ও সন্ধ্যায় গরম গরম লুচির ব্যবস্থা হইল। বোদ্ধা পাঠকগণ বলুন দেখি, ইহাতে খুড়ুর মন কতদিন স্থির থাকিতে পারে? পিতামাতা যদি কন্যার বৈধব্য অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে উপদেশ দেন, স্বামী কি জিনিষ বুঝাইয়া দেন, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি তাহার নিকট আলোচনা করেন, তাহা হইলে সেই বিধবা কন্যা একদিন সকলের প্রাতঃস্মরনীয়া হইতে পারে।

কন্যা বিধবা হইলে মাতার বিলাসপ্রিয়তা, বৈভব লালসা একেবারে অশোভনীয় হইয়া পড়ে। কন্যার দুঃখে তাঁহার সমস্ত সুখ ভাসাইয়া দেওয়া উচিত। এবং কন্যার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। প্রকৃত হিন্দুগণ এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। হিন্দুগৃহে মৃতভর্ত্তৃকাও অম্লান বদনে তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে দিনান্তে একাহার হবিষ্যান্ন। দিব্যবস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, মাল্যচন্দন, সীমন্তে সিন্দুর অব্যবহার্য্য; অনন্য ভক্তি হইয়া নারায়ণ সেবা ও নারায়ণ স্মরণ বিধেয়; যানারোহণ, পর্য্যঙ্কে শয়ন, তীর্থস্থান ব্যতিরেকে ক্ষৌরকার্য্য ও আনন্দোৎসবে যোগদান নিষিদ্ধ। সকল ব্যক্তিকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করা উচিত। তাম্বুল অসেবনীয়; একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে উপবাস করা বিধি ইত্যাদি নানাপ্রকার কর্ত্তব্য আছে। এক কথায় হিন্দুবিধবা ব্রহ্মচারিণী। এইরূপ পবিত্রতা কোন সমাজে আছে কি?

কয়েক বৎসর গত হইল আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত আমাদের হিন্দু-সমাজ লইয়া জনৈক ইংরাজের কথাবার্ত্তা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন হইয়াছিল। ইহাতে সাহেব বলেন, "দেখুন মহাশয়! আপনাদের সমাজ বড় সুন্দর। যদি আপনাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় এত পবিত্র হইত না। আমাদের সমাজে বিধবার বিবাহ হয়, এবং আমিও জনৈক বিধবাকে বিবাহ করিয়াছি, এখন বুঝিতেছি ইহা অনিষ্টকর। যখন সেই বিধবাকে বিবাহ করি তখন তাহার একটি সন্তান ছিল, আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত একটি সন্তান আছে, এবং বিধবা বিবাহের পর আর একটি সন্তান হইয়াছে। আপনাদের সমাজভুক্ত

নষ্ট হয় বলিয়া বিবেচনা করি।" বিধবা বিবাহ যে কতদূর দূষণীয় তাহা এই সাহেব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন।

অদূরদর্শী ব্যক্তিদিগের কথার প্রতিবাদ কল্পে আমরা আর এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইতে হইলে অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়, আমরা তাহা প্রয়োজন বিবেচনা করি না। হিন্দুধর্ম্ম-কর্ম্ম হিন্দুদিগেরই চিরাদরনীয়, অন্যে ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবে। পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ যে ধর্ম্ম জগতের সার ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের পবিত্র নিয়মসমূহ অবনত মস্তকে পালন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ সেই ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইয়াছেন।

হিন্দু বিধবা ক্রীড়ার সামগ্রী নহে, তাঁহাদের লইয়া যথেচ্ছাচার করা নির্ব্বোধের কার্য্য। সধবা স্ত্রীলোক অপেক্ষা বিধবার সম্মান আরও অধিক। এই প্রকার নিঃস্বার্থপরতা এবং নিষ্কাম ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে ঐকান্তিক হওয়া জগতে বড়ই দুর্ল্লভ। এই প্রলোভনময় সংসারে যিনি এরূপ আত্ম সংযম করিতে পারেন, তিনি তো জগজ্জননী। হিন্দু বিধবা কোন অংশেই পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের আলোচনার যোগ্যা নহেন, হিন্দু বিধবা হিন্দু-দিগের সদাপূজনীয়া, তাঁহাদের জন্য হিন্দুধর্ম্মের আজও এত প্রতিপত্তি। যতদিন পর্য্যন্ত জগতে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হইবে, ততদিন প্রকৃত হিন্দুর গৃহে বিধবা বিবাহ কখনও প্রচলিত হইবে না, ইহা যেন বিধবা বিবাহ পক্ষাবলম্বন-কারীদিগের হৃদয়ে আজীবন জাগরূক থাকে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত।

বাবা পরীক্ষিত।

সে আজ অনেক দিনের কথা। যখন আমি ছোট ছিলাম,—তখন সাধক শ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত দাসের পদাবলী আমার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তৎকালে বালক ছিলাম,—সেইজন্য এ হেন রত্নের কদর বুঝি নাই।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইটেবেড়ে মহারাজপুর নিবাসী পরম বৈষ্ণব মদীয় পূজ্যপাদ মাতামহ ৺সৃষ্টিধর সেন মহাশয়ের জমা খরচের খাতার মধ্যে উক্ত

বরণের মলাট, দেখিতে—ঠিক পুরাতন পুঁথীর ন্যায়। এই পুস্তক কি প্রকারে সেন মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। তবে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন—ইহাতে কৃষ্ণ গুণ কথা নিহিত থাকায় কাহারও নিকট হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।—কালে সেন মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল।

বাল্য-স্মৃতি স্মরণ হওয়ায়,—আমি উক্ত পদাবলীর অনুসন্ধান করি।—অনেক কাগজ পত্র ঘাঁটিয়া, দাদা মহাশয়ের ভাঙ্গা বাক্সে পুস্তকখানি পাইলাম। পাইলাম বটে—কিন্তু আশা মিটিল না। বহুদিন ধরিয়া ভগ্ন বাক্সে আবদ্ধ থাকায় তাহার মধ্যে তেলা পোকা যাইয়া বাসা বানাইয়া পুস্তকখানি জমাট করিয়া ফেলিয়াছে। বই খানি—কত প্রকারে—খুলিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। হস্তস্পর্শে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। আমার ভাগ্যে অকৃত কার্য্যটাই লাভ হইল। এই পুস্তকখানির উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে—৺ জ্ঞানদাসের এবং গোবিন্দদাসের পুস্তকেরমত আদর হইত বলিয়া বিশ্বাস। পুস্তকের কলেবর ও অনুান ২০০।২৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইত।

অতি কষ্টে পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তত্রাচ স্থানে স্থানে ছিন্ন থাকায় তদস্থানে ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটি কথা সংযোজিত করিয়া দিলাম। তবে আসলে খাস্ত করি নাই। যথা।—

ছিক্ লো ছি ওলো রাই
দেখে লাজে মরে যাই,
কেমনে লো আবির দিলি পর পুরুষে—
ও সে আমাদের দেখে ফিকি ফিকি হাসে
ওর হাসি নয় প্রেম ফাঁদ
ওলো তোরে ওর বড় সাধ,
লজ্জা সরম নাইকো ওর সুবুচক্ষুঠারে
আমরা গোপের নারী রঙ্গ দেখে মরি ডরে।
উচ্চ শিখি পুচ্ছ চূড়া
তাহে বামে আধা খাড়া
গলে শোভে বন মালা অতি সুশোভন,
হেসে হেসে বলে আমি রাধিকা রমণ।

আয়ান ঘোষ থাকতে ঘরে
তোরে কেন ও এমন করে,
তাইতে গোকুল মাঝে তোরে বলে—কলঙ্কিনী
ছিছি লো ছার প্রেমের দায় তুই উন্মাদিনী।

ইহার পর খানিকটা বুঝিতে পারি নাই। শেষ ভনিতাটি বুঝিয়াছি, যথা।—

পর পুরুষে ম'জবি বলে পড়িস্ কালার পায়
অধম পরীক্ষিত দাস পদরজে ম'জিতে চায়।

এত বড় বইখানির মধ্যে তিন স্থান মাত্র বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। সে যাহা হউক নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা—

বলো বলো চিকণ কালা
গত রাত্রে কোথায় ছিলা

ইহার পর অনেকখানি অংশ বুঝিতে পারি নাই।

তারপর।—

বল হে ভ্রমর বঁধু, কোন ফুলে বেশী মধু
বাসি ফুল মধুহীন, তাতে' বুঝি এত দিন,
যাহা কিছু বোল্‌বে তুমি—মিথ্যা অছিলা
শ্যাম তোমায় নিয়ে হোল বিষম জ্বালা।
কপালে সিন্দুর চিহ্ন,
কেশ পাশ ছিন্ন ভিন্ন;
পরনে রমণী বাস,
এ কি হেরি পীতবাস;—
দেখে তোমায়—আমরা লাজে মরে যাই;
কল্লে কি পুরুষ হোয়ে আই আই আই।
নয়নে ঘুমের ঘোর
যেমন দেখিতে চোর,
ননীচোরা নাম যাঁর এই বৃন্দাবনে,
শ্রীনন্দদুলাল বোলে সকলে বাখানে।
কি কারণে এলে হেথা,

অবোধ গরুর রাখাল
তাতে তুমি হও বাচাল,
কেমনে জানবে তুমি প্রেম রীতনীত,
কাতরে ও প্রেম চাহে দাস পরীক্ষিত।

ইহার পর আরও খানিকটা বুঝিয়াছি ইহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট লেখা বুঝা যায় না।

কালো কানাই কি ছিলা কি হইয়াছ মথুরায় এসে।
রাধা প্যারী বসেনা বামে কুঁজো কুব্জা বইসে পাশে।
চারু চূড়া দাওনা মাথে,—মাথায় পর সোণার তাজ।
গরু চরান নাই আর, এখন—রাজ্যেশ্বরের কাজ॥
পরিধানে পরতে কপীন হাতে নিয়ে পাচন বারি।
এখন নাইকো সে বেশ ভূষা এবে তুমি দণ্ডধারী॥
বেশ এখন হোয়েছে ভাল,—মাথে তাজ চিকণ কালো।
আঁধার ক'রে রাধার হৃদয়,—মথুরা কোরেছ আলো॥

বৈষ্ণব চূড়ামণি পরীক্ষিত দাস যে একজন ভাল ভাবুক পদকারক ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত উপরোক্ত পদাংশ হইতে বেশ বুঝা যায়। উক্ত রচনা তাহার বাল্যকালের রচনা বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি পরবর্ত্তী সময়ে এক মুহূর্ত্তও বিনা কাজে নষ্ট করিতেন না। অর্থাৎ সদাসর্ব্বদাই ঈশ্বরোপসনায় মগ্ন থাকিতেন।

যখন তাহার ক্ষুদ্র কবিতাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম। তখন তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী বলা আবশ্যক। বহুদিনের কথা—কেহই তাঁহার নিশ্চিত-বিস্তৃত জীবনী বলিতে পারে না। তবে লোক মুখে যাহা শুনা যায়—তাহা হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী বেশ বুঝা যায়।

জনশ্রুতি এইরূপ—তিনি নদীয়া জেলার উত্তরে পদ্মার নিকটে কোন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বর-পরায়ণ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যাবস্থায় তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবাস ত্যাগ করিবেন বলায় তাঁহার পিতামাতা রাসমণি নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সমাধা করাইয়া দেন। তিনি বিবাহ করিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। ধর্ম্মস্রোতে বাধা পড়িল। কিন্তু অচিরেই পিতা-মাতার কাল হইল। পিতামাতার মৃত্যু হইলে তিনি সংসার-ধর্ম্মের উপর

বড়ই বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন গৃহে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এবং ধর্ম্মপত্নী রাসমণিকে লইয়া আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী পরীক্ষিত দাসের উত্তেজনাতে তিনিও ভগবত প্রেমে মত্তা হন।

সে যাহা হউক তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে করিতে ইটেবেড়ে মহারাজপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তথাকার ভদ্রসমাজ তাঁহার এক নিষ্ঠ ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাঁহাকে এই গ্রামে থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে অস্বীকার হন। পরে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কথা অগ্রাহ্য করা পাপ বিবেচনা করিয়া থাকিতে স্বীকার হন।

যখনকার কথা বলিতেছি,—তখন উখড়া পরগণার ইটেবেড়ে মহারাজপুর মহাসমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল—লোকে ইহাকে সহর বলিত। এই গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। এই গ্রামে এখনও দীর্ঘ দীঘি, শতাধিক পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে,—কিন্তু তাহা কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। দীঘির পারে এখনও রাজবাটীর চিহ্ন আছে, কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ রাজা বাস করিতেন তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই গ্রাম ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং মহারাজা বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম ইটেবেড়ে মহারাজপুর হইয়াছে।

সে যাহা হউক, তিনি ইটেবেড়ে মহারাজপুরের সঙ্গমস্থলে দলুয়া পুষ্করিণীর পাড়ে আখড়া স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র কুটীর স্থাপন করেন। শুনা যায় ঘরখানি গোলার মত গোল ছিল। এই পুষ্করিণীর পাড়ে তিনি যোগ সংযম চিত্তজয়াদি করিয়া সিদ্ধ হন।

লোকে তাঁহাকে উপঢৌকন দিত। তিনি তাহা স্পর্শ করা দূরে থাক—দৃক্‌পাতও করিতেন না। পরম বৈষ্ণবী রাসমণি তাহা দীন দুঃখীগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন। তিনি উপাসনায় বসিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত—তাহার গায়ে সাপ জড়াইয়া দিলেও তিনি সে দিকে দৃকপাতও করিতেন না। দিবানিশি মুদিত নেত্রে ঈশ্বরারাধনায় কাল কাটাইতেন। এক প্রহরতক্, ধ্যান প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম বন্ধ থাকিত। সেই সময় তিনি লোকের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় কাল অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু কাহারো সহিত বেশী কথা কহিতেন না।

তাঁর যোগাসনের বামপাশে বৈষ্ণবী রাসমণি স্বামীর অনুরূপ ধ্যানস্থ থাকিতেন। পরীক্ষিতের ধর্ম্মে একাগ্রতা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'বাবা পরীক্ষিত' বলিয়া ডাকিত ও সভক্তি প্রণাম করিত। তিনি আহার করিতেন

না। ধ্যানের সময় কোন ক্ষুধার্ত্ত অথবা তৃষ্ণাতুর উপস্থিত হইলে পত্নী রাসমণি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন ইহা পরীক্ষিতের আদেশ ছিল।

তিনি যে স্থানে বসিয়া জপ তপ করিতেন, অদ্যাপিও সেইস্থানে তাঁহাদের সমাজ আছে। তিনি জীবিতাবস্থায় স্থানীয় বৈষ্ণবদের বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু হইলে আমাদ্বয়কে এইস্থানে সমাজ দিবে—তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই সমাজ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, কেহ যেন এইস্থান পদস্পর্শে অপবিত্র না করে। কারণ এইস্থানে বসিয়া অসংখ্য অসংখ্য ঈশ্বর নাম উচ্চারণ করিয়াছি—এইস্থান পরম পবিত্র পীঠস্থান তুল্য হইয়াছে।

এই স্থান অপবিত্র করা দূরে থাক, আজিও লোকে গদগদ চিত্তে প্রেমাশ্রু নয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া সভক্তি প্রণাম করে। পরীক্ষিতের তিরোভাব হইলে স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পারণী করিতেন—এখনও সে প্রথা প্রচলিত আছে। লোকে স্বীয় মঙ্গলোদ্দেশে এখন পর্য্যন্ত বাবার আখড়ায় মাটির উপরে কলিকাতে গাঁজা সাজিয়া দিয়া আইসে।

তিনি পত্নী রাসমণিকে বলিতেন,—দাম্পত্য প্রেমই মুক্তি—প্রেমেই মোক্ষ।

আজি ইটেবেড়ে মহারাজপুরবাসীগণ দীন দশাগ্রস্থ। তথাপি তাহারা 'বাবা পরীক্ষিতের' নামে জাঁক জমকের সহিত মহোৎসব দিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। শেষ কথা,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি এই গ্রামে আসিবার পূর্ব্বে উক্ত কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

যমুনা।

বল বল! প্রেমময়ী রূপসী যমুনে?
আর কি শ্যামের বাঁশী বাজে বৃন্দাবনে,
বংশী রবে গোপীগণ, জীবন যৌবন প্রাণ,
সমর্পণ করে কি গো পূর্ব্বের মতন;—
আত্মহারা হ'য়ে রাধা ধায় কি তেমন?
শ্রীকৃষ্ণ বসেন কিরে তমালের তলে।
শারি শুক প্রেম গাথা গায় বসি ডালে।

অধরে অধর দিয়ে, দুই অঙ্গ এক হ'য়ে
বিহার করেন তিনি সদা কুতূহলে,—
কলঙ্কিনী রাধা ব'লে ডাকে কি গোকুলে ?

৩। উদয়াচলে বাল সূর্য্য উদয় হ'লে,
শোভে যেন হিরণ্মণি রমণী কপালে,—
হাতে হাতে দিয়ে তালি, চল ভাই বনমালী,
ডেকে বলে সখাগণ—যাই গোচারণ
এত বেলা হ'ল তবু শয্যায় শয়ন।

৪। উঠ উঠ কানু খাবে ক্ষীর সর ননী
দূর গোঠে যাব আজি লহ হে পাঁচনী।
যাবে শ্যামলী ধবলী, আর যত গাভীগুলি,—
লয়ে স্ব বৎসগণ—যাবে বন মাঝ,—
উঠ উঠ প্রাণসখা শীঘ্র কর সাজ।

৫। এখনো এখনো কি গো কদম্বের মূলে,
ষোড়শ গোপিনী লয়ে হোলি খেলা খেলে ?
কৃষ্ণপ্রেম তৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে কি মন গোকুলে,—
বাঁশী কি এখনো ধরে 'রাধা রাধা, তান,—
তুই কি লো প্রেমভরে বহিস উজান ?

৬। আকুল হ'য়ে রাধা কি সতৃষ্ণ নয়নে,—
ফিরে ফিরে চায় সদা মথুরার পানে ?
রব হীন তীরে তোর, কাঁদে সদা নিরন্তর,
কাঁদে কি না কাঁদে তোর হৃদয় মাঝার
কি ব'লে বুঝাস তুই রাধার অন্তর ?

৭। কোথা রাধা কোথা কৃষ্ণ কোথা বৃন্দাবন,
রাধাকৃষ্ণ বিনা ব্রজ হয়েছে শ্মশান ;—
নাহি ভ্রমর ভ্রমরী, নাহি চকোর চকোরী,
বসন্তের ভেঙ্গে গেছে চির প্রেম ভোর,
ভাব কি—যমুনা ! এবে দুখ নিশি ভোর,

৮। বহুদিন হ'তে তুমি আছ এই স্থানে
কৃষ্ণপ্রেম গাথা তোর সকলে বাখানে,

এবে তুমি বিরহিনী, বল সখি প্রবাহিনী,
মনে কি লো পরে তোর স্মৃতি সুমধুর,
ঝরে কি লো জল, পাষাণ হৃদয়ে তোর?

শ্রীপ্রমথনাথ সরকার।

মণিপুর নারী।

শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের পত্নী চিত্রাঙ্গদা মণিপুর-রাজ-দুহিতা। ত্রিলোক বিজয়ী কিরীটিকে যে বীরেন্দ্র সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন চিত্রাঙ্গদা সেই বভ্রুবাহনের জননী! ইহাতেই অনুমান হয় তাহা মহাভারতের যুগে মণিপুর কত শক্তিশালী ছিল। এইত সেদিনকার কথা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ যে অদ্ভুত বীরত্বে অসি ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে কোন সেনাপতিরই সে বীরত্ব নাই। সে দেশের রমণীগণ যে বীরাঙ্গনা হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মণিপুরের পশ্চিম সীমায় কাছাড় জেলা। এখানে বহুকাল হইতে বহু-সংখ্যক মণিপুরী বসবাস করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুরুষ পরম্পরা ভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির সহিত বাস করিয়াও ইহাদের রীতিনীতি পোষাক পরিচ্ছদ এবং ভাষা ঠিক মণিপুরের মতই আছে। যদিও অনেকে বর্ত্তমানে সভ্য (?) জাতির সংস্পর্শে সভ্যতা শিখিয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালী বা ভারতের অন্যান্য জাতির মত মণিপুরীরা এখনও তত-দূর সভ্যতা শিখে নাই। এখনও ইহারা শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষে তিলক কাটে। এখনও প্রতিদিন প্রত্যেক বাড়ীতে তুলসী-মূলে সন্ধ্যায় ধূপ দীপ পড়ে।

মণিপুর মহিলার সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদই নিজেদের তৈয়ারী। ইহারা সকলেই বস্ত্র বয়ন করিয়া পরিধান করে। ৩।৫ হাত লম্বা ও ২।৩ হাত চওড়া চটের মত মোটা এক একখানা কাপড় এবং একখানা পাতলা ওড়না হইলেই ইহাদের লজ্জা নিবারণ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় যে মণিপুর নারী অলঙ্কারপ্রিয়া নহে। অবিবাহিতা সময় ২।৪ খানি অলঙ্কার থাকিলেও বিবা-

হাতে খুলিয়া ফেলা হয়। কদাচিৎ কাহারও গলায় একটী মালা বা হার এবং কাণে একটু সোণা থাকে। কিন্তু বিবাহিতা রমণীর হাতে অলঙ্কার থাকা বোধ হয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহারা অত্যন্ত ফুল ভালবাসে। কাণে এবং কবরীতে ফুল না পরিয়া মণিপুর নারী গৃহের বাহির হয় না। দোল ও রাস যাত্রা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা উৎসবে সুন্দরী মণিপুর বালা যখন ফুলের সাজে ফুলরাণী সাজিয়া উৎসবে মত্ত হয় তখন বাস্তবিকই মনে হয় মহাভারতকারের গন্ধর্ব্বের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

মণিপুর বালিকারা নিজে পতি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করে। এজন্য আমাদের দেশের বালিকা অপেক্ষা ইহাদের অধিক বয়সে বিবাহ হয়। ইহারা অনূঢ়া কাল পর্য্যন্ত "লাইছাপি", যুবতীরা "পেমা" (প্রেমার) এবং বৃদ্ধারা হানবী বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে।

ইহারা প্রায় সকলেই সুরসিকা ও নৃত্য গীত প্রিয়া। পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে মণিপুর সুন্দরীর নিষেধ নাই। উৎসাদিতে বসিয়া স্ত্রীপুরুষে সঙ্গীত আদি শ্রবণ করাও মণিপুরীদের কুরীতি নহে। অবিবাহিতা বালিকারাই নৃত্য গীত করে অপর সকলে শ্রোতা মাত্র। রাধা কৃষ্ণ সঙ্গীত ব্যতীত অন্য সঙ্গীত ইহারা গায় না—জানেনা শিখেও না। তাই অতুল সৌন্দর্য্যময়ী গন্ধর্ব্ব দুহিতা সে সভায় ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই শেখে না। বোধ হয় এই জন্য সভায় বসিয়া স্ত্রীলোকের গান শুনিতে ইহাদের নিষেধ নাই।

৭।৮ বৎসর বয়স্কা বালিকা সুকমল সুন্দর দেহখানি যখন ফুল সাজে সজ্জিত করিয়া নৃত্য করে, ক্ষুদ্র বালিকা কমনীয় দেহ খানি দোলাইয়া যখন ভক্তি ভরা সরল প্রাণে, "সখিরে কিবা অপরূপ হেরিনু সুরধুনী কূপে" বলিয়া বীণা বিনীন্দিত স্বরে গান করে—তখন মনে হয় ইহাই বুঝি দুরমন্দাকিনী তীরের ত্রিদীব বালার নিশীথ বীণার ঝঙ্কার।

কর্ম্ম কুশলতায় মণিপুর নারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। সংসারের যাবতীয় কর্ম্মেই ইহাদের অভিজ্ঞতা আছে। হাট বাজার করা, ক্ষেত্রের কাজ করা, মাথায় করিয়া বোঝা বহা, কাপড় বোনা,—নানাবিধ কারুকার্য্যে ও সেলাই করা, প্রভৃতিত ইহারা জানেই, ইহা ছাড়া প্রায় অধিকাংশ রমণীই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। মণিপুরীর সংসার নারীর উপর এতই নির্ভর করে যে রমণী বিহীন গৃহস্থের দিন চলা সুকঠিন। যে গৃহস্থের দৈনিক আয় এক টাকা তাহার বার আনাই রমণীর পরিশ্রম লব্ধ।

অনেকেরই বিশ্বাস যে মণিপুর নারীদের নাক বসা। বলা বাহুল্য যে, খঞ্জন নাসা রমণীও অনেক আছে। যাহাদের নাক একটু বসা তাহারাও সুন্দরী। এমন সুগোল সুঠাম দেহের গঠন, এমন বর্ণের ঔজ্জ্বল্য অন্যান্য জাতীয় রমণীদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র পাল।

প্রবাদ।

সকল দেশেই বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল সহজ গ্রাম্য কথায় যত দার্শনিক ভাব ও দেশের লোকের প্রকৃত চরিত্র অবগত হইতে পারা যায়, তত আর বোধ হয় কিছুতেই জানিতে পারা যায় না। এই জন্যই কয়েক জন ইংরাজ পণ্ডিত এ দেশের বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ফালন সাহেব ১২৫০০ হিন্দুস্থানি প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। পারসিভাল সাহেব ৬১৬৬ তামিল ও কার সাহেব ২১০০ তেলিগু প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। নোলেস সাহেব অনেক কাসমিরি প্রবাদ ও লং সাহেব বাঙ্গলা প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। সংবাদ-পত্রে এই গুরুতর বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার উপায় নাই; তবে আমরা এ স্থলে কয়েকটী মাত্র প্রবাদের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে এই সকল সহজ কথার ভিতর কত গুরুতর দার্শনিক ভাব নিহিত হইয়াছে।

নিয়তিই প্রবল,—নিয়তি লঙ্ঘনের কোন উপায় নাই। এই গুরু দার্শনিক কথা দেখুন। কত সহজে প্রকাশিত হইয়াছে, "যো হোগা—সো হোগা।"

আর একটা দেখুন, "যায়সা কাম তায়সা দাম।" যাহা শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, তাহা যে শীঘ্রই নষ্ট হয়, এই মতসিদ্ধ সত্য বোধ হয় নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র কথায় যত প্রকাশিত হইয়াছে, তত আর কিছুতেই হয় নাই;—"যলদি পাক্ তা—যলদি স্রুকতা।"

অন্যায় আচরণ ও বিচার বোধ হয় "আপড়ে লাত—মিছে বাত" অপেক্ষা অধিক সহজ কথায় প্রকাশ হয় না।

---

* সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সোণারকণ্ঠী নামক পুস্তক দেখুন।

এ দেশে চাষ বাস সম্বন্ধে যে রূপ সুন্দর প্রবাদ আছে,—তেমন আর কোন দেশেই নাই। যেমন

অঘ্রাণে যে বষে
ধন্য রাজা,—ধন্য দেশ।

আর একটা দেখুন ঃ—

পানি বর্ষে আধা পৌষ
আদা জিহন আধ ভূষ।

আর একটাও দেখুন ঃ—

চা চাষ গঙ্গা
পচাস চাষ মঙ্গা
তেকার আধা যোরি
তেকার আধা তোড়ি।

সহজ কথায় চাষ সম্বন্ধে এত সত্য অন্ত উপায়ে প্রকাশ করা বোধ হয় সম্ভব পর ছিল না।

"চিরাগ কো নিবে আন্ধা হয়।"

প্রদীপের নিম্নে চিরকাল অন্ধকার থাকে,—ইহাতে যত গভীর দার্শনিক-ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তত একখানি বৃহৎ পুস্তকেও বোধ হয় প্রকাশ পাইত না।

এইরূপ যে একবার কোন বিষয়ে ঠকে, সে দ্বিতীয়বার ঠকে না,—ইহা "নেড়া একবারের অধিক দুই বার বেলতলায় যায় না।" এই সহজ কথায় কতই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে! এই রূপ শত শত প্রবাদ বাক্য আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারি, কিন্তু সে উদ্দেশ্য আমাদের নাই। সময়ের গতিতে এই সকল অতি সুন্দর প্রবাদ বাক্য সকল দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অপর সাধারণ সকলে সাধারণ কথা বার্ত্তার মধ্যে প্রায়ই এই সকল প্রবাদের উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ মনভাব প্রকাশ করিতেন,—কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে এক্ষণে আমরা আর বড় এই সকল প্রবাদ কথোপকথনে প্রায়ই বলি না।—এমন কি অনেকে দুই দশটার অধিক জানেন না;—অনেক সুন্দর প্রবাদ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে,—ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয়

ইহার লোপ হইলে প্রকৃতই দেশের বিশেষ লোকসান। আশা করা যায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পাঠকগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে,—তাহারা সকলই দেশের প্রবাদ গুলিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবেন।

স্বপ্ন।

সুকুমার কৈশোরপ্রভাতে
স্বপনে দেখিয়াছিনু হায়,
সুবিশাল এ মরত ধাম
সুশোভিত শান্তি সুষমায়
দেখেছিনু এ জগত ভ'রে
শুধু হসি স্নেহ প্রীতিমায়া,
নাহি জ্বালা তীব্র হাহাকার,
অশান্তির সে করাল ছায়া
সদা মম শ্রবণে পশিত
ত্রিদীবের প্রেমের সঙ্গীত,
সে মধুর সঙ্গীত লহরে
হ'য়ে ছিল চিত্ত বিমোহিত।
দেবতার সেই আশীর্ব্বাদ,
প্রেম জ্যোতিঃ-ধারা ল'য়ে শিরে
আমার এ হৃদয় সরোজ
বিকশিত হ'তে ছিল ধীরে।
তার পরে?
সুখের স্বপন
নিমিষে ভাঙ্গিয়া গেল হায়!
এবে হেরি ধরা মরু সম,
পরিপূর্ণ তীব্র বেদনায়।

প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী।

রমণী রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় কন্যা।

রামরূপ শর্ম্মা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় নোটের তাড়া ও কন্যার পত্রের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। এ সকল ব্যাপার কি, তাহার তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার ভাব দেখিয়া দাড়ী মাঝিগণও বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বহুক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না দেখিয়া মাজি বলিল, "কর্ত্তা, নৌকা ছাড়িয়া দিব কি ?"

মাজির কথায় ব্রাহ্মণের চমক ভাঙ্গিল; তিনি ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিলেন,—তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "না, মাজি—চল তীরে; আমার মেয়ের যদি কোন সন্ধান পাই।"

মাজি বলিল, "কর্ত্তা,—এখন আমার ঠিক বোধ হইতেছে, তিনি সিপ নৌকায় চলিয়া গিয়াছেন।—রাত্রে আমরা ঘুমাইয়া ছিলাম, এই সময়ে নৌকা হইতে উঠিয়া তিনি তাহাদের সেই নৌকায় উঠিলে,নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছিল,—এই সময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—আমাদের পাশ দিয়া নৌকা খানা যখন চলিয়া যায়,—তখন আমি তাঁকে দেখিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে নৌকা কার ?'

"কেমন করে জানব কর্ত্তা,—বোধ হয়, যে জমিদার বাড়ী গিয়াছিলাম, সেই তাদের নৌকা।"

ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র বলিলেন, "উহুঁ—তা নয়।"

তবে কি,—তাহাও তিনি জানিলেন না,—কন্যার পত্রে ও তাহার কার্য্য কলাপে, ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে সে ইচ্ছা করিয়া, চলিয়া গিয়াছে,—কেহ তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যায় নাই। তিনি যতই এই সকল বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—ততই তাঁহার বেশ প্রতিতি জন্মিল যে,—এই বাড়ীতে টাকার জোগাড়,—তাহার পর নৌকা ভাড়া করিয়া করিয়া শ্বশুর বাড়ী আসা,—তাহার পর এই খানে নৌকা বাঁধিয়া রাখা,—এই সমস্তই

উষা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিল,—সে পূর্ব্ব হইতেই তাহার চক্ষে ধুলি দিয়া আসিতেছিল,—এরূপ কন্যার কথা ভাবিতেও তাঁহার হৃদয়ে বেদনা লাগিতে লাগিল,—তিনি অবশেষে বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "না,—এমন কন্যার মুখ দেখিব না,—মাজি নৌকা খোল।"

মাজি বলিল, "কর্ত্তা,—যেমনরূপ কর্‌তে হুকুম করেন।"

সেও সমস্যা। তিনি বাড়ী ফিরিয়া ব্রাহ্মণীকে কন্যার বিষয় কি বলিবেন? যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বলিলে ব্রাহ্মণী তাঁহার এক কথাও বিশ্বাস করিবে না; তাঁহার জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলিবে;—না,—আর বাড়ী ফিরিয়া লাভ কি? সংসারে চির জীবনেই দুঃখ ঘটিল,—এমন সংসারে থাকিয়া লাভ কি?—না, বিবাগী হইয়া যাই।

কে যেন দূর হইতে বলিল, "নীশার বাড়ী যাও।"

সহসা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে, লোকের যেরূপ অবস্থা হয়,—ব্রাহ্মণেরও ঠিক সেই অবস্থা হইল,—তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—কিন্তু কাহাকেও কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। অথচ তিনি স্পষ্ট শুনিয়াছেন,—কে বলিল, "নীশার বাড়ী যাও।" মাজিদের মধ্যে কেহ কি এ কথা বলিয়াছে?—না, অসম্ভব,—তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা নীশার কথা ইহারা আদৌ জানে না! তবে কি তিনি ভুল শুনিয়াছেন?—তাঁহার কন্যার কথা ভাবিতে ছিলেন, বলিয়া তিনি কি ভ্রমক্রমে এই কথা নিজের মনে মনে আপনা আপনি বলিয়াছিলেন?

ব্রাহ্মণ নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে চাহিতেছিলেন;—সহসা কন্যা হারাইয়া তিনি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন ভাবিয়া দাঁড়ি মাঝিগণ দুঃখিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেছিল,—কিন্তু সহসা তাহারাও চমকিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। এবার তাহারাও স্পষ্ট শুনিল;—

"হি, হি, হি, হি! নীশার বাড়ী যাও।"

তখন বেশ বেলা হইয়াছে,—নদী বক্ষে কেবল তাহাদের নৌকা ব্যতীত আর কোন নৌকা নাই,—যতদূর দৃষ্টি চলে কোন দিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই স্থানের নিকটে কোন গ্রাম ছিল না। তবে কে কোথা হইতে এ কথা বলিল? কৈ কোন দিকে কেহই নাই।

নীশা কে,—নীশার বাড়ী কোথায়, মাজিরা তাহার কিছুই জানিত না। তাহারা কেবল সেই বিকট অব্যক্ত অদৃশ্য হাসি শুনিয়া প্রাণে প্রাণে শিহরিয়া উঠিল,—ভয়ে তাহাদের মুখ শুখাইয়া গেল,—তাহারা সকলেই অস্পষ্ট কম্পিত স্বরে বলিল,—"আল্লা, আল্লা, আল্লা!"

রামরূপ শর্ম্মাও যে এই নির্জ্জন জনশূন্য স্থানে এই বিকট হাসি শুনিয়া ভীত হন নাই তাহা নহে,—তবে তিনি ভীতু লোক ছিলেন না,—গায়েও বেশ সামর্থ ছিল,—তিনি নিতান্ত মূর্খও ছিলেন না,—ভূত প্রেত্ব কখনও বিশ্বাস করিতেন না,—তিনি বলিলেন,—"এইখানে নিশ্চয়ই লোক আছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই বিকট অস্পষ্ট হাসি,—হি, হি, হি ধ্বনি,—নির্জ্জন প্রান্তরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নদী বক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে আরও যেন বিকটতর হইয়া উঠিল।

রামরূপ শর্ম্মা নিমিষে নৌকা হইতে তাঁহার বৃহৎ বংশ যষ্টি তুলিয়া লইয়া লম্ফ দিয়া তীরে নামিলেন,—বলিলেন, "এই তেঁতুল গাছে কেউ আছে।"

নবম পরিচ্ছেদ।

শাওতালনী।

তিনি ছুটিয়া তেঁতুল গাছের নিকট আসিয়া গাছের উপর বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। গাছ ঘন পাতায় পূর্ণ,—তিনি প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বহুক্ষণ সমস্ত গাছ বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন যে কে যেন এক জন গাছের পাতার ভিতর লুকাইবার চেষ্টা পাইতেছে,—দিনের বেলা ভয় কি,—যদি চোর ডাকাত হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও দাঁড়ি মাজি লইয়া ছয়জন আছেন। এ যেই হউক এ লোককে দেখিতে হইবে,—এ লোক নীশার নাম কিরূপে জানিল? আমায় নীশার বাড়ী যাইতে বলিতেছে কেন,—এমন বিকট ভয়াবহ হাসি হাসিতেছে কেন? মানুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সুদৃঢ়ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি কে,—নেবে এস।"

তাহার উত্তরে কেবল সেই হি হি হি হাসি। সেই হাসিতে এবার ব্রাহ্মণের মনে হইল যে লোকটা পাগল। পাগল যদি হয়, তবে তাঁহার কন্যার কথা এ কিরূপে জানিল? যেই হউক দেখিতে হইল,—তিনি আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কে তুমি—নেবে এস।"

এবার সে পাতা ও ডাল সরাইয়া তাহার মুখ বাহির করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া সাদা দন্তপাতি বাহির করিয়া হাসিল, "হি, হি ! হি, হি !

এরূপ মূর্ত্তি রাঘরূপ জীবনে আর কখনও দেখেন নাই।

মস্তক উষ্ক খুষ্ক, ছিন্ন ভিন্ন তৈল বিহীন লোহিতাভ লম্বা কেশে পূর্ণ,—সেই কেশ মুখ পীট বুক আবরিত করিয়া লম্বিত। কেশের মধ্য হইতে চক্ষু দুইটী বিড়ালের চক্ষের ন্যায় জ্বলিতেছিল। হস্ত দুইখানি দীর্ঘ,—অতি দীর্ঘ,—মৃত মনুষ্যের হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রং অতি কালো—এমন কালো অথচ ধুসর বর্ণ মানুষ ব্রাহ্মণ আর কখনও দেখেন নাই।

লোকটা মানুষ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই,—তবে পুরুষ না স্ত্রীলোক তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না,—তাঁহার এ সন্দেহও অধিকক্ষণ থাকিল না। তাহার দেহ অতি মলিন কৃষ্ণ ছিন্ন বসনে আবরিত ছিল, তাহা অপসারিত হইয়া যাওয়ায় ব্রাহ্মণ দেখিলেন দুই শীর্ণ দীর্ঘ স্তন নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত।

তবে স্ত্রীলোক,—দেখিলেই উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হয়,—বাঙ্গালী নহে। এই ভয়াবহ স্ত্রীলোক তাঁহার কন্যার নাম কিরূপে জানিল,—তাহাকেই বা কিরূপে চিনিল ?

তিনি আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি কে—নেবে এস।"

উত্তরে সেই হি হি হি হাসি।

ব্রাহ্মণ এবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার সহিত বদমাইসি চলিবে না,—আমি শুনিতে চাই—তুমি আমায় চিনিলে কিরূপে ?—তুমি আমার মেয়ে নীশার নাম জানিলে কিরূপে ?—কেনই বা নীশার বাড়ী যাও,—এ কথা বলিতেছিলে ?"

উত্তরে—বিকট কর্কশ ভয়াবহ হিহি হাসি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গাছ থেকে নাবিবে না মনে করিতেছ,—বটে ! দেখি, নাব কি না !"

তিনি নৌকার দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন, "মাজি—মাজি, এই দিকে সব এস,—এই গাছের উপর এক মাগী পাগলী রয়েছে,—তাকে গাছ থেকে নাবাতে হবে।"

দাড়ী মাজিগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া চাহি করিতে লাগিল,—

তাহাদের বিশ্বাস হইল না। গাছের নিকট এই দিনের বেলায় যাইতেও তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গাধারা,—আমি বল্‌ছি একটা পাগলী !—এত ভয় ! তোরা মানুষ—না কি ? আচ্ছা আমি,—আমিই এটাকে গাছ থেকে নাবাচ্চি।"

"কর্ত্তা, যাচ্চি,—দাঁড়ান,—ভয়টা কি !" এই বলিয়া মাঝি তীরে নাবিল। তাহাকে নাবিতে দেখিয়া অন্যান্য দাঁড়ীগণও তাহার পশ্চাতে পশ্চাত আসিল।

তেঁতুল তলায় আসিয়া গাছের উপর চাহিয়া তাহারা আবার আল্লা আল্লা করিয়া উঠিল,—দাড়ীগণ ভয়ে নৌকার দিকে ছুটিল। "অপদার্থ,—কুষ্মাণ্ড", বলিয়া ব্রাহ্মণ কোমরে কাপড় ভালরূপে জড়াইয়া গাছে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া পাগলী আবার বিকট উচ্চ হাস্য আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বানরের অপেক্ষাও সুকৌশলে এ ডাল হইতে ও ডালে যাইতে লাগিল। রামরূপ শর্ম্মাও নাছোড় বান্দা,—তিনিও তাহাকে ধরিবার জন্য সাবধানে ডালের পর ডাল উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। শেষ পাগলী একটা উচ্চ ডাল হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে অবতীর্ণ হইল, প্রায় সে মাজির স্কন্দের উপর পতিত হইয়াছিল;—"দোহাই আল্লা" বলিয়া মাঝি নদীর জলে লাফ দিল।

পাগলী কিন্তু পালাইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সে দুই হাতে তাহার দুই জানু চাপড়াইয়া মহা আনন্দে মহা হাসি হাসিতে লাগিল।

রামরূপ শর্ম্মা কষ্টে গাছ হইতে নাবিলেন, এখন রমণীকে ভালরূপ দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে নানা লোকের নিকট ডাইনীর যে বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন, এই স্ত্রীলোকের সহিত তাহার কোন বিভিন্নতা নাই। ডাইনী বলিয়া সংসারে যদি কিছু থাকে, তবে এই স্ত্রী লোক সেই ডাইনী।

ব্রাহ্মণ নিকটে আসিলে সে হি হি করিয়া হাসিয়া আকুল হইল,—তাহার পর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলিল, "আমায় দেখে ডরায় না কে ? হি হি হি !"

তাহার পর দাঁড়ী মাজিদিগকে দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ—দেখ কি ভয়,—হি হি হি !"

রামরূপ শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

"হি, হি হি ! আমায় চেন না ? আমি শাওতালনী—শাওতালনী—শাওতালনী,—হি, হি !

দশম পরিচ্ছেদ।

শাওতালনীর কথা।

মাজি সাঁতার দিয়া গিয়া নৌকায় উঠিয়াছিল,—দাড়িগণও নৌকা ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল,—কিন্তু এক্ষণে রামরূপ শর্ম্মাকে এই অত্যদ্ভুদ শাঁওতালনীর সহিত কথা কহিতে দেখিয়া তাহাদের ভরসা হইল, তাহারা নৌকা আবার তীরে বাঁধিয়া তেঁতুল তলার নিকট উপস্থিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ রামরূপ শর্ম্মা এই স্ত্রীলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন, এই পাগলিনী কি রূপে তাঁহার কন্যার নাম জানিল,—কি জন্যই বা তাঁহাকে এই রূপ ভাবে কন্যার নিকট যাইতে বলিল। তবে কি এ যথার্থে পাগল নহে?—ইহার ভিতরও কি কোন গূঢ় রহস্য নীহিত আছে? যাহাই হউক, যখন ইহাকে পাইয়াছি, তখন ইহার নিকট সকল কথা না জানিয়া ইহাকে ছাড়িব না।

মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রামরূপ শর্ম্মা সেই শাওতাল রমণীকে বলিলেন, "তুমি আমার মেয়ের নাম করিলে কেন?"

সে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তখন সহসা তাহার মুখ গম্ভীর হইল,—তাহার মুখ হইতে হাসি বিদূরিত হইল;—তাহার সেই গোল চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল,—সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি নীশার বাপ।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ, আমার এক মেয়ের নাম নীশা,—তুমি তাহাকে কি জান?"

শাওতাল্নী আবার হি হি করিয়া হাসিল, বলিল, "চিনি! চিনি! হাঁ— চিনি,—না চিনি না।"

রামরূপ শর্ম্মা রাগত স্বরে বলিলেন, "তোমার ও বদমাইশী পাগ্‌লামি দেখিয়া আমি ভুলিব না। তুমি কেন ঐ কথা গাছ থেকে আমায় বলিতেছিলে,—তাহা যতক্ষণ না বলিবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে এখান থেকে এক পাও যাইতে দিব না।"

শাওতাল্নী আবার গম্ভীর হইল,—বলিল, "তবে তোমার নৌকায় চল,— তোমার মেয়ের বাড়ী যাই।"

"সে ভাল কথা,—এস।

এই বলিয়া রামরূপ শর্ম্মা নৌকার দিকে অগ্রসর হইলেন। পাছে এই

ডাইনী পালায়, এই ভয়ে তাহাকে বলিলেন, "চল, সাম্‌নে সাম্‌নে, আমি তোমায় পালাইতে দিতেছিনা।"

ইহার উত্তরে স্ত্রীলোক আবার সেই রূপ হি হি হাসিয়া নৌকার দিকে চলিল। যষ্টি স্কন্ধে রামরূপ শর্ম্মা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

শাঁওতাল্‌নী নৌকায় আসিয়া নৌকার ভিতর গিয়া বসিল,—রামরূপ শর্ম্মা নৌকায় উঠিলে বলিল, "নৌকা খুলে দাও,—চল তোমার মেয়ের বাড়ী যাই।"

মাজি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিল,—তাহাদের ভূতের ভয় গিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ডাইনী রূপিনী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহারা বড় আশ্বস্ত হয় নাই। তাহাকে নৌকায় লইয়া যাইতে তাহাদের বিন্দু মাত্র ইচ্ছা ছিল না; তবে সাহস করিয়া কোন কথা বলিতেছিল না,—তবুও মাজি বলিল, "কর্ত্তা, বেলা হয়েছে, কাল থেকে আমাদের খাওয়া হয় নি,—কেবল চিড়ে খেয়ে আছি। কর্ত্তা, এখানে রাঁধা বাড়া করে তার পর কর্ত্তা, যেখানে বলবেন, সেই খানেই তবে যাব কর্ত্তা ——"

রামরূপ শর্ম্মার কোমরে তখনও তাঁহার কন্যা প্রদত্ত নোটের তাড়া ছিল, তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না;—অর্থ এমনই দ্রব্য যে ইহাতে মরা মানুষের দেহেও বল আইসে। হয়তো এই নোটের তাড়া কোমরে না থাকিলে, তাঁহার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ যাহা করিতেছিলেন, যত সাহস আস্ফালন দেখাইতে ছিলেন, তাহা দেখাইতে পারিতেন না।

যাহা হউক তিনি মাজির মনভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ভাড়ার কোন ভয় নেই—"

মাজি নোটের তাড়া দেখিয়াছিল, বলিল, "না কর্ত্তা, সে কথা বলি না আপনার কাছে ভাড়ার ভাবনা কি?—তবে খাওয়া দাওয়া ———"

প্রকৃত কথা বলিতে কি, এই নির্জ্জন স্থানে এই দিনের বেলাও এক মুহূর্ত্ত থাকিতে মাজির ইচ্ছা ছিলনা,—অর্থ বড় ভয়ঙ্করী দ্রব্য,—অর্থের লোভ বড় লোভ। ব্রাহ্মণ নৌকায় একাকী—এই দাঁড়ি মাজিদেরই বিশ্বাস কি? নির্জ্জন স্থানে তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে হত্যা করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া নোট গুলি লইয়া পলাইতে পারে,—এরূপ কাণ্ড প্রত্যহ হইতেছে। এই জন্যই হয়তো এই অদ্ভুত শাঁওতাল স্ত্রীলোককে পাইয়া তিনি কতকটা যেন হৃদয়ে বল পাইয়াছিলেন। সংসারে কখন কিসে কি হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

তিনি বলিলেন, "চল,—নিকটে কোন বাজার দেখিয়া নৌকা লাগাইব,—সেই খানে আহারাদি করিয়া তবে আমার আর এক মেয়ের বাড়ী যাইব। এই খরচের জন্য এখন পাচ টাকা দিতেছি।"

পাগলী হি হি করিয়া হাসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই কথা।

রামরূপ শর্ম্মা কলিকাতায় উষার নিকট যে এক শত টাকা পাইয়া ছিলেন, তাহা হইতে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা পথ খরচ বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি মাঝির হস্তে পাঁচ টাকা দিলেন। "কর্ত্তা, যা হুকুম করেন" বলিয়া সে দাঁড়ীদের বলিল, "নৌকা ছেড়ে দে,"—তাহার পর রামরূপ শর্ম্মার দিকে চাহিয়া বলিল "কোন দেখে কর্ত্তা যাতি হবে?"

এক কন্যার বাড়ী হইতে তাড়া খাইয়া তিনি কোন দিকে নৌকা আনিয়া ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন না। সেই জন্য তিনি নদীর দুই তীরের দিকে চাহিলেন,—এ স্থানে তিনি যে কখনও আসিয়াছেন,—তাহা বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি মাঝিকে বলিলেন, "এ যায়গার নাম কি?"

সে বলিল, "কর্ত্তা, এ পথে আমরা বড় চলা ফেরা করি না। তবে বোধ হয় যেন একটু আগে গেলে রায়গ্রামের হাটখোলা।"

এতক্ষণ শাঁওতালনী অন্য মনস্ক ভাবে নদীর দিকে চাহিয়াছিল, এক্ষণে মাঝির এই কথা শুনিয়া সে সহসা রামরূপ শর্ম্মার দিকে চাহিল;—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "নিজের মেয়ের বাড়ী চিন না?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি তোমার ভাব বুঝিতে পারিতেছি না,—তুমি কখনও পাগলের গান করিতেছ,—কখনও আবার গম্ভীর ভাবে কথা কহিতেছ,—যদি যথার্থ তুমি আমার মেয়ের কথা জান, তাহা হইলে তাহার বিষয় সকল কথাই জান;—তখন আবার এ কথা বলিতেছ কেন?"

ইহার উত্তরে—স্ত্রীলোক বলিল, "আমার নাম জঙ্গলী।"

গত কয়েক দিনের ঘটনায় রামরূপ শর্ম্মার মস্তক প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারে যাহা ঘটিতেছে, তাহা যদি বুঝিতে পারা না যায়,—তাহার

অনেকেরই মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়া থাকে। সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামরূপ শর্ম্মার যে মস্তক বিঘুর্ণিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

তাহার উপর কোথা হইতে সহসা, পাগলিনী ডাইনী শাঁওতালনী আসিয়া তাহার স্কন্ধে চাপিল, ইহার ভাব, ইহার কার্য্য, ইহার কথা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি এক কথা বলেন,—এই স্ত্রী লোক অন্য কথা কহে, তিনি যাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র, এই ডাইনী সে কথায় কান না দিয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা বলিতে থাকে, তিনি কি করিবেন কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে দাঁড়ীগণ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কোন্ দিকে যাব?"

শাঁওতালনী বলিল, "এই দিকে সামনে—রায় গ্রামের পরেই পুরন্দরপুর।"

রামরূপ বলিলেন, "হা—শুনিয়াছি পুরন্দরপুরেই আমার ছোট মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, সেই দিকেই চল।"

মাঝি সেই দিকেই নৌকা ঘুরাইয়াদিল,—দাড়িগণ সবলে দাঁড় ফেলিল,—নৌকা আবার নবগঙ্গা বক্ষে ছুটিল।

তখন রামরূপ শর্ম্মা শাঁওতালনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এখন তোমায় দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর দিবে।"

সে উত্তর করিল, "আমার নাম জঙ্গলি—শাঁওতালনী,—বাড়ী মুদিবাদ,—মধুপুর—মধুপুর,—তুমি সেই বট গাছ—সেই বট গাছ চেন।"

রামরূপ শর্ম্মা মধুপুরের নাম জানিতেন, কিন্তু কখনও মধুপুরে যান নাই। এই মাত্র জানিতেন যে লোকের পীড়া হইলে কিছুতে না সারিলে লোকে এই মধুপুরে হাওয়া বদলাইতে যায়,—তিনি আরও জানিতেন যে এই মধুপুরের নিকট শাঁওতালগণ বাস করে,—তাহাদের অনেকে এ দেশে আসিয়া বাস করিলে, তাহাদের লোকে বুনো বলিয়া থাকে। মধুপুর ও শাঁওতাল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামরূপ শর্ম্মার ইহাপেক্ষা আর অধিক জ্ঞান ছিল না; সুতরাং এই পাগল ডাইনীরূপিণী স্ত্রীলোক বট গাছ সম্বন্ধে কি বলিতেছে, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এরূপ হেয়ালী সমস্যায় কথা কহিলে তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন না ভাবিয়া তিনি অতি সুদৃঢ় ভাবে বলিলেন,—"দেখ, তোমার আমি কোন কথা বুঝিতে পারিতেছি না —"

সে তাঁহার কথায় প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "শক্ত কি—শক্ত কি?—নাম আমার জঙ্গলী।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—"তোমার নাম শুনিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই,—আমি শুনিতে চাই, তুমি আমার মেয়ের সম্বন্ধে কি জান?"

"সব জানি—সব জানি।"

"দেখ পগলামি করিও না,—ভাল হইবে না।"

"হি—হি—হি!

"ফের বদমাইশী!—আমার মেয়েকে তুমি কেমন করিয়া চিনিলে, এ কথার স্পষ্ট উত্তর দিবে কিনা শুনিতে চাহি।" পাগলী গাইল;—

"দুরে ছিল বটগাছ
খুনখারাপী ফেরবাজ।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হাটে।

রায় গ্রামের হাটে মাজিগণ নৌকা লাগাইল। তাহারা আহারাদি না করিয়া আর এক পাও অগ্রসর হইতে স্বীকার করিল না। অগত্যা রামরূপ শর্ম্মা নিজেও সেই থানে আহারাদি করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন,—নতুবা তাঁহার আর এক মুহূর্ত্তও কোথায় কাল বিলম্ব করিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি তাঁহার বড় মেয়ের বাড়ী যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাহার কারণও যথেষ্ঠ ছিল। তিনি নৌকায় শাঁওতালনীকে তুলিয়া তাহাকে নানা কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না।—তিনি অনুনয় বিনয় করিলেন,—ভয় দেখাইলেন—ধমকাইলেন,—শাসাইলেন,—কিন্তু সে নীরব,—যেন সম্পূর্ণ হাবা কালা;—তিনি যতই রাগত হয়েন, সে ততই হি হি করিয়া হাসে। রামরূপ শর্ম্মা সম্পূর্ণ উন্মত্ত প্রায় হইলেন,—অতি কষ্টে তিনি আত্ম সংযম করিলেন। স্ত্রীলোক না হইলে তিনি যে ইহাকে প্রহার করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাগত বিরক্ত হইয়া তিনি আর এই ডাইনীর সহিত কথা কহিলেন না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিলেন, "যখন সঙ্গে যাইতেছে, তখন পরে সকলই জানিতে পারা যাইবে,—এখন এই পাগলের সহিত পাগলামী করিয়া কোন লাভ নাই। স্পষ্টতই এই ডাইনী কোন রকমে আমার মেয়েকে চেনে,—নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আমায় কোথায় দেখিয়াছিল,—সব রহস্যই পরে ভাঙ্গিবে,—ব্যস্ত হইয়া অনর্থক মাথা খারাপ করি কেন?"

মনকে এই রূপে প্রবোধ দিয়া রামরূপ শর্ম্মা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে নৌকা আসিয়া রায়গ্রামের বাজারের ঘাটে লাগিল। সে দিন হাট,—শত শত লোক জমিয়াছে, ঘাটেও ছোট বড় অসংখ্য নৌকা। এমন কি রামরূপ শর্ম্মার মাজিরা তাঁহার নৌকা বাঁধিবার স্থান খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে বাজারের ঘাট ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়া এক অঘাটায় নৌকা বাঁধিল।

নৌকা বাঁধিয়াই তাহারা নৌকা হইতে চাল ডাল কাঠ তীরে তুলিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল।

রামরূপ শর্ম্মা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে রন্ধন করিবেন না,— যাহা হয় কিছু বাজার হইতে কিনিয়া খাইবেন, তাহাই তিনি তাহার ব্যাগ হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া পাগলীকে বলিলেন, "তুমি কি খাবে?" সে হি হি করিয়া হাসিয়া তাহার ছিন্ন বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া ঘাড় নাড়িল। ব্রাহ্মণ দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া বলিলেন, "ডাইনী।" তিনি আর কোন কথা না কহিয়া তীরে নাবিয়া কিছু আহারাদি কিনিবার জন্য বাজারের দিকে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি করিবেন; তিনি জানিতেন, অন্ততঃ দুই ঘণ্টার কম মাজিগণ আহারাদি করিয়া নৌকা খুলিতে পারিবে না।

এই জন্যই তাড়াতাড়ি না করিয়া তিনি হাটের মধ্যে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পল্লীগ্রামের হাট যেরূপ হয়,—এ হাট ও সেই রূপ। এক স্থানে মাছ,—অন্য স্থানে লাউ কুমড়া কলা বেগুন ঝিংয়া,—এক দিকে সারি সারি মনোহারির দোকান;—অন্য দিকে স্থানে স্থানে চাউলের স্তূপ,— এক পার্শ্বে কাপড় গামছা;—রামরূপ শর্ম্মা এই সকল দেখিতে দেখিতে অবশেষে এক দোকানে উপস্থিত হইলেন,—তথায় বসিয়া চিনি, চূড়া, বাতাসা,— কিছু সন্দেশ ক্রয় করিলেন। তৎপরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে বাজারে দই দুধও পাওয়া যায়, এক খানা গোয়ালার দোকানও আছে। তিনি তাহার ক্রীত দ্রব্যাদি উত্তরীয়ে বাঁধিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাজারের প্রান্ত ভাগে গোয়াল বাড়ী পাইলেন,—তখন সেখান হইতে এক ভাড় দই কিনিয়া নৌকার দিকে ফিরিলেন।

নৌকায় ফিরিতে তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছিল,—কিন্তু

মাজিরা র াধিতেছিল,—তাহাদের রন্ধনের কোন চিহ্ন নাই। সারি সারি অসংখ্য নৌকা বাঁধা রহিয়াছে,—কেবল তাঁহারই নৌকা নাই!

নিশ্চয়ই তাঁহার ভুল হইয়াছে,—তিনি ভুল ক্রমে অপর দিকে আসিয়া পড়িয়াছেন,—নিশ্চয়ই নৌকা বাজারের অপর দিকে আছে,—তিনি সত্বর পদে সেই দিকে ছুটিলেন। বাজারের অপর দিকে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও নৌকা নাই। না,—তাঁহার ভুল হয় নাই, নৌকা নিশ্চয়ই অপর দিকে বাঁধা ছিল। নিকটে এক খানা নৌকার দাঁড়িগণ রন্ধন করিতেছিল, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে যে নৌকা একটু আগে বাঁধিয়াছিল,—সে খানা কোথায় গেল জান?"

তাহারা বলিল, "কই, এখানে আজ আর কোন নৌকা আসেনি।—আমরা কাল রাত্রি থেকে আছি,—আসিলে দেখিতে পাইতাম।"

ব্রাহ্মণ কোন কথা না কহিয়া নদীর তীরে তীরে চলিলেন।—যদি কোন কারণে মাজিগণ অন্য কোন ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া থাকে,—তিনি সেই অসংখ্য নৌকার প্রত্যেক খানি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন,—ক্রমে আবার সেই পূর্ব্ব স্থানে আসিলেন,—কিন্তু কোথায়ও তাঁহার নৌকা নাই। নৌকা যেন বাতাসে মিলিয়া গিয়াছে! তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই বিদেশে অপরিচিত স্থানে তিনি নিঃসম্বল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অসহায়।

এ রূপ বিপদে এ ত্রিসংসারে আর কেহ কখন পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। রায়গ্রামের বাজার দেশের মধ্যে হইলেও রামরূপ শর্ম্মার পৈত্রিক ভিটা সুন্দরপুর হইতে প্রায় এক দিনের পথ; বিশেষতঃ এই দুই বৎসর গরিব ব্রাহ্মণ দেশ ছাড়া;—দেশ হইতে বিতাড়িত;—তিনি রায়গ্রামের নাম অবশ্যই অবগত ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে আর কখনও রায়গ্রামে আইসেন নাই। এ গ্রামের কাহাকেও চিনিতেন না,—তাঁহাকেও কেহ চিনিত না; সুতরাং সহসা তিনি তাঁহার নৌকা হারাইয়া যে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

প্রায় দশ মিনিট ব্রাহ্মণ স্তম্ভিতপ্রায় কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নদীতীরে

বৃক্ষনিম্নে বসিয়া রহিলেন,—সকলই তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিকটে হাটে শত শত লোক কেনা বেচা লইয়া কোলাহল করিতেছে,—সম্মুখে নদী বক্ষে ডিঙ্গা পানসি, ডোংগা, ভড়, পালোয়ারি নৌকার উপর দাঁড়ি মাঝিগণ কেহ রন্ধনে নিযুক্ত, কেহ মাল নাবাইতেছে, কেহ মাল তুলিতেছে। ছোট ছোট নৌকাগুলি,—বিশেষতঃ জেলে ডিঙ্গাগুলি—লৌহ শৃঙ্খলে পরস্পরে বদ্ধ থাকিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে—চারিদিকেই গোল,—হাটুরে গোল,—কিন্তু হতভাগ্য রামরূপ শর্ম্মার কর্ণে ইহার কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না। বিদেশ বিভুঁই—কন্যাপ্রদত্ত নোটের তাড়া তাঁহার একমাত্র ক্যাম্বিস ব্যাগের মধ্যে ছিল,—তাহাও গিয়াছে;—দুই চারিখানি বস্ত্রাদি যাহা আনিয়াছিলেন, তাহাও নৌকায় ছিল। তিনি এক-বস্ত্র—উত্তরীয় খানিতে চূড়াদি বাঁধা রহিয়াছে। সম্মুখে দধি ভাণ্ড,—এ অবস্থায় কিরূপে কোথায় যাইবেন?

কন্যার ব্যবহারে তিনি প্রীত ছিলেন না। তিনি সরল প্রাণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,—এত গোলযোগ বুঝিতে পারেন না। দুষ্ট জমিদার তাঁহার দুইটী সুন্দরী কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল,—সে অত্যাচারের যাতনা তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—সহসা কন্যা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘোর রহস্যজাল বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে চোক ঢাকা বলদের ন্যায় ঘুরাইয়া এই অপরিচিত স্থানে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তিনি মূর্খ নহেন,—তিনি এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে সে তাহার শ্বশুর বাড়ীর নিকট আসিয়া যে পালাইবে, তাহা সে পূর্ব্ব হইতে বেশ জানিত;—তাঁহাকে কেবল তাহার খেলার পুতুলের ন্যায় করিয়াছে। এত টাকাই বা সে কোথায় পাইল? কাহার সহিত,—কাহার সাহায্যে,—সে এই সকল করিতেছে, আবার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, "বাবা ভাবিও না?" ভাবিও না?—এরূপ ব্যাপারে ভাবিবে না, এরূপ লোক জগতে কেহ কি থাকিতে পারে? জগতে এরূপ সম্ভাবনা কি কোনক্রমে আছে?

তাহার পর শাঁওতালনী? এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এই স্ত্রীলোক আদৌ পাগল নহে,—নিশ্চয়ই কোন ডাকাত দলের চর। কোন গতিকে তাঁহার দুই মেয়েরই সন্ধান রাখিয়াছিল,—ডাকাতগণ সর্ব্বদাই এরূপ সন্ধান রাখে,—নতুবা ডাকাতি রাহাজানি করিবে কিরূপে?

তাঁহার কন্যা তাঁহাকে যে এক তাড়া নোট দিয়া গিয়াছিল,—তাহারও

সন্ধান ডাকাতগণ রাখিয়াছিল,—এই বদমাইস ডাইনীর সাহায্যে সেই নোট-গুলি এখন কৌশলে চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়াছে।

তবে দাঁড়িগণ,—তাহাদের উপর তাঁহার একদিনের জন্যও সন্দেহ হয় নাই। তিনি কন্যা সহ এতদিন তাহাদের নৌকায় ছিলেন,—কই এক দিনের জন্যও তো তাহাদের উপর সন্দেহ করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণ পান নাই।—তিনি গাধা, তাহাই সন্দেহ করেন নাই,—এখন স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে তাহারাও এই ডাকাত দলের লোক। না হইলে, তিনি ক্ষণিকের জন্য নৌকা ছাড়িয়া বাজারে যাইবামাত্র তাহারা এই ডাইনীর কথায় তাঁহাকে এই বিদেশে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পলাইবে কেন?

তাঁহার আপত্তি সত্বেও রন্ধনের জন্য এইখানে নৌকা বাঁধিয়া তীরে রাঁধিতে যাওয়া সমস্তই তাহাদের কাংস্থজি ভিন্ন আর কিছুই নহে।—এই গাছ তলায় তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছে, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া হাটে গিয়াছিলেন। অথচ বৃক্ষ নিম্নে রন্ধনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই? সংসার কি এমনই ভয়ানক স্থান হইয়াছে!

ব্রাহ্মণ হতাশভাবে সেই নদী তটে বসিয়া এইরূপ কতরূপ ভাবিতে ছিলেন,—সহসা তাঁহার মনে যে কথা উদিত হইল, তাহাতে তিনি দুই হস্তে তাঁহার বুক চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বোধ হইল কে যেন সহসা তাঁহার হৃদয়ে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করিল। তবে কি উষা,—তাঁহার এত ভালবাসার কন্যা,—শেষে ডাকাতের অনুষঙ্গিনী হইয়াছে,—হা ভগবান্!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নিমাই খুড়ো।

"ঠাকুর মহাশয় যে?"

কে পশ্চাত হইতে এই কথা বলিল।—রামরূপ শর্ম্মার চমক ভাঙ্গিল,—তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন, এক অতি কৃশ দীর্ঘাকার ব্যক্তি দাতন কাষ্ঠে দন্ত মার্জ্জন করিতেছে। এই লোকের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। অতি দীর্ঘ,—বোধ হয় চারি সাড়ে চারি হাতের কম নহে। ব্রাহ্মণ এরূপ দীর্ঘ লোক আর কখনও দেখেন নাই,—তাহার উপর এত কৃশ লোকও তাঁহার চক্ষে আর কখনও পড়ে নাই,—অথচ মুখে অতি দীর্ঘ গোঁপ—চক্ষু দুইটী সম্পূর্ণ গোল,—সেই চক্ষু হইতে এক অমানুষিক তেজ নির্গত

হইতেছে। পরিধান তসরের ধুতি! রামরূপ শর্ম্মা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতপ্রায় এই অত্যদ্ভুত লোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

একটু পূর্ব্বে তেঁতুল গাছে আর এক অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন,—সে রূপ স্ত্রীলোকও তিনি জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। ডাইনী শাঁওতালনীর ন্যায় মানব মূর্ত্তি আর কখনও তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই,—আবার এই অপরূপ মূর্ত্তি! এ সমস্তই স্বপ্ন,—হয়তো তিনি নৌকায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তাহাই ঠিক। তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

সেই মূর্ত্তি আবার বলিল, "ঠাকুর মহাশয় যে?"

না—এ স্বপ্ন নয়,—মনে মনে এই কথা বলিয়া বিঘূর্ণিত মস্তক ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই লোকের দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন, "আমি পাগল নই,—আমি মূর্খ নই,—একটু শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছি,—একটু ধর্ম্মালোচনাও আছে। বিপদে পড়িয়াছি বটে,—সে সমস্তই নিয়তি,—তবে ভয় পাইব কেন!"

তিনি হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিয়া সুদৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আপনি কে,—আপনাকে আমি চিনি না।"

সেই ব্যক্তি তাহার বিস্তৃত মুখ ব্যাদন করিয়া, দুই পাটী সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, তুমি চেন না—আমি চিনি! আমার নাম নিমাই গোঁসাই, লোকে আমায় নিমাই খুড়ো বলে ডাকে।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "আমি তোমায় চিনি না,—জীবনে কখনও তোমায় দেখি নাই।"

সে বলিল, "সে কথাটা কি ঠিক হলো, ঠাকুর মহাশয়? তা হলে তোমায় আমি চিনলেম কেমন করে?"

"আমার নাম কি তুমি জান?"

"হা, হা, হা!—নাম না জান্‌লে চিনলেম কেমন করে?"

"বাপু, হাসিবার এর মধ্যে কি দেখ্‌লে—আমার নাম কি বল শুনি,—আমায় নিতান্ত মূর্খ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাওর কর না।"

"হা, হা, হা!—কে বলে তা।"

"আবার হাসি!—হাসিবার কি দেখ্‌চ বাপু—বিরক্ত কর না,—নিজের কাজে যাও।"

"কাজেই তোমার কাছে এসেছি। রামরূপ শর্ম্মা,—তুমিও ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ। সংসারে বিপদাপদ সকলেরই আছে।"

এই অপরিচিত লোকের মুখে তাঁহার নাম শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত প্রায় হইলেন। এ কি মায়া! এই লোককে জীবনে তিনি কখনও দেখিয়াছেন কি না তাহা সহস্র চেষ্টায়ও তিনি মনে করিতে পারিলেন না। এ জীবনে তিনি কখনও এই রায়গ্রামে আইসেন নাই,—অথচ এই অপরিচিত অদ্ভুত চেহারার লোক তাঁহাকে চিনে,—তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে,—এ সব কি? ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—আর দুই একটা এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি সত্য সত্যই উন্মাদ হইয়া যাইবেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি আমায় চিনিলে কিরূপে?"

সে আবার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "সুন্দরপুরের রামরূপ শর্ম্মা,—তোমায় চেনে না কে?"

"আমি গরিব ব্রাহ্মণ,—অনেক দিন সুন্দরপুর ছাড়া,—আমায় কে চিনিবে?"

"অনেকে চেনে।"

"তুমি হয়তো কোথাও আমায় দেখিয়া থাকিবে,—কিন্তু আমি যে তোমায় জীবনে কোথাও দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে পড়ে না। তুমি কি বিপদাপন্ন গরিব ব্রাহ্মণ পাইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতেছ।"

"দোহাই ধর্ম্ম,—আমি উপহাস বিদ্রূপ করিতেছি না। তবে ইহাও স্বীকার করি, নিমাই খুড়োকে সকলেই রসিক লোক বলে জানে।"

"যাই হোক,—আমাকে বিরক্ত করিও না।"

"ঠাকুর, কথা কইলেই বিরক্ত করা হয় কি?"

"তবে বল, তুমি কোথায় আমাকে দেখেছ?"

"কেন, সুন্দরপুরে।"

ব্রাহ্মণ কিয়ৎক্ষণ লোকটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—কিন্তু ইহাকে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া তাহার তাহা বোধ হইল না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না,—আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই।"

গোঁসাই বাবু বা নিমাই খুড়ো বলিল, "কাজেই—কাজেই।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কথার মানে কি?"

গোঁসাই বলিল, "এ কথার মানে,—আমি তোমার বেয়াই।"

সরসীর অদৃষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

একটী রক্তবর্ণ উষার মনোরমার পাপপঙ্কিল দেহ পূতপ্রসন্ন সলিলা জাহ্নবীর জলে মিশাইয়া গেল। এমনি করিয়া মানুষ যায়। এমনি করিয়া মানুষ স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে। সতীত্বই রমণীর শ্রেষ্ঠভূষণ অমূল্যধন—সার-ধর্ম্ম। তাই কবি বলিয়াছেন,—

সতীত্ব সোণার নিধি বিধি দত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমনি রতন॥

যাহার হৃদয় গভীর কলঙ্কে কলঙ্কিত, তাহার আর বাঁচিয়া সুখ কি? পৃথিবীর পাপভার বাড়াইয়া কি ফল? তাই আজ সুরধনীর জলে পাপদেহ বিসর্জ্জন করিয়া মনোরমা তার কলঙ্কিত জীবন পবিত্র করিল।

* * * * *

বসন্তকুমার কন্যার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। সংসারে আসিয়া কবে যে সরসী মাতার স্নেহোৎসঙ্গ—হইতে বিচ্যুত হইয়া পিতৃস্বসার হাতে পড়িয়াছিল তাহা তাহার মনে নাই। আজ সেই স্নেহময়ী পিসীমাতাও তাহাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গেল। সরসীর জীবনটা বড় নীরব, নির্জ্জন ভাবে চলিতে লাগিল। প্রভাতগুলা কত শুষ্ক, নীরস—রৌদ্রতপ্ত, বিজন মধ্যাহ্নগুলা কত কর্ম্মহীন, অর্থহীন, সন্ধ্যাগুলা কত বিষন্ন, অশ্রুময়—আর নিদ্রাহীন, রাত্রিগুলা কত দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইল।

উপর্য্যুপরি দুই তিনটী শোক পাইয়া বসন্তকুমারের হৃদয় পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গেল। দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীরে অতি ভীষণ কাশরোগ দেখা দিল। ক্রমান্বয়ে দুইতিন মাস ভুগিয়া দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা বড় খারাপ হইল। প্রতিবেশীরা দেখিতে আসিলে তিনি অতি ক্ষীণস্বরে তাহাদের বলিলেন। আমি অনেক আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায়—চঞ্চল মানবজীবনে, মানুষের কত আশা, কত সাধ, কতও ভাবী সুখের কল্পনা আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে ফুরাইয়া যায়; কত ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে। সরসী রহিলতাকে একা রাখিয়া

আমি চলিলাম। এ সংসারে আপন বলিতে তার আর কেহই নাই। তোমরাই তার অভিভাবক। দেখ যেন সে পবিত্র চিত্তে এ জীবন শেষ করিতে পারে।" শেষ কথাগুলি সরসীর হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল, তার সুপ্ত, জীর্ণ হৃদয়-তন্ত্রী এক অভিনব সুরে বাজিয়া উঠিল। অতীতের অস্ফুটালোক ভেদ করিয়া এক মধুময় স্মৃতি স্বপ্নের ন্যায় আসিয়া তাহাকে পাগল করিল। সরসী মনে মনে বলিল 'প্রাণাধিক, হৃদয় সর্ব্বস্ব। তোমাকে ভুলিব, এজীবনে ত নয়! এক মধু-যামিনীতে সকৃৎ তোমাকে দেখিয়াছিলাম। সে রাত্রে যে মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা জন্মজন্মান্তরেও মুছিতে পারিব না। যার স্মৃতি আমার হৃদয়ে অহরহ জ্বলিতেছে, যার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়ের অতি গভীর অন্তস্তলে রাখিয়া গোপনে পূজা করি, তাহাকে ভুলিব, এ নিষ্ঠুর বানী পিতা কেন বলিলে! সরসীর চোকে জল আসিল। বস্ত্রাঞ্চলে সে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

ক্রমে সন্ধ্যাসুন্দরী ধীরে ধীরে একটি উজ্জলতারার টিপ্ পরিয়া ধরাতলে নামিয়া আসিলেন। দেবায়তনে শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল। ভৈরবীর মন্দিরে কাল ভৈরবীর সন্ধ্যা আরতি আরম্ভ হইল। প্রতিবেশীরা পূজা বন্দনাদি করিতে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। সরসী একাকী পিতৃপদপ্রান্তে বসিয়া পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি রোগীর অবস্থা একইরূপ রহিল। নিশাবসানে শ্বাস উঠিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া অনেক রকম ঔষধ দিল, কিন্তু কিছুই গলাধঃকরণ হইল না। সরসী কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনেও পাষাণ কালীর পাষাণ হৃদয় গলিল না, পিতারও জীবন রক্ষা হইল না।

শরতের একটী পীত-রৌদ্র সায়াহ্নে বসন্তকুমারের প্রাণ-পক্ষী—দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া মুক্ত আকাশে উড়িয়া গেল। প্রতিবেশীরা শবদেহ শ্মশান-সৈকতে লইয়া গেল।

* * * * *

ধিকি-ধিকি চিতা জ্বলিল। গমনপরায়ণ সূর্য্যের শেষ রশ্মি আসিয়া তাহাতে চুম্বন করিল। সরসীর অবশিষ্ট সংসার-বন্দন—অদৃষ্টের শেষ সূত্রটীও বুঝি তাহার সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইল। দুঃখের মহাসমুদ্রে ভাসমান সরসীর জীবন পোতের একমাত্র পরিচালক, মঙ্গল কিরণবর্ষী ধ্রুবনক্ষত্র—তাহাও আজ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। পিতৃ মাতৃহীনা সরসী কেবল প্রতিবেশিনীদের হাত ধরিয়া অসহায় অবস্থায় সংসার পথে দাঁড়াইল।

(৮)

"ওই আসে নিতি নিতি, সংসার-যাতনা ভীতি,
দীন জনে দয়া করি' দেমা পদাশ্রয় ;
সহেনা হৃদয় আর বিভীষিকা অভিনয়।"

সহৃদয় পাঠক! একবার এই বিপন্না, নিঃসহায়া, মাতৃশোকবিহ্বলা, পিতৃশোক বিধুরা বালিকার সরল সুন্দর, শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানির দিকে তাকাইয়া দেখ! একবার সেই হিমহতা জল নলিনীর ন্যায় পবিত্র, আকর্ণবিশ্রান্ত, উজ্জ্বল, সজল নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সেই সরলতার ও পবিত্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি শরতের শশলাঞ্জনের শুভ্র জ্যোৎস্না, বসন্তের মৃদু মারুত, বিহগের ললিতকূজন, পদ্মের কোমল মৃণাল, শিশুর অমিয় হাসির সমবায়ে নির্ম্মিত—সেই সোহাগমাখা, প্রীতি পুত্তলিকারদিকে একবার চাহিয়া দেখ! বসন্ত-কুমারের নন্দনকাননে আজ একটা প্রচণ্ড শিরকোর বহিয়া গিয়াছে। আর সেই বিষ-বায়ুতে সরসী বৃন্তচ্যুত কুসুম কলিকাবৎ শুকাইয়া গিয়াছে।

* * * * *

বসন্তকুমারের মৃত্যুর ঠিক দুইমাস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সরসী 'মোহানার' তীরে গেল। তখন আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত, উজ্জ্বল ও মধুর এবং এবং সেই পবিত্র সময়টী যেন শ্বাসাবরুদ্ধ ধ্যান নিমগ্না যোগিনীর মত শান্ত। গগনপটে অমল-ধবল-জ্যোতি চন্দ্র বিরাজমান, শুভ্রজ্যোৎস্না শ্যামল তরুপরি কুসুমে কুসুমে, দোদুল্যমান লতিকা-অঙ্গে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বর্গের শোভা খুলিয়া গিয়াছে। সে জ্যোৎস্নাতরঙ্গে মোহানার শ্বেতশতদল ও ফুটানামুখ কুমুদ কহ্লার ভাসিতেছে। নির্ম্মল বারিতে শুভ্রকুসুমের শুভ্র হাস্য দেখিয়া প্রাণ আন্দোলিত হয়।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যখন সরসী প্রকৃতির এই নির্ম্মল মন্দিরে, 'মোহানার' তীরে গিয়া বসিল তখন তার ভারের কতক লাঘব হইল। সেই শশীকরোজ্জ্বল নিশীথে নব দূর্ব্বাদলের উপর—শয়ন করিয়া সরসী একবার উপরে চাহিয়া দেখিল, নীলাকাশের অনন্ত নীলিমা ভেদ করিয়া কোটী কোটী জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশের উপর—আকাশ, নক্ষত্রের উপর নক্ষত্র—সীমা নাই, অন্ত নাই। সেই চন্দ্রকরদীপ্ত আকাশের অনন্ত নীলিমা, তরঙ্গান্দোলিত মোহানার অপূর্ব্ব লীলা, তদুপরি কুসুমরাশির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া

প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সরসী চাহিয়া রহিল, তখন শৈশবের অনেক স্মৃতি হৃদয়ে জাগিল। শৈশবে জ্ঞানসঞ্চার কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত যাবতীয় স্মৃতি তিমিরাবগুণ্ঠিত নৈশ আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় বারম্বার তাহার তমসাচ্ছন্ন—হৃদয় মধ্যে চমকিত ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সরসীর সংজ্ঞা লোপ স্বপ্নাবেশে সরসী দেখিল শ্বেতমলয়জচর্চ্চিত বক্ষে, শ্বেতাম্বর পরিধায়ী এক জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহার শির-স্পর্শ করিয়া আশী-র্ব্বাদকরিতেছেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও স্বর্গীয় জ্যোতি বলিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইল। তাঁহার নয়নে নিমেষ নাই, দেহের ছায়া নাই, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তি সে অহরহ হৃদয়ে ধ্যান করিতেছে, যে মূর্ত্তি একবার মাত্র দেখিয়াও তাহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, সে মূর্ত্তি সরসী চিনিল। সদ্যচ্ছিন্ন পাদপের ন্যায় তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া, প্রেমপদ গদ গদ কণ্ঠে বলিল 'স্বামী, আমার ইহকাল পরকালের দেবতা! এতদিন পরে কি দাসী বলিয়া স্মরণ হইয়াছে। যদি এতদিন পরে দাসীকে মনে পড়েছে, তবে হতভাগিনীকে আর ফেলিয়া যাইও না। পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য পুঞ্জ ফলে তোমায় পাইয়াছি। যদি পাইয়াছি তবে তোমার পদ-সেবা হইতে আর আমায় বঞ্চিত করিও না।' তখন সরসীর স্বর্গত স্বামী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। সরসী দেখিল সজল জলদবর্ণ নীলকণ্ঠ পুচ্ছশিরে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার গ্রীবাদেশে কিঙ্কমালা, পরিধানে পীতবাস। আর সেই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে স্থির দামিনী সমরূপে ললনাকুল অবস্থান করিতেছে। এখানে নিত্য আনন্দ বিরাজিত, এখানে লোক নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ হিংসাদি কিছুই নাই। এখানে যে সমস্ত মহানুভব বাস করেন, তাঁহাদের চিত্ত নিত্যানন্দময়। দেখিয়া সরসীর প্রাণ ব্যাকুল হইল। সে আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল 'প্রভু! এই পাপ তাপ দগ্ধ পৃথিবী হইতে আমাকে তোমার ঐ জরামৃত্যুর অনতিক্রমণীয়, চিরসুখময় স্থানে লইয়া চল। আমি ঐ চির পুণ্যময় স্থানে যাইয়া মনের সাধে তোমার চরণ সেবিব।' এই বলিয়া সরসী—তার বাহুদ্বয় প্রসারণ করিল—অমনি দেব-মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইলেন। তখন শুক্লাষ্টমীর চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সরসী ত্রস্তপদে গৃহে ফিরিল। অবশিষ্ট রাত্রি সরসী অতি সুখেই কাটাইল। অদিতি নন্দিনী—ঊষা—অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া

ভুবন মোহন রূপে ভুবন ভুলাইয়া, সহাস্তআস্তে যখন ধীরে ধীরে অবনী তলে নামিয়া আসিলেন, তখন—সরসীর ঘুম ভাঙ্গিল।

আজ উষার কনক-কিরণ কি স্নিগ্ধ, কি প্রাণস্পর্শী! সরসী দেখিল আজ তাহার ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ খানি পারিজাতের সৌগন্ধ ছড়াইতেছে। যুথী—মল্লিকা আজ এক অনির্ব্বচনীয় সৌগন্ধ বিলাইতেছে। আজ তাবৎ বস্তুই যেন মাধুরী-মাখা। ধরণী এমন কমনীয় কনককুসুমরাশি কুন্তলে পরিয়া, এমন প্রীতিময় পল্লব হার বক্ষে ধরিয়া প্রাণ মন বিমোহিত করিতে পারে, সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করে নাই। সরোজের মৃত্যুর পর প্রকৃতিদেবী—যে একখানা সূক্ষ্ম পাঁশুটে বর্ণের ওড়্নায়—আপনার সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া ছিলেন আজ তাহা হঠাৎ অপসারিত করিলেন। এমন শ্যামল, সজীব, মনোহর পল্লবের পর পল্লবরাশি, এমন আনন্দময় তরুরাজির বক্ষে, এমন—আদরমাখা, এমন প্রীতি-মাখা, উজ্জ্বলকান্তি লজ্জাবতীলতা, এমন মধুর—হাস্যময়, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়, প্রসূন রাশির পর প্রসূন রাশি, সে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই। উষার আবির্ভাবে লোকমনমোহিনী—প্রকৃতি দেবীর এমন মৃদুল গম্ভীর, মধুমাখা সঙ্গীত; এমন সুমধুর ঐক্যতান ধ্বনি, কোকিলের ঝঙ্কার, পাপিয়ার তান, তটিনীর অস্ফুট কুল কুল রব, সমীরণের তর্ তর্ শব্দ, বিটপী—শ্রেণীর শর্ শর্ নিনাদ, এক সঙ্গে—এমন মধুর রবে মিশিয়া এমন—অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী উঠে-সরসী পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। আজ সরসীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে মন্দাকিনীর পুত-ধারা বহিয়াছে। সরসী আজ হাস্যমুখী।

আহারান্তে বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া সরসী শয়ন করিল। বৈকালে অতিশয় জ্বর হইল—সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া ঔষধা-দির ব্যবস্থা—করিয়া 'এখনই সব সারিয়া যাবে' এই আশ্বাস দিল। সরসী—একবার হাসিল—সে হাসি প্রাবৃটের মেঘাবগুণ্ঠিত গগন তলে চন্দ্রের ক্ষণিক ক্ষীণ আলোক সম্পাতের ন্যায়—একটু ক্ষীণ হাসি। ক্রমেই রোগিণীর অবস্থা—খারাপ হইল। সন্ধ্যার পুর্ব্বে সেই স্বর্ণপ্রতিমায়—কে যেন একটা গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিল। সোণার খাঁচা পড়িয়া রহিল—পাখী পলাইল।

সরসী চলিয়া গেল। কোথায় গেল, কে বলিতে পারে। কোন্ পাপে সেই পূতগন্ধী কুসুম মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়িল, বলিতে পারি না। শরতের এক চন্দ্র করজ্জ্বল সায়াহ্নে স্বামীর প্রেমময় মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া সরসী কোন্ এক অজ্ঞাত রাজ্যে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। সরসীর

মৃত শরীর শ্মশানে বাহিত হইল। চিতা জ্বলিল। সোণার প্রতিমা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শেষে একটা উদাস—শ্মশান-বায়ু আসিয়া সেই চিতা ভস্মের প্রত্যেক কণা—উড়াইয়া দিল।

(৯)

সরসীর মৃত্যুর পর প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমরা একদিন ফাল্গুন মাসের অতি প্রত্যুষে 'মোহানায়' গেলাম। সেদিন "হোলী"। পথ, ঘাট, বাট, সকলই লালে লাল। স্ত্রী পুরুষ, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক সকলেই আজ রঙে মাতিয়াছে। উদ্দাম প্রমদাগণের কপাল চ্যুত সিন্দুর রঞ্জিত চরণ স্পর্শে দশদিক্ সিন্দুরময় হইয়াছে। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে, হাসির খল খল রবে, নুপুরের সুমিষ্ট নিক্কণে আজ—প্রত্যেক হৃদয়ই প্রফুল্ল। কোথায় কাহারা গাহিতেছে 'দেখ্‌রে সারি দুনিয়া হায় রং বরং—আবার কোথাও বা 'রঙ্গিলা শ্যাম খেলে হোরী বিরজ মে' ইত্যাদি। এই মধুর স্বর-লহরী দিগ্‌-দিগন্তে—ভাসিয়া সুষুপ্তিমগ্ন, অসাড় বাঙালী—জীবন এক অভিনব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতেছে। উৎসব দেখিয়া হৃদয়ে এক অতুল—আনন্দ উপজিল। অতীতের অস্পষ্টালোক ভেদ করিয়া—এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাহাতে পাপ তাপ ময় মানব জীবনে সুবিমল শান্তি আসিল। ক্রমে উৎসব শেষ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে যেখানে আনন্দের উৎসব ছুটিয়াছিল, ক্রমে তথায় একটা ভয়ানক নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল।

তখন সূর্য্যদেব শেষ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচল চূড়াবলম্বী—হইলেন। শ্যামল তরুরাজি স্বর্ণাভা—ধারণ করিল। আমরা সরসীর ক্ষুদ্র গৃহখানি দেখিতে আসিলাম। আসিয়া কি দেখিলাম—দেখিলাম সেই কুসুম-লতা পরিবৃত, বঞ্জুল-বকুল-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটিরখানি অতি দীন ভাবে তাকাইয়া আছে। বৎসরের সুখ স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া অতি ম্লান ভাবে দাঁড়াইয়া আপনার—অবশিষ্ট দিন কয়টা গণিতেছে। আর প্রকৃতির কোমল দর্পন, 'মোহানা' আপনার সুবিস্তৃত স্বচ্ছ হৃদয়ে জীর্ণ গৃহখানির প্রতিবিম্ব ধারণ পূর্ব্বক মোহন বংশীধর ঘূচিত করিবার জন্যই যেন মধুর ভ্রমর-গুঞ্জন ধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতি যেমন সুন্দর, তেমনই সজীব। সূর্য্য তেমনি অস্ত যায়, আকাশে তেমনি চাঁদ ভাসে, নক্ষত্র তেমনি উঠে, প্রকৃতি তেমনি ঘুমায়, জগৎ যেমন চলিয়া থাকে তেমনি চলিতেছে। বিহগের কাকলী, সমীরণের প্রবাহ, প্রকৃতির স্তব-গাহিকা গিরি নির্ঝরিণীর কল্লোচ্ছ্বাস তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে,

কেবল সরসী নাই। সমস্ত দেখিয়া আমাদের হৃদয় উদাস হইয়া গেল, মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। পৃথিবীতে শুধু নিত্যকালব্যাপী সুদুঃসহ বিষাদের অভিনয় দেখিয়া মানব জীবন অনাস্থা জন্মিল। তখন পূর্ব্বকাশ উদ্ভাসিত করিয়া রাকাপতি উদয় গিরিতে দেখা দিলেন। আর কোথা হ'তে একটা বসন্তের উদাস চঞ্চল বায়ু আসিয়া গৃহখানি বেড়িয়া, সন্ সন্ শব্দে ঊর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। আমরাও ধীরে ধীরে 'মোহানা' ত্যাগ করিলাম।

শ্রীফণিভূষণ মিত্র।

আশানন্দ ঢেঁকি।

বিগত চৈত্রমাসের "অবসর" পত্রিকায় "বঙ্গবীর আশানন্দ ঢেঁকি" বিষয়ে পাঠ করিয়া সেকালের অনেক কথা মনে পড়িল। বৃদ্ধদিগের মুখে বাঙ্গলা দেশের যে গল্প শুনি, তাহা এখন উপকথা অপেক্ষাও মধুর, অথচ বর্ত্তমান যুগের ধারণার অতীত ধ্রুব সত্য। সোণার বাঙ্গলার সেই সুখ শান্তি-শৌর্য্য-সম্পদের দিনে লোকে মনেও আনিতে পারে নাই যে, সেই বাঙ্গলা এই বাঙ্গলায় পরিণত হইবে। তখন বাঙ্গলার গোলাভরা ধান ছিল, পুকুর ভরা জল ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল,—তখন দু' এক বৎসর ধান্য অজন্মায়ে গৃহে গৃহে এমন হাহাকার উঠিত না—পেটের জ্বালায় লোক মরিত না। তখন বাঙ্গলার খাদ্য ছিল, বাঙ্গালীর পেটে খাদ্য পরিপাক করিবার উপযুক্ত—ক্ষুধাও ছিল; সুতরাং বাঙ্গালীর দেহে বল ছিল, মনে স্ফূর্ত্তি ছিল, তখন বাঙ্গলার লোকে ম্যালেরিয়ার নামও জানিত না, কলেরা প্লেগে এখনকার মত লোক ক্ষয় হইত না; সুতরাং তখন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল, দেহে শক্তি ছিল, বাহুতে বল ছিল; তাই তখন বাঙ্গালীর লাঠিতে তখন কাজ হইত। আর আজ? আজ বাঙ্গলার দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না! যেরূপ দ্রুতগতিতে বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই সোণার বাঙ্গলা শ্মশানে পরিণত হইবে, অভাবের আগুন যেরূপ জ্বলিয়াছে তাহাতে—বোধ হয় সোনার বাঙ্গলা ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে! সে শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য বাঙ্গালীর বংশ থাকিবে না!

পুষ্টিকর খাদ্য বাঙ্গলা দেশে ক্রমেই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ধান, চাল, যব, গম প্রভৃতি বিদেশী বণিকবৃন্দের জাহাজে বোঝাই হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে, কসাই খানায় গোবংশ ধ্বংস হওয়ায় ঘৃত দুগ্ধাদি পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে না, পুষ্করিণী প্রভৃতি শুষ্ক হওয়ায় মৎস্যের পরিমাণও কমিতেছে; সুতরাং বাঙ্গালীর যে গুলি প্রধান খাদ্য তাহা ক্রমেই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। বাস্তবিকই—বাঙ্গালার বহু লোকেই পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, শাক ভাতে কোন প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইয়া দিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল খাদ্য হইতে শরীর পোষণ উপযোগী সারভাগ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাদ্বারা উপযুক্ত রূপ শরীর পোষণ দূরের কথা, শীঘ্রই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; তাই আজ ঘরে ঘরে ডিস্‌পেনসিয়ার রোগী। তার উপর ম্যালেরিয়া আছে! "অন্নাভাবে শীর্ণ, জ্বরে, জীর্ণ" অনেকেরই এখন প্লীহা যকৃত উদর পূর্ণ!

বঙ্গের বীরপুরুষ আশানন্দ ঢেঁকি যে সময়ের লোক, সে সময়ের সাধারণ বাঙ্গালীই এখনকার সাধারণ বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ছিল। অনেকেই ⁄৫ পাঁচসের দুধ খাইয়া পরিপাক করিতে পারিত এবং নিত্যই তাহা খাইত, অনেকেই বিশ ক্রোশ পথ অক্লেশে হাঁটিয়া যাইতে পারিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ও যে গল্প শুনি তাহা ও যেন উপকথা! কেহ আকণ্ঠ আহারের পর পাঁচ সের পায়স, কেহ পাঁচ সের মিষ্টান্ন, কেহ দু'হাঁড়ী ক্ষীর, কেহ এক খোলা দধি অক্লেশে উদরস্থ করিয়া পরিপাক করিতেন। যাহারা এইরূপ অধিক আহার করিতে পারিতেন, লোকে তাঁহাদিগের এক একটা উপাধি দিত। আমাদের গ্রামের কাশীনাথ শর্ম্মার উপাধি ছিল "ভিস্তি" পূর্ব্ব পুরুষের অত্যধিক আহারের গল্প শুনিয়া এখন অম্ল পীড়াগ্রস্থ আমরা তাঁহাদিগকে রাক্ষসের অবতার বলিয়া বোধ করি, আর তাঁহাদের লাঠির গল্প শুনিয়া "ষ্টিক" ধারী আমরা তাঁহাদিগকে অসুরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর দৈহিক বলের যে রূপ অবনতি ঘটিতেছে, তাহাতে বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসর পরে আমরাও উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইব।

পুরুষ পরম্পরায় বাঙ্গালীর বল কিরূপ কমিতেছে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ দু, একটি কথা বলিব। বাব্‌না পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তীর বয়স নব্বই বৎসরেরও অধিক হইয়াছে। তিনি আমার পিতামহের সমসাময়িক এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই বয়সেও

৫।৭ ক্রোশ পথ হাঁটিতে পারেন, ৩।৪ সের দুগ্ধ দৈনিক আহার করিয়া থাকেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যৌবনে খুব বলিষ্ঠ ছিলেন। আমার পিতামহের অসাধারণ শক্তির কথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি, বিশেষতঃ উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এখানে দু' একটি কথা লিখিত হইল।

আমার পিতামহের নাম রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সর্ব্বপ্রকারে দশ বার সের খাদ্য খাইয়া পরিপাক করিতে পারিতেন। তাঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল। তখনকার কালে "গোড়ো-গোয়ালা"গণ প্রসিদ্ধ লাঠি-য়াল ছিল। এজন্য আমার পিতামহকে লোকে "চাঁদ গোড়ো" বলিত। ফুলিয়া, বেলগড়িয়া অঞ্চলে "চাঁদ গোড়োর লাঠি" প্রসিদ্ধ ছিল। আমার পিতার সমবয়সী একজন বলেন, "বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের এক কিলে একটা ষাঁড় পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" তিনি অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগে পেষণ করিয়া তিসি হইতে তৈল বাহির করিতেন, মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিতেন। আমার পিতাও খুব বলবান ছিলেন। তিনি পাঁচমণ পাথর অক্লেশে উত্তোলন করিতেন। বাঙ্গলা ১২৬৬ সালে যখন জমিদারের সহিত গ্রামের ভদ্রলোকগণের জমিজমা লইয়া বিবাদ হয়, তখন জমিদারের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণ আমার পিতাকে লাঠি হস্তে আসিতে দেখিলেই বিবাদের স্থান পরিত্যাগ করিয়া কাছারীতে যাইয়া আশ্রয় লইত। জমিদার একজন খুব বলবান ও সাহসী লোককে আমিন নিযুক্ত করেন। আমিন বাবু কাছারীতে মুগুর ভাঁজিতেন, কুস্তি করিতেন, লাঠিয়ালদিগের সহিত লাঠি খেলিতেন এবং মুখে খুব আস্ফালন করিতেন। এক দিন ঐ আমিন লাঠিয়ালগণের সঙ্গে যখন গ্রামের দক্ষিণ মাঠে একজনের নাখরাজ জমি মাপিতে ছিলেন, তখন আমার পিতা ও আর একজন ভদ্রলোক লাঠিহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া জমি-দার পক্ষের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণকে প্রহারে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং ঐ আমিনকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় বিষ্ঠার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার গর্ব্বচূর্ণ করিয়া-ছিলেন। এই ঘটনার পর জমিদার প্রজাগণের জমিজমা মাপিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাকে দুই বৎসরের রাখিয়া পূর্ণ-যৌবনে আমার পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার বলবীর্য্যের কথা আমি এখন লোকের মুখে শুনি। আমার পিতার সমবয়স্ক অনেক লোক এখনও জীবিত

করেন। আমার পিতার একমাত্র পুত্র আমি। বাল্যকালে আমার শরীরও খুব হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল। আমার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন আমার উপনয়ন সংস্কার হয়। সেই সময়ে আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরলাল মুখোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড এইচ, এল, মুখার্জ্জি) মহাশয়ের আদেশে আমি ২॥• মণ ওজনের একখানা পাথর তুলিয়া ছিলাম। তখন আমার শরীরের বৃদ্ধি দেখিয়া সকলেই বলিত, আমি আমার পিতামহের মত বলবান হইব। কিন্তু হায়! এখন আমাকে দেখিলে, তাঁহাদের মত বীরপুরুষের বংশধর বলিয়া কেহ অনুমান করিতেও পারে না। কেন এমন হইল? আমার এগার বৎসর বয়সে কাল ম্যালেরিয়া আমার শরীরে আশ্রয় লইল, এবং আমার সমস্ত কৈশোর জীবনটা বসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিল। তারপর যখন প্লীহা যকৃতের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম, তখনও প্রতি বর্ষার শেষে জরাক্রান্ত হইয়া শীতের শেষ পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। সেই যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না। তথাপি পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা এবং শক্তি সামর্থ্য যাহা আছে, আমার ছেলেদের তাহাও হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এইরূপে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, বাঙ্গালী এইরূপে দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতেছে। ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর বংশ থাকিবে কি?

আশানন্দের সময়ে এবং পরবর্ত্তী বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় লাঠির আদর ছিল, লাঠিয়ালের কদর ছিল, যে ব্যক্তি লাঠি ধরিতে না পারিত, তাহাকে লোকে আত্মরক্ষায় অক্ষম বুঝিয়া ঘৃণা করিত। তারপর বাঙ্গালী যখন „বাবু" উপাধি ধারণ করিয়া পরিশ্রম বিমুখ হইয়া পড়িল, তখন লাঠির আদর কমিল, লাঠিয়ালের সম্মান নষ্ট হইল। এ বিষয়ের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে চাই। শ্যামাচরণ নামক একজন পশ্চিম প্রদেশীয় লোক আমাদের পাড়ায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। আমি, আমার একজন আত্মীয় ও একজন মুসলমান বালক, আমরা তিনজনে শ্যামাচরণের নিকট লাঠি খেলা ও কুস্তি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমরা সমবয়স্ক তিনজনে শ্যামাচরণের বাড়ীতে আমাদের স্বহস্ত প্রস্তুত "আখড়ায়" কুস্তি করিতাম ও লাঠির পেঁচ অভ্যাস করিতাম। শ্যামাচরণের শারীরিক বল অধিক ছিল না, কিন্তু সে একজন পাকা "খেলোয়ার" ছিল। তাহার কাছে খেলা শিক্ষা করিতে পারিলে এক্ষণে আমরাও "পাকা খেলোয়ার" বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম।

কিন্তু শুনিয়াছি গ্রামের কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্যামাচরণকে তিরস্কার করেন, এবং আমাদিগকে কুস্তি ও লাঠি খেলা শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা ভাবিতেন, এখনও অনেকে ভাবেন যে, ছেলে বেলা হইতে পাঠ মুখস্থ করিয়া চক্ষুর মাথা খাওয়া এবং বাবুত্বের খাতিরে শারীরিক শ্রম হইতে দূরে থাকিয়া শরীরটাকে একটা মাংস-পিণ্ডে পরিণত করাই ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। তাই যে সকল বালক বা যুবক অধিক আহার করিতে পারিত, তাহাদিগকে "পেটুক" এবং যাহারা দৌড় ঝাঁপ করিতে পারিত, তাহাদিগকে "চোয়াড়" বলা হইত। তাই সে সময়ে শ্যামাচরণকে "আখ্ড়া" তুলিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

স্বর্গীয় বীর আশানন্দের জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া, সেকাল ও একালের কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার তাঁহার কথাই বলি। বিগত ১২৯২ সালের "সাধারণী" পত্রিকায় এই ব্রাহ্মণবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। অবসরের লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক জ্ঞাতব্য কথা তাহাতে ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন যাহা পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা স্মরণ নাই এবং "সাধারণী"র সে সংখ্যাও যত্ন করিয়া রাখি নাই। আশানন্দের বলবীর্য্যের অনেক গল্প শান্তিপুর এবং শান্তিপুরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচলিত আছে। অনেকে হয় ত সেগুলিকে অতিরঞ্জিত বলিবেন। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। কেননা সাধারণতঃ পূর্ব্বের বাঙ্গালী এখনকার বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলবান থাকার কথা বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের পোষকতার জন্যই উপরে কয়েকটি কথা লিখিত হইল।

অবসরের লেখক শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ "রামনগরের লড়াই" জিনিষটাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন কেন তাহা বুঝিলাম না। আশানন্দের গল্প বলিতে হইলে এ উপাখ্যান পরিত্যজ্য নহে। এই লড়াইয়ের গল্পে আশানন্দের বলবীর্য্যের কথা, মাতৃভক্তির কথা, অসীম সাহসের কথা বিশেষরূপে অনুভব করা যায়; এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির উদয় হয়। তাই এখানে "রামনগরের লড়াইয়ের" বিবরণ লিখিত হইল।

শান্তিপুরের পশ্চিমে সূত্রগড় নামক স্থান বোধ হয় অনেক বাঙ্গালীরই পরিচিত। কেননা শান্তিপুর যেমন শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী প্রভুর জন্য ও বস্ত্র শিল্পের

কিন্তু হায়! উভয় স্থানেরই নাম আছে মাত্র! বিদেশী বস্ত্রের কল্যাণে শান্তিপুরে তাঁতির অন্ন হয় না, বিদেশী চিনির অনুগ্রহে শুক্রগড়ের চিনি-ব্যবসায়ীদিগেরও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। এই শুক্রেগড়ের গোয়ালারা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ছিল—বাঙ্গালার অনেকের "গোড়ো-গোয়ালার" নামে ভয় পাইত! শুনিয়াছি এই গোড়ো গোয়ালাদের সঙ্গে শান্তিপুর রামনগর পাড়ার লোকেদের প্রতি বৎসর একটা আপোষ লড়াই হইত। শান্তিপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে সবুজঘাসে ঢাকা বিস্তৃত মাঠ এই ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। এই লড়াই, আমোদ উপভোগ করিবার জন্ম আপোষে হইত বটে, কিন্তু প্রায় প্রতি বৎসরই ইহাতে দু' চারিটা খুন জখম হইত। বীর আশানন্দের বাসও শান্তিপুরের এই রামনগর পল্লীতে ছিল; সুতরাং তিনিও এই লড়াইয়ে যোগদান করিতেন। অন্যস্থানের বলবান লাঠিয়ালগণও কোন একদলে যোগদান করিয়া এই আসুরিক আমোদ উপভোগ করিতে আগমন করিত। সহস্র সহস্র দর্শক দূরে দাঁড়াইয়া এই লড়াই দর্শন করিত এবং উভয় পক্ষের জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিত। আশানন্দ এই লড়াইয়ে যোগদান করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কাহাকেও প্রহার করিতেন না, কেননা আশানন্দ জননী প্রথম হইতেই পুত্রকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন কোন পক্ষের লোককে প্রহার না করেন। বীরপুত্র মাতার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া ঢেঁকি হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। বীরবর উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন এবং উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত ইষ্টক, গোহাড়, গোমুণ্ড প্রভৃতি আপন পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়া আনন্দে লম্ফ প্রদান করিতেন। তিনি বিপুলবলে ঢেঁকি ঘুরাইয়া উভয় পক্ষের সকলকে এবং দর্শকগণকে চমৎকৃত করিতেন। শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে ধন্য ধন্য করিতেন। ইহাতেই তাঁহার অতুল আনন্দ ছিল। আশানন্দ এই লড়াইয়ে বিপন্নকে বুক দিয়া রক্ষা করিতেন এবং পরকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজে প্রহৃত হইতেন। শুনিয়াছি, যে বৎসর তিনি অল্প আঘাত প্রাপ্ত হইতেন, সে বৎসর বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। মাতা বঙ্গভূমি কি আর আশানন্দের মত সন্তান প্রসব করিবেন না?

অনেক দিন হইল ব্রাহ্মণবীর আশানন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লড়াই বন্ধ হইয়াছে, দুঃখ ফুরাইয়াছে—স্মৃতি জাগিতেছে! আমরাও আজ সেই পূর্ব্ব স্মৃতি বুকে করিয়া, বঙ্গের ব্রাহ্মণবীর আশানন্দের প্রসঙ্গ এবং তৎ-সাময়িক বৃত্তান্ত শেষ করিলাম।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গান।

(বাউল সুর।)

থাক্‌তে আলো আগে চল,
অন্ধকারে পথ পা'বে না
পলে পলে জীবন চলে,
গেলে সেত আর ফেরেনা!
ওযা' কর্‌তে হ'বে করাই ভাল,
বিলম্বে হয় বিঘ্ন নানা;
কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দেনা ভাই,
বসে বৃথা আর ভেবোনা!
আত্মরক্ষার মহামন্ত্র
দিবানিশি কর সাধনা;
ও ভাই, জন্ম ভূমির পথের ধূলায়
আপনাকে লুট্‌য়ে দেনা!
মায়ের স্নেহ ত্যাগ ক'রে ভাই,
রাক্ষসীর মায়ায় ভুলোনা;
সে তোর, মেদ মাংস রক্ত খা'বে,
নিয়ে যা'বে হাড় ক'খানা!
ভাইয়ের মায়া ত্যাগ ক'রে ভাই,
ভূতের সেবা আর ক'রোনা;
সে তোর, মুখের গরাস ভুলুয়ে নেবে,
কুহক দিয়ে কর্‌বে কানা!
আপনাকে আপনি রাখ
পরের কৃপা আর চেওনা;
সেবক শর্ম্মার প্রার্থনাটা,
চক্ষু মুদে পায় ঠেলোনা!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিকাডো।

জাপানের সম্রাটগণ 'মিকাডো' নামে অভিহিত। জাপানের বর্ত্তমান সম্রাটের নাম মাটসুইটো। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কার্য্য তৎপর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাটগণ অলস ছিলেন এবং বৃথা আমোদে কাল কাটাইতেন। বর্ত্তমান সম্রাট প্রাতে ছয়টার সময় উঠেন এবং প্রত্যহ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন। ঘোড়ায় চড়িতে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাঁহার আস্তাবলে নানাদেশীয় তিন হাজার উৎকৃষ্ট ঘোড়া আছে। বৎসরে ৪৫ লক্ষ টাকা তিনি ঘর খরচের জন্য লইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার খাস জমিদারীতে বিস্তর টাকা আয় আছে এবং পূর্ব্ব পুরুষ সঞ্চিত অগাধ সোণা রূপা ও মণি মুক্তায় তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাঁহার বাগাড়ম্বর নাই, পোষাক পরিচ্ছদের বাহার নাই,—খোস গল্প করিয়া কালাতিপাত করা নাই। পুস্তক এবং সংবাদ-পত্র পাঠে তাঁহার বড় অনুরাগ। পৃথিবীতে যত নরপতি আছেন, তন্মধ্যে জাপান-সম্রাট সর্ব্বাপেক্ষা কবিতা প্রিয়। তিনি স্বয়ং একজন সুকবি। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্নে ৩০।৩৫টা শ্লোক রচনা করেন। জাপানী সাহিত্যে ঐ সকল কবিতা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত একাদশ বৎসরে সম্রাট ৩৭০০০ শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

জাপানের সাম্রাজ্ঞী হারুকো সম্রাট মাটসুইটোর উপযুক্ত পত্নী। ইনি ও স্বামীর ন্যায় কবিতা প্রিয়া। ইনি বিস্তর শ্লোক রচনা করিয়াছেন, সে গুলি ও জাপানের সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আদৃত। সাম্রাজ্ঞী হারুকো, রাজ সভার কোন সম্ভ্রান্ত সভাসদের দুহিতা। ১৮৬৯ অব্দে সম্রাট মাটসুইটোর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। রমণী-সুলভ ললিত-গুণাবলীতে মহিষীর হৃদয় অলঙ্কৃত। চিকিৎসালয় সংস্থাপন, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি পরোপকার মূলক কার্য্যেও মহিষীর সমধিক অনুরাগ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "রেড্ ক্রশ" চিহ্ন ধারিণী মহিলামণ্ডলী শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে বিগত রুষ-জাপান সমরে আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মহিষীর একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা বিদ্যমান।—জাপানের সম্রাট দম্পতি একধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ষষ্ঠীর অনুকম্পালাভে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ সৌভাগ্য সর্ব্বদা সকল নরপতির অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না।

শ্রীমতী পঙ্কজকুমারী দেবী।

বন-ফুল।

(১)

শুন ওরে "বন-ফুল" কাহার আশায়
ফুটিয়া কানন মাঝে ছড়াইছ বাস।
ঢলিয়া পড়ি'ছ কভু সমীরণ গায়
কার তরে "বন-ফুল" এতই উল্লাস?

(২)

বাস করি একাকিণী এ গহন-বনে
কি হেতু সৌন্দর্য্য-রাশি করিয়া বিকাশ;
নাচিছ সতত তুমি সমীরণ সনে
কার তরে "বন-ফুল" এতই উল্লাস?

(৩)

কেনরে বনের ফুল তোমার অধরে
হাসির লহরী ছুটে থাকি বনবাস।
কেন বা যাপি'ছ দিন হসিত-অন্তরে
কার তরে "বন-ফুল" এতই উল্লাস?

(৪)

শুন ওরে "বন-ফুল" বিজন-বিপিনে
থাকিতে অন্তরে তব হয় নাকি ত্রাস?
পুলকে রহে'ছ মাতি নির্ভীক পরাণে
কার তরে "বন-ফুল" এতই উল্লাস?

(৫)

বুঝেছি যে হেতু ফুল আকুল পরাণে
রহে'ছ বিজন-বনে ত্যজিয়া সংসার।
প্রণয়ীর সাঙ্কেতিক থাকি গুপ্ত স্থানে
সতত বাসনা চিতে করিতে বিহার॥

(৬)

ঢল্ ঢলে মুখখানি পত্র আচ্ছাদনে
কভু বা ফেলি'ছ ঢাকি মুচকি হাসিয়া।
আবার মারি'ছ উঁকি তেরছ নয়নে
আবৃত আননখানি উন্মুক্ত করিয়া॥

(৭)

মনোমুগ্ধকর তব জীবন-যৌবন
দিতেছ ভাসায়ে কভু মলয় পবনে।
বায়ু ভরে ধীরে ধীরে করি সন্তরণ
ডুবিছ উঠিছ যেন প্রেমের তুফানে॥

(৮)

আপন সৌরভ-রাশি বিমল আকাশে
দিতেছ ছড়ায়ে ফেলি কিসের কারণ?
জানাতে বিপদ কথা প্রণয়ী-সকাশে
তাহে কি কুসুম কর গন্ধ বিকিরণ?

(৯)

অথবা অলির মন ভুলা'বার তরে
করিতেছ আমোদিত সাধের কানন?
পথশ্রান্তে ক্লান্তজনে শ্রান্তি নাশিবারে
সুস্নিগ্ধ-সৌরভ কিম্বা কর বিতরণ।

(১০)

কেন হেরি "বন-ফুল" সতত তোমার
নবীন জীবনে হেন প্রেমের উচ্ছ্বাস!
জানিনা অন্তরে কারে করিয়াছ সার
তার তরে "বন-ফুল" এতই উল্লাস॥

(১১)

যে সুখ ভুঞ্জিতে ফুল জনমের মত
আত্মীয় স্বজন সবে দে'ছ বিসর্জ্জন।
সে সুখ ত্বরায় হায়! হবে অস্তমিত;
যে দিন ফুরা'বে তব সাধের যৌবন॥

(১২)

চাহিবে না ফিরে কেহ আইলে সে'দিন
ঘৃণায় চলিয়া যা'বে চরণে ঠেলিয়া।
মধুকর অযতনে হইয়া মলিন,
বৃন্ত হ'তে ক্রমে তুমি পড়িবে ঝরিয়া॥

(১৩)

যদ্যপি কুসুম তব সংসার-আলয়ে
ফিরিয়া যাইতে পুনঃ হয়রে বাসনা!
ত্বরা চল মম সাথে যাইব লইয়ে
পাবে না সেথায় হেন বিরহ যাতনা॥

(১৪)

আদরিণী কামিনীর সাধের কুন্তলে
রাখিব সোহাগ-ভরে করিয়া যতন।
অথবা প্রেমময়ের চরণ যুগলে
প্রেমের আহুতি দিও সঁপিয়া জীবন॥

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সংবাদ।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাঁর প্রাচীন ভৃত্য সর্দ্দার খাঁ সে দিবস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আসিবার সময় গুর্খা সিপাহীর চপেটাঘাতে নাকি জর্জ্জরীত হইয়াছে।

জনরব যে, আরিচা থানার দারোগা আবদুল গফুরের বাড়ীতে সে দিবস ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা নাকি দারোগার পত্নীর অলঙ্কারাদি লইয়া গিয়াছে।

গিরিডি নামক স্থানে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহকে গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অলীক বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।
বাঁকুড়ায় নরেন্দ্র গোস্বামীদের "পারিবারিক উকীল" বাবু নগেন্দ্রলাল ঘোষের বাড়ীও পুলিশ খানাতল্লাসী করে নাই।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।
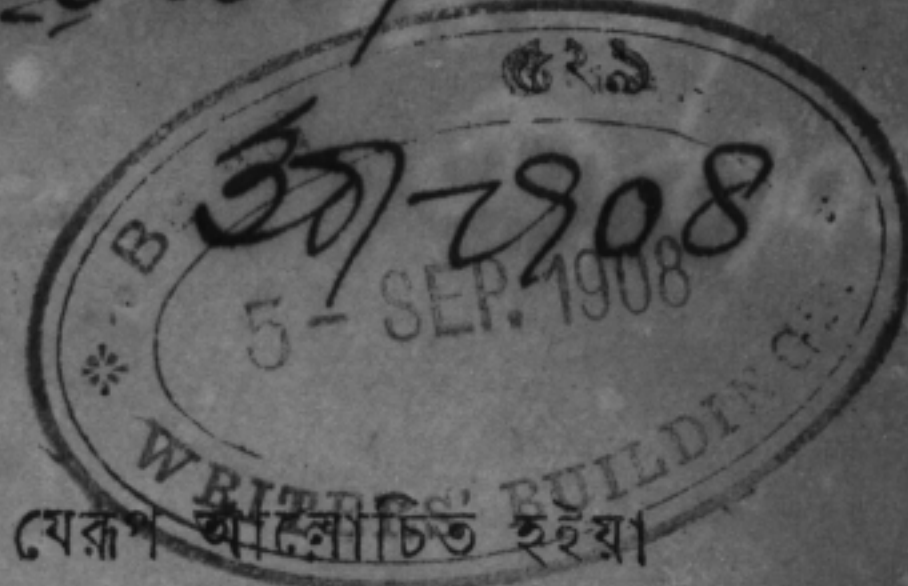
বিলাতের পার্লামেণ্টে এখন ভারত-কথা প্রায়শঃ যেরূপ আলোচিত হইয়া থাকে। ইংরাজ-শাসনের প্রথমাবস্থায় তদ্রূপ হইত না। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। বিলাতের জনসাধারণ ভারতের প্রতি দৃষ্টিহীন—তাঁহাদিগের নিকট ভারত যে তিমিরে—সেই তিমিরে।" পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে ভারতের কথা এরূপ ঘন ঘন আলোচিত না হইলে শাসকদিগের প্রতি পার্লামেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। কুশাসনের পরিচয় পাইলে শাসককে পার্লামেণ্ট বিচারাধীন করা হইত। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় শাসকেরও ইম্পিচমেণ্টে বা বিচার হইয়াছিল। ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপয়িতা লর্ড ক্লাইবের বিচার হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা আর সম্ভব নহে। লর্ড কর্জ্জনের বিচার হইবার আভাস পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়। ইহাতেই এদেশে শাসনের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা কি বুঝা যায় না?

লর্ড কর্জ্জন আমাদিগকে ছাড়েন নাই। বিলাতের শীতল সমীরণও তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন, ভারতের শাসন-কথা পার্লামেণ্টে আলোচিত হয় বলিয়া এবং বর্ত্তমান শাসননীতি কঠোরতাহীন বলিয়া ভারতে অশান্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। লর্ড কর্জ্জন, মিঃ রীজ প্রমুখ সাহেবদিগের ইচ্ছা কঠোর শাসনে ভারতবাসীকে নিষ্পিষ্ট করা। আমাদিগের ইহাতে দুঃখ নাই। 'কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা' দেওয়া অপেক্ষা একেবারে "শেষ" করা শ্রেয়ঃ। তবে দুঃখ, প্রভুরা কি লইয়া শাসন করিবেন।

চিদম্বরম্ পিলে এবং সুব্রহ্মণ্য শিব মান্দ্রাজের তিনেভেল্লীতে রাজদ্রোহ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দায়রার জজ পিলের যাবজ্জীবন এবং শিবের দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন। চিদম্বরম পিলে স্বদেশী ষ্টীমার চালাইয়া সাহেব ষ্টীমার কোম্পানীদের নাস্তানাবুদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বোধ হয় এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

দেশীয় শিল্পের বিনাশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেশীয় শিল্প বাণিজ্য নাশের প্রধান কারণ যে ইংরেজ বণিকগণের জুলুম, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ভেরেলষ্ট সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—এদেশে আসিয়া ইংরেজ বণিকেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করায় ও দেশীয় বণিকগণ উচ্চহারে শুল্কদানে বাধ্য হওয়ায় বঙ্গদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ইংরেজ বণিকগণ অসীম অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইংরেজ বণিকের গোমস্তারা কেবল দেশবাসীকে উৎপীড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা কোম্পানীর ভৃত্যগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশীয় রাজসরকারের আদেশও লঙ্ঘন করিত। দেশীয় রাজপুরুষেরা ইংরেজ বণিকের অত্যাচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর দল তাঁহা-দিগকে পর্য্যন্ত উৎপীড়িত করিতে ভীত হইত না। নবাব মীরকাশিম এই সকল অত্যাচারের প্রতিকারে কৃতসংকল্প হওয়ায়, ইংরেজেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন।

স্বয়ং নবাব মীরকাশিম কলিকাতায় গবর্ণরের নিকট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোম্পানীর ভৃত্যগণের বহুল অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিসিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়, নবাবের কর্ম্মচারীদিগের আদেশ ও রাজবিধানাদি লঙ্ঘন তাঁহাদের নিত্য কার্য্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ বণিকেরা এদেশে সোরা ক্রয়-বিক্রয়ের একাধিকার লাভ করিয়া-ছিলেন। একজন বণিক নবাবের ব্যবহারের জন্য সামান্য পরিমাণে সোরা ক্রয় করিয়াছিল। তাহার এই কার্য্যে সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া কোম্পানীর পাটনাস্থিত প্রতিনিধি মিঃ এলিস, নবাবের বণিককে বন্দী করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। দুইজন ইংরেজ সৈনিক পলাতক হওয়ায়, এলিস নবাবের মুঙ্গের স্থিত দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুসন্ধানের জন্য স্বীয় ভৃত্যদিগকে প্রেরণ করেন। যাঁহারা স্বয়ং নবাবের প্রতি এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিত না, তাহারা জনসমাজের উপর জুলুম আরম্ভ করিলে তাহার বেগ কিরূপ অপ্রতিহত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দুইখানি পত্রে উল্লিখিত দুইটী ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই অত্যাচারের প্রকৃতি সম্বন্ধে নবাব মীরকাশিমের একখানি পত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।—"ইংরেজ বণিকেরা এদেশবাসী প্রজা ও ব্যবসায়ীর গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক মাল উঠাইয়া লইয়া যায় এবং প্রকৃত মূল্যে চতুর্থাংশ মাত্র তাহাদিগকে প্রদান করে। পক্ষান্তরে রায়তদিগকে বিলাতী জিনিষ গছাইয়া দিয়া, নানাপ্রকার জোর জুলুমের দ্বারা এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা আদায় করে। আমার কর্ম্মচারীদিগকে ইহারা বিচার বা শাসনকার্য্য করিতে দেয় না। এইরূপ অত্যাচারে দেশে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে। আমি কোম্পানীর সহিত সন্ধির সর্ত্ত অদ্যাপি পালন করিতেছি; কিন্তু কোম্পানীর ভৃত্যেরা আমাকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে।"

সার্জ্জেণ্ট ব্রেগো নামক একজন শ্বেতাঙ্গ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—কোম্পানীর ভৃত্যেরা আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করে। কোম্পানীর জন্য কোনও দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইলে ইহারা গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া অধিবাসীদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাল খরিদ করিতে বাধ্য করে। কেহ কোম্পানীর ভৃত্যদিগের আদেশ পালনে অসম্মত বা অসমর্থ হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত বা তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, অধিবাসীরা ইংরেজবণিক ভিন্ন আর কাহারও মালের ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না—এইরূপ সর্ত্তেও তাহাদিগকে বাধ্য করিবার জন্য বল প্রযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর নামে কোম্পানীর ভৃত্যগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এইরূপ জোর জুলুম করিয়া যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহার পূর্ণ মূল্যও হতভাগ্য দেশবাসীদিগকে প্রদত্ত হয় না—কখনও কখনও আদৌ মূল্য দেওয়া হয় না। এইরূপ অত্যাচারের ফলে বাখরগঞ্জ জেলা ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। এখানকার বিখ্যাত হাট বাজারেও আর বেশী জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইংরেজ বণিকের ভৃত্যেরা অবাধে দরিদ্র লোকের উপর জুলুম করিতে ছাড়ে না। জমিদারেরা প্রজা রক্ষার চেষ্টা করিলে তাঁহাকেও বিপন্ন করিবার ভয় দেখান হয়। পূর্ব্বে সরকারী কাছারীতে, সাধারণে অভিযোগ করিয়া বিচার পাইত। ইংরেজ বণিকের গোমস্তাই বিচারকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক গোমস্তার ঘরেই আদালত বসিতেছে। গোমস্তারা বিচারকরূপে জমিদারদিগের বিরুদ্ধেও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। জমিদারদের ব্যবহারে কোম্পানীর

ক্ষতি হইতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে অকারণে টাকা আদায় করা হয়। গোমস্তার নিজের লোকেরা কোনও জিনিষ চুরি করিলেও জমিদারের লোকে করিয়াছে বলিয়া, ভয় দেখাইয়া জমিদারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইয়া থাকে!

কেবল যে বাখরগঞ্জেই এইরূপ অত্যাচার হইত, তাহা নহে। বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ ঘটিত। ঢাকার তদানীন্তন কলেক্টর মহম্মদ আলি ১৭৬২ অব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজ বণিকদিগের অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া কলিকাতার গবর্ণরের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতেও এই প্রকার অত্যাচারের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—কোম্পানীর ভৃত্যেরা ঢাকা ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে তামাক, তুলা, লৌহ প্রভৃতি পণ্য বাজার-দরের অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করে। সকল স্থলেই বলপূর্ব্বক মূল্য আদায় করা হয়। ফলে, এখানকার আড়তগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর লক্ষ্মীপুরস্থিত কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের বাসের জন্য বলপূর্ব্বক লোকের জমিজায়গা কাড়িয়া লয়, তাহার খাজনাও দেয় না। তাহারা সিপাহী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া অনেক গ্রামে গমনপূর্ব্বক অকারণে দাঙ্গাহাঙ্গামা করে। ইহারা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে যাহা পায়, তাহা বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করে। এইসকল জুলুমে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। প্রজারা ঘরে থাকিতে পায় না, মালগুজারী দিতে পারে না। স্থানে স্থানে ইংরেজ বণিকেরা হাট ও শিল্পশালা স্থাপন করিয়াছে এবং জাল সিপাহী পাঠাইয়া যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া আনিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে। ইহাদের জুলুমে হাট, ঘাট, পরগণা একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে।

উইলিয়ম বোল্টস নামক একজন ইংরেজ বণিক Consideration on Indian Affairs নামক গ্রন্থে এই অত্যাচারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আরও ভয়ানক। তিনি লিখিয়াছেন,—বঙ্গদেশে ইংরেজের বাণিজ্যকে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলি বলিয়া উল্লেখ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। বঙ্গদেশের প্রত্যেক তন্তুবায় ও শিল্পী এই অত্যাচারের কুফল ভোগ করিতেছে। দেশের প্রত্যেক শিল্প দ্রব্যই ইংরেজ বণিকেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ শিল্পীকে কত মাল কিরূপ মূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা ইংরেজেরাই স্বেচ্ছামত স্থির করিয়া দেয়। এজন্য দালাল, পাইকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে সিপাহীর সাহায্যে কোম্পানীর ভৃত্যদিগেব নিকট হাজির করা

হয় এবং মালের পরিমাণ, মূল্য ও মাল দিবার সময় সম্বন্ধে একটা দলিলে আপনাদিগের সুবিধামত সর্ত্ত লিখিয়া তাহাতে শিল্পীদিগের স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হয়। সে বিষয়ে শিল্পীর সম্মতির বা মতামতের অপেক্ষা করা হয় না। শিল্পীগণের হস্তে কিছু টাকা অগ্রিম বায়না বলিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। সে তাহা লইতে অস্বীকৃত হইলে তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কাছারীর সিপাহীরা চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়। অনেক শিল্পীকে অন্য কাহারও কাজ করিবে না এই সর্ত্তে বাধ্য করা হয়। এই সকল কার্য্যে কল্পনাতীত জুয়াচুরি খেলা হয়। প্রথমত যে দরে তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে তাহাই বাজারদর অপেক্ষা অল্প। তাহার উপর "যাচেনদার" বা বস্ত্র পরীক্ষকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া উৎকৃষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাতে হতভাগ্য তন্তুবায়দিগকে শতকরা ৪০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়। এই সকল জুয়াচুরির জন্য যে সকল তন্তুবায় এগ্রিমেণ্ট অনুসারে মাল যোগাইতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাত সমূহ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া ক্ষতি-পূরণ লওয়া হয়। রেশমশিল্পী নাগোরাড়াদিগের প্রতিও নানাপ্রকার ভীষণ জুলুম হইয়া থাকে। ব্যবসার পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদিগের নিষ্কৃতি ছিল না। পাছে কোম্পানীর লোকেরা ইহাদিগকে উৎপীড়নে জর্জ্জরিত করিয়া বস্ত্রবয়ন কার্য্যে বাধ্য করে, এই ভয়ে অনেক হতভাগ্য আপনাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া অক্ষম সাজিয়া বসিয়া থাকিত।

অপরের কথা কি বলিব, কোম্পানীর ডিরেক্টারেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে,—
We think vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a scene of the most tyraric and oppressive conduct that was ever known in any age or country.

ভৃত্যদিগের অনুষ্ঠিত এই সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা অবশ্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ভৃত্যদিগের দুর্নিবার অর্থলোভই যে ইহার একমাত্র কারণ, এ কথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, ভৃত্যদিগের অত্যাচার নিবৃত্ত হইলেও বঙ্গবাসী শিল্পীকুলের দুর্দৈব ঘুচিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চের আদেশপত্রে এখানকার কর্ম্মচারী-গণের প্রতি অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, বঙ্গের সমস্ত রেশম শিল্পীদিগকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। অতঃপর কেহ যাহাতে স্বগৃহে স্বাধীনভাবে পট্টবস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে গিয়া কার্য্য করিতে শিল্পীদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। যাহারা স্বাধীনভাবে রেশমশিল্পের ব্যবসায় করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া দমিত করিতে হইবে।

দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ অকথ্য অত্যাচারের ফলে এদেশের শিল্পবাণিজ্যের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরেজ বণিকেরা বৈধ প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে এই পাশববলের সাহায্যে এদেশের শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, বিদেশের ও এদেশবাসীর অপরিমেয় ধনসম্পত্তি অন্যায় পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরু-শিষ্য সংবাদ।

একদা তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় শিষ্য দেবদত্তকে বলিলেন,—'শোনহে বাপু তোমায় সেদিন যে গল্পটা বলবো বলেছিলাম আজ সেটা শুনে রাখ'। শিষ্য মনঃসংযোগ করিলে বাচস্পতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন। 'ত্রেতাযুগের মহাসমরের অবসান হইলে, ভগবান রামচন্দ্র তদনুজ লক্ষ্মণ ঠাকুর সমভিব্যাহারে সুবর্ণময়ী লঙ্কার বহির্ভাগে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দূর হইতে লঙ্কার সুশোভন দৃশ্য দর্শনে উভয়েই পরম প্রীত হইলেন। গগনস্পর্শী হেম-অট্টালিকার শিরদেশে নানাবর্ণের বিজয় পতাকা রক্ষকুলশ্রেষ্ঠ বিভীষণের নব-রাজ-অভিষেকের ঐশ্বর্য্য সূচনা করিতেছে, আর তমালতালীবনরাজি সুশোভিত কুটিল কুণ্ডলা বেলাভূমী লবণাম্বুরাশির ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে ধৌত হইয়া দূর হইতে চন্দ্রকলার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

লক্ষ্মণ ঈদৃশ সৌন্দর্য্যদর্শনে অধিকতর প্রীত হইয়া বলিলেন 'হে আর্য্যশ্রেষ্ঠ, এরূপ রমণীয় স্থান যে পৃথিবীর এরূপ বিজন নেপথ্যে লুকান ছিল তাও জানিতাম না। এখানে দিনকতক অবস্থান করিবার বাসনা হয়।'

রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া নীরবে লক্ষ্মণকে লইয়া এক নূতন পথে যাইতে লাগিলেন। উভয়ে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন

কতকগুলি কৃষক অদূরে হলকর্ষণ করিতেছে। তাহাদের পাদদেশ স্থূল লৌহ পাদুকা দ্বারা আবৃত ও তাহাদের মস্তকে একটী অগ্নিপাত্রে জলন্ত অঙ্গার সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। যখন মস্তকে অতিশয় তাপ অনুভূত হইতেছে তখন অতি সাবধানে অগ্নিপাত্র নামাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সেইভাবে কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে।

লক্ষ্মণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আর্য্য! কৃষকদের এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি, সবিশেষ অবগত আছেন? কেনই বা ইহারা লৌহ পাদুকা পরিধান করিয়া মস্তকে অগ্নিপাত্র সংরক্ষণ করিয়া হলচালনা করিতেছে'? রামচন্দ্র বলিলেন 'এখানে একরূপ কীট দৃষ্ট হয়, যাহার দংশনে এত তীব্র জ্বালা অনুভূত হইতে থাকে যে, তাহা নিতান্ত অসহনীয়। সেইজন্য ইহারা লৌহ পাদুকার দ্বারা কীট দংশন হইতে পাদদেশ রক্ষা করিতেছে। আর এখানে একরূপ মাংসাশী পক্ষী আছে যে তাহারা ছো মারিয়া মানুষকে আকাশে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু মস্তকে অগ্নিপাত্রের ভয়ে ইহাদের নিকট আর আসিতে পারে না। সেই জন্য ইহারা এত সাবধান হইয়া কার্য্য করিতেছে'।

লক্ষ্মণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কেন ইহারা এরূপ বিপদ্ সঙ্কুল স্থানে বাস করে বলিতে পারি না। লঙ্কায় অসংখ্য রমণীয় উর্ব্বর বাসোপযোগী স্থান রহিয়াছে, এস্থান ত্যাগ করিয়া সেখানে নিরাপদে বাস করিলেই ত পারে। ইহাদের এ মুর্খতার প্রয়োজন কি?"

রামচন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন 'ভাই রে এই স্থান এই অবোধ কৃষকদের জন্মভূমি। এখানকার প্রত্যেক তরুলতার সঙ্গে ইহারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। স্বর্গাদপী গরীয়সী জন্মভূমির স্নেহাঞ্চলছায়ায় থাকিয়াই ইহারা এতবড় হইয়াছে। এখানে কতশত যুগ ধরিয়া ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হল চালনা করিয়াছে, কত মধুময় অতীত ইহার প্রতি ধূলিকণায় মিশান রহিয়াছে, কত নীরব মহাশশ্মানের সন্ধ্যাপ্রদীপ আজ ইহাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। জন্মভূমির কণ্টকাকীর্ণ কীটদংষ্ট্র ভূমিতেও যে কত মাদকতা, লবণাম্বুরাশির লবণাক্ত জলে যে কত অমৃতস্রাবী, জন্মভূমির শ্রমলব্ধ অন্নও যে কত মধুর, অনলবর্ষী প্রচণ্ড মরুময় বাত্যায় যে কত সুশীতলতা, কত স্নিগ্ধতা তাহা এই অসভ্য জ্ঞানহীন কৃষকেরাই উপলব্ধি করিতেছে। ভাইরে একটা প্রকাণ্ড মায়ার সুদৃঢ় স্নেহাবরণই তাহাদের অন্ধ চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ইহাই তাহাদের মূর্খতার একমাত্র কারণ।'

লক্ষ্মণ ঠাকুর বুঝিতে পারিয়া, প্রেমার্দ্র অন্তঃকরণে দূর হইতে কৃষকদের নমস্কার করতঃ অগ্রজকে বলিলেন 'আর্য্য চলুন আমরা আজ চতুর্দ্দশ বর্ষ জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছি, আপনার কথায় এবং কৃষকদের ব্যবহারে অযোধ্যার জন্য প্রাণ বড়ই চঞ্চল হইয়াছে আমি যে লঙ্কায় কিছুদিন অবস্থানের কথা বলিতেছিলাম, সে বাসনা আমার আর নাই। দাসের সে ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

রামচন্দ্র হাসিয়া ভ্রাতার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এদিকে বাচস্পতি মহাশয় গল্প শেষ করিলে, শিষ্যদেবদত্ত বলিলেন 'পণ্ডিত মহাশয় এ গল্প যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেখিতেছি স্বদেশপ্রেমটা (Patriotism) একবারে ইংরাজদের একচেটিয়া নয়, আমাদের অতি প্রাচীন কালেও তাহার অস্তিত্ব ছিল দেখিতেছি। ইংরাজ সুসভ্য আলোক সম্পন্ন জাতি, তাহাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম আসিতেই পারে কিন্তু আমাদের অসভ্য চাষাদের মধ্যেও সেটা এত বলবতী দেখিয়া ধন্য হইলাম। আমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল।'

বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন (বাপু হে তোমার প্রথম কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, তোমরা ইংরাজী হরপে যাহা কিছু পড় তাহাই মনে কর অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের গল্পগুলার বেলায় তোমাদের সংশয় বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রবলা হইয়া উঠে। ইংরাজদের হ্বিসকের গল্প সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের গল্পগুলি 'আষাঢ়ে' বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এ গল্পটী তখনকার স্বদেশ প্রেমের একটা উজ্জ্বল আদর্শ, জগৎ সমক্ষে ধরিবার জন্যই যে কবি অসভ্য কৃষকদের হৃদয়ে এরূপ প্রেমের সঞ্চার করিলেন, বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ। বাস্তবিক তৎকালে এরূপ স্বদেশ প্রেমের। দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি বিদ্যমান ছিল। কবি না হয় সে আদর্শ আঁকিতে রংটা একটু গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাও তোমাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া রং ফলানর কথাটা অবান্তরে বলিয়া রাখিলাম। বাপু প্রাচীন গ্রন্থাদি একটু উল্‌টে পাল্‌টে তবে তর্ক করিতে আসিও, না পড়িয়া হিন্দু শাস্ত্রে পণ্ডিত সাজিতে যাইও না।

শিষ্য অতিশয় লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন। মনে করিলেন ভারতবর্ষে জন্মিয়া জন্ম সার্থক হইয়াছে অনন্তর ভক্তিউচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে গুরুপাদপদ্ম নিসৃত পূত ধূলিকণারঞ্জিন ললাটদেশে বিজয়চিহ্ন ধারণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-সগর্ব্বে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়।

রমণী রহস্য।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তগৃহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একদিন রামঅক্ষয় বাবু গলির পথে সত্বরপদে তাঁহার বাড়ী হইতে অন্তর্হৃত হইলেন। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলি দিয়া তিনি অবশেষে একটা বড় রাস্তায় পড়িলেন ;—চারিদিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলিলেন "ভাল বদমাইস লইয়াই কাজ হইয়াছে! পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াও চোরের মত বেড়াইতে হইতেছে! চাকুরির ঐটুকুই মজা। বোধ হয় বেটারা এবার আমার পেছন লইতে পারে নাই ;—একবারও তাহাদের দেখিতে পাইতেছি না সত্য, কিন্তু তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বেটারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। দেখা যাক,—কত দূর কি হয়।"

তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন,—মধ্যে মধ্যে পশ্চাত দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন,—পথে বহু লোক চলাচল করিতেছিল,—কিন্তু কেহ যে তাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহা বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না।

তিনি একটী বাড়ীর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—তৎপরে আবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যত লোক যাইতেছিল,—তাহাদের প্রত্যেকের মুখ ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন—সহসা তিনি নিমিষ মধ্যে পার্শ্বস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাড়ীটী ছোট,—উপরে দুইটী ঘর মাত্র আছে,—নিচেও দুইটী ঘর,—ঘোর অন্ধকার,—উঠানটী অতি ছোট—স্যাঁতসেঁতে,—কোন জন্মে সূর্য্যকিরণ এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনে আসিয়াছে কি না সন্দেহ! বাড়ীটীর তিন দিকেই বড় বড়

বাড়ী,—রাস্তার দিক ব্যতীত অন্য কোন দিক দিয়া আল ব' হাওয়া আসিবার উপায় ছিল না। রাস্তার দিকেও কেবল দুইটী মাত্র জানালা,—তাহাও বন্ধ,—ইহার জন্যই বাড়ীটী আরও অন্ধকার।

নিচের ঘরে বোধ হয় কেহ থাকে না,—সহসা দেখিলে বাড়ীতে যে কেহ বাস করে তাহা বোধ হয় না,—কিন্তু রামঅক্ষয় বাবু দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে আসিবামাত্র অন্ধকার ঘর হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল। সে একজন নাকে তিলক কাটা,—বৃহৎ টিকি যুক্ত দীর্ঘকায় উড়িয়া,—বয়স পঞ্চাশের কম নহে;—সে শীর্ণকায় হইলেও তাহার এই বয়সেও যে শরীরে অসীম বল আছে,—তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "গঙ্গারাম,—বাবু এসেছেন?"

গাঙ্গারাম বলিল, "হাঁ, অনেকক্ষণ এসেছেন,—উপরে বসে আছেন।

রামঅক্ষয় বাবু গঙ্গারামকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, উপরে চলিলেন। উপরের ঘর দুইটীও ছোট। অপেক্ষাকৃত আলো থাকিলেও অন্ধকার;—গৃহ নানা দ্রব্যে পূর্ণ,—দেখিলে কোন থিয়েটারের সাজঘর বলিয়া মনে হয়,—নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ, পরচুল, দাড়ি,—রং-বেরঙ্গের দ্রব্য,—প্রাচীরে বন্দুক, পিস্তল, ছোরা, বল্লম,—সন্ন্যাসীর ত্রিশূল, চিমটা,—এই গৃহমধ্যে কি যে নাই,—তাহা বলা যায় না। গৃহের কোনে একটা টেবিলের উপর নানাবিধ রং, তুলি প্রভৃতি রহিয়াছে,—টেবিলের সম্মুখে একখানি বড় আর্শী।

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহও এইরূপ নানা দ্রব্যে পূর্ণ। এই ঘরে একখানি তক্তপোষ আছে,—তাহাতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বিছানা,—নিম্নে একটা বড় গুড়গুড়ি রহিয়াছে। এই ঘরে তক্তপোষের পার্শ্বে দুইখানি পুরাণ চেয়ারও রহিয়াছে,—এঘরেও একটা বড় টেবিল আছে, টেবিলে নানা কাগজপত্র নানাবিধ পুস্তকে পূর্ণ।

খাটের উপর একটী যুবক বসিয়া আছেন।—তিনি খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে গুড়গুড়ির নল টানিতেছিলেন,—নিশ্চয়ই গঙ্গারাম সম্প্রতি তামাক দিয়া গিয়াছিল,—কারণ গভির ধূম অনর্গল নির্গত হইয়া ঘর পূর্ণ করিয়া ফেলিয়া ছিল। তিনি রামঅক্ষয় বাবুকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সত্বর কাগজ ও নল পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই যে!"

রাম অক্ষয় বাবু বলিলেন, "শুনিলাম অনেকক্ষণ এসেছ?"

"হাঁ—প্রায় এক ঘণ্টা। চিটিতে যেমন হুকুম ছিল।"

"আমার এখানে আসিতে একটু দেরি হইয়া পড়িয়াছে।"

তাহার পর তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সুশীল, এক যায়গায় একটু আগে তুমি হইয়াছিলাম।"

যুবক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি হইয়াছিলাম! সে কি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রেল গাড়ীতে।

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এটাও বুঝিতে পারিলে না? আমার নামটা সৌভাগ্য বশতই হউক আর দুর্ভাগ্য বশতই হউক,—অনেকে জানে;—হঠাৎ আমার নাম শুনিয়া ভয়ে লোকে কোন কথা বলিতে চাহে না,—তাহাই একটু আগে একজনের কাছে আমি আমার নাম সুশীল বলিয়াছিলাম। এখন বুঝিলে তুমি হইয়াছিলাম কি রূপে?"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ—লোকটা কে?"

"রামরূপ শর্ম্মা।—খুব সম্ভব সরল ব্রাহ্মণ রামরূপ শর্ম্মা ডিটেক্‌টিভ রাম-অক্ষয়ের নাম কোন জন্মে শুনেন নাই,—তবুও সাবধানের মার নাই।—পরে আসল নামটাও বলিয়া আসিয়াছি,—গরিব ব্রাহ্মণের বোধ হয় আতঙ্কে একমাস ঘুম হইবে না।"

"রামরূপ শর্ম্মাটী কে?"

"সব কথা বলিব বলিয়াইতো ডাকিয়াছি,—তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত।"

"সে কেবল আপনার অনুগ্রহ। এখন হঠাৎ এমন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন কেন?"

"তোমরা ভাবিয়াছিলে আমি আর নাই।"

"আমি তাহা ভাবি নাই,—আমি রামঅক্ষয়কে খুন করিতে পারে, এমন লোক এখনও জন্মায় নাই।"

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে তুমি আমায় ভাল বাস বলিয়া বল; তোমরা কি ভাবিয়াছিলে?"

"অন্য সকলে বোধ হয় ভাবিয়াছিল,—আপনাকে কোন বদমাইসের দলে হত্যা করিয়া কোথায় পুতিয়া ফেলিয়াছে—আপনার শত্রুর অভাব—"

"আমার অধিকাংশ এরূপ বন্ধু—হয় ফাঁসী কাষ্ঠে নরক যাত্রা করিয়াছে, না হয় দ্বিপান্তরে বা জেলে আছে।"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কথাটা ঠিক,—তবুও সংসারে আজও বদমাইস শূন্য হয় নাই।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "কোন কালে হইবেও না।—তুমি কি ভাবিয়াছিলে ?"

"আমি ঠিক জানিতাম, আপনি এই মধুপুরের ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্যই এরূপভাবে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন,—আরও একটা কারণে আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল।"

"সে কারণটা কি ?"

"আপনার মত একটা লোক নিরুদ্দেশ হইলেন,—ইহাতে বড় সাহেবের কিরূপ ভাব হওয়া উচিত ?—প্রথম দিন তিনি আমাদের ডাকিয়া দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন,—তাহার পর আর উচ্চ-বাচ্চা নাই।"

উহাতে কি ভাবিলে ?"

"স্পষ্টই বুঝিলাম যে সাহেব আপনার খবর রাখেন,—কোন কারণে তিনি আমাদের কিছু বলিতেছেন না।"

"হাঁ, ঠিক ভাবিয়াছিলে। সাহেবকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার নিরুদ্দেশ থাকায় অনুসন্ধানে সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহাকে আমার কথা কাহাকে বলিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম।"

"আমিও তাহাই অনুমান করিয়া ছিলাম ;—এখন এই অদ্ভুত অন্তর্দ্ধানের কারণটা শুনিতে পাই কি ?"

"নিশ্চয়ই।—যখন তোমায় লইয়া কাজ করিতে হইবে,—তখন তোমায় সকল কথা না বলিলে চলিবে কেন ?"

"আমিও শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।"

"এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হইবার আমার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল না। ঘটনা ক্রমে হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী বর্দ্ধমান হইতে ছাড়িলেই আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম বলিতে পারি না,—কাহারা আমার গাড়ীতে কথা কহিতেছে শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম,—দুইটী ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিয়াছে,—আমি যে গাড়ীতে যাইতেছিলাম,—তাহা সকল ষ্টেশনেই থামিতে থামিতে যায়,—সুতরাং এই দুই জন লোক কোন ষ্টেশনে উঠিয়াছিল,—তাহা জানি না। ঘুম চোখেই যেন মধুপুরের খুনের কথা ইহাদের বলিতে শুনিলাম। তাহাই ইহাদের কথা

শুনিবার জন্য চক্ষু বুজিয়া রহিলাম,—কিন্তু ইহাদের একজন বলিল,—"এখন আর নয়,—কি জানি লোকটা জাগিয়াই যদি থাকে।"

আর এক জন বলিল, "শুনিয়াছি, কলিকাতার একজন ডিটেকটিভ আসিতেছে,—খুব সম্ভব, এই গাড়ীতে যাইতেছে।"

অপরে বলিল, "এ লোকটা কে,—এ তো নয় ?"

"কে বলিতে পারে ? সাবধানের মার নাই। শত্রু পক্ষও হইতে পারে। আমাদের খুব সাবধানে চলা উচিত।"

"ষ্টেশনে আসিলেই পেছনকার দরজা দিয়া নামিয়া পড়িব,—খুব অন্ধকার আছে।"

"ভালই হইয়াছে।"

এই সময়ে গাড়ীর বেগ কমিল,—কোন্ ষ্টেশন আসিতেছে, আমি স্থির করিতে পারিলাম না। উঠিয়া বসাও যুক্তি সঙ্গত মনে করিলাম,—ইহাদের চক্ষের আড়াল করাও উচিত নহে। ইহারা যাহা বলিল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিলাম যে ইহারা এই খুনে জড়িত আছে। ইহারা কে ? কেনই বা এরূপ ভাবে গাড়ী হইতে পলাইতেছে ?

এই সময়ে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। নিমিষে পশ্চাৎ দিককার দরজায় চাবি লাগাইয়া দরজা খুলিয়া লোক দুইটী নামিয়া পড়িল,—আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসরণ।

সুশীল বাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর,—আপনার চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইল ?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "তখন আমার আর কিছুই ভাবিবার সময় ছিল না,—আমার পরিধান ধুতি মাত্র,—গরমের জন্য জামাও খুলিয়াছিলাম। সেই এক বস্ত্রে আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম,—গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখিবার উপায় নাই,—সেই অন্ধকারে যতদূর দেখা সম্ভব,—তাহাতে আমার বোধ হইল, লোক দুইটী মাঠের দিকে রেল

পথ পার হইয়া ছুটিতেছে,—আমি হোঁচট খাইতে খাইতে একরূপ প্রাণ হাতে করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। অন্য কিছু ভাবিবার বা দেখিবার সময় হইল না।

লোক দুইটী রেলের একটী গুম্‌টীর নিকট আসিল,—তখন দেখিলাম,—তথায় একটী আলো অন্ধকারে জ্বলিতেছে,—লোক দুইটী সেই আলোর দিকে যাইতেছে। আমিও সেই আলো ধরিয়া চলিলাম।

এখন লোক দুইটী আস্তে আস্তে কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিল,—তাহারা কি বলিতেছে, শুনিবার জন্য আমি দ্রুতপদে তাহাদের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা পাইলাম,—কিন্তু পাছে তাহারা আমার পায়ের শব্দ শুনিতে পায়, ভয়ে অধিক জোরে চলিতে সাহস করিলাম না।”

সুশীল বাবু বলিলেন, “নিশ্চয়ই,—পুলিশের কাজে কি হাঙ্গামায়ই পড়িতে হয়!”

রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, “যে কাজে হাঙ্গামা নাই,—সে কাজ কাজই নয়!”

“তাহার পর কি হইল বলুন।”

“তাহার পর লোক দুইটী আলোর নিকটস্থ হইয়া বলিল, “কে হরিচরণ?” এক জন উত্তর করিল, “হাঁ,—হুজুর।”

“আমার টেলিগ্রাফ পেয়েছিলে?”

“হাঁ হুজুর,—তাই যেমন হুকুম করেছিলেন,—লণ্ঠন নিয়ে এখানে আছি।”

“বেশ—চল,—অনেক রাত হয়েছে।”

“প্রায় ভোর হয়, হুজুর।”

“চল,—আর দেরি করা নয়।”

“হরিচরণ লণ্ঠন লইয়া সম্মুখে সম্মুখে চলিল, বাবু দুইটী দ্রুতপদে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন,—আর কোন কথা কহিলেন না। আমিও দূরে থাকিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

কিছুদূর গেলেই দেখিলাম,—“দূরে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা বাড়ী;—হরিচরণ আলো লইয়া সেই বাড়ীর কমপাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিল।—সহসা বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়াইয়া একজন বলিল, “হরিচরণ, আলোটা উঁচু করে রাস্তায় ধর তো,—কার যেন পায়ের শব্দ শুনিলাম।”

এই কথা বলিবামাত্র,—আমি সত্বর এক গর্ত্তের ভিতর লুকাইলাম।

হরিচরণ আলো উচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুর,—রাত্রি প্রায় ভোর হয়,—কোন শাঁওতাল বোধ হয় কিছু বেচ্‌তে মধুপুর যাচ্চে।"

"তাই হবে চল—কই কাকেও দেখতে পাচ্চি না।"

অপরে বলিল, "বোধ হয় তুমি ভুল শুনিয়াছ,—আমি কই কাহারও পায়ের শব্দ শুনিতে পাই নাই।"

"তাই হবে,—এস।"

"এই বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, অপরে প্রবেশ করিলে হরিচরণ গেট বন্ধ করিয়া দিল। তখন আমি আবার রাস্তায় উঠিলাম।

সেই গেট হইতে দূরে এক শীলাখণ্ডে বসিয়া কি এখন করা উচিত, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। রাত্রিও ভোর হয়,—পূর্ব্ব গগন প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে,—এই লোক দুইটী বোধ হয় উপস্থিত এখান হইতে যাইবে না,—সুতরাং প্রাতে এই বাড়ী কাহার ও ইহারা কে, জানিতে কষ্ট হইবে না। তবে যদি পশ্চাতে দরজা থাকে,—আর যদি সেই দরজা দিয়া পালায়?—আমি তখনই উঠিয়া বাড়ীটীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলাম,—মাঠের উপর বাড়ী, ইচ্ছা করিলে যে কেহ বাড়ী হইতে যে কোন দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। দেখিলাম বাড়ীর সমস্ত জানালাই খোলা। দুইটী ঘরে আলো জ্বলিতেছে,—সেই আলোতে দেখিলাম, দুই জন লোক গৃহ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে;—তাহার পর বোধ হয় তাহারা শুইয়া পড়িল,—কারণ কিছুক্ষণ পরে আর একজন সেই ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ইহার একটু পরে অপর ঘরের আলোও নিবিল,—আমি দূরে আসিয়া এক বৃক্ষ তলে বসিলাম।

এখন কি করা উচিত? ইহারা কে,—আর ইহাদের সঙ্গে মধুপুরের হত্যাকাণ্ডের কি সম্বন্ধ, তাহা না জানিয়া আমি এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না। এক বস্ত্রে রহিয়াছি,—ভালই হইয়াছে,—শাঁওতাল বা রেলের কুলী সাজা কঠিন হইবে না। রামঅক্ষয় রূপে মধুপুরে গেলে হয়তো বিরুদ্ধপক্ষ সাবধান হইয়া পড়িত,—এ যাহা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে,—ভগবান যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কারমাটার।

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান সময় সময় আমাদের সহায় না হইলে, আমাদের অনেক সময়ই হাঁ হইয়া থাকিতে হয়। এই দেখুন না,—লোক দুইটা যদি ঘটনাচক্রে পড়িয়া আপনার গাড়ীতে না উঠিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিত,—তাহা হইলে আপনি আদৌ ইহাদের ধরিতে পারিতেন না।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "এক বস্ত্রে শাঁওতালপরগণার মাঠে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটা যে কেবল পণ্ডশ্রম নহে,—তাহাই বা কে বলিবে ?"

সুশীল বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন ইহাদের ধরেন নাই।"

"সব আগে শোনই,—তাহার পর বুঝিতে পারিবে।"

"ইহারা কে ?"

"বলিতেছি ;—যখন সব কথাই বলিতেছি,—তখন ধারাবাহিক রূপে বলা ভাল।"

"তাহাই বলুন।"

"ক্রমে সকাল হইল,—দুই চারিজন শাঁওতাল কাঠের মোট লইয়া বাহির হইল,—আমি তাহাদের একজনকে একাকী পাইয়া এক ধারে নির্জ্জন স্থানে আনিলাম। তুমি তো জান, টাকা-কড়ি, টিকিট-পত্র সর্ব্বদাই আমি আমার লম্বা গেঁজেয় পুরিয়া কোমরে রাখি,—একটা ছোট পিস্তলও সর্ব্বদা সেই গেঁজেতে থাকে,—সুতরাং আমি নিঃসম্বল ছিলাম না। দুইটা নগদ টাকা ও আমার ফর্সা কাপড় দিয়া তাহার কৃষ্ণবর্ণ মস্তকাধার ও ততোধিক কৃষ্ণবর্ণ পরিধান বস্ত্র, দুই মোট কাটসহ বাঁক সংগ্রহ করা কঠিন হইল না। দুই চারি মিনিটের মধ্যে আমি পূর্ণ শাঁওতাল কাঠওয়ালায় পরিণত হইয়া কাঠের বাঁক স্কন্ধে হরিচরণের বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলাম। ছদ্ম বেশে একটু হাত আছে, তাহা বোধ হয় তুমি জান ?"

"খুব জানি।"

"হরিচরণ তখন উঠিয়াছিল,—অথবা বাবুদের রেল হইতে আনিয়া আর নিদ্রা যায় নাই,—সে সৌচ কার্য্য করিয়া বাহিরে আসিয়া আমায় দেখিয়া বলিল, "কত নিবি ?"

"আট পয়সা।"

"নিয়ে আয় ভেতরে।"

আমি বাঁক স্কন্ধে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম ;—সে বলিল, "আয়, এখানে।" তাহার পর সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোকে নুতন লোক বলে বোধ হচ্চে।"

আমি বলিলাম, "আমি হুমকায় মকদ্দমা কর্ত্তে গিয়াছিলাম,—কাল ফেরে এসেছি।"

"বটে!—এই নে পয়সা,—রোজ কাঠ দিয়ে যাস্।"

"দেব হুজুর,—কিছু জলপান—"

"দূর বেটা,—এত সকালে জলপান কোথায়? বেলায় আসিস্—ভাত দেব। এখন আমায় কুমার বাহাদুরদের চা কর্ত্তে দে।"

আমি তথা হইতে বাহির হইলাম,—কুমার বাহাদুর? কোথাকার কুমার বাহাদুর! আমি কাঠ নামাইয়া বাড়ীটী বিশেষ বিলক্ষণ লক্ষ করিয়া দেখিতেছিলাম,—গৃহের সমস্ত জানালাই খোলা ছিল,—ঘরের ভিতরের সবই দেখা যাইতেছিল।—সম্মুখের ঘরে একটী টেবিল ও চারিখানি চেয়ার মাত্র আছে,—পার্শ্বের ঘরে দুইখানি খাট,—দেখিলাম দুই ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে, বুঝিলাম, আমি রাত্রে যে দুই জনকে দেখিয়াছিলাম,—তাহারাই নিদ্রা যাইতেছে,—কুমার বাহাদুর! রাজার ছেলে না হইলে কুমার হয় না? তবে কি রাত্রে এত কষ্ট পাইয়া ইহাদের অনুসরণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হইল?

কিন্তু গাড়ীতে যে মধুপুরের খুনের কথা ইহারা বলিয়াছিল,—তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই ;—তাহারা যদি এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এরূপ ভাবে গাড়ী হইতে লুকাইয়া নাবিত না,—যে সকল কথা বলিয়াছিল,—তাহাও কখনও বলিত না ;—যাহা হউক বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া আমি এখান হইতে নড়িতেছি না,—মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া আমি ষ্টেশনের দিকে চলিলাম ;—সেখানে কুলিদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এই বাঙ্গালার কথা তুলিলাম,—তাহার পর যাহা শুনিলাম,—তাহাতে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলাম।"

সুশীলবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শুনিলেন?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "শুনিলাম, রাজা নিমাই নারায়ণের পুত্র কুমার গুনেন্দ্র নারায়ণ প্রায় ছয় মাস হইল এই বাঙ্গালা ভাড়া লইয়াছেন,—সব সময়

এখানে থাকেন না,—মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই এক দিন থাকেন;—এখানে তাঁহার একমাত্র ভৃত্য হরিচরণ থাকে। কুমার বাহাদুর অতি অমায়িক লোক।—আমি যত দূর অনুসন্ধানে জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম,—এখানকার সকল লোকই তাঁহার উপর বিশেষ খুসী।'

"আর একজন কে?"

"ইহাঁর নাম বরেন্দ্র বাবু,—যশোহর জেলার জমিদার বনমালি রায়ের ছেলে,—ইনিও বড় লোক,—ইনিও মধ্যে মধ্যে কখনও একলা,—কখন কুমার বাহাদুরের সঙ্গে,—এখানে আসিয়া থাকেন।—উভয়ের কেহই কখনও এখানে দুই তিন দিনের বেশী থাকেন না,—ষ্টেষণে গিয়া জানিলাম, স্থানটী করমাটর মধুপুরের পূরের ষ্টেষণ।"

সুশীল বাবু বলিলেন, "রহস্য ঘনিভূত হইতেছে সন্দেহ নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

করমটরে।

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "ইহাঁদের সংবাদ করমটরে আর অধিক কিছুই জানিতে পারিলাম না।—সকলেই ইহাঁদের যথেষ্ট প্রশংসা করিল,—বিশেষতঃ হরিচরণের প্রশংসা তো সকলের মুখে! আমি হরিচরণকে যেরূপ সকালে দেখিয়াছিলাম,—তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে তাহার নিকট হইতে কিছু জানিবার সম্ভাবনা নাই।—সে সাধারণ পাড়াগেয়ে চাকর নহে;—তাহাকে দেখিলেই অত ধূর্ত্ত বুদ্ধিমান লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যাহা যাহা শুনিলাম,—তাহাতে এরূপ সম্ভ্রান্ত লোকের উপর কোনরূপে সন্দেহ করা কিছুতেই যাইতে পারে না,—মিছামিছি পণ্ডশ্রম হইল!—সমস্ত দিনের মধ্যে মধুপুরে যাইবার গাড়ী নাই; আড়াইটার সময় গাড়ী আছে,—সেই গাড়ীতেই এই ছদ্মবেশে মধুপুরে যাইব,—তাহার পর সেখানে গিয়া যাহা করিতে হয় বিবেচনা করিয়া করা যাইবে; আমি মনে মনে এই কথা স্থির করিয়া ষ্টেষণ হইতে বাহির হইতেছিলাম,—এই সময়ে দুইটী বাবুর কথা আমার কাণে প্রবেশ করিল!—তাঁহারা ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন;—নিশ্চয়ই ষ্টেশনের বাবু।

একজন বলিলেন, "কাল রাত্রে কুমার বাহাদুর এসেছেন শুনেছ?"

"কই না,—কই, তাঁকেতো গাড়ী থেকে নাব্‌তে দেখিনি।"

"দেখ্‌তে পাওনি,—টিকিট নিয়ে ব্যস্ত ছিলে।"

"সম্ভব,—বলেছিলেন—এখন শীঘ্র আস্‌বেন না,—দেশে কাজ আছে।

"আমার বোধ হয় রাণী বিন্দেশ্বরীর বাড়ীর গোলযোগের জন্যই এসেছেন।"

"তার সঙ্গে কুমার বাহাদুরের সম্বন্ধ কি?"

"শোন নি,—রাণী বিন্দেশ্বরী যে বরেন্দ্র বাবু ও কুমার বাহাদুরের আপনার মাসী।"

"কার কাছে শুনিলে?"

"হরিচরণের কাছে শুনেছি,—তাঁরা বৈকালের গাড়ীতে মধুপুরে যাইতেছেন।

"বটে! তা হলে ষ্টেষণে দেখা হবে।"

"দুই এক দিন এখানে থাকলে একটা ভোজ পাওয়া যেত।"

"অনেক খাওয়া গেছে! বেলা হল, স্নান করা যাগকে।"

উভয়ে বাসার দিকে চলিয়া গেলেন।—আমি ইহাঁদের কথায় আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলাম।—এই খুনের কেন্দ্রস্থান যে রাণী বিন্ধেশ্বরী তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম।—ইহারা দুই জনেই রাণী বিন্ধেশ্বরীর ভগিনীর ছেলে,—না,—ইহাঁদের বিশেষ বিবরণ না জানিয়া আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।—ইহাঁদের মত সম্ভ্রান্ত লোকের উপর সন্দেহ করা উচিত নহে বটে, কিন্তু এক্ষণে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ হইয়াছে,—না,—আমি ইহাঁদেরই অনুসরণ করিব। মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া আমি ষ্টেশন হইতে বাহির হইলাম।

হরিচরণ আমায় আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল,—আমি আবার কুমার বাহাদুরের বাড়ীর দিকেই চলিলাম,—এখানে আহার ঔষধ দুইই হইবে। আরও কিছু নূতন সন্ধানও পাইতে পারি। এই ভাবিয়া একটু বেলা করিয়া আমি হরিচরণের সহিত সাক্ষাত করিলাম। হরিচরণ বাহিরে সাল পাতায় আমায় ভাত দিয়া চলিয়া গেল,—আমি তাহাকে ও বাবুদ্বয়কে আর দেখিতে পাইলাম না। তখন আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ীর গেটের দূরে এক যায়গায় লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

বেলা দুইটার সময় কুমার গুণেন্দ্র নারায়ণ ও বরেন্দ্র বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেষণের দিকে চলিলেন। আমিও দূরে থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

তাঁহারা ষ্টেশনে আসিলে, বাবুরা মহা সম্ভ্রমে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে চেয়ার আনিয়া দিলেন ;—একজন বলিলেন, "দুইখানা ফাষ্ট কেলাস মধুপুর,— রিটার্ণ দিব কি ?"

কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"বদ্দিনাথে বিশেষ কাজ আছে, ফাষ্ট কেলাস বদ্দিনাথ সিঙ্গেল দিন,—কবে ফিরিতে পারিব বলিতে পারি না।"

এই বলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা নোট দিলেন,—বাবুটী টীকিট আফি-সের দিকে প্রস্থান করিলেন।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, "এ আবার কি ? মধুপুর না গিয়া বদ্দিনাথ যায় কেন ? যাই হউক,—আমাকে সঙ্গে যাইতে হইল।—এ সুত্রের শেষ না দেখিয়া আমি ছাড়িতে পারি না।"

আমিও বদ্দিনাথের থার্ড কেলাস টিকিট কিনিলাম,—গাড়ী আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও গাড়ীতে উঠিয়া বদ্দিনাথ রওনা হইলাম।

মধুপুর গাড়ী আধ ঘণ্টা থামে,—গাড়ী আসিলে, ইহাঁরা গাড়ী হইতে নাবিলেন না।—ফাষ্ট কেলাসে আর কেহ ছিল না,—কিন্তু মধুপুর ষ্টেষণে আর একটী বাবু সেই গাড়ীতে উঠিলেন।—আমিও নাবিয়া সেই গাড়ীর কাছে আসিলাম,—দেখিলাম,—কুমার বাহাদুর ও বরেন্দ্র বাবু এই লোকের সহিত গাড়ীর এক কোনে বসিয়া মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিতেছেন,—আমি তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম,—কিন্তু উপায় নাই!

এই সময়ে ঘণ্টা দিল,—আমি ছুটিয়া গিয়া আবার গাড়ীতে উঠিলাম,—গাড়ী ছাড়িয়া দিল ;—তখন সেই লোকটী গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া নাবিলেন,—তৎপরে আবার ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "গোঁসাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চেষ্টার ফল।

গাড়ী নিমিষে প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া গেল। আমি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম, বরেন্দ্র বাবু ও কুমার বাহাদুর উভয়েই জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া ষ্টেশনের দিকে দেখিতেছেন।

পথে আর কিছুই জানিতে পারিলাম না,—বদ্দিনাথে গাড়ী থামিল,—আমি গাড়ী হইতে নাবিয়া পড়িলাম। কুমার বাহাদুর ও বরেন্দ্র বাবুও

নাবিলেন ;—তাহার পর পদব্রজে ষ্টেশন হইতে বাহিরের দিকে চলিলেন,—ষ্টেশনের সকলেই তাঁহাদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, আমি বুঝিলাম ইহারা এখানে নূতন লোক নহেন।

ইহারা ষ্টেশনের সমিপবর্ত্তী একটা বৃহৎ সুন্দর বাগান বেষ্টিত বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন,—বাড়ীতে বহু লোক জন,—দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যে, কোন খুব বড় জমিদার সপরিবারে এইখানে বাস করিতেছেন।

অনুসন্ধানে জানিলাম, বরেন্দ্র বাবু প্রায় দুই বৎসর এই বাড়ীতে বাস করিতেছেন,—তিনি দুই একদিনের জন্য কলিকাতায় বা দেশে যান এইমাত্র ;—প্রায় এক বৎসর হইল কুমার বাহাদুরও সস্ত্রীক এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন,—তবে তিনি প্রায়ই এখানে থাকেন না,—এখানে আসিয়া দশ পনের দিন থাকিয়া আবার দেশে চলিয়া যান। উভয়কেই লোকে অতি ভাল লোক বলিয়া জানে।

নানা বেশে নানাভাবে দুই তিন দিন এখানে থাকিয়া আমি অনেক অনুসন্ধানেও কিছুই জানিতে পারিলাম না। ইহাদের লোকজনের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করিলাম,—কিন্তু তাহাদের নিকটও কিছু জানিতে পারিলাম না ;—এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে দেশে কি একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে,—সে কি গোলযোগ তাহা আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না,—বুঝিলাম, ইহারা দেশের কোন কথাই বলিতে চাহে না।

কয়দিন বৃথা নষ্ট করিলাম ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম, কিন্তু উপায় নাই,—আমি হতাশ হইয়া শাওতাল বেশে মধুপুরে আসিলাম,—কিন্তু দুই তিনদিন নানা বেশে নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া নূতন কিছুই জানিতে পারিলাম না,—পূর্ব্বে কাগজ-পত্র পড়িয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা ব্যতীত আর নূতন কিছুই নয়,—খুনের কিছুই সন্ধান হয় নাই,—দারোগার নিরুদ্দেশেরও কিছু হয় নাই। রাণী বিন্ধেশ্বরী তাড়াতাড়ি কাহারও কোন কথা না শুনিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার কন্যাকে পাওয়া গিয়াছে,—সে নাকি বাড়ীতেই ছিল,—কিন্তু কেহ তাহাকে দেখে নাই। একজন রেল বাবু বলিলেন, "আমার সন্দেহ হয়,—কারণ, রাণী যখন রেলে উঠেন,—তখন তার মেয়ে যে সঙ্গে ছিল বলে বোধ হয় না।"

আমি মনে মনে বলিলাম,—"এ আর এক নূতন সমস্যা।"

আমি বড় সাহেবকে পত্র লিখিয়া সেইদিন রাণী বিন্ধেশ্বরী, রাজা নিমাই

নারায়ণ ও বনমালী রায়ের সন্ধানে তাহাদের দেশে রওনা হইলাম। এতদিন সেইখানেই ছিলাম—;সেখানে অনুসন্ধানে কতক আলোক পাইয়াছি।"

সুশীল বাবু বলিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে রহস্য ভেদ হইয়াছে?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "ঠিক তাহা নহে,—তবে এতদিন অন্ধকারে ঘুরিতেছিলাম, এখন একটু আলো পাইয়াছি।"

"সে কি?"

"ব্যাপারটার কতক আভাষ পাইয়াছি,—অতি সঙ্ক্ষেপে তোমায় তাহার আভাষ দিতেছি।"

এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু—এ সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সুশীল বাবুকে সমস্ত বলিলেন।

সুশীল বাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা কতকটা বুঝিলাম বটে,—তবে সব এখনও ভাল বুঝিলাম না।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "মধুপুরের ব্যাপারটা যে ঠিক কি হইয়াছে,—এখনও স্থির করিতে পারি নাই,—এখন তোমায় আমায় দুইজনে মিলিয়া সেই রহস্য ভেদ করিতে হইবে।"

"আমায় যাহা হুকুম করিবেন, তাহাই করিব।"

"তাহা আমি জানি,—নতুবা তোমায় এত কথা বলিতাম না। এখন এ কথা আর কাহাকেও বলিবার আবশ্যক নাই।"

"নিশ্চয়ই,—এখন কি করিতে চাহেন?"

"এটা বোধ হয় বুঝিয়াছ যে পশ্চিমের এক দল বদমাইশ এদেশে আসিয়া নানা গোলযোগ করিবার চেষ্টা পাইতেছে।"

"তাহাতো স্পষ্টই বুঝিলাম।"

"অথচ এই খুনের ব্যাপারের সন্দেহ শুণেন্দ্র নারায়ণ ও বরেন্দ্রের উপর হয়।

"কথা হইতেছে, ইহারা খুন করিবে কেন? বিশেষতঃ গার্ড স্মিথের উপর ইহাদের রাগের কারণ কি?

"তোমার এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে তো সকল গোলযোগই মিটিয়া যায়। এখন তোমায় আমার স্ত্রী হইতে হইবে।"

সুশীল বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সেকি! বলেন কি!"

রামঅক্ষয় বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "শীঘ্র সেজে ফেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ছদ্মবেশ।

সুশীল বাবুর বিস্মিত ভাব দেখিয়া রামঅক্ষয় বাবু হাসিয়া উঠিলেন,—সুশীল বাবু তাহার হাসিতে অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি উপহাস করিতেছেন?

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "একি উপহাসের সময়?"

"তবে—তবে—"

"আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে এই গোসাই বাবুর কলিকাতায় একটা আড্ডা আছে,—থাকিবারই কথা—"

"নিশ্চয়ই;—আপনার কাছে যাহা শুনিলাম,—তাহা যদি ঠিক হয়, তবে তাহাদের কলিকাতায় যে একটা আড্ডা রাখিতে হইবে,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

"বলিলাম তো, অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাহাদের একটা আড্ডা আছে,—আমাদের ছদ্মবেশে এই আড্ডায় যাইতে হইবে।"

"কি ছদ্মবেশ?"

"তাইতো বলিতেছিলাম, তুমি আমার স্ত্রী হইবে—"

"কি বলেন—

"কেন,—ইহাতে এত ঘাবড়াইতেছ কেন?—আমি অন্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হইব, তুমি আমার স্ত্রী হইয়া হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইবে,—এই রকমে তাহাদের আড্ডায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে,—যদি সহজে প্রবেশ করিতে না দেয়,—আমার তাহাদের বাড়ীর দরজায় মির্গি রোগ হইবে, তখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িব,—সেই সময়ে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহাও কি তোমায় বলিয়া দিতে হইবে?"

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এতদিন আপনার চেলা হইয়াও কি এটা শিখিতে পারি নাই?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "ভাল, তাহাই হইলে আর সময় নষ্ট করিয়া ফল নাই,—কাজে লাগিয়া পড়া যাক।"

উভয়েই পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে ছদ্মবেশে নিযুক্ত হইলেন। রামঅক্ষয় বাবু প্রথমে সুশীলকে সাজাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে সুশীল

বাবু সম্পূর্ণ স্ত্রী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। এমন কি বোধ হয় তাহার নিজের জননী তাহাকে দেখিলে কোনমতে চিনিতে পারিতেন না।

সুশীল বাবুকে ব্রাহ্মণীতে পরিণত করিয়া রামঅক্ষয় বাবু নিজে অতি শীঘ্রই অতি বৃদ্ধ অন্ধ ব্রাহ্মণে পরিণত হইলেন। তাহার পর তাহারা দুইজনে নিম্নে নাবিয়া আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া একদিকে লইয়া গিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন;—তাহার পর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে গিয়া রামঅক্ষয় বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, সুশীল,—লোক চেনা নাই,—পিস্তল ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয়,—একটু দাঁড়াও।

তিনি সত্বর উপরে গিয়া দুইটী পিস্তল আনিয়া একটী সুশীল বাবুকে দিয়া বলিলেন, সাবধানে কাপড়ে লুকাইয়া লও,—ব্যবহার করিবার দরকার হইলে ব্যবহারে ক্রটী করিও না।

সুশীল বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা জানি?"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন,—এখন আর আমি রামঅক্ষয় নই—কানা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—হাত ধর।

তখন রাত্রি হইয়াছিল,—পথে লোকজন চলাচলও কম হইয়া আসিয়াছিল,—নারী-রূপী সুশীল বাবু রামঅক্ষয় বাবুর হাত ধরিয়া অতি সাবধানে লইয়া চলিলেন;—এ ব্যাপার ও এ ছদ্মবেশের কথা না জানা থাকিলে, কাহারই তাঁহাদের চিনিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

তাহারা কিয়দ্দূর আসিলে,—সহসা রাম অক্ষয় বাবু সুশীল বাবুর হাত টিপিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "বোধ হয় কেহ আমাদের পিছু লইয়াছে,—দাঁড়াও —না,—এই রোয়াকটায় বসে পড়,—দেখি কে।"

সুশীলবাবু চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কই—কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

রামঅক্ষয় বাবু যেন চলিতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন,—এবং একবার পথের চারিদিকে চাহিলেন,—দুই চারিটি লোক ব্যতীত পথে আর কেহ নাই,—সুশীলবাবু যাহাদের দেখিলেন,—তাহাদের কাহারও উপর সন্দেহ করিবার তিনি কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। মৃদুস্বরে বলিলেন, "কই কাহাকেও তেমন দেখিতেছি না।"

রামঅক্ষয় বাবুও সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "এই মুটে-টা কোথা যায়।—একটু নজর রাখ।"

পরস্পরের এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছে, ইত্যবসরে সেই মুটে একটি বাক্স মস্তকে করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

টিনের বাক্স।

মুটে এদিকে ওদিকে চাহিয়া বলিল, "বাবু,—একবার যদি ধরেন—বড় হাঁপিয়ে গিয়েছি!"

রামঅক্ষয় বাবু সুশীল বাবুর হাত টিপিলেন,—সুশীল বাবু কোন কথা না কহিয়া মুটের মস্তকস্থ বাক্স ধরিলেন। সে বাক্সটা রোয়াকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী রামঅক্ষয় বাবুর পার্শ্বে রাখিল। তাহার পর বলিল, "একটু বাক্সটা দেখবেন, ঐ কলে জল খেয়ে আসি।"

রামঅক্ষয় ও সুশীল বাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে ছুটিয়া পলাইল। উভয়েই ছদ্মবেশে,—একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,—অপরে স্ত্রীলোক, এ অবস্থায় কি করা না করা তাঁহারা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না,—মুটেও নিমিষে কোন্ গলির ভিতর অন্তর্দ্ধান হইল। সুশীল বাবু তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—কিন্তু রামঅক্ষয় বাবু ক্ষিপ্র হস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "না—থাম। অগত্যা সুশীল বাবু নিরস্ত হইলেন।"

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "বসো,—ভেবে দেখা যাক।"

বলুন, কি করা যায়।

এই বলিয়া সুশীল বাবু তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন।

রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "দেখিতেছ না,—আমাদের উপর কোন লোক নজর রেখেছে, এই মুটে বাক্স নিয়ে আমাদের বাড়ীর দরজা থেকেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছে—বাক্সটা আমাদের ঘাড়ে চাপানই উদ্দেশ্য।"

সুশীল বাবু বলিলেন,—"এতে আছে কি?" রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "কোন গুরুতর কিছু আছে,—না হ'লে, এমন ক'রে ফেলে পলাবে কেন?"

"এখন কি করা যায়?"

"তুমি এই খানে বাক্সের পাহারায় থাক, আমি বাসায় গিয়া চাকরটাকে ডেকে নিয়ে আসি। দেখ যেন বাক্স কিছুতেই হাত ছাড়া না হয়।"

সহসা উভয়েই লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুশীল বাবু প্রথমেই বলিলেন, "এ কি!"

রামঅক্ষয় বাবু বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতেছিলেন, তিনি সহসা সুশীল বাবুর কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এই বাক্সের ভিতরে—"

সুশীল বাবু বলিলেন, "তাইতো,—ব্যাপার কি!

"আর দেরি করা নয়, এখনই বাক্সটা বাসায় নিয়ে যাওয়া আবশ্যক—দেখিতেছ না, নিচেয় আগাগোড়া ছেঁদা করিয়াছে।"

"কে ইহার ভিতর!"

"মানুষ, বোধ হয় ছেলে মানুষ!"

এই বলিয়া রামঅক্ষয় বাবু বাক্সের ডালার উপর মুখ রাখিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

পূর্ব্বে তাঁহারা যে মৃদু হাস্যধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়ে লম্ফ দিয়া উঠিয়াছিলেন, বাক্সের ভিতর হইতে আবার সেই খিলখিল হাস্যধ্বনি উঠিল। রামঅক্ষয় বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; "কে তুমি?"

আবার সেই খিলখিল শব্দ। রামঅক্ষয় বাবু বলিলেন, "আর এক মিনিটও দেরি করা নয়,—আমি এখানে আছি,তুমি ছুটে গিয়ে চাকরকে ডেকে আন।"

সুশীল বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাসার দিকে ছুটিলেন। রামঅক্ষয় বাবু বাক্সের দিকে সরিয়া বসিয়া আবার মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি হে বাপু?"

কোন শব্দ নাই। রামঅক্ষয় বাবু দেখিলেন বাক্সের চাবি বন্ধ। বিলাতী টিনের বাক্স, সহজে খুলিবার উপায় নাই,—না ভাঙ্গিলে ইহার ভিতর কি আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে ইহার ভিতর যে এক জন মানুষ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বাক্সের ভিতর তাহাকে রাখিবার জন্যই যে, বাক্সের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করা হইয়াছে, তাহা বাক্স দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। রামঅক্ষয় বাবু বহুকাল পুলিশে কাজ করিতেছেন,—নানা অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছেন,—কিন্তু এরূপ ব্যাপার আর কখনই দেখেন নাই। এই মধুপুরের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছেন, তাহা আর পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। আরও কত নূতন ব্যাপার দেখিতে হইবে, তাহাই বা কে বলিবে!

এই সময়ে তাহার ভৃত্য ছুটিয়া তথায় আসিল। রামঅক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীল কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "বাসায় আছেন।"

"নে—শীঘ্র শীঘ্র বাক্সটা তুলে নে।"

ভৃত্য বাক্স তুলিতে গিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌—কি ভারি, এতে আছে কি ?"

রায়অক্ষয় বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "মানুষ!"

(ক্রমশঃ)

ওয়াল্‌টিয়ার।

ভীষণ সমুদ্র-কূলে পর্ব্বত উপর
জগৎ বিখ্যাত ; নাম "ওয়াল্‌টিয়ার"
শোভিছে ত্রিদিব সম অতি মনোহর।
যথায় বিরাজে সদা শম্ভু, গৌরী সনে ;
শুভ্র-অভ্রভেদী সেই কৈলাস-পর্ব্বতে,
যেমতি কৈলাসপুরী অপূর্ব্ব শোভায় ;
নন্দন-কানন জিনি শোভে নিরন্তর।
প্রাকৃতিক নানাবিধ দ্রব্য অলঙ্কারে,
লোহিত, ধূসর, শ্বেত, পীত আদি করি
নানাবর্ণে সুরঞ্জিত বিবিধ কুসুমে
কুঞ্জ-বন সম সদা সজ্জিত এ' স্থান।
এই কি গোলকধাম বিষ্ণুর আলয় ?
যথায় গরুড়াসনে লক্ষ্মী নারায়ণ
শশাঙ্ক ভাস্কর জিনি উজ্জ্বল প্রভায়
ভাতিছে অঙ্গের ভাতি দেব মধ্যস্থানে ?
নতুবা এহেন শোভা কভু না সম্ভবে।
কোথাও অচল-শিখা গগন ভেদিয়া,
তৃণ সম ধরাতল দলি পদতলে,
গর্ব্বভরে স্থির চিতে রহেছে অচল।
কে-জানে; কাহার প্রেমে মজিয়া ভূধর
শীত, গ্রীষ্ম, বরিষার অসহ্য যাতনা
অনায়াসে সহ্য করি আপন হৃদয়ে
নিস্পন্দ, নিশ্চলভাবে রহেছে দাঁড়ায়ে।
বুঝিনু রহস্য তব, আরেরে ভূধর!
মায়াবিনী রমণীর পড়ি মায়াজালে
নাশিতে মদন দেবে ষড়যন্ত্র করি.
সাঙ্কেতিক গুপ্ত-স্থান করি অধিকার ;
একদৃষ্টে আশা-পথ রহেছ চাহিয়ে।
কিম্বা, ত্যজি লোকালয় পশিয়া নির্জ্জনে
স্বকার্য্য সাধিত-গিরি করি উচ্চ বাহু,
সতত বিভুর নাম জপিছ অন্তরে।
যোগীজনে শতজন্ম বসি যোগাসনে
যোগবলে কভু নাহি পায় যেই স্থান,
করেছ মানস তুমি রহি মর্ত্তধামে
স্পর্শিতে ত্রিদিব সেই দেবতা বাঞ্ছিত।
যথা স্বর্গ লভিবারে যোগী ঊর্দ্ধ বাহু,
এক স্থানে এক প্রাণে করি ঊর্দ্ধ বাহু ;
ঈশ্বর চিন্তায় সদা রহে নিমগন।
হেরিতে সৌন্দর্য্যরাশি,কিম্বা যথা অরি
শূলপাণী-শম্ভু ভয়ে করি পলায়ন

রক্ষিতে আপন প্রাণ ত্যজি হিম-গিরি,
গোপনে মদন-সখা পশিয়া হেথায়
সতত করিছে বাস নির্ভীক পরাণে।
অথবা ; সখার খেদে হইয়া কাতর,
জনমের তরে হায় ! মন্দাকিনী নীরে
আত্মীয়-স্বজন সবে দিয়া জলাঞ্জলি
নিভৃতে হেথায় পশি অতি মনো দুঃখে
কাটাইছে শেষ কাল রহে যে দু'দিন।
তাহে বুঝি পিকধ্বনি না শুনি শ্রবণে ?
তাহে কি না'পশে কর্ণে পাপিয়া-ঝঙ্কার
মন মাতাইয়া যাহে ভুলায় মানবে ?
বুঝিনু অন্তরে আমি, রে মদন সখা !
জীবনের সুখ-সাধ দিয়া বিসর্জ্জন
অনন্ত দুখের স্রোতে যেতেছ ভাসিয়া,
ইহা হেরি ক্ষুণ্ণমনে কোকিল-কোকিলা,
ত্যজি সুমধুর তানে প্রেম আলাপন
দুঃখের কাহিনীতব ভাবিছে নীরবে।
দগ্ধকারী প্রজ্জ্বলিত হুতাশন সম
সখার বিরহানল সহিতে না পারি,
যদ্যপি বসন্ত তুমি গিরি-শির হ'তে
লম্ফ দিয়া পড়ি হায় ! অতল-সাগরে
আত্মহত্যা কর পাছে এই মনে করি,
মনোদুখে (ডলফিন্) পশিলা সাগরে,
জুড়াতে দুখের জ্বালা চিরদিন তরে ॥

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ॥

কোথা তুমি।

যতদিন এই ভাবে রহিব হেথায়,
হৃদয়ের আশাগুলি হৃদয়ে লুকায়ে
রাখিব বা কত দিন ? এত ব্যাথা স'য়ে
পরবাসে রব সখা অনাথার প্রায়।
আসি আসি ক'রে আসা হইলনা আর
আশা-পথ চাহি আমি আর কত দিন
রহিব গো প্রাণ-সখা তনু মন ক্ষীণ,
তোমা বিনা এ জীবন রাখা হলো ভার।
শূন্যদেহ শূণ্য প্রাণ দিগন্ত আঁধার
হেরি সদা, আকুলিত মনোবৃত্তি চয়,
প্রেমতৃষা অপূর্ণিত, হৃদয়-নিলয়
দগ্ধমরু সম হায় ! হ'য়েছে আমার।
প্রতি লিপি প্রেম-শেজ পাতি রাখি আমি
প্রাণ-সখা, কোথা আমি কোথায় বা তুমি।

শ্রীমতি অপরাজিতা দেবী।

সরসীর অদৃষ্ট।

(১)

সরসী মানবী হইয়াও দেবী। যখন চারি বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখ মাসে সরসীকে তাহার পিতৃভবনে দেখিয়াছিলাম, তখন সে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা। শরন্নিশার মৃগলাঞ্ছনের ন্যায় মৃদু হাস্য করিয়া কাছে বসিয়া যখন সে ধীরে ধীরে গল্প করিত, তখন তাহাকে দেখিয়া নিরাশার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও হৃদয়ে শান্তি আসিত। মধুর-ভাষিনী সরসীর স্বর যেন অমৃত বর্ষণ করিত, সেই অমামুখী স্বরে যখন সে কথা কহিত, তখন ছিন্নতন্ত্রী বীণার ন্যায় কোকিলার মধুর তানও কটু বোধ হইত। কথঞ্চিৎ রক্তবর্ণ দুই ওষ্ঠের উপর বিরাজমান শুভ্রদশন কান্তি সুশোভিত তাহার মধুর হাস্য প্রাণমন বিমোহিত করিত। আগুল্ফ লম্বিত কেশরাশি সমীর-সঞ্চালিত হইয়া যখন তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানিতে ছুলিয়া পড়িত, তখন তাহা স্বর্গীয় প্রতিভায় প্রতিফলিত হইত। সংসারে পিতামাতার একমাত্র কন্যা হইলে যে মান অভিমান অবশ্যম্ভাবী, সরসীর সে সব কিছুই ছিল না। তাহার সেই স্ফটীকবৎ স্বচ্ছ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক হৃদয় সংসারের কুটিল কালচক্রের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন স্পর্শ করে নাই। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া সরসী 'পুণ্যিপুকুর ব্রত' করিত—বসন্ত কুমার দেখিতেন,—দেখিয়া তাঁহার রাজীব চরণে প্রণিপাত করিতেন।

(২)

সরসীর পিতা বসন্ত কুমার বিপত্নীক। তাঁহার পত্নী যোগমায়া কন্যাকে স্বামীর চরণে দিয়া সূতিকাগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া, বসন্তকুমার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে সংসারে দুই একটা ধাক্কা আসিয়া তাঁহাকে কক্ষচ্যুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্যগুণে ব্যর্থ চেষ্টাগুলিকে উপেক্ষার নির্ম্মম দৃষ্টিতে দেখিয়া জীবনের নির্ম্মল উষাকাল হইতে যৌবন-মধ্যাহ্নের সন্ধিকাল

* অনবধানতা বশতঃ "সরসীর" প্রথমাংশ মুদ্রিত না হইয়া দ্বিতীয়াংশ বিগত আষাঢ় মাসের "অবসরে" প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রথমাংশ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। গ্রাহক মহোদয়েরা আমাদিগের ত্রুটী মার্জ্জনা করিলেই কৃতার্থ হইব। অঃ সং।

অবধি নিয়তি-চক্র-রেখাঙ্কিত পথে সমানভাবে চলিতেছিলেন। এইরূপে তিনি ক্ষুদ্র মানব জীবনের বারটি বৎসর অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া দিলেন।

বসন্তকুমার দত্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও ইংরাজের চাকুরী করেন নাই। তাঁহার সামান্য জমি ছিল—সেই জমিতে চাষ করিতেন এবং তাহাতেই দু-পয়সা করিয়াছিলেন। সংসারে বড় কেহ ছিল না—কেবল তিনি তাঁহার এক বিধবা ভগ্নী ও কন্যা সরসী। দাস দাসীর প্রাদুর্ভাব বেশী দেখি নাই। জীবনে কখনও বসন্তকুমার দারিদ্র্যের কঠিন নিপীড়নে নিপীড়িত হন নাই। যদিও তাঁহার সেরূপ সঙ্গতি ছিল না, তিনি একরূপ সুখেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার গৃহখানি সামান্য অথচ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দুইটি ইষ্টক নির্ম্মিত ও দুইটি চালা ঘর। দুইটি চালের গোলা আর দুইটি পয়স্বিনী গাভী আছে। বাটীর দক্ষিণ ধারে একটি বড় বাগান—বাগানে আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম ইত্যাদি সকল রকম বৃক্ষই আছে। বাটীর উঠানের পশ্চিম কোণে একটি ফুল বাগান। এটি সরসী নিজ হাতে তৈয়ার করিয়াছে। সকাল সন্ধ্যা সে প্রত্যহ তাহাতে জল দেয়। গোলাপ, চামেলি, জুঁই, জাতী, মল্লিকা, হেনা, টগোর সকল রকম ফুলই এই বাগানে আছে। আর পূর্ব্বদিকে ক্ষীণ সলিলা 'মোহানা' বনপথের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। 'মোহানা'র নির্ম্মল সলিলে গৃহখানির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে—যেন প্রণয়ীর মোহন মূর্ত্তি সযত্নে হৃদয়ে ধরিয়া আছে।

এ স্থলে আমরা বলিয়া রাখি যে, এই নদীর নামে গ্রামখানিও মোহানা নামে বিখ্যাত।

(৩)

ফাল্গুন মাস। নিশ্চল নীলাম্বুবিস্তার তুল্য অনন্ত নীলাম্বরে সপ্তমীর চন্দ্র সহস্র কিরণরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে ধীরে ধীরে দূর গগনে চলিয়া পড়িতেছে। পাপিয়ার মধুর তান বসন্তের উদ্দাম বায়ুতে ভাসিয়া ভাসিয়া দিগ্‌ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিকবর থাকিয়া থাকিয়া লতা-কুঞ্জের মধ্য হইতে গলা বাড়াইয়া 'কি জানি কি বিষাদ মাখা গীতি গাহিতেছে। ধরণী মৃতবৎ সুপ্ত। মনুজ নিকর নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখে শায়িত। কিন্তু সরসীর আজ নিদ্রা নাই। রাত্রি পোহাইলে তাহার বিবাহ—আবার এক নূতন জীবন, এক নূতন ঘর। সরসী ভাবিতেছে আর দু'দিন পরে পিতার স্নেহ বিজড়িত [illegible] গৃহকোণ ছাড়িয়া দূরে কোন অপরিচিত স্থানে যাইতে হইবে।

মানুষ আশার দাস। কল্পনা-রাজ্যে তাহার বাস। যখন নিরাশা আসিয়া হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন করে, যখন জীবন-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়, যখন দুঃখের বজ্রসূচী বিন্ধনে মানুষ উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হয়, তখন আশাই হাসিতে হাসিতে আপন রক্তিমাঞ্চল ছড়াইয়া দেয়। কল্পনার হৈম সিংহাসনে বসিয়া মানুষ দুঃখের দিন অবসান হইতে দেখে এবং ভবিষ্যৎ জীবন কত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে। বসন্তকুমার ভাবিলেন সরসীর মা নাই—তার কত দুঃখ। শ্বশুর শাশুড়ী পাইয়া, স্বামী পাইয়া সে দুঃখের অনেকটা উপশম হইবে। হায়! মানুষ কি ভাবে যে ঈশ্বরের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি হেলনে তাহার পাতান সংসার কোথায় ভাসিয়া যাইবে? মানুষ অতি দুর্ব্বল, অতি তুচ্ছ। আর এই তুচ্ছ শক্তি লইয়া মানুষ অহঙ্কার-মদে মত্ত হয়—কখনও ভাবে না যে, তার দম্ভ, আশা সকলই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কালের করাল স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে।

(৪)

আজ ফাল্গুনের চন্দ্রকরোজ্জ্বল অষ্টমী নিশীথে সরসীর বিবাহ হইবে। সরসীর আজ অপূর্ব্ব মোহিনী বেশ। প্রভাতে স্ফুটনোন্মুখী নলিনীর মত রূপরাশি অনির্ব্বচনীয়। যাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজমান সেই শ্মশানবিহারী তপোনিষ্ঠ, মহাযোগী মহাকালের ধ্যানভঙ্গ মানসে পুষ্পশর নিক্ষেপের পূর্ব্বে কুসুম চাপের কোমল পক্কবিম্বাধরোষ্ঠে যেমন হাসিটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সরসীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আজ তেমনি একটা লাবণ্যচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজ বসন্তকুমারের ক্ষুদ্র গৃহখানি জনকোলাহলে পূর্ণ। প্রভাত হইতে না হইতে দলে দলে প্রতিবেশী আসিয়া ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিনমনি অস্তাচলে আশ্রয় লইলেন। ইন্দুকরবিভাসিত বসন্তোৎফুল্ল নিশীথিনী অপূর্ব্ব মোহন সাজে দেখা দিল। বিহঙ্গকুল স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ধাবিত হইল। পুণ্ডরীকরাজি দিনদেবের বিরহে মুদিত হইল। এই প্রদোষ সময়ে প্রকৃতির সুখ-বাসরে, জীবনের প্রবেশদ্বারে, মোহানার তীরে বসিয়া অস্তগামী পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সরসী একাকিনী কি ভাবিতেছে। অদ্য দিবার শেষ হইল। তোমারও জীবনের একটা দিন অনন্ত কাল-সাগরে লীন হইয়া গেল। এই দিন যাহা গত হইল, তাহা কেহ আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছে, এবং কেহ বা প্রাক্তনের

ফলে এই দিবসেই দুঃখদাবদগ্ধ হইয়া হাহাকার করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কাহারও নিরবচ্ছিন্ন, ঐকান্তিক সুখ অথবা অত্যন্ত দুঃখ হয় না। কবি বলিয়াছেন—"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।" সরসী হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিল।

সন্ধ্যার অতি অল্প পরেই বর আসিল। সরোজকুমার রূপেগুণে সরসীর অনুরূপ। তাহার সেই কন্দর্প-নিন্দিত অনুপম রূপরাশি যেই দেখিল সেই বলিল—"যোগ্যং যোগ্যেনযোজয়েৎ।"

রাত্রি ১১টা বিবাহের সময় ছিল। কিন্তু একটু পূর্ব্বে সুবিমল নীলাকাশে হঠাৎ স্তরে স্তরে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের ন্যায় সাজিয়া আসিল—কি তুমুল করকাপাত, বিদ্যুল্লতার কি জ্যোতির্ম্ময়-তীব্র বিকাশ! বোধ হইল, সুরস্ত্রীগণের জন্য দেবাসুরে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, শঙ্কাস্পৃষ্ট সুন্দরীগণ কেবল দ্রুত পলায়নে আত্মরক্ষা করিতেছে। ক্রমে বিবাহের সময় আসিল—বর কনের দুই হাত এক হইল—অমনি ভীষণ বজ্রনাদ হইল। বসন্তকুমার কন্যা সম্প্রদান করিতেছিলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। নব-দম্পতীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—দামিনী চমকে চমকিত হইল। সরসী ভাবিল—এই কি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্ব সূচনা!

সেই ঘনান্ধকারপূর্ণ প্রলয়ঙ্করী নিশীথে দুইটি হৃদয় এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত হইল। এ মিলন ইহকাল পরকালের অতীত—অনন্তকালের জন্য দু'টি হৃদয় এক হইল। সরোজ সরসীকে পাইয়া আনন্দিত হইল—সরসী সরোজকে পাইয়া সুখী হইল।

* * * * *

ঊষার কনক-মাধুরিতে জগৎ হাসিল। আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মল। দূরে দু' একটি পাখী গাছের সুন্দর শ্যামিকরে গা ঢাকিয়া তরুণ অরুণের প্রতি করুণ স্বরে যেন কোন অজানিত অদৃষ্ট শক্তিকে আবাহন করিতেছিল। যেন সে আহ্বানে মানবের 'স্বার্থপরতা' নাই—তাহাতে যেন 'কি যেন' মাখান! সে আহ্বান হৃদয় মাঝারে কি যেন এক সঙ্গীত-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়—নীরব বীণা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে—হৃদয়-কন্দরে যেন কোন উদাস স্বরলহরী মৃদুল প্রতিধ্বনি আনয়ন করে! কবি গাহিয়াছেন—

> "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্,
> পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্,
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি ॥”

(৫)

একটি পরমায়ুহীন বৎসর রৌদ্রতপ্ত, মরুময় ব্যর্থ মানব জীবনের দুঃখগাথা বহিয়া নীরবে অনন্তকালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কে বলিতে পারে কত জন অকালে সংসার-ছাড়িয়া গিয়াছে!

একদিন সন্ধ্যাকালে বসন্তকুমার বহির্বাটীতে পা'চারি করিতেছেন। এমন সময়ে পিয়ন আসিয়া একখানি urgent telegram দিল—'Saroj in deathbed, come sharp with Bouma. টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া তিনি সরসীর নিকট যাইলেন। তাহাকে সকল কথাই বলিলেন—এবং আরও বলিলেন যে, পরদিবস সকাল ১০টার গাড়ীতে তাঁহারা দু'জনে সরসীর স্বামীকে দেখিতে যাইবেন। সরসীর চন্দন-চর্চ্চিত লজ্জারক্তিম সুন্দর মুখখানি বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল—তাহার সেই ইন্দিবর তুল্য প্রফুল্ল মুখখানি অস্তগমনোন্মুখ প্রভাত তারকায় ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। তাহার উজ্জ্বল ভাসা ভাসা চক্ষু দু'টি ম্লান জ্যোতিহীন হইল। ধীরে ধীরে সরসী তুলসী-মঞ্চবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। দেখিস্ মা তুলসি! যেন হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকে।

পরদিন প্রত্যূষে ডাকে একখানা চিঠি আসিল। বসন্তকুমার কম্পিত হস্তে তাহা খুলিলেন—যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল, তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যা আজ বিধবা, এ কথা ভাবিতেও তাঁহার হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল। আর সরসী—সে সব বুঝিল। তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল—এক জ্বালাময় তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত হৃদয় শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গেল। সে বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেল—তাহার সুকোমল কুন্তলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া মানুষ অকালে কালস্রোতে ভাসিয়া যায়। কাহাকেও আমাদের স্নেহাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই। আমাদের শত শত অনুরোধেও পৃথিবীর কঠোর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না; তাহার নির্ম্মম, নিষ্ঠুর নিয়ম-চক্র অন্ধবেগে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে আবর্ত্তন করিতে থাকে। কাহারও আগ্রহে, তপ্তশ্বাসে, হাহাকারে নিয়মের কুটিল গতি রুদ্ধ হয় না।

(৬)

আমাদের পাঠক পাঠিকা মনে করিতেছেন যে আমরা অভাগী সরসীর পিসীমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোরমা বাল-বিধবা। দশ বৎসরের সময় তাহার বিবাহ হয়। দুই বৎসর পরে তাহার স্বামী অভয়াচরণের মৃত্যু হয়। বিবাহের পর একবারমাত্র মনোরমা শ্বশুর ঘর করিয়াছিল—এই তার প্রথম আর এই তার শেষ। স্বামীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে মনোরমা পিতৃভবনে ফিরিয়া আইসে। সংসারে কেহ ছিল না বলিয়া বসন্তকুমার বিধবা ভগ্নীকে আপনার কাছেই রাখিলেন।

মনোরমার রূপ আমরা বর্ণনা করিব না। কালিদাস পার্ব্বতীর রূপ বর্ণনা-কালে ক্লান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনি-বেশিতেন। সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থ-সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব।" আমরাও বলি বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা হইয়া থাকিবেক যে অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য একত্র সংগ্রহ করিলে দেখিতে কেমন হয়। এই নিমিত্ত চন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যেখানে যত উপমা দিবার বস্তু ছিল, সে সমস্ত মনোরমা-শরীরের যথাযোগ্য অবয়বে সংস্থাপনপূর্ব্বক অতি যত্নে তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার সে সুষুমা-মণ্ডিত রূপরাশি বাক্‌পথাতীত।

এখন আর মনোরমা স্ফুটনোন্মুখী কলিকা নহে—প্রফুল্ল অম্লান পঙ্কজ। ভাদ্রের ভরা গঙ্গা,—দুকূল ভরা উচ্ছ্বাস। আমরা জানি সে অনেক দিন যৌবনের উদ্দাম, চঞ্চল প্রবৃত্তির সহিত ছুটিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃত স্বামীর স্মৃতি বুকে করিয়া কুৎসিত বাসনা দমন করিয়াছিল। কিন্তু পারে নাই। শেষে কলঙ্কের কালিমায়—তাহার সতীত্ব সরোজ ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। জ্যোৎস্নাত শরতের আকাশ নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মল। দূরে—অতিদূরে স্রোতস্বিনীর অস্ফুট মর্ম্মধ্বনি, সমীরণের কুসুম পরাগমিশ্রিত সুমন্দ আনন্দ-হিল্লোল প্লুত রাগিনীর ন্যায় চৌদিক ভাসাইয়া দিগ্‌দিগন্তে মিশিয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিয়া মনোরমা আজ কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া কোথায় যাইতেছে! এই গভীর নিশীথে কার তরে ছুটিতেছ! মনোরমা নির্ব্বাক্‌ 'মোহানার' তীর ছাড়িয়া পার্ব্বত্য-পথ ধরিল। বাতাসে উজ্জ্বল পাহাড়ী ফুলগুলি মনোরমার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। মনোরমা চলিল—কোথাও পথ বন্ধুর, কোথাও বিস্তৃত। কোথাও মাথার উপর লতায় লতায় জড়াইয়া একটি সুন্দর চন্দ্রাতপ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে

এক এক খণ্ড আকাশ স্বচ্ছ-স্ফটীক-মুকুতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। একটু দূরে, নিম্নে মৃদু কলনাদিনী ফুল্ল-নীরা 'মোহানা' একটি ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে—দূরে—বহুদূরে গিয়া কে জানে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে!

রাত্রি শেষে মনোরমা শ্বশুরালয়ের সম্মুখে আসিল। মনোরমার শ্বশুরালয়ের দৃশ্যপট ঠিক যেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। সম্মুখে অনন্ত কলনাদিনী জাহ্নবী কোন অজ্ঞাত মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে অনন্তের পথে ধাইয়াছে। মনোরমা সেই ভাগীরথী সৈকতে বসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিতে লাগিল—মা ভাগীরথি! তুমিই ত স্বর্গের একমাত্র সোপান; তোমারই পুণ্য প্রবাহে গা ঢালিয়া ষষ্ঠি সহস্র সগর-সন্তান স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিল। তোমারই শীতল বারি-বিন্দু স্পর্শ করিয়া সমীরণ জগতের সন্তাপ হরণ করিতেছে। আমার সন্তাপ কি যাইবে না? পরক্ষণে ভাগীরথীর পরপারে শ্মশান-সৈকতে দৃষ্টি পড়িল, অমনি মনোরমা কাঁদিয়া উঠিল। এই খানে তাহার স্বামী পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইয়াছিলেন. সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা—দুরন্ত শ্মশান-বায়ু চিতা-ভস্মের প্রত্যেক কণা উড়াইয়া দিয়াছে। সে চিতার এখন সামান্য চিহ্নও নাই।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে উষাদেবী হাসিতে হাসিতে আপন প্রিয়তম তরুণ তপনকে সঙ্গে করিয়া দেখা দিলেন। মনোরমা উঠিয়া ধীরে ধীরে জলের ধারে আসিল একবার হাতযোড় করিয়া উর্দ্ধদিকে প্রণাম করিল. তারপর পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিল। অনন্ত জলরাশি একবার উদ্বেলিত হইল, তারপর—তারপর সেই 'সুনীল বিতান তলে' নির্ম্মল সলিলা জাহ্নবী তর্ তর্ বেগে অনন্তের দিকে ধাবিল। ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ মিত্র।

প্রবাসের পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বম্বের জের।

প্রায় একমাস গত হইল বম্বে পরিত্যাগ করিয়াছি। সময়াভাবে এ পর্য্যন্ত তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। আজ বম্বের অবশিষ্ট দুই একটী কথা লিখিয়াই ২য় পত্র শেষ করিব।

বম্বে অনেকগুলি কল কারখানা আছে; তন্মধ্যে কাপড়ের কলগুলিই সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য আমরা একটী কল দেখিতে গিয়াছিলাম। সেটীতে রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কাপড়ের কলগুলির কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপ চলিতেছে। 'কি প্রকারে কলে কাপড় প্রস্তুত হয়,' দেখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এদেশে বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া, আমি এতই আনন্দ অনুভব করিতেছি যাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। বম্বে, যে কয়েকদিন ছিলাম, কেবল স্বদেশী আন্দোলনের আলোচনা করিয়াই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হইত। অনেকের বাঙ্গালা দেশের অবস্থা আমাদের মুখে শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, নূতন কিছুই আমরা বলিতে পারি নাই। তাঁহারা সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া যাহা অবগত হইতেছেন, তদতিরিক্ত কিছু বলিতে না পারিয়া আমরা বড়ই লজ্জিত হইতাম। প্রায় প্রতিদিন "ব্যাকবে"র ধারে সন্ধ্যা-সমিতির অধিবেশন হইত। সেই প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-শোভিত সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া, স্বদেশের কথা আলোচনা করিতে করিতে অন্তর-নয়ন স্মৃতিদ্বার অতিক্রম করতঃ অনন্ত-অতীতের অক্ষয় রাজ্যে প্রবেশ করিত। সেই অটল প্রতিজ্ঞা, অসীম বীরত্ব, অতুল উৎসাহ;—সেই অপ্রমেয় ধৈর্য্য, সতীত্ব, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি স্মরণ হইত। অনন্তময়ের অচিন্ত-ধ্বংসনীতি চিন্তা করিয়া অশ্রুপাত করিতে হইত। সমগ্র মানবের ক্ষুদ্র ইচ্ছা, শক্তি ও সাহসের উপর যে, অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত সাহস, অনন্ত কালের অঙ্গাবরণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া সর্ব্বশক্তিমানের শ্রীচরণে মস্তক আপনি নত হইয়া পড়িত। অবিশ্রান্ত চিন্তায় অন্তর পরিশ্রান্ত হইলে সকলে নীরবে বাসায় ফিরিতাম।

বম্বে বেশ আমোদে ছিলাম। তথায় বহু মহারাষ্ট্রী, পার্শী ও অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত মিশিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক উচ্চ। অন্য এক সময়ে এবিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(পূনা)

"বম্বে" হইতে "পূনায়" গিয়াছিলাম। তথায় একদিনের বেশী থাকিবার সুবিধা পাই নাই। বম্বে হইতে "পূনায়" যাইতে রেল-পথের উভয় পার্শ্বের

দৃশ্য বড়ই মনোমদ। "কল্যাণ" ষ্টেশন হইতে গাড়ী "ঘাট" বা "মলয়" পর্ব্বতে উঠিতে থাকে। গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইখানি এঞ্জিন্ জুড়িয়া দেওয়া হয়। স্তরে স্তরে পর্ব্বত শ্রেণী ; তাহার ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে যখন গাড়ী দৌড়াইতে থাকে, বোধ হয় যেন, 'পর্ব্বত সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গরাশি জড়াইয়া একবার নিকটে আসিতেছে, আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে।' "পূনা" যাইতেও কতকগুলি সুড়ঙ্গ পার হইতে হয়। আমার বিশ্বাস "বোম্বাই প্রদেশের সমস্ত অন্ধকার দিবসে ঐ কয়েকটী সুরঙ্গে আশ্রয় লইয়া প্রভাকরের প্রখর দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার পরামর্শ করে।" সেই অন্ধকারে কেহ লুকাইয়া থাকিলে সূর্য্যের কথা- দূরে থাকুক তাঁহার পুত্রের- পক্ষেও খুঁজিয়া লওয়া অসম্ভব।

"বম্বে" হইতে 'পূনা' ২০০০ ফিট উচ্চ, পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। পর্ব্বতের উপরে উঠিলে পূনা পর্য্যন্ত সমতল ভূমি। এই পূনা প্রবল প্রতাপ মহারাষ্ট্রপতি শিবজীর রাজধানী ছিল। এখন বিবেচনা কর, মহারাষ্ট্রীয়গণ কিরূপ অসীম বীরত্বে শূন্যমার্গে স্বাধীনতা সিংহাসন স্থাপন করিয়া অনন্তকালের বক্ষ চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"পূনা" দেখিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম ! যে শিবজী সামান্য কঙ্কনপ্রদেশের জায়গীরদার হইয়া অসাধারণ সাহস, বীরত্ব ও কৌশলে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন,—বিজাতি পদাশ্রিত দুর্ব্বল মহারাষ্ট্র জাতিকে উন্নত করিয়াছিলেন,—যাঁহার দুর্ভেদ্য কৌশলজাল ধূর্ত্ত-চূড়ামণি মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব পর্য্যন্তও ছিন্ন করিতে পারেন নাই ; সেই শিবাজীর সাধের রাজধানী পূনা দেখিয়া ভাবিলাম, একি সেই পূনা ? সে পুরাতন কীর্ত্তি সকল কোথায় ? যাহা দেখিলাম সকলই ইংরেজের নবীন কীর্ত্তি। বোম্বাই গবর্ণরের বাড়ী,—ইংরেজের সেনা-নিবাস ইত্যাদি সকলই নূতন। সিংহগড়, রায়গড় দুর্গ বিষাদে অধোদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শিবাজী চির অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার দুর্গ দুইটীও আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। পুরাতন দুইটী মন্দির আছে। একটী মন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলময় দেবাদিদেব মহাদেব, জগন্মাতা পার্ব্বতী ও গণপতিকে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে বিরাজ করিতেছেন। মহাদেব রজতনির্ম্মিত, এবং পার্ব্বতী ও গণেশ স্বর্ণ নির্ম্মিত। চতুঃসিংহ নামক আর একটী মন্দিরে হরপার্ব্বতি প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই মন্দিরের দেবদেবীর পূজা করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা

করিতেন। আমি একজন মহারাষ্ট্রীকে বলিয়াছিলাম,—"এই সকল বিগ্রহ-গণ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁদের সংকার করিয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া ফেলিবেন। ইহাঁরা জীবিত থাকিলে আপনাদের এ দশা ঘটিত না।

পূনা পর্ব্বত মস্তকে বড়ই সুন্দর সহর। একদিন মাত্র ছিলাম, সমস্ত সহর ঘুরিয়া ভালরূপ দেখিতে পারি নাই। দুর্গের ভিতর গিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রবেশের অনুমতি পাইলাম না। প্রার্থনা করিতেছি এবার মরিয়া যেন রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিতে পারি। পূনার কথা এই পর্য্যন্তই শেষ। তুমি পঞ্চবটীর কথা শুনিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছ, পর পত্রে লিখিব। কয়েকদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আবাহন।

নিশি দিন ডাকি তোমা' প্রাণাধিক! নীরবে গোপনে,
প্রাণের আহ্বান মম, পশেনা কি তোমার শ্রবণে?
উজ্জ্বল প্রেমের দীপ্তি ল'য়ে অঙ্গে সুমোহন বেশে
আর কি তেমন ক'রে মোর কাছে দাঁড়াবে না এসে?
শেফালি বকুল বেশে রচিয়াছি শয্যা সুকুমার,
যতনে তোমার তরে হে বাঞ্ছিত দেবতা আমার!
যুগল নয়ন ভ'রি রাখিয়াছি নিরমল জলে,
দানিতে প্রীতির পাদ্য প্রভো! তব রাঙ্গা পদতলে,
রাখিয়াছি প্রিয়তম, প্রেম-পুষ্পে অঞ্জলি রচিয়া,
পবিত্র সৌরভময় প্রণয়ের চন্দন মাখিয়া।
এস, এস, প্রাণাধিক, ব্যাকুল ভকত-আবাহনে
বিভাসিয়া দশ দিশি নিরমল লাবণ্য কিরণে।

প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বিশে-ডাকাত।

মুসলমান রাজত্বের পতন ও ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুত্থান সময়ে দেশে বড়ই চোর ডাকাতের উপদ্রব বাড়িয়াছিল। সে সময়ে অনেক বড় বড় ডাকাতের দলের কথা শোনা যাইত।

তখন নদীয়া জেলার মধ্যে 'ব'দে বিশে' ডাকাতের দল খুব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। বিশের নাম বিশ্বনাথ দাস, তাহার নিবাস নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আশাননগর গ্রামে ছিল; তাহারা জাতিতে বাগ্দী। বিশ্বনাথের পিতা অতিশয় দরিদ্রছিল, সে মজুর খাটিয়া কোন ক্রমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

বিশ্বনাথ ছেলেবেলায় অত্যন্ত সাহসী ও ক্ষমতাবান ছিল। গ্রাম্য-পাঠশালায় বিশ্বনাথ সামান্য লেখা পড়াও শিখিয়াছিল। কিন্তু সে লেখা পড়া শিক্ষা অপেক্ষা ব্যায়াম, কুস্তী, লাঠিখেলা করিতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিত ও অবসর পাইলেই ঐ সকল ব্যায়াম করিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বনাথ অতিশয় সাহসী ছিল। তাহার সমপাঠীরা যাহা করিতে সাহস করিত না; বিশ্বনাথ তাহা দর্পভরে সম্পন্ন করিত।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশে দেশে প্রচার হইল যে, বিশ্বনাথ একজন প্রধান ক্ষমতাশালী লোক। কিন্তু বিশ্বনাথ যেরূপ সাহসী ও ক্ষমতাবান পুরুষ ছিল, সে সৎসংসর্গে পড়িলে আজ বিশ্বনাথ ডাকাত নামে সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র হইত না। যাহা হউক শেষে বিশ্বনাথ অসৎ সংসর্গে পড়িয়া দস্যু ব্যবসায় আরম্ভ করিল।

বিশ্বনাথের কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল এই যে, সে যখন দু'টি লাঠির উপর চড়িয়া দৌড়িত তখন অশ্বারোহী অশ্ব ছুটাইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিত না। আর সে যখন লাঠি ঘুরাইত তখন ৫।৭ শত লোক কোনক্রমেই তাহার নিকট যাইতে অথবা তাহাকে আঘাত করিতে পারিত না।

কিন্তু বিশ্বনাথ ডাকাত হইলেও তাহার কয়েকটী মহৎ গুণ ছিল। তাহার ঐ রূপ গুণ না থাকিলে আজ আমরা তাহার কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। তাহার প্রধানগুণ, বিশ্বনাথ বড়ই মাতৃভক্ত ছিল, তাহার মাতা একটীবার যাহা করিতে বারণ করিতেন সে প্রাণান্তেও তাহা করিত না।

তাহার মা বলিয়াছিল, বিশে, তুই কখনও শিশু স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধের গায়ে হাত দিস না।" সেই হইতে বিশ্বনাথ কখনও স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুর অনিষ্ট করিত না। তাহার পরোপকারও উল্লেখযোগ্য। বিশ্বনাথ দীন হীন, অর্থের কাঙ্গাল দেখিলেই তাহাকে অর্থ সাহায্য করিত। বিশ্বনাথের এই সকল বিষয়ের অনেক গল্প শোনা যায়, আমরা এখানে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ত্রিবেণীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, শুনা যায় তিনি অতিশয় কৃপণ ছিলেন। একদিন বিশ্বনাথ ভদ্র বেশে তাঁহার নিকট যাইয়া বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়, কৃপণের ধনে কাহার অধিকার?" তর্কপঞ্চানন মহাশয় উত্তর করিলেন, "চোর, দস্যু ও রাজার।"

বিশ্বনাথ বলিল, মহাশয় আমাকে একখান ঐরূপ ব্যবস্থা লিখিয়া দিতে হইবে।"

পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "ব্যবস্থা কি অমনি হয় বাপু, টাকা চাই?"

বিশ্বনাথ তখনই তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের হাতে দু'টি টাকা দিয়া বলিল, "এখনই আমায় উহা লিখিয়া দিন।"

তর্কপঞ্চানন মহাশয় একখানি ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিলেন।

বিশ্বনাথ তখন বলিল, "মহাশয়, আমি 'বিশে ডাকাত', আপনি কৃপণ, কাজেই আপনার ধনে আমার অধিকার।" পণ্ডিত মহাশয় কৃপণ বলিয়া তাঁহার কিছু অর্থ জমিয়াছিল। সে কারণ তিনি সর্ব্বদা বিশ্বনাথ ডাকাতের নামে ভয়ে কাঁপিতেন, এখন সশরীরে তাহাকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্বনাথ বস্ত্র মধ্য হইতে একটী শাঁখ বাহির করিয়া উচ্চ রবে বাজাইয়া দিল। শাঁখের গম্ভীর স্বর দিক হইতে দিগন্তরে মিশিতে না মিশিতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সশস্ত্র দস্যু পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল।

পণ্ডিত মহাশয় তখন অর্দ্ধজ্ঞান লুপ্ত ভাবে থর থরি কাঁপিতেছে। বিশ্বনাথ অভয় দিয়া বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় আপনার বিশেষ ভয় নাই, আমি মাতৃ আজ্ঞায় কোন স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিই না; আপনি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া, মাতাঠাকুরাণীদের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাইয়া তাঁহাদের বলুন যে, তাঁহারা তাহাদের অলঙ্কার, বস্ত্রাদি লইয়া অন্যস্থানে আশ্রয় লউন, আমি কেবল আপনার অর্থাদি লইবমাত্র।"

অগত্যা তাহাই হইল। মুহূর্ত্তে পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী লুঠ করিয়া বিশ্বনাথ দলবল সহ চলিয়া গেল। শুনা যায়, সেই হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় আর কখনও কৃপণতা করিতেন না।

বিশ্বনাথ গুণীর আদর বড়ই করিত। সে যদি কখনও তাহার ন্যায় বলবান লোক দেখিত, তবে আদর করিয়া তাহাকে আরও উৎসাহ দিত। এমন কি তখন বড়ই ডাকাতের ভয় ছিল বলিয়া যাহাতে সকলেই নিজে নিজে ক্ষমতাবান হইয়া নিজের অর্থ রক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিশ্বনাথ স্থানে স্থানে 'আখড়া' করিয়া সকলকে আগ্রহের সহিত লাঠি খেলা ও কুস্তী কৌশল শিখাইত। নিম্নে সে বিষয়ের একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম।

শেষে বিশ্বনাথের এতদূর সাহস হইয়াছিল যে, সে যখন কোথাও ডাকাতী করিতে যাইত, তৎপূর্ব্বেই সেখানে সে পত্র লিখিয়া তাহা জানাইত।

একদা বিশ্বনাথ আশানগরের ৫ মাইল পশ্চিম মহারাজপুর * গ্রামে পিতাম্বর ক'লের বাড়ী ডাকাতী করিতে যাইবে বলিয়া দিন স্থির করিয়া পত্র দেয়। অবশেষে ধার্য্য দিনে বিশ্বনাথ শিবিকা যোগে (বিশ্বনাথ যখন কোথাও ডাকাতী করিতে যাইত তখন শিবিকা যোগেই যাইত) দলবল সহ মহারাজপুর যাত্রা করিল। সন্ধ্যার সময় পথিমধ্যে বিশ্বনাথের দল, দেখে একটী লোক একটী বটগাছের বৃহৎ ডাল নোয়াইয়া গরুকে গাছের পাতা খাওয়াইতেছে; বিশ্বনাথ তাহা দেখিয়াই তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইল (কারণ বটের ডালটি অতিশয় বড় ও খুব উচ্চে ছিল)। বিশ্বনাথ তখন সেখানে শিবিকা রাখিয়া তাহাকে ডাকিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় জানিল যে, তাহার নাম জগন্নাথ ক'লে জাতি কৈবর্ত্ত দাস, (বর্ত্তমানে মাহিষ্য হইয়াছে)। তখন বিশ্বনাথ তাহাকে পিতাম্বর ক'লের বাড়ী দেখাইয়া দিতে বলিল। জগন্নাথ বলিল, "আমারই পিতার নাম পিতাম্বর, আমার সঙ্গে আসুন আমি লইয়া যাইব।

পিতাম্বর ক'লে বিশ্বনাথকে আসিতে দেখিয়াই অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে বসিতে দিল ও তৎক্ষণাৎ বিশ্বনাথকে ১০০৲ টাকা 'নজর' দিল ও মহা সমারোহে রাত্রিকালে আহারের বন্দোবস্ত করিল।

বিশ্বনাথ, জগন্নাথ ক'লের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বেই তাহাদের বাড়ী

---

* বর্ত্তমানে মহারাজপুরের অতি শোচনীয় অবস্থা, আর ২৫ বৎসর পরে ঐ গ্রামের নাম ও থাকিবে কিনা সন্দেহ।

ডাকাতী করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে পিতাম্বর ক'লের সৌজন্যতা দেখিয়া আরও মুগ্ধ হইল। নানাবিধ আমোদ-আহ্লাদে সে রাত্রি অতি বাহিত হইল।

পরদিন প্রাতে পিতাম্বর ক'লের বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইল। বিশ্বনাথ নিজে ও তাহার দলের বৈদ্যনাথ ও কাশীনাথ প্রভৃতি সকলে অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাইল। জগন্নাথ ক'লে বলিল, "আমি পাগল ক্ষেপা মানুষ, কিছুই জানি না তবে সামান্য একটু ধনুর্ব্বাণ বিদ্যা জানি, সারি সারি ৫০।৬০টী কলা গাছ পুঁতিলে আমি তীর মারিয়া ঐ সমস্ত গাছ ভেদ করিয়া তীর চালাইতে পারি ও লক্ষ্য স্বরূপ কয়েকটী কলসী উপুর করিয়া তাহাতে সিন্দূর বিন্দু লাগাইলে আমি তীর মারিয়া ঐ সমস্ত চিহ্ন ঠিক লক্ষ্য করিয়া তীর চালাইতে পারি। তখনই উভয় পরীক্ষা লওয়া হইল। জগন্নাগ ক'লের অসাধারণ ধনুর্ব্বাণ বিদ্যার পরিচয় পাইয়া বিশ্বনাথ খুব প্রশংসা করিতে লাগিল ও নিজ দলে থাকিবার জন্য জগন্নাথ ক'লেকে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাহাতে জগন্নাথ বলিল, "আমি ডাকাতী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক নই।" তখন বিশ্বনাথ তাহাকে উৎসাহ দিয়া ফিরিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বনাথের দয়াও একটী প্রধান গুণ। একদিন বিশ্বনাথ নদীর ধার দিয়া যাইতে, দেখে একটী ব্রাহ্মণ নদী-তীরে বসিয়া কাঁদিতেছে। ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে বিশ্বনাথের দয়ার উদ্রেক হইল। তাহাকে ডাকিয়া জানিল যে, ব্রাহ্মণের সম্প্রতি মাতার বিয়োগ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বিদেশে পাচকগিরী কর্ম্ম করিয়া মাসে মাসে মায়ের নিকট ৫টী করিয়া টাকা পাঠাইত। তাহার মা সেই টাকা জোগাড় করিয়া কিছুদিন হইল তাহার বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার মাতার সঙ্গে তাহার স্ত্রীরও মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া প্রায় ৩০০৲ টাকা জোগাড় করিয়া তাহার দ্বারা কোন ক্রমে মাতার শ্রাদ্ধ করিবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু অদ্য একজন দস্যু আসিয়া তাহাও কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ আরও ক্রন্দনের মাত্রা বাড়াইল। ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে দস্যুর অন্তকরণও কাঁদিল। বিশ্বনাথ দস্যু বটে, কিন্তু এখন কয়জন মহানুভব ব্যক্তির ঐরূপ হৃদয় কাদিয়া থাকে! বিশ্বনাথ তাহাকে তখনই সহস্র টাকা দিয়া বলিল, "আপনি ইহাতে আপনার মায়ের শ্রাদ্ধ ও বিবাহ করিবেন।" ব্রাহ্মণ সহস্র টাকা পাইয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। হায়! বঙ্গদেশে এইরূপ

ক্ষমতাবান মহানুভব ব্যক্তির স্মৃতিও থাকে না। ইহা বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য বই আর কি?

বাল্যকালে বিশ্বনাথের প্রকৃতি মন্দ ছিল না সে অসৎ-সংসর্গে না মিশিলে আজ তাহার নাম বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইত। বিশ্বনাথ ডাকাত হউক, সে কিন্তু ভীরু বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। এক কথায় তখন কেবল বিশ্বনাথ কেন বাঙ্গালায় অনেক বীরপুরুষ ছিলেন। এখন আমরা এমনই সভ্য হইতেছি যে, তাহাদের জীবনী আলোচনা করিতেও লজ্জা বোধ ভিন্ন গৌরব অনুভব করিনা ইহা বঙ্গদেশের একটী প্রধান দুর্ভাগ্য।

যাহা হউক কিন্তু শেষে হক সাহেব কর্ত্তৃক বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ ধরা পড়িয়াছিল। ও বিচারে তাহাদেয় নিজ জন্ম ভূমির উপর ফাঁসী হইয়াছিল।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

লজ্জাবতী।

নীরব নিকুঞ্জে বসি' কে গো একাকিনী?
সরলা অমলা প্রায় বিনীত বদনী;
অমল ললাটে ধরি' সতীত্বের রবি
বসিয়া রয়েছ? নমঃ সরগের দেবি!
ঢাকিও না লাজ ভরে অমল বদন
ভয় কি? ভেবনা, আমি দেবনা চুম্বন।
প্রাণ ভরি' চারু মুখে সুধা মাথা বাণী
চলিয়া যাইব ফিরে দূর হ'তে শোনি,
বুঝিয়াছি তুমি দেবি! লোক লাজ রাণী
লাজে ভয়ে জড়মড় জগৎ মোহিনী।
তোমার সতীত্ব-স্রোত ধরণীর গায়,
মধুর কল্লোলে বয় মন্দাকিনী প্রায়,
আমি বড় ভাল বাসি লজ্জাশীলা সতী,
ছোবনা ছোবনা লাজ পাবে লজ্জাবতী।

মহাম্মদ হারুণ।

দ্রৌপদীর প্রতি।

বীরকুল বধূ তুমি, বীর প্রসবিনী,
স্বাধীনতা শান্তি আশে, প্রাণ প্রিয়তমে
অধিক্ষেপ শরজালে বিধিলে যেমন
ওজস্বিভাষায়, পাঠাইতে রণাঙ্গণে,
সে শিক্ষায় সে দীক্ষায় সেই সে সাহসে
শিক্ষিত দীক্ষিত ক'রে অবলা নামের
সার্থক কারিণী এই ভারত নারীকে
বলতো গো! বীরাঙ্গণা কেন না করিলে?

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

মাসিক সংবাদ।

ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদে দুই কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন। আগামী ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত ঋণ দানেচ্ছুকেরা আবেদন করিতে পারেন।

মান্দ্রাজ রেলের মান্দ্রাজ-কলিকাতাগামী একখানা ট্রেণ উল্টাইয়া দিবার জন্য পাক্র সেতুর শেষ ভাগে দুইখানা রেল সরাইবার কে চেষ্টা করিয়াছিল। অপরাধীকে যে ধরিয়া দিবে, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন।

ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীন আফিসগুলির কেরাণীরা বড়লাটের নিকট বেতনবৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, গত ৪০ বৎসর যাবৎ একইরূপ বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। আহারীয় দুর্ম্মূল্য প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি করিলে বেতন হার বৃদ্ধি করা উচিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মসীজীবীকুলের আবেদন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার একটা কমিটীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে সুলভে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাইতে পারেন তজ্জন্য আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে অরিজিন্যাল আমেরিকান্ ডাইলিউশন্ আনাইয়া অতি সামান্য (নাম মাত্র) লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতেছি। আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতা একবারমাত্র পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বোরিক এণ্ড ট্যাফেলের অরিজিন্যাল আমেরিকান্ ডাইলিউশন্—মূল্য নিম্নক্রম ১ হইতে ১২ পর্য্যন্ত—প্রতি ড্রাম ।০ আনা। উচ্চক্রম ।৵০ হইতে ৸৵০ আনা। বোরিকের ব্যাক্ ডাইলিউশন হইতে আমাদের নিজ ডাইলিউশন প্রস্তুত হয়, মূল্য—/৫ ও /১০ পয়সা। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান যায়।

ঔষধ পূর্ণ বাক্স।
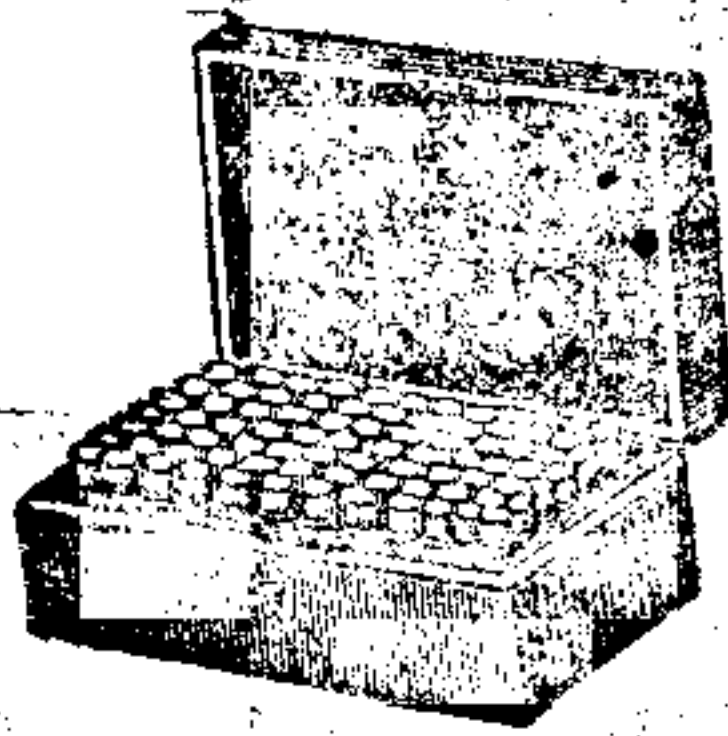
কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স।

কলিকাতা ডাইলিউসন।

এক শিশি ক্যাম্ফার, একখানি পুস্তক, একটি ফোঁটাফেলা যন্ত্রসহ মূল্য

১২ শিশি	২৲
২৪ ,,	৩৲
৩০ ,,	৩॥০
৪৮ ,,	৫।০
৬০ ,,	৬।০
১০৪ ,,	১১॥০

কলেরা ও গৃহচিকিৎসার বাক্স।

আমেরিকার ডাইলিউসন্।

এক শিশি ক্যাম্ফার, একখানি পুস্তক ও ১টী ফোঁটাফেল যন্ত্রসহ মূল্য

১২ শিশি	৪৲
২৪ ,,	৭॥০
৩০ ,,	৮॥০
৪৮ ,,	১২॥০
৬০ ,,	১৫৲
১০৪ ,,	২৩॥০

হোমিওপ্যাথিক প্রচার।

হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক-পত্র বার্ষিক মূল ১॥০ টাকা। আমাদের ঔষধের নিমিত্ত গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে মাসিক-পত্র দেওয়া যায়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে দিয়া থাকি।

১৪নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোষ্ট বক্স নং ৩২৪ কলিকাতা।

১। অমরাবতী

উপন্যাস প্রকাশিত করিলাম। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

মনোরম,—লোমহর্ষণ,—হৃদয় উদ্বেলক,—ছত্রে ছত্রে মাধুরী।

ইহা একটী সংসারের বিচিত্র চিত্র।

বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার সুন্দর দৃশ্য—

প্রেমের জ্বলন্ত প্রতিমা।

ইহার মূল্য ধরিলে ১॥০ দেড় টাকা, কিন্তু "অবসরের" গ্রাহকগণকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিব, একটি পয়সাও দিতে হইবে না।

২। মুরলা।

নূতন ছাঁচে ঢালা একখানি অতি মনোরম উপন্যাস। পুরাকালে কাপালিকগণ যেমন নরবলির দ্বারা শক্তির উপাসনা করিত, সূর্য্যোপাসকগণ তেমনই সুন্দরী যুবতী রমণী অপহরণ করিয়া তাহার সহিত তাহাদের আরাধ্য দেবতার কাল্পনিক বিবাহ দিত এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহাকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিয়া সময় অতীত হইলে আগ্নেয়গিরি-গহ্বরে নিক্ষেপ করতঃ উৎসর্গ করিত। এই লোমহর্ষণ ভয়ানক রহস্য যদি পাঠ করিবার বাসনা থাকে তবে "মুরলা" পাঠ করুন। রমণীর নিঃস্বার্থ প্রেম, বিপদে তাহার অতুল গাম্ভীর্য্য ও সাহস, অসভ্যের উপর সভ্য জগতের প্রভুত্ব, প্রবল ধনলিপ্সার অপূর্ব্ব পরিণাম এই সমস্তই ইহাতে একাধারে দেখিতে পাইবেন। মূল্য ১৲।

এই দুইখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক গ্রাহকগণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাইবেন। হাতে লইলে একপয়সাও অতিরিক্ত খরচ নাই। ডাকে লইলে ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচা বাবদ ।০ চারি আনা। অর্থাৎ অবসরের বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা ও উপহার পুস্তকের ডাকমাশুলাদি ।০ চারি আনা একুনে এক টাকা চারি আনা।

যাঁহারা হাতে লইবেন, কাগজের সডাক মূল্য ১৲ এক টাকা দিলেই উপহার পুস্তক ও এক বৎসর কাগজ পাইবেন।

শ্রীনবকুমার দত্ত।

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা